বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস

শ্রী বরুণকুমার চক্রবর্তী
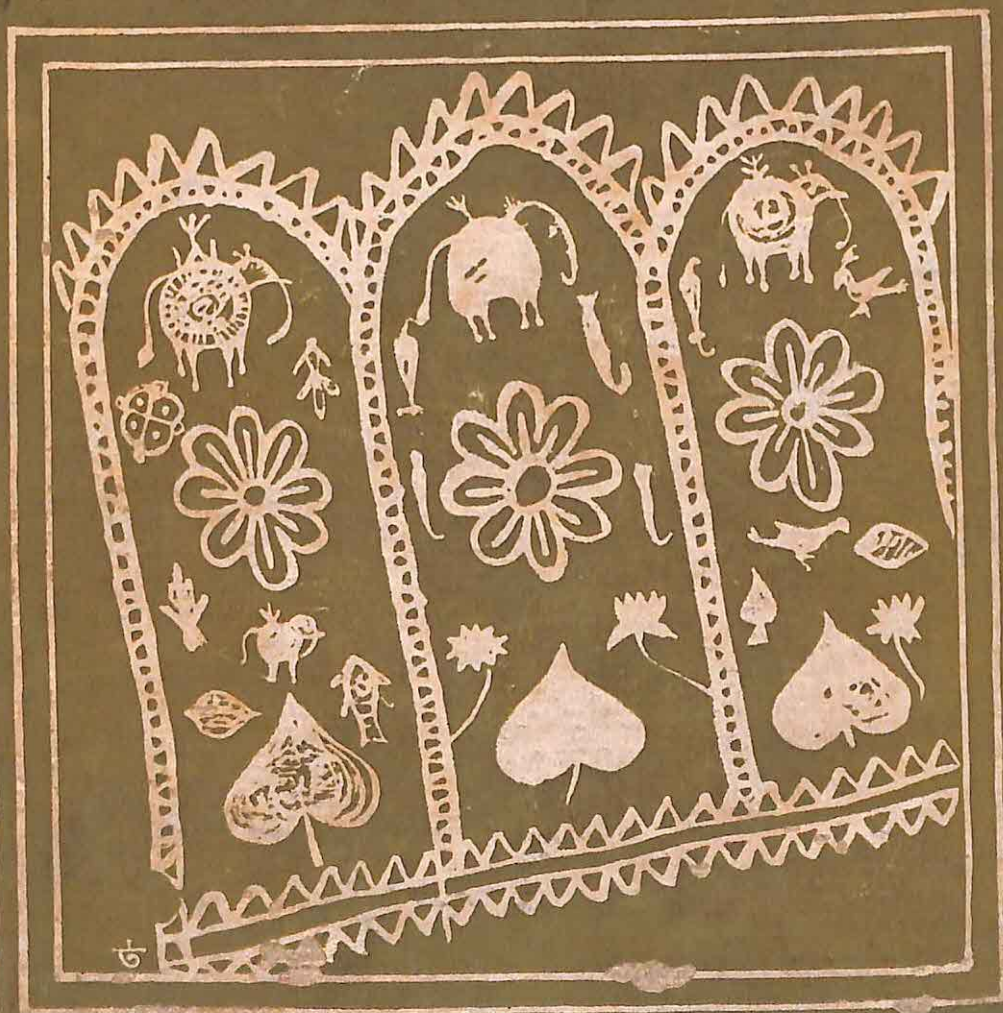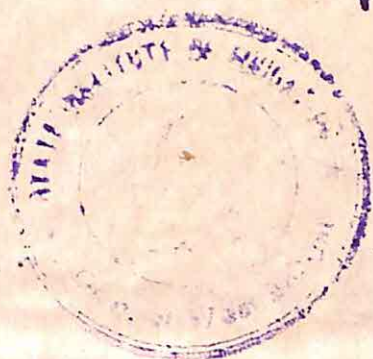
বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস

"গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে ; তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয়, স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য ; সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা
লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস

ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী এম. এ. পি. এইচ. ডি.

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

Bangla Lok Sahitya Charchar Itihash

[History of Folk-Literature Studies in Bengal]

প্রথম সংস্করণ : শ্রীপঞ্চমী, ১৩৮৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : জন্মাষ্টমী ১৩৮৭

প্রচ্ছদ শিল্পী : তপন কর

'স্নায়ন'
প্রকাশক : অমল কুমার সাহা
১১৬, কার্ল মার্কস সরণী,
কলিকাতা-৭০০০২৩

মুদ্রক : অমল কুমার সাহা
এ. কে. প্রিন্টার্স
১১৬, কার্ল মার্কস সরণী,
কলিকাতা-৭০০০২৩

মূল্য : তিরিশ টাকা

শ্রীচরণেষু

মা ও বাবাকে

প্রস্তাবনা

বিদ্যা হিসাবে লোকসাহিত্য চর্চার বোধন হয়েছিল জার্মানিতে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে য়াকেব ও বিল্‌হেল্‌ম গ্রিমের সংগৃহীত গল্পমালার প্রথম খণ্ডের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক এই সালেই আমাদের এই বঙ্গভূমিতে এক বিদেশী বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক অনুরূপ বাংলা গল্পমালা ছাপিয়ে ছিলেন। যে কোন কারণে হোক বইটি প্রকাশিত হয় নি। সেই কারণে আমরাও আমাদের ন্যায্য গৌরবের একটুকুও পাই নি। সম্প্রতি ফাদার ছ্যতিয়েন কেরির সংকলনটি ছাপিয়েছেন। বইটির ইংরেজী অনুবাদও বেরিয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বাংলায় লোক সাহিত্যের চর্চার ইতিহাস দীর্ঘকালের। তবে আশি-নব্বই বছর আগে রবীন্দ্রনাথ কলম না ধরলে আজও কেরিদের কৃতিত্ব আমাদের কাছে উপেক্ষিতই রয়ে যেত। সুতরাং কেরির কৃতিত্ব কিছুমাত্র খর্ব না করেও বলতে পারি যে আমাদের লোকসাহিত্য চর্চায় হাতে খড়ি দিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু হাতেখড়ি নয় এ বিষয়ে আমাদের গায়ত্রী মন্ত্রও কানে দিয়ে গেছেন। এখনকার দিনে অনেকে লোকসাহিত্যের আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি কেউই এ বিষয়ে সত্যকার নূতন আলোক-পাত করতে পারেন নি।

পারা সহজও নয়। লোকসাহিত্য এম্‌-এর পাঠ্য বিষয়ও নির্ধারিত হয়েছে। সহজ ও মুখরোচক বিষয় এই জন্যে এবং অন্য কোন কঠিন বিষয়-নিরপেক্ষ মনে করে অনেকেই পড়েন। তাই এ বিষয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে ও হচ্ছে। প্রবন্ধও অনেক বেরিয়েছে।

এই গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলির আলোচনা করেছেন শ্রীমান্ বরুণ চক্রবর্তী। এঁর এ বিষয়ে ঔৎসুক্য আছে, যোগ্যতাও আছে। শিশুপাঠ্য ভালো বইও লিখেছেন ইনি।

বিষয় গৌরবে ও আলোচনার গুণে 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস' বইখানির যথোপযুক্ত সমাদর হবে বলে মনে করি।

২২শে নভেম্বর, ১৯৭৭

সূচীপত্র

ভূমিকা

১. পূজার আগে যেমন আচমন, আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, দেহশুদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপারগুলি, অনুরূপভাবে 'বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার ইতিহাস' প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে 'লোক-সাহিত্য' কথাটির সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নেওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতেই দেখা যাচ্ছে যে 'লোক-সাহিত্য' বিষয়টি 'লোক-সংস্কৃতি' নামক বিজ্ঞানঋদ্ধ একটি শাস্ত্রের অত্যন্ত সুপুষ্ট এক উপাঙ্গ অর্থাৎ যদি বিজ্ঞানের ভাষায় 'লোক-সংস্কৃতি'কে genus বলি, তবে 'লোক-সাহিত্য' হলো species। অবশ্য 'লোক-সংস্কৃতি' শব্দটি কে আমরা এখানে ইংরেজি Folklore এর প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় গ্রহণ করেছি। অতএব 'লোক-সংস্কৃতি' যে বিরাট বিষয়কে তার জ্ঞান-রাজ্যের অন্তর্গত করেছে, 'লোক-সাহিত্য' তারই এক ঐতিহ্যসম্পন্ন ও বৈচিত্র্যময় প্রদেশ। প্রথমে আমরা 'লোক-সংস্কৃতি' শব্দটি প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলবো ; যদিও এই 'লোক-সংস্কৃতি' বা Folklore শব্দটির সংজ্ঞা নিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে (১) তবুও সেই মত তর্ক-কণ্টকিত জটিল পথে সাবধানে প্রবেশ করে এই সত্য-কুসুম চয়ন করতে পারি যে, একই রূপ ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক পরিবেশে বিশেষ এক এক জনগোষ্ঠী যে আচার, আচরণ, জীবনচর্চা, সাহিত্য, শিল্প ও ললিত কলা ইত্যাদির ঐতিহ্যানুযায়ী অনুশীলনে স্বাভাবিক পারঙ্গমতা অর্জন করে, তার আলোচনা, বিচার, সংরক্ষণ, চর্চা প্রভৃতিই 'লোক-সংস্কৃতি' বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। যেমন লোকাচার [Folk Customs], লোক-বিশ্বাস [Folk Beliefs], লোক-উৎসব [Folk Festivals], লোক-শিল্প

[Folk Art] ,লোক-নৃত্য [Folk Dance], লোক-ধর্ম [Folk Rituals], লোক-সংস্কার [Folk Superstitions], লোক-সাহিত্য [Folk Literature] ইত্যাদি। অর্থাৎ এককথায় 'লোক-সংস্কৃতি' শব্দটির মধ্যে সমগ্র মানব-সমাজের অন্তর্গত বিশেষ এক এক জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় বিধৃত হয়ে থাকে—যাকে আমরা সেই সেই জনগোষ্ঠীর দর্পণ বলে অভিহিত করতে পারি। একজন প্রখ্যাত লোক-সংস্কৃতিবিদ্‌কে অনুসরণ করে এবিষয়ে বলতে পারি ঃ

> 'Folklore is the material that is handed on by tradition, either by word or mouth or by custom and practice. It may be folksongs, folktales, riddles, proverbs or other materials preserved in words. It may be traditional tools and physical objects like fences or knots, hot cross buns or Easter eggs ; traditional ornamentation like the walls of Troy or traditional symbols like the Swastika. It may be traditional Procedures like the throwing salt over ones shoulder or knocking on woods. It may be traditional beliefs like the notion that elder good for ailments of the eye. All these are folklore'. (২)

অতএব দেখা যাচ্ছে যে 'লোক-সংস্কৃতি'র ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের ভূমিকাটিই প্রধান। সমগ্র মানব সমাজের অন্তর্গত বিশেষ এক জনগোষ্ঠী—যাকে আমরা 'লোক' (folk) বলতে পারি,—'পৈতৃক সম্পত্তির মত এগুলি বিনা দ্বিধায়, বিনা বিচারে গ্রহণ করে ও পালন করে'। (৩) জ্ঞানলাভের পর থেকেই বিশেষ মানব-গোষ্ঠীভুক্ত শিশু সেই গোষ্ঠীজীবনে যে সব রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সংস্কার প্রভৃতির মধ্যে বর্ধিত হয়, এবং প্রতিনিয়ত তার চেতনা তথা মানসিকতা সেই বিশেষ বাতাবরণে গড়ে উঠতে থাকে, পরিণামে সেই সংস্কৃতিই তার মজ্জাগত বা স্বভাবজ হয়ে যায়। এই ভাবে 'লোক-সংস্কৃতি'র ধারা যুগ-যুগান্তরের সীমানা পেরিয়ে, ভাবীকালের পথে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে, উত্তরাধিকারকে সঙ্গী করে নিয়ত বহমান।

এই কথায় পৌঁছানোর পরেই এরকম প্রশ্ন হতে পারে যে, যেহেতু 'লোক-সংস্কৃতি' ঐতিহ্যবাহিত এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এক ঋক্‌থ বিশেষ, সেহেতু এখানে নতুনের কোন জায়গা নেই,—সজীবতা ও তারুণ্যের দক্ষিণের জানালা এখানে চিররুদ্ধ। কিন্তু গভীর ভাবে 'লোক-সংস্কৃতি'র আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে উক্ত ধারণা যথার্থ নয়। কারণ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা জানাচ্ছে যে 'লোক-সংস্কৃতি'র বিষয়ে, ভাবে অর্থাৎ তার সামগ্রিক প্রত্যঙ্গে নিত্য নূতন উপাদান সংযোজিত হয়েছে,— এমনকি আজও হচ্ছে। এই ভাবে নিত্যনতুনকে স্বীকার করে না নিলে অন্য অনেককিছুর মতো 'লোক-সংস্কৃতি' ও বৈচিত্র্যহীন, গতানুগতিকতার সংকীর্ণ দহে বাধা পড়ে যেতো। আর পরিণামে তার আয়ুষ্কালও হতো নিঃশেষিত। এই প্রসঙ্গে একথা তো মানতেই হবে যে 'লোক'-এর অন্তর্গত মানুষেরাও মানুষ এবং দীর্ঘ বিবর্তনের পথে নিয়ত-বিবর্তিত। তবে এক্ষেত্রে একথাও স্মর্তব্য যে এই পরিবর্তন ব্যক্তির অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের দ্বারা গৃহীত বা আহৃত হলে চলবে না; বিশেষ জন-গোষ্ঠীর সামগ্রিক অভিজ্ঞতার জারক রসে সেই নতুনকে জারিত হয়ে আসতে হবে। তবেই তা 'লোক-সংস্কৃতি'র উদার আসরে আসন পাবে। এই বহমানতা এবং নবীনত্বই 'লোক-সংস্কৃতি'র প্রাণ। স্বাভাবিক জ্ঞানে আমরা জানি যে, ভৌগোলিক পরিবেশ, অর্থ-নৈতিক অবস্থা প্রভৃতির ভিন্নতার কারণে এক 'লোক'-এর সংস্কৃতির সঙ্গে অপর এক 'লোক'-এর সংস্কৃতির পার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেকার 'লোক-সংস্কৃতি'তে উপাদানগত কিংবা গুণগত সাদৃশ্যও যে দেখা যায় না, এমন নয়। এক্ষেত্রে একস্থানের সংস্কৃতি অন্যস্থানে গৃহীত হওয়া ছাড়াও একই রূপ-পরিবেশ, জীবনবোধ ও অভিজ্ঞতা অনেক সময় সাদৃশ্য-মূলক সাংস্কৃতিক উপাদান রচনায় সক্রিয় হয়েছে,—এমন মন্তব্যও করা যেতে পারে। অধিকন্তু, 'লোক-সংস্কৃতি'র আলোচনা

প্রসঙ্গে একথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে 'লোক-সংস্কৃতি' জীবন্ত মানুষেরই সৃষ্টি, যে মানুষ একই প্রবৃত্তি, একই ভৌতিক বা আধিভৌতিক বিশ্বাস-দুঃখ এবং আনন্দে বিতাড়িত হয়ে যুগ যুগ ধরে দেশে দেশান্তরে বসবাস করছে। ওপরের আলোচনাকে সংঘবদ্ধকরে 'লোক-সংস্কৃতি' কি এই প্রশ্নের একটি সংহত চেহারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় জনৈক লোক-সংস্কৃতিবিদ্‌কে অনুসরণ করে বলতে পারি, 'এক কথায় এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তবে এযাবৎ আলোচনায় আমরা কতকগুলো বিষয় পেয়েছি সেগুলো এক একটি মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি, যারা একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করে, যাদের জীবনব্যবস্থা, ভাষা, জীবিকা ও ঐতিহ্যের অবলম্বন একই সূত্রে গ্রথিত। ফোকলোর সাধারণ মানুষের সৃষ্টি অশিক্ষিত মানুষ মুখে মুখে এগুলোর সৃষ্টি করে এবং সব ক্ষেত্রেই তা ব্যক্তির সৃষ্টি, তবে মাঝে মাঝে দলগত ভাবেও সৃষ্টি হতে পারে, যেমন কোন কোন সঙ্গীত বা গীতিকা, হেঁয়ালী, ক্ষুদ্র কাহিনী প্রবাদ ইত্যাদি। তবে ব্যক্তির বা ব্যষ্টির সৃষ্টি হলেও কালের প্রবাহে যখন সেই সৃষ্টি একটি ব্যাপক জনসমাজের সামগ্রী হয়ে ওঠে, তখনই তা ফোকলোর হয়। এগুলো সাধারণতঃ মুখে মুখেই জন্মলাভ করে এবং মুখে মুখেই পূর্বপুরুষের নিকট থেকে পরবর্তী পুরুষে চলে আসে, লালিত হয়, এবং বেঁচে থাকে। মুখে মুখেই এগুলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে এবং এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে ভ্রমণ করে। ফোকলোর-এর অনেক অংশ আছে যেগুলো শুধু মুখে মুখে সৃষ্টি হয় না, কোন একজন মানুষ পুঁথিগত বিদ্যার স্পর্শ ছাড়াই কোন একটি বস্তু উদ্ভাবন করতে পারে বা শিল্প সৃষ্টি করতে পারে এবং অন্য লোক এই উদ্ভাবিত বস্তু দেখে বা শিল্পকে অনুসরণ করে তার প্রস্তুত-প্রক্রিয়া শিখতে পারে। ধীরে ধীরে এই বস্তু বা শিল্প একটি বিশেষ মানব-গোষ্ঠীর সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং কালের প্রবাহে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করে।

এছাড়া ফোকলোর-এর কোন কোন অংশ লিখিত অবস্থাতেই সৃষ্টি হতে পারে আর লিখন-পদ্ধতির মাধ্যমেই এগুলো লালিত হয় এবং কালোত্তীর্ণ আয়ু লাভ করে। এছাড়া অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেও ফোকলোর-এর কোন কোন অংশ সৃষ্টি হয় এবং অপরেরা এগুলো দেখে আয়ত্ত করে থাকে। কালে কালে এগুলো একটি মানবগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে অন্য সমাজ বা দেশও এগুলো গ্রহণ করতে পারে।' (৪)

২.

'লোক-সংস্কৃতি' সম্পর্কে ওপরে প্রারম্ভিক আলোচনার পর এইবার আমরা 'লোক-সংস্কৃতি'র সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ শাখা 'লোক-সাহিত্য' বিষয়ে আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি।

এই কাজে প্রবৃত্ত হয়ে প্রথমেই আমরা চরিত্র এবং গঠন-প্রকৃতি অনুসারে 'লোক-সংস্কৃতি' বা Folklore-কে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করতে পারি: (ক) বস্তু-নির্ভর 'লোক-সংস্কৃতি' বা Material Folklore এবং (খ) অ-বস্তুনির্ভর 'লোক-সংস্কৃতি' বা Non-material Folklore. (৫) এই দুই ভাগের মধ্যে প্রথম ভাগের 'লোক-সংস্কৃতি'র অন্তর্গত হলো পোষাক-পরিচ্ছদ, কুটির-শিল্প, লোক-ভাস্কর্য, বিভিন্ন শ্রেণীর পাত্র বা দেওয়াল চিত্র ইত্যাদি। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে লেখ্য ব্যাপারের কোনো সাহায্য ছাড়াই বিশেষ জন-গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি যে সকল বস্তুকে রূপায়িত করে তাই-ই হচ্ছে 'বস্তু-নির্ভর লোক-সংস্কৃতি'। অপর পক্ষে, আমাদের আলোচ্য 'লোক-সাহিত্য' [Folk Literature] হচ্ছে 'লোক-সংস্কৃতি' বিদ্যার অ-বস্তু বা Non-material Folklore বিভাগের অন্তর্গত। এবং যেহেতু একথা আগেই বলে এসেছি যে, 'লোক-সাহিত্য', 'লোক-সংস্কৃতি' নামক একটি বিজ্ঞান-ঋদ্ধ বিষয়ের (৬) সমৃদ্ধতম শাখা, সেহেতু 'লোক-সাহিত্য'-এর সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা পৃথকভাবে বলার প্রয়োজন আছে।

অবশ্য একথা ঠিক যে পূর্বের আলোচনায় 'লোক-সংস্কৃতি' কথাটির তাৎপর্য এবং সীমাকে যদি চিহ্নিত করে থাকতে পারি, তবে তারই অনুষঙ্গে 'লোক-সাহিত্য' কথাটিরও প্রকৃতি ও স্বরূপ অনালোচিত থাকে নি। তবুও যে হেতু কেবল 'লোক-সাহিত্য' চর্চার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের চিত্র ফুটিয়ে তোলা আমাদের উদ্দেশ্য, সেহেতু পৃথক অনুচ্ছেদ রচনার দ্বারা 'লোক-সাহিত্যে'র স্বরূপ ও সংজ্ঞা এবং উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে তার মিল বা পার্থক্যটিকে প্রকাশ করা বিধেয় বলে মনে করি।

এ বিষয়ে আলোচনার সূচনাতেই দেখতে পাচ্ছি যে একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক 'লোক-সাহিত্যে'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন ঃ 'Folk literature is simply literature transmitted orally.(৭)—অর্থাৎ 'লোক-সাহিত্য' হলো সেই সাহিত্য যা স্রষ্টার মুখে সৃষ্টি হয়ে মুখে মুখেই প্রসার লাভ করে, বিবর্তন সহ্য করে এবং মানব অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে জীবিত থাকে। এ 'নিয়ত-পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো' (৮) এরা মানব মনে আপনিই জন্মায়।

অনেকের মতে 'লোক-সাহিত্য' unsophisticated বা অপরিশীলিত বা নিরক্ষর গ্রাম্য জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি; এর গায়ে মাটির গন্ধ লেগে আছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই সাহিত্যের জন্ম হয় মানুষের মুখে এবং এই মৌখিক ভাষা তাঁদের জনগোষ্ঠীরই স্মৃতি রসে পুষ্ট হয়ে এক মুখ থেকে আর এক মুখে দীর্ঘ কাল ধরে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এ প্রসঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, নিরক্ষর বা তথাকথিত লেখাপড়া না শিখেও সহজাত সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী হলে 'লোক-সাহিত্য' রচনায় কোনো প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখী হতে হয় না।

এই কথা বলার পরেই একটি প্রশ্ন এসেছে। তবে কি গ্রামে

বসবাসকারী নিরক্ষর ব্যক্তির অলিখিত রচনা মাত্রই 'লোক-সাহিত্য,' উত্তরে বলা যায় যে না। গ্রামে রচিত সাহিত্য মাত্রই 'লোক-সাহিত্য' নয়। কারণ, অশিক্ষিতের, অপরিশীলিত ও অলিখিত সাহিত্য হলেই তার মধ্য দিয়ে 'লোক-সাহিত্যে'র সামগ্রিক চরিত্রটি প্রকাশিত হয় না। কেন না, 'লোক-সাহিত্য সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি'। (৯) অধিকন্তু যেহেতু 'লোক-সাহিত্য' 'লোক-সংস্কৃতি'রই একটা অংশ মাত্র, সেহেতু উচ্চতর সংস্কৃতির [Higher বা Sophisticated Lore] মতো তা আদপেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য [individuality] মণ্ডিত হয় না। ফলে, 'লোক-সংস্কৃতি'র মতো 'লোক-সাহিত্য'কেও একটি সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টিতে পরিণত হতে হবে ;—এ হয়ে উঠবে 'collective creation of the folk.' স্বচ্ছ সরোবরে যেমন রাতের তারাদের মুখচ্ছবি ভাসে, তেমনি একটি দৃঢ় পিনদ্ধ সমাজ তার মনের ছায়াকে দুলতে দেখবে তার 'লোক-সাহিত্যে'র মধ্যে। তাই, 'লোক-সাহিত্যে' রচয়িতার কোনো পৃথক পরিচয় লাভ অসম্ভব।

এই জন্যেই উচ্চতর সাহিত্য যেখানে এক এক বিশেষ ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ, 'লোক-সাহিত্য' সেক্ষেত্রে সমগ্র সমাজের সম্পদরূপে গৃহীত ও বিবেচিত হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, সত্য সত্যই 'লোক-সাহিত্য' কি ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টির সৃষ্টি? সার্বজনীন পূজা অনেকের কম-বেশি প্রয়াসে সম্পন্ন হয় সত্য, কিন্তু তাই বলে সমষ্টিগতভাবে সাহিত্যসৃষ্টি কি সম্ভব? অবশ্য উচ্চতর সাহিত্যের ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তির সমবেত প্রয়াসে সৃষ্ট সাহিত্যের দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যের বারোয়ারী উপন্যাসের বিষয়টিও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সে এক-আধটি স্বেচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম। কিন্তু 'লোক-সাহিত্যে'র সমগ্র ইতিহাসেই যে সমস্ত সমাজের অংশ গ্রহণ রয়েছে সে সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন ঃ

'All aspects of folklore, Probably Originally the products of individuals, are taken by the folk and put through a process of recreation, which through constant Variation and repetition become a group product'(১০)

অর্থাৎ, 'লোক-সাহিত্য' প্রথমে ব্যক্তি বিশেষের দ্বারাই রচিত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে তা সমগ্র সমাজের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ব্যক্তি বিশেষের দাবী আর তাতে থাকে না। এই নৈর্বক্তিক বিশেষত্বই উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে 'লোক-সাহিত্যে'র পার্থক্য বিশেষ ভাবে সূচিত করে থাকে।

এই সূত্রেই আমরা এখন 'উচ্চতর' এবং 'লোক' এই দুই সাহিত্য ধারার মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে এসে পড়েছি। প্রথমত উভয় সাহিত্যের মধ্যে আরও কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। তা হচ্ছে—'লোক-সাহিত্য' নিরক্ষর মানুষ নিয়ে গঠিত যে সমাজ, যে সমাজ কৃত্রিম সভ্যতার প্রভাব মুক্ত, সেই সমাজের সামগ্রিক জীবনবোধ ও মানসিকতার দ্বারা রচিত। স্বভাব কবিত্ব এবং সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাবই সেই সাহিত্যের মুখ্য উপাদান। চমৎকারিত্ব সৃষ্টির চেষ্টাকৃত প্রয়াস সেখানে অনুপস্থিত। ভাব অথবা আঙ্গিক প্রকরণে জটিলতাও অনুপস্থিত। অনেক সময়েই তা পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট। কিন্তু উচ্চতর তথা লিখিত সাহিত্যে ব্যক্তির নিজস্ব জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটে। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট সাহিত্যে তাঁদেরই নিজস্ব জীবন-দর্শনের অভিব্যক্তি ঘটেছে, সমগ্র সমাজের নয়। আবার বঙ্কিমের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার ভাষাগত, ভাবগত ও আঙ্গিকগত পার্থক্য সচেতন পাঠক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কিন্তু 'লোক-সাহিত্যে'র একই বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন রচনাবলীর মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের সন্ধান লাভ প্রায় অসম্ভব। বিষয়টিকে আরও বিস্তৃত ও তুলনামূলক ভাবে বলা দরকার। কারণ, এই তুলনামূলক সমালোচনার মধ্য দিয়ে

'লোক-সংস্কৃতি'র বৈশিষ্ট্যটিকে বোঝা সহজ হবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে 'উচ্চতর' এবং 'লোক' সাহিত্যের ধারা পরস্পর সমান্তরাল সরলরেখায় প্রবাহিত। দুইয়ের মধ্যে গঠন ও চরিত্রগত পার্থক্য এত বেশি যে মিল হওয়া সম্ভব নয়, বিশেষতঃ যখন লিখিত সাহিত্য অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত মনের সৃষ্টি আর 'লোক-সাহিত্য' নিরক্ষর জনের রচনা। কিন্তু বাস্তবত আমরা দেখতে পাই 'লোক-সাহিত্য'ই অনেক ক্ষেত্রে উচ্চতর সাহিত্যের ভিত্তিরূপে গৃহীত হয়েছে। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা আধুনিক বাঙলা সাহিত্য জগতের মধ্যমনি কবি সার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করতে পারি। তাঁর বহু কবিতায়, রূপকথায় বিধৃত স্বপ্নজগতের অনবদ্য অনুরণন লক্ষ্য করা যায়। 'লোক-সাহিত্যে'র ছড়ার ছন্দ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্ট কাব্যে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও পরিশীলিত উচ্চ সাহিত্যের সঙ্গে 'লোক-সাহিত্যে'র গভীর সম্পর্ক বিষয়ে সম্যকরূপেই ছিলেন অবহিত। 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে তাই তাঁকে বলতে দেখা গেছে: 'গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে; তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয় স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য; সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুল-ফল ডাল-পালার সঙ্গে মাটির নিচেকার শিকড়গুলার তুলনা হয় না, তবু তত্ত্ববিদ্‌দের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।'(১১)

কেবলমাত্র অভিমত প্রকাশ করেই কবি ক্ষান্ত থাকেন নি, নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থনে খোদ বাংলা সাহিত্য থেকেই নির্দিষ্ট উদাহরণের উল্লেখ করেছেন ঃ 'নিচের সহিত উপরের এই যে যোগ, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভা ধনীসভার কবি; যদিচ তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশি দূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গল কুমারসম্ভবের ছাঁচে গড়া হয় নাই। তাহার দেবদেবী বাংলাদেশের গ্রাম্য হর-গৌরী। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা সমস্তই গ্রাম্য কাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়। রাজসভার কাব্য ছন্দ মিল ও কাব্যকলা সুসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রাম্যছড়াগুলির সহিত তাহার মর্মগত প্রভেদ ছিল না'।(১২) আমরা যদি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহলে লক্ষ্য করতে পারব যে ভারতীয় ক্ল্যাসিক সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশও লৌকিক তথা মৌখিক ঐতিহ্য থেকে বহু উপাদান সংগ্রহ করেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত থেকে শুরু করে পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, বেতাল-পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করতে পারি। সাম্প্রতিক কালের একজন সমালোচক ও বিশিষ্ট সংস্কৃতিবিদের সুচিন্তিত অভিমত এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ঃ 'মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে লিখনপদ্ধতি বা পুথিগত শিক্ষার আবিষ্কার খুব বেশিদিনের ঘটনা নয়। এর পূর্বে মানুষের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার মানদণ্ড অলিখিত মৌখিক ঐতিহ্যে বিদ্যমান ছিল। সেই ঐতিহ্যের নিকট পরবর্তী লিখিত ও পুথিগত ঐতিহ্য যে কত ব্যাপকভাবে ঋণী তা সহজেই প্রণিধানযোগ্য।'(১৩)

অবশ্য শুধুমাত্র উচ্চতর সাহিত্যই যে 'লোক-সাহিত্যে'র কাছে গভীরভাবে ঋণী তা নয়, পরবর্তী কালে 'লোক-সাহিত্য'ও উচ্চতর সাহিত্য থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করে থাকে। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে মাতাপিতা আপন সন্তানকে শুধু জন্মই দেন না, সেইসঙ্গে তার লালন-পালনেরও গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাই মাতা-পিতার কাছে সন্তানের ঋণ অপরিসীম। আবার সন্তান উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত ও কর্মক্ষম হলে মাতা-পিতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। তবু তুলনামূলক বিচারে সন্তানের কাছে মাতা-পিতার যত না ঋণ, তার থেকে মাতা-পিতার কাছে সন্তানের ঋণ আরও অনেক—অনেক বেশি। অনুরূপ ভাবেই লিখিত সাহিত্যের কাছে 'লোক-সাহিত্যে'র যত না ঋণ, তার থেকে বিপরীতটাই আরও অনেক বেশি সত্য।

আমরা দীর্ঘকাল ধরে লিখিত সাহিত্যের আলোচনা ও তার বিচার বিশ্লেষণেই নিজেদের পরিতৃপ্ত রেখেছিলাম। অলিখিত বা মৌখিক সাহিত্য বিষয়ে দৃক্‌পাত করার কোন প্রয়োজনই আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ অনুভব করিনি। ব্যক্তিমনের সচেতন প্রয়াসে সৃষ্ট সাহিত্য মুখ্যতঃ খ্যাতি ও অর্থের কারণে রচিত হয়। তাই রচয়িতা তাঁর রচিত সাহিত্যের প্রচারে নিজে থেকেই তৎপর হন। কিন্তু মৌখিক সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য নিছক সহজ কবিত্ব শক্তি প্রকাশের আনন্দেই নিঃশেষিত। তাই প্রচারের তাগিদ সেখানে অনুপস্থিত। তবু অল্প কিছুকাল আগে বিশেষভাবে জাতীয়তা-বোধের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে শিক্ষিত মানুষ উপলব্ধি করলে লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক সাহিত্যের পরিচয় ও আস্বাদ গ্রহণ না করলে জাতির সাহিত্য আলোচনা ও তার রসাস্বাদন অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট থেকে যায়। তাই নিজেদেরই প্রয়োজনে আমরা নিরক্ষর মানুষের রচিত মৌখিক সাহিত্যের দিকে নজর দিই। বর্তমানে 'লোক-সাহিত্য' ও 'সংস্কৃতি'র আলোচনা কোন নতুন

ব্যাপার নয়। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে 'লোক-সাহিত্য' ও 'সংস্কৃতি' বেশ উল্লেখযোগ্য আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। বহু পণ্ডিত ও গবেষক 'লোক-সাহিত্য' ও 'সংস্কৃতি'র চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লোক-সাহিত্য' ও 'সংস্কৃতি'র পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। এতদসম্পর্কিত বেশ কিছু প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু গ্রন্থ ও রচিত হয়েছে। কিন্তু লিখিত সাহিত্যের একাধিক ইতিহাস রচিত হলেও আমাদের 'লোক-সাহিত্য' ও সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস রচনায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এখনও দেখা যায়নি। আমরা 'লোক-সংস্কৃতি'র ব্যাপকতাকে পরিহার করে কেবল 'লোক-সাহিত্য চর্চার ইতিহাস' রচনায় প্রয়াসী হয়েছি।

'লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস' সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে 'লোক-সাহিত্যে'র শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আলোকপাত করে নেওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'লোক-সাহিত্যে'র সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে পণ্ডিত মণ্ডলী তেমন ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি বটে, কিন্তু 'লোক-সাহিত্যে'র শ্রেণী বিভাগ প্রসঙ্গে তাঁদের মত পার্থক্য তেমন প্রকট হয়ে ওঠেনি। 'লোক-সাহিত্যে'র অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে কোনটির আবির্ভাব প্রথমে হয়েছিল সেই সম্পর্কে কিন্তু যথেষ্ট মত পার্থক্য বিদ্যমান। কারো কারো মতে প্রবাদ হল 'লোক-সাহিত্যে'র আদিমতম বিভাগ কেউবা স্থান দিয়েছেন ছড়াকে। (১৪) আবার কারো মতে কথা হল 'লোক-সাহিত্যে'র প্রাচীনতম বিভাগ —'আদিম মানুষ তার আদিম জীবন যাপনের অবকাশে যে সমস্ত প্রাকৃতিক বিস্ময়ের মুখোমুখী হতো তা থেকেই ধীরে ধীরে তার কথার (tales) ভাণ্ডার ভরে উঠতো'। (১৫) উচ্চতর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন গদ্যের আগেই পদ্যের আবির্ভাব ঘটেছে, অনুরূপ ভাবে 'লোক-সাহিত্যে'র ক্ষেত্রেও ছড়ার আবির্ভাবকেই প্রথম স্থান দেওয়া যেতে পারে। কারণ পদ্যের আদিমতম রূপ ছড়াগুলিতেই বিধৃত।

মানুষ তার আবেগকে প্রথমে ছন্দোবদ্ধ করে প্রকাশ করে—এটাই স্বাভাবিক প্রবণতা। 'লোক-সাহিত্যে'র বিভিন্ন বিভাগগুলি হল যথাক্রমে প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা, লোক-কথা লোক-সঙ্গীত ও গীতিকা। আমাদের গ্রন্থে এই বিভাগগুলির আলোচনাই স্থান পাবে।

'লোক-সাহিত্য' চর্চার সূত্রপাত খুব বেশীদিনের না হলেও, সীমিত সময়ের মধ্যে এই চর্চার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি কিন্তু বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না। তাই 'লোক-সাহিত্য' চর্চার একটি সম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক ইতিহাস রচনা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। ইদানীং ছাপাখানার আনুকূল্যে সুদূর গ্রাম থেকেও অনেক পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। সেই সব পত্র-পত্রিকায় এবং অন্যত্রও 'লোক-সাহিত্য' সম্পর্কিত বহুবিধ উপকরণ প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বলাবাহুল্য 'লোক-সাহিত্য' চর্চার ইতিহাসে এই সব উপকরণ আলোচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু সীমিত প্রয়াসে এই সব প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ অনেক ক্ষেত্রেই যে সম্ভবপর হয়নি অকপটে এবং সবিনয়ে তা স্বীকার করি। এ ছাড়াও অধুনা 'বাংলাদেশ' যা নাকি স্বাধীনতার পর (১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট) পূর্ববঙ্গ হিসাবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেখানেও 'লোক-সাহিত্য' চর্চা উল্লেখযোগ্য ভাবে হয়েছে। রাজনৈতিক কারণেই বাংলার এই অঞ্চলের সব উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। অথচ 'লোক-সাহিত্য' চর্চার ইতিহাস এই সব উপাদান ব্যতিরেকে সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, তবে যেটুকু উপকরণ সংগ্রহ করা গেছে, তা বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হল। অবশ্যই স্বীকার করা দরকার যে, সংগৃহীত উপাদান এপর্যন্ত যা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হল না তার তুলনায় অনেকাংশে কম। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও অধুনা 'বাংলাদেশে' 'লোক-সাহিত্য' চর্চা যে ভাবে হয়েছে তা একই সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু

স্বাধীনতা উত্তর (১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর) 'বাংলাদেশে' যে 'লোক-সাহিত্য' চর্চা হয়েছে, বর্তমান গ্রন্থের একেবারে শেষে পৃথক পরিচ্ছেদে সে সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবিষ্ট করা গেল। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এই দুই দেশের অভিন্নতা অনস্বীকার্য, তবে স্বাধীনতা উত্তর 'বাংলাদেশে'র 'লোক-সাহিত্য' চর্চাকে পৃথক পরিচ্ছেদে বিধৃত করাকে উভয় দেশের 'লোক-সাহিত্য' চর্চার তুলনামূলক আলোচনার পটভূমিকা রূপেই গ্রহণ করতে হবে।

'লোক-সাহিত্য' চর্চার ইতিহাস রচনায় একাধিক পদ্ধতি অনুসৃত হতে পারে। যেমন যুগ অনুযায়ী বিভাগ, আবার প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক আলোচনাও করা যেতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও পত্র-পত্রিকাকে ভিত্তি করে ধারাবাহিক আলোচনা। বর্তমান গ্রন্থে কিন্তু সাল তারিখের ক্রমানুযায়ী আলোচনা করা হয়েছে। এবং 'লোক-সাহিত্যে'র বিভিন্ন বিভাগকে যেমন প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা, কথা, গান ইত্যাদিকে পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এর ফলে বিশেষ বিভাগে উৎসাহী পাঠক সেই বিভাগটির অগ্রগতি ও ক্রমবিকাশ সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন।

বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় অনেকের কাছ থেকেই নানা ভাবে উৎসাহ পেয়েছি, সক্রিয় ভাবেও অনেকেই সাহায্য করেছেন। তবে প্রয়োজনীয় নানাবিধ গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন অগ্রজ প্রতিম অধ্যাপক সনৎ কুমার মিত্র। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার পরম পূজনীয় অধ্যাপক প্রখ্যাত লোক-সংস্কৃতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রন্থটি রচনায় বিশেষ উৎসাহ দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন। এছাড়াও যাঁদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ না করলে আমার ত্রুটি থেকে যাবে তাঁরা হলেন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ অরুণ বসু, পরম হিতৈষীবন্ধু কল্যাণাশিস্ দাশগুপ্ত, ডঃ নির্মল দাশ, অধ্যাপক শ্যামল সেনগুপ্ত,

বন্ধুবর অধ্যাপক মানস মজুমদার, সুসাহিত্যিক শান্তিময় ঘোষাল। আমার ছাত্র শ্রীমান্ অমল কুমার সাহা গ্রন্থটির মুদ্রন কার্য সুচারু রূপে সম্পাদনের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাকে আমার আশীর্বাদ জানাই। পিতৃপ্রতিম আচার্য ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের প্রস্তাবনার সংযোজন গ্রন্থটির মর্যাদাকে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

১. Maria Leach ed : Standard Dictionary of Folklore & Mythology : [Newyork 1949] : pp 398—408.

২. A. Taylor : Folklore and the Student of Literature : 'The Pacific Spectator [1948 : Vol. II] : pp 216—23.

৩. ওয়াকিল আহমদ : 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি' [ঢাকা] : পৃ ১৩।

৪. ডঃ মযহারুল ইসলাম : 'ফোকলোর পরিচিতি' [ঢাকা : ১৯৭৪] পৃঃ ৫—৬।

৫. দ্রঃ ৪নং পাদ টীকা : পৃঃ ১২।

৬. এ বিষয়ে Dr. A. H. Krappe রচিত Science of Folklore গ্রন্থের [New york : 1964] Introduction অংশ দ্রষ্টব্য।

৭. দ্রঃ F. L. Utley : Folk Literature : An operational Definition : Journal of American Folklore : Vol : 74 : pp 193—206.

৮. রবীন্দ্রনাথ : লোক সাহিত্য : ১৩৬২ : পৃ ৯।

৯. ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোক-সাহিত্য' : ১ম খণ্ড : ১৯৬২ : পৃ ১।

১০. দ্রঃ ১নং পাদটীকা : পৃঃ ৪০১।

১১. দ্রঃ ৮নং পাদটীকা : পৃঃ ৯২।

১২. ঐ ঐ : পৃঃ ৯২—৩।

১৩ দ্র ৪নং পাদটীকা : পৃ ২২।

১৪. 'ছড়াই প্রাচীনতম লোক-সাহিত্য ; কারণ, ছড়া শিশুর সাহিত্য।' (রবীন্দ্রনাথ)

১৫. রবীন্দ্রনাথের লোক সাহিত্য ; সনৎ কুমার মিত্র ; পৃঃ ১২।

বাংলা প্রবাদ চর্চার ইতিহাস

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী, তা বর্তমানে এক স্বীকৃত সত্য। কিন্তু কেবলমাত্র মধুসূদন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের প্রতিভাপুষ্ট বাংলার লিখিত সাহিত্যই নয়, মৌখিক তথা লৌকিক সাহিত্যও যে সমগ্র ভারতীয় লোকসাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী, লোকসাহিত্য গবেষক ও সাহিত্য-রসিক মাত্রই তা স্বীকার করতে বাধ্য। এ হেন বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস কিন্তু খুব প্রাচীন নয়। কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি ছিল চরম অবহেলিত এবং অবজ্ঞাত। যেন লোকসাহিত্য একান্তভাবে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ বা ইতরজনেরই ছিল উপভোগ্য বিষয়। তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ একে দেখতেন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে। লিখিত সাহিত্যের ন্যায় লোক সাহিত্যেরও যে একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে, দীর্ঘদিন এই সত্য শিক্ষিত জনের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি। বাঙালী যে 'আত্মবিস্মৃত জাতি' বলে কথিত হয়ে থাকে - লোকসাহিত্য বিষয়ে তার অসচেতনতা, এর আস্বাদন—রক্ষণ ও আলোচনায় অনীহাই তার অন্যতম প্রমাণ।

বাংলা লোকসাহিত্যের অবহেলিত অঙ্গনে আজ বহু শিক্ষিত ও রসিকজনের উল্লেখযোগ্য সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। আর এই অবহেলিত অঙ্গনের প্রতি শিক্ষিত জনের দৃষ্টি আকর্ষণে যাঁরা প্রয়াসী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম—লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ।

বাংলা লোক সাহিত্যের ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়া, গান, লোককথা

প্রভৃতি সকল বিভাগই যথেষ্ট সমৃদ্ধ, কিন্তু তথাপি লোকসাহিত্য চর্চার প্রথম যুগে বিশেষভাবে প্রবাদ চর্চার প্রতিই সমধিক গুরুত্ব আরোপিত হতে দেখা গেছে। এর মুখ্য কারণ, প্রাত্যহিক জীবনে লোক সাহিত্যের অন্তর্গত অপরাপর বিভাগগুলির তুলনায় প্রবাদের ব্যবহারিক গুরুত্বেই রয়েছে নিহিত। ধাঁধা, ছড়া কিংবা লোক-কথাকে নিছক অপরিণত শিশুর উপভোগ্য বস্তু হিসাবেই গণ্য করা হত। বর্তমানে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রবাদের ব্যবহার নিতান্ত সীমিত হলেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রবাদের ব্যবহার ছিল সুদূরপ্রসারী। সেই ব্যবহারিক প্রয়োজনেই প্রবাদ চর্চায় বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে প্রথম দিকে। এতদ্ব্যতীত সহজ-বোধ্যতা, সরল প্রকাশভঙ্গী প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলিও প্রবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

সর্বোপরি প্রবাদের জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে অভিজ্ঞতার সাযুজ্য। দীর্ঘদিনের প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতাই প্রবাদগুলিতে প্রতিফলিত হয়। মানুষ যেহেতু তার নিজস্ব পরিচিত অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ প্রবাদের মাধ্যমে লাভ করে, তাই প্রবাদকে সহজেই গ্রহণ করে।

প্রবাদ যেহেতু লোকসাহিত্যেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, তাই এগুলি ব্যষ্টি রচিত হয়েও সংহত সমাজেরই সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়। অবশ্য তাই হলে সব প্রবাদের ক্ষেত্রেই এই বক্তব্য প্রযোজ্য নয়। কবি, সাহিত্যিক বা জ্ঞানী ব্যক্তিরাও অনেক সময় প্রবাদ সৃষ্টি করেন। এরূপ প্রবাদও অনেক সময় বিশেষ জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়। কিন্তু সংহত সমাজ মানসের দ্বারা সৃষ্ট নয় বলে এগুলি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা।

বাংলা প্রবাদ দীর্ঘকাল ধরে সংগৃহীত হয়ে আসছে এবং এযাবৎ সংগৃহীত প্রবাদের সংখ্যা বেশ কয়েক সহস্র হবে। সন্ধান করলে যে আরও অসংখ্য প্রবাদ সংগৃহীত হতে পারে, সে বিষয়ে নিশ্চিত

করেই বলা যায়। তবে যে পরিমাণে প্রবাদ সংগৃহীত হয়েছে, প্রবাদ সম্পর্কিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ কিন্তু সে পরিমাণে হয়নি। অথচ এই আলোচনা হলে বাঙালী জাতির আচরণগত বৈশিষ্ট্য মানব চরিত্রের সূক্ষ্ম মনস্তত্ব, আমাদের ধর্মীয় জীবন ও ব্যবহারিক জীবনের নানা অজ্ঞাত, আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য তথ্য জানা যেত। বিশেষ করে বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও বাঙালীর নৃতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় প্রবাদগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

১৩০১ সালে রবীন্দ্রনাথ রচিত এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাংলার ছেলেভুলানো ছড়া' নামক সুদীর্ঘ আলোচনাকে কেন্দ্র করেই বাংলা লোকসাহিত্য আলোচনার যথার্থ সচেতন সূত্রপাত হয়েছিল বলা চলে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে এর অন্ততঃপক্ষে প্রায় ৬০ বছর আগেই বাংলা লোকসাহিত্যের সংগ্রহ ও চর্চার কাজ শুরু হয়েছিল। এবং এর সূত্রপাত হয়েছিল একজন বিদেশীয়ের দ্বারা। পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত বাঙ্গালী যখন অন্ধ পরানুকরণের মোহে আচ্ছন্ন, আত্মমর্যাদাবোধহীন বাঙ্গালী জাতির কাছে যখন জাতীয় সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ যে লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি, তা ছিল অবহেলিত, অবজ্ঞাত, সেই সময়ে রেভারেণ্ড উইলিয়াম মর্টন [William Morton] নামে এক বিদেশী পাদ্রী 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' নামে ৮০৩ টি বাংলা প্রবাদ এবং সত্তরটি সংস্কৃত প্রবাদের ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করলেন [১৮৩২]। বললে বোধকরি অত্যুক্তি হবেনা বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার বীজ এইভাবে একজন বিদেশীয়ের দ্বারাই উপ্ত হয় পরবর্তীকালে মহীরূহের আকারে আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায়। মর্টন পরবর্তীকালে অর্থাৎ 'দৃষ্টান্ত বাক্যসংগ্রহ' প্রকাশের ৩—৪ বছর পরে 'Calcutta Christian Observer' পত্রিকায় আরও দেড়শতাধিক বাংলা প্রবাদ প্রকাশ করেন [Christian Observer ; vol iv, 1835 pp 177—7, 303—7, 532 – 37, 590 – 94]

মর্টন ছিলেন একজন সিনিয়র মিশনারী। বিদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। সুতরাং এ হেন ব্যক্তির দ্বারা বাংলা প্রবাদ চর্চার সূত্রপাত সঙ্গত কারণেই বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না। প্রথমেই মনে হতে পারে মর্টন বোধহয় আন্তরিকভাবে বাংলা দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও ভাষার একজন অনুরাগী ছিলেন, যেমন ছিলেন উইলিয়ম কেরী। তাই স্বেচ্ছায় তিনি বাংলা দেশের সংস্কৃতির এক অবহেলিত বিষয়ের চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে তা ঠিক নয়। মর্টনের বাংলা প্রবাদের সঙ্কলন ও ইংরেজীতে সেগুলির অনুবাদ করার মূলে যত না ছিল এদেশীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ, তার থেকে অধিক ছিল তাঁর ধর্মপ্রচারে মনোযোগ।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নরদামটন সায়ারের কয়েকজন ব্যাপটিস্ট মিশনারীর দ্বারা ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টানধর্ম প্রচারের জন্য যে প্রয়াস শুরু হয়, যে প্রয়াসের সঙ্গে টমাস, কেরী, ওয়ার্ড, গ্রাণ্ট, মার্শম্যান প্রমুখেরা যুক্ত ছিলেন, মর্টনও সেই একই প্রয়াসের সরিক রূপেই এদেশে হয়েছিলেন উপস্থিত।

মর্টনের বাংলা প্রবাদ সঙ্কলন ও তার ইংরেজী ব্যাখ্যার কারণ তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের ঠিক দু'বছর আগে আর একজন খ্যাতনামা পাদ্রী মার্শম্যানের প্রকাশিত বক্তব্যের অংশ বিশেষের মাধ্যমে জানা যাবে। মার্শম্যান লিখেছেন (ক) 'With the hope of aiding the researches of our Countrymen into the popular language of Bengal ; (খ) They will furnish the English student with a key to many of the popular sayings which he finds in his intercourse with the people of this province, and also explain many of the maxims which have exercised a very considerable influence on the habits and conduct of the natives.'

—অবশ্য মার্শম্যান মর্টনের সঙ্কলন প্রসঙ্গে এইসব অভিমত প্রকাশ করেন নি, তিনি নীলরত্ন হালদারের 'কবিতা-রত্নাকর' নামে একটি প্রবাদ সঙ্কলনের ভূমিকায় উদ্ধৃত মন্তব্যটি প্রকাশ করেছিলেন [১৮৩০]।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নীলরত্ন হালদারের প্রবাদ সঙ্কলনটি যদিও মর্টনের গ্রন্থের অনেক আগেই ১৮২৫খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, কিন্তু তথাপি গ্রন্থটি যেহেতু সংস্কৃত প্রবাদের সঙ্কলন, সেইহেতু বাংলা প্রবাদ চর্চা তথা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাসে প্রথম স্থান বিদেশীয় মর্টনকেই দিতে হয়।

মর্টন যে মার্শম্যানের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েই 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' প্রকাশ করেন এমন অনুমান করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ মার্শম্যান এবং মর্টন দুজনেই ছিলেন মিশনারী এবং একই আদর্শে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। দ্বিতীয়ত, মার্শম্যান নীলরত্ন হালদারের প্রবাদ সঙ্কলনটির দ্বিতীয় সংস্করণে [১৮৩০] ইংরেজীতে ভূমিকা লিখে দেন এবং গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবাদের ইংরেজী অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করেন, এর ঠিক দু'বছর পরেই অর্থাৎ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মর্টনকে দেখা গেল বাংলা প্রবাদ সঙ্কলন প্রকাশে ব্রতী হতে। মর্টনের সঙ্কলনে মার্শম্যানের প্রভাবের ছাপ সুস্পষ্ট। অবশ্য একথা ঠিক যে প্রবাদ সঙ্কলন হিসেবে অপর একজন মিশনারী ভারত-প্রেমিক রেভারেণ্ড লঙের প্রবাদমালা [১৮৬৮—১৮৬৯, ১৮৭২] বিশালতার জন্য যে গুরুত্বের অধিকারী, মর্টনের গ্রন্থে সে গুরুত্ব অনুপস্থিত। তথাপি প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে ঐতিহাসিক গুরুত্ব যে মর্টনেরই প্রাপ্য তা অনস্বীকার্য।

বাংলা প্রবাদের চর্চায় অথবা সংকলনে অপর যে সকল বিদেশীয়ের নাম জড়িত হয়ে গেছে, তাঁদের একজন হলেন Captain T. H. Lewin, এবং অপরজন J. D. Anderson। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে Lewin এর "Hill Proverbs of the

Inhabitants of Chittagong Hill Tracts" প্রকাশিত হয়।

J. D. Anderson ছিলেন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী। চট্টগ্রামের উপভাষার নিদর্শন স্বরূপ তিনি ৩৫২টি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদের ইংরেজী অনুবাদ টিপ্পনী সহ প্রকাশ করেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। Anderson এর গ্রন্থটির নাম 'Some Chittagong Proverbs'। Anderson চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত প্রবাদগুলির ভাষা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তিত করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনারদিক থেকে এই ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং সংগ্রহও বলাবাহুল্য ত্রুটিপূর্ণ।

বাংলায় প্রবাদ চর্চার সূত্রপাত দীর্ঘদিনের হলেও, প্রথমাবধি এর সংগ্রহের উপরে সকলে যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিলে তেমন কেউই কিন্তু সে তুলনায় প্রবাদগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা কিংবা প্রবাদ অবলম্বনে বাঙ্গালীর বিশেষ কোন মানসিকতা তথা জীবনাদর্শের সন্ধানে ব্রতী হন নি। অথচ এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আর একটি বিষয়ে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন—বাংলা প্রবাদের সংখ্যাধিক্যের তুলনায় এগুলির উৎপত্তির সূত্র—সন্ধান তেমন করা হয় নি। অথচ বহু প্রবাদ সৃষ্টির মূলে যে বিশেষ কোন লৌকিক কাহিনী বা ঘটনা যুক্ত ছিল, কিংবা অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় ইতিহাসও প্রচ্ছন্ন রূপে থেকে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

বাংলা প্রবাদ চর্চার ইতিহাসে না হলেও বাংলায় প্রবাদ চর্চার ইতিহাসে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থটি হল 'কবিতা-রত্নাকর' [১৮২৫]। গ্রন্থটি 'বঙ্গদূত' পত্রিকা [১৮২৯] সম্পাদক নীলরত্ন হালদার কর্তৃক সংকলিত এবং শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে ২০৩টি সংস্কৃত প্রবাদের ইংরেজী ও বাংলা অর্থ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটির আখ্যান পত্র নিম্নরূপ ঃ

> The kobita—Rutnakur or Collection of Sungskrit Proverbs in popular use Translated into Bengali and English Compiled By Neel—Rutna Halder.

নীলরত্ন হালদার গ্রন্থটির ভূমিকায় বলেছেন, 'এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মধ্যে পুরাণোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত ও নীতি শাস্ত্রোক্ত ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থোক্ত অথচ ঋষিবাক্য কবি বাক্য মহাজন গৃহীত বাক্য প্রভৃতি নানাপ্রকার নানা উপমার কবিতা ও তৎসংশ্লিষ্ট বহুবিধ ইতিহাস ও পরিহাস সন্দেহ ভঞ্জন ও মনোরঞ্জনার্থ লিখিত হইয়াছে।' (পৃঃ ।৶০)

নীলরত্ন আরও বলেছেন, 'যে যে শ্লোকার্দ্ধ কিম্বা চরণ পরম্পরা গ্রাহ্যমতে সর্বসাধারণে প্রচলিত আছে এবং প্রস্তাবের পোষকতার নিমিত্তে ও দৃষ্টান্তস্থলে সর্বদা ব্যবহার হয়······বহুবিধ কবিতার পূর্ব চরণ কি প্রকার তাহা সমুদ্ধার করিয়া এবং তত্তৎ শ্লোক গ্রন্থোক্ত কিম্বা ঋষিবাক্য অথবা মহাজন গৃহীত বাক্য তন্নিরূপণ করিয়া অথচ তদ্ভিন্ন অন্যান্য যাহার সম্পূর্ণ লোকে প্রকাশ আছে কিন্তু দৃষ্টান্ত স্থলে অতিআবশ্যক ও প্রয়োজনক তৎসমূহ কবিতারূপ পুষ্পরস মধুমক্ষিকার ন্যায় নানা শাস্ত্রোদ্যান হইতে কিঞ্চিৎ ২ আহরণ করিয়া রসিকের রসাস্বাদনের জন্য এই সংগ্রহে সংগৃহীত করিলাম।' [পৃঃ ।/—।৶০]

গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রতিটি প্রবাদের সম্পূর্ণ অংশটি উদ্ধার করে তার সম্পূর্ণ বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। ইংরেজী অনুবাদ করেছেন মার্শম্যান সাহেব। প্রসঙ্গত গ্রন্থে মুদ্রিত মার্শম্যানের বক্তব্যটি উদ্ধার করা যেতে পারে ঃ

> 'This Compilation of Sungskrit Proverbs which have grown into popular use among the natives of Bengal was made by Baboo Neel—Rutna Halder, and an edition printed at his own Private press. A Second edition appearing desirable, I have inserted a translation of them into English, with the hope of aiding the researches of our Countrymen,

into the popular language of Bengal. These proverbs Consist generally of portions of Sungskrit poetry, which have been gradually incorporated with the language of Bengal to such an extent as to have become familiar even to these who are unacquainted with the source from which they are drawn. It has appeared advisable therefore to elucidate them by giving the entire Couplet or Couplets to which they belong, and where they are Connected with some popular story. They will furnish the English student with a key to many of the popular sayings which he finds in his intercourse with the people of this province, and also explain many of the maxims which have exercised a very Considerable influence on the habits and Conduct of the natives. If these maxims, some will be found puerile, others exceptionable in point of morality, but some few, drawn evidently from the wisdom of the ancient sages of the East, possess a large share of merit and in culcate moral lessons, by similies drawn from nature.'

Serampore, March, 1830. J. C.M.

রামমোহন রায় এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক নীলরত্ন হালদারের বাংলা গদ্যের নিদর্শন স্বরূপ কিছু অংশ তাঁর প্রবাদ সম্পর্কিত আলোচনা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। 'তন্নষ্টং যন্নদীয়তে' প্রবাদটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক লিখেছেন :

'কবি কালিদাস, কোনহ স্থানে গিয়াছিলেন তথায় পথিমধ্যে ক্রোশ পরিমিত বালুকা ছিল সেই স্থলে কোনহ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে রৌদ্র করণক ঐ উত্তপ্ত বালুকাতে পীড়িত দেখিয়া আপনার চর্ম্ম পাদুকা দান করিয়াছিলেন পরে রাজা বিক্রমাদিত্য সভাতে সমাগত কালিদাস

প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি প্রকারে ক্রোশ পরিমিত উত্তপ্ত বালুকা উত্তীর্ণ হইয়াছ তাহাতে কালিদাস ঐ পূর্বোক্ত শ্লোকদ্বারা উত্তর করিলেন। যে প্রাচীন জর্জ্জর চর্মপাদুকা কোন ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলাম সেই ফলেতে দৈবাৎ এক অশ্ব লাভ হইয়াছিল তদ্দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়াছি অতএব যাহা না দেওয়া যায় তাহাই নষ্ট হয়।"

[পৃঃ ১৫]

লক্ষনীয় বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তীকালে রচিত উদ্ধৃত গদ্যাংশটিতে বিরামচিহ্নের সার্থক ব্যবহার অনুপস্থিত।

দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজী অনুবাদের প্রকাশক ভারতপ্রেমিক রেভারেণ্ড লঙ্ সাহেবের নাম বাংলা প্রবাদ চর্চার ইতিহাসের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বললে বোধ করি অত্যুক্তি হয় না যে, লঙ্ সাহেব সঙ্কলিত বাংলা প্রবাদ গ্রন্থটিই পরবর্তীকালে বাংলা প্রবাদ সঙ্কলনে ও সংগ্রহে বিশেষভাবে প্রেরণা-দান করেছে। কেবলমাত্র বাংলা প্রবাদ সংগ্রহের প্রথম যুগেই লঙ্ সাহেব প্রণীত গ্রন্থের যে এক উল্লেখযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট তাই নয়, পরবর্তীকালেও তাঁর গ্রন্থটি এক আদর্শ সঙ্কলন ও প্রবাদের আকর গ্রন্থরূপে চিহ্নিত। তদুপরি প্রবাদ সঙ্কলন—লঙ্ সাহেবের এক ভিন্নতর পরিচয় ও মানসিকতাকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে। বাংলা প্রবাদ সঙ্কলন প্রকাশে তাঁর একদিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রীতি, অপরদিকে বিশেষভাবে লোক-সাহিত্যের একনিষ্ঠ অনুরাগী রূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলা প্রবাদ সঙ্কলনে লঙ্ সাহেবকেই সর্বপ্রথম সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হতে দেখা গেছে। তিনিই এ ব্যাপারে প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষর প্রদান করেছেন।

রেভারেণ্ড লঙ্ প্রণীত 'প্রবাদমালা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থের আখ্যান পত্রে যদিও বলা হয়েছে, 'Two thousand Bengali proverbs illustrating native life and

feeling', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটিতে সর্বমোট ২৩৫৮টি প্রবাদ সঙ্কলিত হয়েছে দেখা যায়।

প্রবাদগুলি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী সাজানো। প্রবাদের অর্থ বা ব্যবহারগত প্রয়োগ অনুপস্থিত। আখ্যানপত্রে লেখক বা সঙ্কলক হিসাবে লঙ্ সাহেবের নাম কিন্তু মুদ্রিত হয়নি। তবু এ গ্রন্থটি যে লঙ্ সাহেব প্রণীত, 'প্রবাদমালা'র পরবর্তী খণ্ডেই তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত। গ্রন্থটি 'Calcutta Literature Society'র জন্য রচিত।

'প্রবাদ মালা'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় ভাগটি 'Calcutta School Book and Vernacular Literature Society' দ্বারা প্রকাশিত। গ্রন্থটির আখ্যানপত্রে মুদ্রিত হয়েছে 'Proverbs of Europe and Asia Translated into the Bengali Language: ইউরোপ ও এস্যা খণ্ডস্থ প্রবাদমালা। দ্বিতীয়ভাগ। বঙ্গীয় ভাষায় অনুবাদিত।'

'প্রবাদ মালা'র প্রথমখণ্ডে লঙ্ সাহেবের নাম অথবা ভূমিকা স্বরূপ কিছু মুদ্রিত না হলেও দ্বিতীয় খণ্ডে ইংরেজীতে একটি ভূমিকা প্রকাশিত হয়েছে লঙের নিজের নামে। ভূমিকায় লঙ্ বলেছেন ঃ

> 'The following Contains a free translation into Bengali by Babu Rangalal Banerjee of Proverbs selected by me from the German, Italian, Spanism, Portuguese, Dutch, French, Badagar, Malaylim, Tamul, Chinese, Panjabi, Mahratta, Hindi, Orissa and Russian languages.'

—অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবিষ্ট লঙ্ নির্বাচিত বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী প্রবাদের বঙ্গানুবাদ কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। এরূপ সঙ্কলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লঙের মন্তব্য ঃ

'The object is to introduce to the notice of the Bengali people the wit wisdom in other parts of the world, the Russian Proverbs 200 in number though last in the series will not be found the least in their wit and keen sarcasm.'

সঙ্কলনটিতে জার্মানদেশের প্রবাদ স্থান পেয়েছে ৭১টি, ইতালীয় প্রবাদ ৮২টি, স্পেনীয় প্রবাদ ৩২টি, পর্তুগীজ প্রবাদ ২০টি, ওলন্দাজী প্রবাদ ৭৭টি দিনামার প্রবাদ ৭২টি, ফরাসী প্রবাদ ৯৫টি, রুশদেশীয় প্রবাদ ২০২টি। এতদ্ভিন্ন এশিয়া ও ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশ সমূহের মধ্যে চীনদেশীয় প্রবাদ স্থান পেয়েছে ৩১টি, মালয়ালম প্রবাদ ১০০টি, তামিল প্রবাদ ২০২টি, পাঞ্জাবী প্রবাদ ২১টি, সার্ব্বিয়া দেশের প্রবাদ ২৪টি, মহারাষ্ট্রীয় প্রবাদ ৭টি, হিন্দী প্রবাদ ২৬টি এবং উৎকল দেশীয় প্রবাদ ৮২টি। এতদ্ব্যতীত নীলগিরির আদিম অধিবাসী উটকামণ্ডের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী বাদাগাদের ৩৭টি প্রবাদও সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। সর্বমোট ৯৭৯টি প্রবাদ সঙ্কলনটিতে সঙ্কলিত হয়েছে। এই সঙ্কলনটির বৈশিষ্ট্য এই যে, বিদেশী যে সকল প্রবাদের সঙ্গে বাংলা প্রবাদের গভীর সাদৃশ্য, সেক্ষেত্রে বাংলা প্রবাদটিও অনুবাদের সঙ্গে উল্লেখ করে তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক। ফরাসী প্রবাদঃ ভালুক মারার পূর্বে তাহার চামড়া বিক্রী করিও না।

অনুরূপ বাংলা প্রবাদঃ কালনেমির লঙ্কা ভাগ।

খ। দিনেমার প্রবাদঃ ক্ষুদে কুকুর, শিং ছাড়া গরু আর বাউনে মানুষ, ইহারা প্রায় অহঙ্কারী।

অনুরূপ বাংলা প্রবাদঃ কানা খোঁড়া একগুণ বাড়া।

গ। ওলন্দাজী প্রবাদঃ গর্জনকারী বিড়াল অত্যল্প ইন্দুর ধরে।

অনুরূপ বাংলা প্রবাদঃ যত গর্জে তত বর্ষে না।

ঘ। পর্ত্তুগীজ প্রবাদঃ মুখাবরোধ করাতেই নির্বিরোধে আছি।

অনুরূপ বাংলা প্রবাদঃ বোবার শত্রু নাই।

ঙ। ইতালীয় প্রবাদঃ শত্রু পলাইলে সকলেই সাহসী।

অনুরূপ বাংলা প্রবাদঃ চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

চ) স্পেনীয় প্রবাদঃ আগে আমাকে পাড়, তবে জলপাই বলিয়া ডাকিও।

অনুরূপ বাংলা প্রবাদঃ না আঁচালে বিশ্বাস নাই। ইত্যাদি।

'Men are all made of the same paste'—কথাটি যে কতখানি সত্য, বিভিন্ন দেশীয় প্রবাদের মধ্যেকার ঐক্যই তার প্রমাণ।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লঙ্ সাহেবের সম্পাদনায় প্রবাদের আর একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। এটিরও নাম 'প্রবাদমালা'। এই সঙ্কলনটিতে সর্বমোট ৩৪২৯টি প্রবাদ স্থান পেয়েছে। লঙ্ গ্রন্থটির ভূমিকায় বলেছেনঃ

> 'This little work complete the series of Proverbs and proverbial sayings of Bengal which I have brought out in Co-operation with Pandit Nabin Chunder Bunarjyea and other Native Gentlemen to whom I owe a deep debt of obligation for the assistance they rendered.'

লঙ্ সাহেবের এই মন্তব্য থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, প্রবাদমালার প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড মিলিয়ে তিনি একটি সিরিজে পরিণত করতে চেয়েছেন। এছাড়া বাংলা প্রবাদ সঙ্কলন রচনায় তিনি নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপরাপর দেশীয় ব্যক্তিদের সহায়তা গ্রহণ করেছেন।

এই সঙ্কলনটির আখ্যান পত্রে মুদ্রিত হয়েছে: 'Three Thousand Bengali Proverbs and Proverbial sayings Illustrating Native Life and Feeling among Ryots and women.' এই সঙ্কলনটিতে বেশ কিছু সংস্কৃত প্রবাদ স্থান পেয়েছে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে লঙ্‌ সাহেব সঙ্কলিত 'প্রবাদমালা'য় বিচিত্র শব্দ ব্যবহার লক্ষণীয়। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় এগুলির মূল্য নিঃসন্দেহে অপরিসীম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে:

ক। এক পয়সার মুরগী। তার দুই পয়সার পুদগানি।

খ। এসো কো শুনায়ো দরদ যো তোমরা দরদ লেয়।
বেদরংদিকো দরদ শুনানেছে দুনা দরদ দেয়॥

গ। কাঙ্গালের দুয়ারে হাতীর পাড়া। [বিক্রমপুরাদি স্থানে পদচিহ্নকে 'পাড়া' বলে]

ঘ। অতি পর্শ্বে গৌর নটা। [অর্থাৎ বারংবার গেলে মান থাকে না, স্পর্শ শব্দের অপভ্রংশে পর্শ্ব]

ঙ। অন্ধকার সেরঘুট্টি।
চোরের মায়ের কুরখুট্টি। ['সেরঘুট্টি'র অর্থ হল নিবিড় মেঘ; 'কুরখুট্টি'র অর্থ হল আহলাদ। কুরুক্ষেত্রীর অপভ্রংশে— 'কুরখুট্টি']

চ। যদি বর্ষে মকরে।
খন্দ হয় টীকরে। [টিকর = কঠিন মাটি]

ছ। যদি ওঁয়াল কচুর পাত
পাতে রৈল চাষার ভাত। [ওঁয়াল = শুকাল]

জ। যদি থাকে আগা পাছা
কি করে তার শাগা মাছা। [আগা = ঘৃত; পাছা = দুগ্ধ]

ঝ। শৌল চেঙ্গ ও বোঝে না। পোলা চেঙ্গেরাও বোঝে না।
[চেঙ্গ = ছেলে]

ঞ। চাপের উপরে চাপ
উসর নেইরে বাপ। ['অবসর' শব্দের অপভ্রংশে উসর ;
স্ত্রীলোক দ্বারা ব্যবহৃত]

ট। খেরে কুটায় আগুন দিয়ে।
পেতনী বৈসে আলগোছ হৈয়ে। [খড় শব্দের অপভ্রংশে
খেরে ; বিক্রমপুরাদি অঞ্চলে প্রচলিত]

ঠ। নিকৌড়িয়া গেইলেন হাটে।
কাঁকড়ি দেখকে জিয়ারা ফাটে। [জিয়ারা = প্রাণ]

ড। পোল, পাগল, পুলো।
তিন নিয়ে উলো॥ [পোল = বাগান ; পুলো = খড়]

'প্রবাদ সংগ্রহে' অনেকগুলি প্রবাদ সৃষ্টির মূলে যে লৌকিক কাহিনী বা ঘটনা ছিল, তারও উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। মাচা নাই তার বুধবার' প্রবাদটির উৎপত্তি প্রসঙ্গে জানা যায় যে এক ব্যক্তি এক গোপের বাড়ী ঘুঁটে আনতে গিয়েছিল। কিন্তু গোপটি বলে সেদিন বুধবার, তাই সে ঘুঁটে দেবে না। তখন আগন্তুক ব্যক্তিটি বলে যে, যার মুঠো পরিমাণ চাল পর্যন্ত নেই, তার বুধবার—যেন মাচা নাই তার বুধবারের মত। 'মাচা' অর্থে ধানের গোলা বা মরাই।

অনুরূপ ভাবে 'তো অদ্ধম মো অদ্ধম্' প্রবাদটির উৎপত্তি স্বরূপ কাহিনীটি হল—কোন কৈবর্ত্যের পিতৃশ্রাদ্ধে কার্পাস ক্ষেতের অর্থাৎ চাষের ভূলার ভুজ্জি দেওয়াতে অন্য কৈবর্ত্যের পুরোহিত জিজ্ঞেস করে যে সে কি পাবে। উত্তরে ঐ কৈবর্ত্যের পুরোহিত বলে, 'তোমার অর্দ্ধেক আর আমার অর্দ্ধেক হিসাবে ভাগ হবে।'

বাংলা প্রবাদ সঙ্কলনে উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকাটির উল্লেখযোগ্য অবদান বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। ১২৯৩

সনের [জুন ১৮৮৬] জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পত্রিকায় [২৫৭ সংখ্যা ; ৩য় কল্প, ৩য় ভাগ] প্রবাদ সঙ্কলন বিষয়ে বলা হয়েছে, '…আমরা বাঙ্গালা প্রবচন সকল সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখি ইহা একটি অতি বৃহৎ ব্যাপার, যত সংগ্রহ করা যায় শেষ করা যায় না। বামাবোধিনীর পাঠক-পাঠিকাগণ এ বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিলে বিশেষ উপকৃত হইব। বাঙ্গালা প্রবচনের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির ব্যবহৃত সকল প্রবচন বাক্য সঙ্কলন করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য সুতরাং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও হিন্দী, বাক্যও দৃষ্ট হইবে। পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট একটী বিষয় বক্তব্য, একই প্রবচন বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় কিছু কিছু ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় গ্রথিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা অধিকাংশ স্থলে কলিকাতা অঞ্চলের প্রচলিত কথা দিব।' [পৃঃ ৬০]

১২৯৯ সনের ৩৩৬ সংখ্যার পত্রিকায় [ইং জানুয়ারী, ১৮৯৩ ; ৫ম কল্প, ১ম ভাগ] পত্রিকা সম্পাদক আবেদন জানিয়ে বলেছেন, 'একই বচন বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কথায় চলিত আছে, এজন্য সকলের সঙ্গে মিলিবে না। পাঠক পাঠিকারা তাঁহাদের জানা মূল কথা পাঠাইলে আদরের সহিত গ্রহণ করিব।' ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাস থেকে 'বামাবোধিনী'তে যে প্রবাদ সঙ্কলন প্রকাশিত হতে শুরু করে, মাঝে কিছুকাল বিরতি বাদে তা চলে ১৩০০ সন পর্যন্ত। ডঃ সুশীল কুমার দে এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবাদের সংখ্যা নির্দেশ করে বলেছেন ১৫৯৩। কিন্তু আমাদের হিসাবে এই সংখ্যা ১৬৩৮। প্রবাদগুলি ধারাবাহিক রূপে এবং বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রকাশিত। উল্লেখযোগ্য, প্রবাদগুলির সঙ্কলকের নাম অপ্রকাশিত। পূর্বোল্লিখিত ১৬৩৮টি প্রবাদ ব্যতীত ১২৯৭ সালের ৩১০ সংখ্যায় [৪র্থ কল্প ; ৪র্থ ভাগ] আরও ১০২টি প্রবাদ প্রকাশিত হয়েছিল দেখা যায়। তন্মধ্যে ৯।১০টি সংস্কৃত প্রবাদ।

কানাইলাল ঘোষাল সংগৃহীত 'প্রবাদ সংগ্রহ' ১২৯৭ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থটির আখ্যানপত্রে বলা হয়েছে : 'A Collection of Bengali and Hindi Proverbs with annotations'।

লেখক গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে এটিকে দ্বিতীয় প্রবাদ সংগ্রহ রূপে দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক কালানুক্রমে লেখকের দাবী যুক্তিহীন বলে প্রমাণিত। কারণ ইতিপূর্বেই উইলিয়াম মর্টন এবং রেভারেণ্ড লঙের একাধিক উল্লেখযোগ্য প্রবাদ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। তবে 'প্রবাদ সংগ্রহ'কে প্রথম একজন বাঙ্গালী প্রকাশিত প্রবাদ সংগ্রহের মর্যাদা দান করা যায়। লেখক দীর্ঘ ৭।৮ বৎসর ধরে গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবাদগুলি সংগ্রহ করেছেন। গ্রন্থে সংকলিত অধিকাংশ প্রবাদ তিনি স্ত্রীলোক ও গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। প্রায় ১৩০০ বাংলা প্রবাদ গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। বাংলা প্রবাদ ব্যতীত বেশ কিছু সংখ্যক সংস্কৃত, হিন্দী এবং ইংরেজী প্রবাদও গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। প্রবাদগুলি বর্ণানুক্রমিক সাজানো। প্রতিটি প্রবাদের অর্থ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলা প্রবাদের অনুরূপ হিন্দী, সংস্কৃত ও ইংরেজী প্রবাদও প্রদত্ত হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন লেখকের রচনা থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধার করে প্রবাদের ব্যবহার দেখান হয়েছে। ডঃ সুশীল কুমার দে এই সঙ্কলনটি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, 'প্রবাদগুলির উপর যে সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী আছে, তাহা সর্বত্র নির্ভুল নয়, এবং অনেকগুলি প্রসিদ্ধ প্রবাদের রূপও যথাযথ ভাবে দেওয়া হয় নাই।'

১২৯৯ সালে প্রকাশিত 'উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি' পত্রিকার ২য় খণ্ডের ৮ম সংখ্যায় 'বঙ্গীয় প্রবচনাবলী' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। প্রবন্ধটির রচয়িতা প্রবোধচন্দ্র মজুমদার। সঙ্কলিত প্রবাদের সংখ্যা ১০০। সঙ্কলিত প্রবাদগুলির কিন্তু কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। লেখক দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, '.. আমাদের

এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে প্রবচনাবলীর উন্নতি নিরীক্ষণ করা যায় না। যত্ন বিনা কিছুই সুরক্ষিত ও সুফলদায়ক হয় না। অস্মদ্দেশীয় প্রবচনাবলী যত্ন বিনা ক্রমে ক্রমে কালের অতল গর্ভে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের মধ্যে এই প্রবচনাবলীর পুনঃ প্রচার হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমরা উহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম [পৃঃ ২৩২]। লেখকের প্রকাশিত এই প্রবন্ধটির পূর্বে বাস্তবিক বাংলায় প্রবাদ বিষয়ক আলোচনা তেমন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেনি লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত প্রয়াসে বাংলা প্রবাদের আলোচনায় রেভারেণ্ড মর্টন, রেভারেণ্ড লঙ্, কানাইলাল ঘোষাল প্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকজনকেই ব্রতী হতে দেখা গেছে। অপরপক্ষে পত্রিকাগুলির মধ্যে একমাত্র 'বামা-বোধিনী'কেই এ ব্যাপারে সক্রিয় দেখা গেছে। অতএব প্রবোধ-চন্দ্রের মন্তব্যের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না।

দ্বারকানাথ বসু প্রণীত 'প্রবাদ পুস্তক'টি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত—প্রথম ভাগে 'প্রবাদতত্ত্ব' এবং দ্বিতীয় ভাগে 'প্রবাদমালা' সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রবাদতত্ত্বের বিষয়ে লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, 'কোন জাতির আভ্যন্তরিক বিবরণ প্রবাদে অবগত হওয়া যায়। কি ধর্ম, কি বিদ্যা, কি শিল্প, কি আচার ব্যবহার, সকল বিষয়ের আভাস প্রবাদে আছে। প্রবাদে বঙ্গবাসীর এ সকল বিষয় সম্বন্ধে কি জানা যায়, তাহাই এই পুস্তকের প্রথম অংশ প্রবাদতত্ত্বের উদ্দেশ্য।'

'প্রবাদ তত্ত্ব' অংশে লেখক প্রবাদের সৃষ্টি, প্রবাদে প্রকাশিত উপদেশাবলী, প্রবাদে প্রতিফলিত দেশের অবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্ম বিষয়ে পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে অতিশয় মূল্যবান আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য—জনসাধারণের দ্বারা গৃহীত হবে, উপমা কিংবা রূপক অথবা অপ্রস্তুত প্রশংসা প্রবাদে প্রতিফলিত হবে এবং সর্বোপরি প্রায়ই

প্রবাদে উপমেয় উহ্য থাকবে—সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

'প্রবাদমালা' অংশে মোট ২১৭৩টি প্রবাদ সঙ্কলিত হয়েছে। প্রবাদগুলি বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী সঙ্কলিত।

'বামাবোধিনী'তে প্রবাদ সংগ্রহ ব্যতীত প্রবাদ সম্পর্কিত প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে দেখা যায়। ১৩০০ সালের কার্তিক সংখ্যায় [৩৪৬ সংখ্যক পত্রিকা; ৫ম কল্প; ২য় ভাগ—নভেম্বর ১৮৯৩] 'প্রবাদ বিচার' নামে প্রকাশিত একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধে প্রবাদকে 'জাতীয় দর্পণ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রবাদের মহৎ গুণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'উহা দ্বারা জাতীয় সাধারণ শিক্ষার স্রোত অন্তঃসলিলা নদীর প্রবাহবৎ নীরবে ও গুপ্তভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে।' [পৃঃ ২০৬]

প্রবাদের সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে, 'প্রবাদ সকলের সৃষ্টি অতি আশ্চর্যরূপে হইয়া থাকে। সম্রাট, রাজা, সামন্ত, জমিদার, নবাব প্রভৃতির স্বেচ্ছাচারিতা, চালচলন, অপব্যয়, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক প্রসিদ্ধ ঘটনা, সুন্দর গ্রন্থাদির উৎকৃষ্ট বাক্যাবলী, চির প্রচলিত উপকথা বা আখ্যায়িকার অংশ বিশেষ, প্রসিদ্ধ কবি ও গায়কগণের কাব্য ও গানের অংশ ইত্যাদি বহু বিষয় আশ্রয় করিয়া প্রবাদ নিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে। যাঁহারা ধীশক্তিসম্পন্ন, সূক্ষ্মদর্শী, চিন্তাশীল, কবি ও রসিক, তাঁহারাই প্রবাদের সৃষ্টিকর্তা।' [পৃঃ ২০৭]। প্রবন্ধটিতে দুটি প্রবাদের উৎপত্তির কাহিনী বর্ণিত হওয়ায় প্রবন্ধটির গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক. লোহার কার্তিক : এই প্রবাদটির উৎপত্তি বিষয়ে বলা হয়েছে, 'নদীয়া জিলায় কোন পল্লীগ্রামে কার্তিকেয় দুলে নামে একজন ভয়ঙ্কর দস্যু ছিল। কোন সময়ে সে দস্যুতার অপরাধে ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তৎকালে, যে গ্রামে যে অপরাধীর বাস, সেই গ্রামে বা

তাহার নিকটে তাহাকে ফাঁসী দেওয়ার নিয়ম ছিল। আমরা বাল্য-কালে কার্তিকেয় ডুলের ফাঁসীকাষ্ঠ দেখিয়াছি। কার্ত্তিকেয়ের ফাঁসী হওয়ার পর তাহার মা "আমার লোহার কার্ত্তিক কোথা গেল" বলিয়া কাঁদিয়া ছিল। তদবধি ঐ কথা প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেখিলেই লোকে 'লোহার কার্তিক' বলিয়া থাকে।' [পৃঃ ২০৮]

খ. "গৌর হতে বাঁকী অনেক দিন": প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের একটি গানের শেষ পদ এটি।

'সম্প্রতি কোন আধুনিক গ্রন্থকার স্বরচিত কোন পুস্তক, বঙ্গীয় লেখকগণের অগ্রগণ্য পথ প্রদর্শক স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন পুস্তকের তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করায় কোন বিচক্ষণ রসিক ব্যক্তি কহিলেন, 'গৌর হতে বাঁকী অনেকদিন'। —অর্থাৎ আধুনিক গ্রন্থকার মহাশয়ের গ্রন্থখানি বিদ্যাসাগরের তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। যে স্থলে এই ঘটনা হইয়াছে, আমরা শুনিয়াছি, উহার পর যখন যখন সেই স্থলে ক্ষুদ্রবস্তু বা ক্ষুদ্র ঘটনা. মহৎ বস্তু বা মহৎ ঘটনাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তখন তখনই কোন ২ ব্যক্তির মুখ হইতে ঐ কথা স্বতঃই বহির্গত হই-য়াছে' [পৃঃ ২০৭–২০৮]। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে ৯টি প্রবাদও সঙ্কলিত হয়েছে। 'প্রবাদ বিচার' প্রবন্ধটির শেষাংশ প্রকাশিত হয়েছে ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় [৩৪৭ সংখ্যা ; ৫মকল্প ; ২য় ভাগ]। এই সংখ্যায় লেখক সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত ৮টি প্রবাদ, অবিকৃত সংস্কৃত প্রবাদ ৩৬টি, বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিজাতীয় প্রবাদ ১২টি, স্বেচ্ছাচারিতা বা অমিতব্যয়িতা উপলক্ষে সৃষ্ট ৭টি প্রবাদ প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধকার প্রবাদ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে বলেছেন, 'প্রবাদ দেশের অতীব উপকারী পদার্থ। যেমন প্রাচীরাদির উপর অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিলে তাহার অসংখ্য মূল

প্রাচীরের অসংখ্য ছিদ্রে প্রবেশপূর্বক তাহাকে সর্বতোভাবে আচ্ছন্ন করে, প্রবাদ সকলও তদ্রূপ সমাজের প্রত্যেকান্তরে প্রবেশ করিয়া বিবিধ প্রকারে তাহার হিতসাধন করিতেছে। কোথাও সরল উপদেশ, কোথাও শ্লেষ, কোথাও ব্যজস্তুতি, কোথাও উপমা, কোথাও আদর্শ ইত্যাদি দ্বারা যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেখানে তাহাই করিতেছে। মনুষ্য সমাজে এমন বিষয় কিছুই নাই প্রবাদ যাহাকে স্পর্শ না করিয়াছে। শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যধর্ম, বৈরাগ্য, ত্যাগ, দান, আতিথ্য, তপস্যা, অর্থনীতি, পরকাল জ্ঞান, ভক্তি, স্বার্থ, পরার্থ, প্রভৃতি সকলকেই প্রবাদ আপনার বিষয়ীভূত করিয়াছে। [পৃঃ ২৪১]

১৩০০ সালের পৌষ সংখ্যায় [৩৪৮ সংখ্যা ; ৫ম কল্প ; ২য় ভাগ] 'প্রবাদ বিচার' পর্যায়ের 'দ্বিতীয় পত্র'টি প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রে ৩২টি প্রবাদ অবলম্বনে প্রবাদ রচয়িতৃগণের দুরদর্শিতা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

রেভারেণ্ড কে. কে. জি. সরকার সঙ্কলিত 'মধ্যভারতে প্রচলিত প্রবাদের সঙ্কলন'টি প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। এটি প্রবাদের এক ক্ষুদ্র সঙ্কলন। বাংলায় সর্বমোট ৮৩৯টি প্রবাদ গ্রন্থটিতে সঙ্কলিত হয়েছে। বাংলা প্রবাদ ব্যতীত ১৩৬টি হিন্দী প্রবাদও সঙ্কলনটিতে স্থান পেয়েছে। অবশ্য হিন্দী প্রবাদগুলিও বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রবাদ ব্যতীত মোট ২৫টি হেঁয়ালী এবং প্রহেলিকা উত্তর সহ সঙ্কলিত হয়েছে। গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবাদগুলি বর্ণানুক্রমিক সাজানো।

১৩০৩ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'বামাবোধিনী'তে [৩৭৭ সংখ্যা ; ৬ষ্ঠ কল্প ; ১ম ভাগ] 'বর্ষাজ্ঞান' পর্যায়ে খনার ১৫টি বচন সঙ্কলিত হয়েছে। এই একই পত্রিকায় ১২৯৩ সনের বৈশাখ সংখ্যায় [২৫৬ সংখ্যা ; ৩য় কল্প ; ৪র্থ ভাগ] 'সিরিয় জাতির প্রবচন' শীর্ষক একটি রচনায় সিরিয় জাতির ৭০টি প্রবাদ প্রকাশিত

হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অনুরূপ বাংলা প্রবাদও স্থান পেয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে—

ক। বেশী রাঁধুনি আহার নষ্ট করে [সিরিয়]

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট [বাংলা]

খ। অধিক আঁটিয়া বাঁধিতে গেলে আল্‌গা হইয়া যায়; [সিরিয়]

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। [বাংলা]

গ। গরু মরিলে যত মুচি জমে। [সিরিয়]

গো মড়কে মুচির পার্ঠন। [বাংলা]

ঘ। বন্ধ্যা হইয়া থাকা অপেক্ষা মেয়ের উপর মেয়ে প্রসব করা ভাল। [সিরিয়]

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। [বাংলা]

মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'প্রবাদ পদ্মিনী' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালে। গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখক গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'বঙ্গদেশে সাধুভাষা প্রাকৃত ভাষা ও যাবনিক ভাষায় বিবিধ গ্রাম্য ও বিশুদ্ধ প্রবাদ বাক্য প্রসিদ্ধ আছে, বিভিন্ন প্রকার পণ্ডিতগণ বিভিন্ন প্রকার অর্থ করিলেও আমি বহু যত্নে যতদূর পারিয়াছি সেই সকল প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া অশ্লীল অংশ পরিত্যাগ পূর্বক স্ব-কপোল কল্পিত এবং তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া নানা উদাহরণ ও গদ্য পদ্যাদি ছন্দে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে রচনা দ্বারা পরিস্ফুট করতঃ সাহিত্য সরোবরে এই প্রবাদ পদ্মিনীকে প্রস্ফুটিত করিয়াছি। ···একশত চারিটি প্রবাদে চারিখণ্ড পুস্তক গঠিত করিয়া আপাততঃ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছি।'

লেখক চারিটি খণ্ডের কথা বললেও তিনটি খণ্ডের মাত্র হদিশ পাওয়া যায়। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালের ৮ই বৈশাখ। এই খণ্ডটি দ্বাবিংশ সংখ্যা সম্বলিত। দ্বিতীয় খণ্ডটি

একই সালের ২৭শে শ্রাবণ প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডটি অষ্টাত্বারিংশ সংখ্যা সমৃদ্ধ। তৃতীয় খণ্ডটির প্রকাশ কাল ১৩০৯। এটি ত্রিসপ্ততিতম সংখ্যা সম্বলিত। তিনটি খণ্ডে সঙ্কলিত প্রবাদের সংখ্যা যেখানে এক শতেরও কম, সেক্ষেত্রে প্রবাদের সংগ্রহ হিসাবে লেখকের গ্রন্থটির গুরুত্ব যে যৎসামান্য তা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত। ডঃ সুশীল কুমার দে গ্রন্থটি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, 'ঠিক প্রবাদ সঙ্কলন নয় কতকগুলি প্রবাদ লইয়া রসিকতা মাত্র। ···সংগ্রহের চেয়ে এক একটি প্রবাদের উপর গদ্যে ও পদ্যে উদ্ভট ব্যাখ্যার বহরই বেশি।' কিন্তু তবু 'প্রবাদ পদ্মিনী' গ্রন্থটি রচনার পরিকল্পনা যে বেশ অভিনব তা স্বীকার করতে হয়। প্রতিটি প্রবাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য লেখক বিস্তৃত পরিসরে ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর প্রবাদের উৎপত্তি সূচক কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে গল্প শেষে প্রবাদটিকে পদ্যছন্দে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন ঃ

নির্দয় দুরাচার। করে নীচ ব্যবহার ॥
মর্মভেদী কথা কয়। আঁতেতে বেদনা হয় ॥
চিরদিন সমভাবে। এমনি কি তাদের যাবে ॥
তাই বলি শুন সবে। দিন যাবে কথাই রবে ॥

'পরের ধনে পোদ্দারী'—এই প্রবাদটিকে প্রকাশ করে বলা হয়েছে ঃ

অসৎ লোকের ভাব, বুঝা বড় সুকঠিন।
দাতার উপর কর্তা হয়ে, পাঁচের স্থলে দেয় তিন ॥ হাতে রেখে সিদে মাগে, চাল পোয়াটা নিজে লয়। প্রমাণ বস্ত্র দিবার স্থলে, দিয়ে বসে হাতের ছয় ॥ বার লুচি বার গোল্লা কর্তা যদি দিতে চান। আট খানা বৈ উঠে না হাতে, বুকের মাঝে পড়ে টান ॥ সোনার স্থলে গিলটি চালায়, রূপার স্থলে মেকি। এক ভরিতে চৌদ্দ আনা,

দেন ঘরের ঢেঁকি॥ উপহাস করে সবে, দেখে তার সর্দ্দারী। লোকে বলে বিদ্রূপ করে, পরের ধনে পোদ্দারী॥

১৩১০ সালে প্রকাশিত 'প্রকৃতি' নামক একটি মাসিক পত্রিকাতে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ভাষার পরিবর্তন সূচক প্রবচন সংগ্রহের পরামর্শ দিয়েছেন এবং স্বয়ং কতিপয় প্রবচন সংগ্রহও করেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য বিবরণী থেকে জানা যায় যে, পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে [৩০শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট; ১৯০৯] শৈলেশচন্দ্র মজুমদার 'প্রবাদ প্রসঙ্গ' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটিতে প্রচলিত অনেকগুলি প্রবাদের ইতিহাস আলোচিত হয়েছিল। ১৩১৯ সনের সাহিত্য পরিষদের কার্য বিবরণী থেকে জানা যায় যে সাহিত্য পরিষদে বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যিক গবেষণা শিক্ষা দেবার জন্য যে ছাত্রশাখা ছিল, তৎসংস্রবে যথাক্রমে কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত, 'পল্লী প্রবাদ প্রবন্ধ' রচনার জন্য ২০ টাকা এবং শিবেশ চন্দ্র পাকড়াশী—'পূর্ববঙ্গে প্রচলিত প্রবচন' প্রবন্ধটির জন্য ৮ টাকা পুরস্কার লাভ করেন।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামে মাসিক পত্রিকায় ৩য় বর্ষের ২য় সংখ্যায় [১৩১৯] 'প্রবাদ প্রসঙ্গ' নামে একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নিবন্ধটির লেখক বিমলাচরণ লাহা। প্রবন্ধটির ভূমিকায় লেখক বলেছেন: 'অনেক দিনের কথা পাদরী মিষ্টার লঙ্গ [Long] প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহার পর দ্বারকানাথ বসু "প্রবাদ মালা" প্রকাশ করেন। অতঃপর 'ভারতী' নামক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ লেখকগণ বাঙ্গালা প্রবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন প্রবাদ সম্বন্ধে আর কাহারও বিবরণ কোথাও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা

নাই' [পৃঃ ১১২]। প্রবন্ধটির পাদটীকায় সম্পাদক লেখকের এবংবিধ বক্তব্য প্রসঙ্গে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবাদ সংগ্রহের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'বামাবোধিনী' পত্রিকা ব্যতীত ও অপরাপর অনেকগুলি পত্র পত্রিকায় এবং একাধিক গ্রন্থেও যে প্রবাদ সংগ্রহ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, আমাদের প্রবাদ সম্পর্কিত আলোচনাতেই তার প্রমাণ বিধৃত রয়েছে।

লেখক 'প্রবাদ-প্রসঙ্গে' মূলতঃ 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' এবং 'বিসমিল্লায় গলদ'—এই দুটি বহুল পরিচিত ও প্রচলিত প্রবাদের উৎপত্তি সূচক আকর্ষণীয় কাহিনী বিবৃত করেছেন।

'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' প্রবাদটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনীটি হল নিম্নরূপ—

'কলিকাতার বিখ্যাত প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে বৈষ্ণব চরণ শেঠ সর্বাপেক্ষা পুরাতন লোক ছিলেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বড়বাজারে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তাঁহার সময়ে যে সমস্ত লোক ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বৈষ্ণববাবু একজন অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণ এবং ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায়পরতা সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। তেলিঙ্গানার রাজকুমার রামরাজা কলিকাতা হইতে তাঁহার দেবারাধনার জন্য গঙ্গাজল লইয়া যাইতেন। কিন্তু সেই গঙ্গাজলে বৈষ্ণবচরণের মোহরাঙ্কিত না হইলে তিনি ব্যবহার করিতেন না। একদা বৈষ্ণবচরণ গৌরীসেন নামক তাঁহার অংশীদারের নামে প্রচুর রাঙ্‌তা ক্রয় করিয়াছিলেন। পরে দেখা গেল, সেই রাঙ্‌তার অধিকাংশই রৌপ্য মিশ্রিত। বৈষ্ণবচরণ এই রাঙ্‌তার কারবারে যাহা লাভ হইল তাহার এক পয়সাও গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন, যখন জিনিস গৌরীসেনের নামে ক্রীত হইয়াছে তখন তাহার লাভের অংশ অবশ্যই গৌরীসেনের প্রাপ্য হইবে জিদাজিদি করিলেও তিনি কিছুতেই ঐ টাকা গ্রহণ করিলেন না। সামান্য

ব্যবসাদার গৌরীসেন "আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ" হইলেন। অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া গৌরীসেনের কারবারে উত্তরোত্তর উন্নতি করিতে লাগিলেন। এই গৌরীসেন তাঁহার অর্থের সদ্ব্যয় করিতেন। তাঁহার ঝোঁক ছিল, যদি কেহ দেনার দায়ে জেলে যাইত, তিনি অর্থ দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতেন; যদি কোন দরিদ্র সদুদ্দেশ্যের জন্য কাহারও সহিত কলহ করিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইত তিনি তাঁহাকে অর্থ দিয়া মুক্ত করিতেন।

এইরূপ নানা উপায়ে অর্থ বিতরণ করায় লোক অনেক সময়ে অগ্র পশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া একটা কাজ করিয়া বসিত, মনে মনে আশা থাকিত, লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন। কাজেও তাহাই ঘটিত। ইহাই এই প্রবাদের উৎপত্তির হেতু [পৃঃ ১১২-১১৩]। লেখক কাহিনীটি 'Calcutta in the olden Times and its Localities' থেকে সংগ্রহ করেছেন।

'বিসমিল্লায় গলদ' প্রবাদটির উৎপত্তিও বেশ উপভোগ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক। এক মুসলমান ফকির তার চেলার পরামর্শে গভীর অরণ্য মধ্যস্থিত একটি বৃক্ষে ছুরি দিয়ে অঙ্কিত করে আসে যে সেই ফকিরকে বাদশা যদি দু'লক্ষ আসরফি দেন, তবেই বাদশার মঙ্গল নতুবা তাঁর অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। ক্রমে ফকিরের চেলার মারফৎ বাদশা বৃক্ষের বিষয় অবগত হলেন। বৃক্ষে অঙ্কিত নির্দেশকে সত্য মনে করে বাদশা ফকিরকে দু'লক্ষ আসরফি দিতে মনস্থ করলে উজীর তাতে বাধা দিলেন। বাদশা ও উজীর দুজনে বনমধ্যস্থিত বৃক্ষটি দেখতে গেলেন। বৃক্ষে অঙ্কিত নির্দেশ-নামা দেখেই উজীর সব চক্রান্ত ধরে ফেললেন। কারণ মানুষ কিছু লেখার আগে প্রথমে বিসমিল্লার কথা স্মরণ করলেও স্বয়ং আল্লার পক্ষে কিছু লেখার পূর্বে বিসমিল্লা লেখা অবাস্তব। শেষে বাদশার আদেশে বেচারী ফকিরের দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা হল।

১৩২০ সালে প্রকাশিত 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র ১ম

সংখ্যায় 'রঙ্গপুরের প্রচলিত প্রবাদ-সংগ্রহ' পর্যায়ে তারাশঙ্কর তর্করত্ন কর্তৃক ৬৬টি প্রবাদ ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্কলিত প্রবাদের কয়েকটি উদ্ধার করা যেতে পারে।

ক। মরাক্ মারিস কেনে, কথা কয়না কেনে।

খ। ঝড় যায়া ঝাঁপী, বয়স যায়া বিয়া।

গ। খুঁইয়ার তাঁতী তসরে হাত।

ঘ। হয় সৈয়দপুর না হয় নিয়ামতপুর।

ঙ। পিন্দিবার নেঙ্গটি নাই, দরগা যাবার চায়।

১৩২০ সনের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় [১ম বর্ষ ; ৪র্থ সংখ্যা] অশ্বিনীকুমার সেন রচিত 'গৌরীসেন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রথমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩১৯ সালে অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে পঠিত হয় ও পরবর্তীকালে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধটিতে লেখক গৌরীসেনের আবির্ভাবকাল, তাঁর অপরিমেয় বিত্ত লাভ ও দানশীলতা বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি Hugly Past and Present by Shambhu Chundra Dey B. L ; Calcutta in the olden times and its localities ; চণ্ডীচরণ সেন রচিত 'মহারাজ নন্দকুমার' এবং 'The Early History and growth of Calcutta by Rajah Benoy Krishna Deb Bahadur এর রচনা অবলম্বনে রচিত। লেখকের প্রবন্ধটি প্রকাশের কিছুকাল পূর্বেই বিমলাচরণ লাহা যে এই একই বিষয়ে 'আর্য্যাবর্ত্তে' আলোচনা করেছিলেন তা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাই মনে হয় যে অশ্বিনীকুমার সেন বিমলা চরণের রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই প্রবন্ধটি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অবশ্য 'বিমলাচরণে'র তুলনায় অশ্বিনীকুমারের প্রবন্ধ আরও অনেক বেশি তথ্যসমৃদ্ধ লক্ষ্য করা যায়।

১৩২০ সনের পৌষ মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় [১ম বর্ষ ;

২য় খণ্ড ; ১ম সংখ্যা] ব্রজসুন্দর সান্যাল রচিত 'প্রবাদ-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। রচনাটিতে ১২টি প্রবাদ সঙ্কলিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি আবার সংস্কৃত প্রবাদ। সঙ্কলিত প্রবাদগুলি হল—অন্ন চিন্তা চমৎকারা, দারিদ্রদোষো গুণরাশি নাশী, গোদের উপর বিষ ফোঁড়া, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, বার রাজপুতের তের হাঁড়ি ইত্যাদি। লেখকের মতে প্রবাদগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত—প্রবাদ এবং প্রবচন। লেখকের ভাষায়, 'কোন বিশেষ ঘটনা বিজড়িত ও বহুললোক পরিজ্ঞাত বাক্যগুলিই প্রবাদ এবং যাহা কোন পণ্ডিতের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত হইয়া গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ ও পরে একটু উচ্চশ্রেণীর লোক দিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাকেই আমি প্রবচন বলি।' [পৃঃ ১৪০]

লেখক দীর্ঘ ১০।১২ বৎসর যাবৎ প্রচলিত বাংলা প্রবাদ বাক্যের সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর সংগৃহীত কিছু সংখ্যক প্রবাদ তাঁরই সম্পাদিত 'উৎসাহ' ও 'আলোচনা' পত্রিকায় এবং আর কতকগুলি প্রবাদ 'ভারতী', 'বীরভূমি', প্রভৃতি পত্রিকায় ১৩০৭-১৩০৮ সালে প্রকাশিত হয়।

রজবালী খাঁ চৌধুরী সংগৃহীত "প্রবাদ রত্নহার" গ্রন্থটি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। সর্বমোট ২৫১৬টি প্রবাদ সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে। প্রবাদগুলি বর্ণমালার ক্রম পরম্পরায় সাজানো।

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার ১৩২৬ সনের দ্বিতীয় সংখ্যায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে মুখ্যতঃ চট্টগ্রামের গ্রাম্য ভাষা বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের পরিশিষ্টে লেখক চট্টগ্রামের ভাষার আদর্শ স্বরূপ কতিপয় প্রবচন ও দুটি প্রচলিত লোককথা প্রকাশ করেছেন। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন যে তালিকা-ধৃত প্রবচন সমূহের অধিকাংশই এণ্ডার্সন সাহেবের প্রবচন সংগ্রহে বর্তমান। তবে এণ্ডার্সন সংগৃহীত প্রবাদগুলির ভাষা

বোধগম্য করার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে পরিবর্তিত। এই প্রসঙ্গে বসন্তকুমারের অভিমত, 'আমরা এ প্রকার পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহি। মূল পরিবর্তন না করিয়া অনুবাদসহ প্রকাশ করিলেই প্রবচন সাধারণের বোধগম্য হইবে।' বসন্তকুমার সংগৃহীত প্রবাদের মোট সংখ্যা ৯৬। কয়েকটির দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

ক। কেণ্ডা দি কেণ্ডা খোয়ান [কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা]।

খ। আউন কাঅর দি চাই রাইন্ন পারে [আগুন কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না।

গ। কানর সোনায় কান কাডে [কানের সোনাতেই কান কাটে]

ঘ। উজ্জা আঁউলে ঘিরিং ন উডে [সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না]

ঙ। চুউট্টা দিলে ভাঁউট্টা খায় [চড়টা মারলে কিলটা খেতে হয়]

চ। কাউঅর উঅর কাঁআন দাবান [মশা মারতে কামান দাগা]

ছ। খাল কাডি কুঁইর ঘল্লান [খাল কেটে কুমীর আনা]

জ। গাছৎ কাট্টোল ওডৎ তেল [গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল]

ঝ। ঘাডৎ আই নুকা ডুবান [ঘাটে এসে নৌকা ডোবান]

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩২৬ সনের দ্বিতীয় সংখ্যায় বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা' শীর্ষক ভাষাতাত্ত্বিক নিবন্ধে ৯৬টি প্রবাদ প্রকাশিত হবার দীর্ঘ ৭ বৎসর পরে পরিষৎ পত্রিকার ১৩৩৩ সনের ৪র্থ সংখ্যায় সুকুমার সেন মহাশয়ের "বাঙলার নারীর ভাষা" শীর্ষক একটি রমনীয় ও উপভোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটিতে মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হাবড়া—হুগলী—বর্ধমান—চব্বিশ পরগণার মেয়েদের ব্যবহৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য

সম্বন্ধে রসজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি সাহিত্য পরিষদের ৩৩শ বর্ষের ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির উপসংহারে লেখক ১৭টি প্রবাদের নিদর্শন দিয়েছেন। আলোচনাতেও অবশ্য একাধিক ছড়া বা প্রবাদ স্থান পেয়েছে। প্রবাদের সঙ্কলন হিসাবে তাই প্রবন্ধটির তেমন গুরুত্ব না থাকলেও একমাত্র দ্বারকানাথ বসুকে বাদ দিলে আলোচ্য প্রবন্ধের লেখকই প্রথম বাংলা প্রবাদের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন স্বীকার করতে হয়। এ পর্যন্ত সকলেরই প্রবাদ সংগ্রহের উপরে সকল গুরুত্ব ও মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু সুকুমার সেন মহোদয়ের মাধ্যমেই বাংলা প্রবাদের ভিন্নতর আলোচনার দিকটি উন্মুক্ত হবার সুযোগ লাভ করে। প্রসঙ্গতঃ লেখকের মন্তব্যটি উদ্ধার করা যেতে পারে।

'মেয়েদের ছড়ার মধ্যে দিয়ে আমরা বাঙলার মেয়েদের মনস্তত্ত্বের এমন একটা আভাস পাই, যা অন্যত্র সুদুর্লভ। বাঙলার মেয়েদের সঙ্কীর্ণতা যেমন, প্রতিবেশিনীর উপর হিংসা আর বিদ্রূপ, বাপের ঘর থেকে সদ্যোবিচ্ছিন্ন নববধূর প্রতি উপেক্ষা ও স্নেহহীনতা, সতীনের প্রতি হিংস্র ভাব, ঘরজামাই এর উপর অশ্রদ্ধা, নববিবাহিত পুত্রের উপর মায়ের সতর্ক দৃষ্টি—এই সব এই ছড়াগুলির মধ্যে থেকে ফুটে বেরোয়। বাঙলার মায়েদের যে স্নেহ প্রবণ হৃদয়ের পরিচয় আমরা 'ছেলেভুলানো ছড়া'য় পাই, সেই মাতৃহৃদয়ের স্নেহধারা এগুলির মধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। যদি বা কোথাও তার কিছুমাত্র ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তো সে ফল্গুনদীর মত একেবারেই অন্তঃসলিলা।

অনেকগুলি ছড়ার মধ্যে ইতিহাসের টুক্‌রো থাকা খুবই সম্ভবপর বলে মনে হয়। আর অনেকগুলির মধ্যে স্থানীয় ইতিহাস একেবারে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়নি' [পৃঃ ২৪৮-২৪৯]।

প্রবাদ সঙ্কলনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত

এবং কেদারনাথ মজুমদার প্রবর্তিত 'সৌরভ' পত্রিকাটির অবদান অনেকখানি। পত্রিকাটি ১৩১৯ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। পঞ্চদশ বর্ষের ১ম সংখ্যায় [মাঘ; ১৩৩৩] 'আমাদের কথা' পর্যায়ে পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক জেলার পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্তাকর্ষক পল্লী-সাহিত্য সংগ্রহ এবং সাহিত্য চর্চার সুযোগ দিয়া নূতন নূতন লেখক তৈয়ার করার কাজ কোন স্থানীয় মাসিক পত্রিকা দ্বারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। এই মহোদ্দেশ্য সাধনের জন্যই 'সৌরভ' প্রকাশিত হইয়াছিল। [পৃঃ ২১]

এই একই সংখ্যা থেকে 'প্রবাদের আবাদ' পর্যায়ে বাংলা প্রবাদ সঙ্কলন ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়েছে। মূলতঃ কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রবাদগুলি সঙ্কলিত হলেও সেই সঙ্গে সঙ্কলনের ব্যাপারে অপরাপর একাধিক ব্যক্তির প্রয়াসও যে নিযুক্ত হয়েছিল তার প্রমাণও রয়েছে। এই প্রসঙ্গে দুর্গানাথ সিংহ এবং ভৈরবচন্দ্র চৌধুরীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩৩৩ সনের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় [১৪শ বর্ষ; ১০ম ও ১১শ সংখ্যা] দুর্গানাথ সিংহ কর্তৃক ৩৩টি বাংলা প্রবাদ সঙ্কলিত হতে দেখা গেছে। অপরপক্ষে ভৈরবচন্দ্রের সঙ্কলিত মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত ৭১টি সংস্কৃত প্রবাদ ১৩৩৪ সনের ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ সুশীল কুমার দে কিন্তু প্রবাদ সঙ্কলক হিসাবে কেবলমাত্র কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্যেরই উল্লেখ করেছেন। তাঁর হিসাবে কুমুদচন্দ্র সংগৃহীত ও প্রকাশিত প্রবাদের সংখ্যা ৪১২। ভৈরবচন্দ্র সঙ্কলিত সংস্কৃত প্রবাদ বাদ দিলেও আমাদের হিসাবে কেবলমাত্র কুমুদ চন্দ্রের সঙ্কলিত প্রবাদের সংখ্যাই তদপেক্ষা বেশী হয় ৪৫১টি।

'সৌরভে' প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবাদই ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত এবং ময়মনসিংহ ভাষায় প্রকাশিত। কয়েকটির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

ক। আবাগ্যার লগ্‌গনে চান্ গেছে দক্ষিণে।

খ। নুন্ মরিচ দিয়া ভাত খাই বিলাইয়ে কাঁচকলা দেখাই।

গ। না মারব জামাই, সেকাইট লইয়া কুদে।

ঘ। আঁক খেত থাক্‌তে সেলামালি নাই।

ঙ। আপড়া বামুন, শূদ্রের দেড়া। ইত্যাদি।

অবশ্য কেবলমাত্র মৈমনসিংহ অঞ্চলেরই নয়, সিলেট ও অন্যান্য জেলা থেকে সংগৃহীত বেশ কিছু প্রবাদও সঙ্কলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কুমুদচন্দ্রের বক্তব্যটি উদ্ধার করা যেতে পারেঃ 'শ্রীমান শচীন্দ্র ডাক্তার বহুদিন যাবৎ সিলেট প্রবাসী, সেখানে যে সব প্রবাদ বাক্য আছে সে তার অনেকগুলি আনিয়া আমাকে দিয়া চাযের সাহায্য করিয়াছে [পৃঃ ১৯৫]। অন্যত্রও কুমুদ চন্দ্রকে বলতে দেখা গেছেঃ 'অন্যান্য কয়েক জেলার কয়েকটী প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। ক্রমশঃ সেগুলি বাহির করিবার ইচ্ছা' [পৃঃ ২৫৫]।

১৩৩৪ সনে প্রকাশিত 'প্রবাসী' পত্রিকার [২৭শ ভাগ ; ১ম খণ্ড] 'বেতালের বৈঠকে' 'জিজ্ঞাসা' পর্যায়ে জনৈকা জ্যোৎস্না ঘোষ ভ্যাবা গঙ্গারাম, যত দোষ নন্দ ঘোষ, ভবি ভুলবার নয়, খয়ের খাঁ প্রভৃতি ২২টি প্রবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানতে চাওয়ায় [পৃঃ ৬৯] ২৬১ পৃষ্ঠায় বেতালের বৈঠক মীমাংসায় ৮টির উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়। আলোচনা করেছেন বিধুভূষণ শীল ও যতীন্দ্রনাথ বসু।

'ভবি ভোলবার নয়' প্রবাদটির উৎপত্তি বিষয়ে বলা হয়েছে ভবি বা ভবানী নামে একটি বালিকা তার মা বাবার কাছে অন্যায় আবদার করে। মেয়েটিকে নানাভাবে ভোলাবার চেষ্টা করা হয়। শেষে প্রহার পর্যন্ত করা হয়। কিন্তু মেয়েটি তাতেও জেদ ছাড়লে না। বললেঃ 'তোমরা যাই দাও, যাই কর, ভবি ভুলবার নয়।'

'পেঁয়াজও গেল, পয়জারও হলো' প্রবাদটির উৎপত্তিসূচক কাহিনীটি হল নিম্নরূপ :—

একটি লোক পেঁয়াজের ক্ষেতে ঢুকে পেঁয়াজ চুরি করার সময়ে ক্ষেতের মালিকের হাতে ধরা পড়ে যায়। ক্ষেত্রস্বামী লোকটিকে জুতো দিয়ে রীতিমত প্রহার করে এবং পেঁয়াজগুলি কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেয়। তখন লোকটি মনের দুঃখে বলে— 'আমার পেঁয়াজও গেল, পয়জারও হলো।'

'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' এই বহুল প্রচলিত প্রবাদটির উৎপত্তি মূলক কাহিনীটি চমকপ্রদ : এক গ্রামে এক ছুতোর বাস করত। তার দৈনিক আয় ছিল এক টাকা থেকে দেড় টাকা। বেচারী যা রোজগার করত, তার ও তার স্ত্রীর খাওয়াতেই তা শেষ হয়ে যেত। ছুতোরের ছিল এক সুবর্ণ বণিক বন্ধু। এই বণিকের পুকুরে ছুতোরের স্ত্রী জল আনতে গিয়ে প্রত্যহ বণিক পত্নীর সঙ্গে ভোজনের পারিপাট্য বিষয়ে গল্প করত। বণিক-পত্নী কিন্তু লজ্জায় তাদের ভোজনের বিষয়ে কিছু বলত না। কারণ বণিক ও বণিক পত্নী প্রত্যহ সামান্য আহার্য গ্রহণ করত। একদিন বণিক পত্নী তাই বণিককে ভর্ৎসনা করে বললে যে সামান্য আয়ে ছুতোরেরা যদি ভাল খায়, তাহলে তাদের অধিক আয় সত্ত্বেও সামান্য শাকান্ন ভোজন অযৌক্তিক। বণিক কিছু বললে না। একদিন সে ছুতোরের বাড়ী বেড়াবার ছল করে এসে ইচ্ছা করে একটি টাকার তোড়া ফেলে গেল। তোড়াটিতে ছিল নিরানব্বইটি টাকা।

ছুতোর টাকার তোড়া পেয়ে ভাবলে বণিক ভুলে ফেলে গেছে। কিন্তু তাকে ফেরৎ দিতে গেলেও সে তার টাকা নয় বলে ঐ তোড়া নিতে অস্বীকার করলে। তখন ছুতোর ভাবলে যে জীবনে তার সঞ্চয় বলে কিছুই নেই। তাই ভগবান তাকে টাকাগুলি পাইয়ে দিয়েছেন। ছুতোর ঠিক করলে আর একটি

টাকা সঞ্চয় করে মোট একশ টাকা করবে। এই জন্যে ছুতোর তার ভোজনের ব্যয় সংক্ষেপ করলে। কিন্তু একশ' টাকা হয়ে যাবার পরও তার ঐ টাকাটাকে দু'শ করার ইচ্ছা হল। ক্রমে ক্রমে এইভাবে তার চারশ টাকা জমে গেল। এদিকে সঞ্চয়ের তাড়নায় ছুতোরের ভোজনের পারিপাট্য গেল শেষ হয়ে। পরে বণিক একদিন ছুতোরকে তার পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দিলে ছুতোর নিরানব্বইটা টাকা ফেরৎ দেয়। কিন্তু তার টাকা সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি থেকেই যায়। এবং এই কারণে তাকে আজীবন পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্র সাধন করতে হয়। সেই থেকেই 'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' প্রবাদটির উৎপত্তি হয়।

১৩৩৭ সনের কার্তিক মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় [৩০শ ভাগ; ২য় খণ্ড; ১ম সংখ্যা] নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রচিত 'ভারতচন্দ্রের কবিতায় প্রবচন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে লেখক ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রযুক্ত এবং পরবর্তীকালে প্রাত্যহিক জীবনে বহুল ব্যবহৃত ও প্রচলিত এমন ৫৩টি প্রবাদ সঙ্কলন করেছেন যেমন ঃ

ক। যাহার লাগিয়া চুরি করি গিয়া, সেই জন কহে চোর।

খ। পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর।

গ। সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।

ঘ। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

ঙ। নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়? ইত্যাদি।

লেখকের মতানুসারে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদগুলি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি হয়ত নয়, বরং তিনি সম্ভবত তদানীন্তন কালের প্রচলিত প্রবাদগুলিকেই কাব্যে ব্যবহার করে থাকবেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব সেইখানে যে, তাঁর কাব্যে প্রচলিত প্রবাদগুলি যে ভাবে এবং ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে, বাঙ্গালী অবিকৃতভাবে সেই প্রবাদগুলিকেই উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করেছে।

রেভারেণ্ড লঙ্ তাঁর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রবাদমালা'র ভূমিকার শেষে এইরূপ আশা প্রকাশ করেছিলেন : 'The series consists of about 6000 Proverbs, but there are still many local sayings unpublished, and I hope some Native Gentlemen will continue my work in this direction.'

লঙ্ সাহেবের এই অপূর্ণ আশা পূরণে পরবর্তীকালে যে ক'জন মুষ্টিমেয় 'Native Gentlemen' এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে ডঃ সুশীল কুমার দে অন্যতম। ডঃ দে সম্পাদিত "বাংলা প্রবাদ" [১৩৫২] গ্রন্থটি এ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা প্রবাদ সঙ্কলন সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দীর্ঘ ৯০ পৃষ্ঠা ব্যাপী গ্রন্থের ভূমিকাংশটি গ্রন্থের এক অমূল্য সংযোজন। ভূমিকাংশে লেখক বাংলা প্রবাদ সঙ্কলন ও প্রবাদ সংক্রান্ত যাবতীয় রচনার এক সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণিক ইতিহাস প্রদান করেছেন।

ভূমিকায় লেখক প্রবাদের উৎপত্তি, প্রবাদের শ্রেণী বিভাগ, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ ব্যবহারের বিপুল নিদর্শন, প্রবাদের সমাদৃত ও জনপ্রিয়তা অর্জনের কারণ; একই প্রবাদের লেখক পরম্পরায় পুনরুক্ত হওয়ার পরিচয়, বর্তমান নব্য আধুনিক যুগে প্রবাদ ব্যবহারে বাঙ্গালীর অনীহার কারণ, বাংলা প্রবাদের বিশিষ্ট রূপ ও রস, প্রবাদে নিহিত সূক্ষ্ম মনস্তত্ব, প্রবাদে প্রতিফলিত বাঙ্গালী মানসিকতার ও সামাজিক জীবনের পরিচয় বিস্তৃত পরিসরে দান করেছেন।

ডঃ সুশীল কুমার W. G. Smith সম্পাদিত বহুখ্যাত Oxford Dictionary of English Proverbs [Clarendon press ; 2nd Edition, Oxford 1936] নামক সুবৃহৎ প্রবাদ অভিধান অনুসরণে যে তাঁর গ্রন্থটি রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত। তবে Smith সম্পাদিত গ্রন্থে প্রতিটি

ইংরেজী প্রবাদ বাক্যের বিভিন্ন যুগের প্রয়োগ যেমন দেখান হয়েছে—যার ফলে প্রবাদ বিশেষের প্রাচীন রূপ, রূপান্তর প্রভৃতি অবগত হওয়া যায়, আলোচ্য গ্রন্থে সেই ব্যাপকতা অনুপস্থিত। প্রথমতঃ লেখক গ্রন্থে সঙ্কলিত সমস্ত প্রবাদের প্রয়োগ দেখান নি। দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ প্রাচীন রচনা থেকেই প্রবাদ বিশেষের ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখান হয়েছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য, 'আমাদের উদ্দেশ্য প্রবাদের বিস্তৃত অভিধান রচনা নয়, প্রধানতঃ সুপরীক্ষিত, নির্ভরযোগ্য ও যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ সংগ্রহ মাত্র সম্পাদন করা; [পৃঃ ॥৶ ; দ্বিতীয় সংস্করণ ; ভাদ্র ১৩৫৯]। গ্রন্থে যে সকল রচনা অথবা রচয়িতার রচনা থেকে প্রবাদের সাহিত্যিক প্রয়োগ দেখান হয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য অশ্বঘোষ, পতঞ্জলি, পঞ্চতন্ত্র, শূদ্রক, শ্রীমদ্ভাগবত, ভবভূতি, হিতোপদেশ, রাজশেখর (সংস্কৃত), জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, উইলিয়াম কেরী, রামপ্রসাদ, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ইত্যাদি।

'বাংলা প্রবাদে'র তৃতীয় পরিশিষ্টের অন্তর্গত প্রমাণপঞ্জী অংশটি অত্যন্ত মূল্যবান। এই অংশে কেবলমাত্র বাংলা প্রবাদের সঙ্কলন ও প্রবাদ সংক্রান্ত আলোচনার সংক্ষিপ্ত নির্যাসই দান করা হয়নি, সেই সঙ্গে বাংলা ব্যতীত অন্যান্য নব্য ভারতীয় ভাষায় যে সব প্রবাদ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে তাদের পরিচয়ও প্রদত্ত হয়েছে।

১২৮ পৃষ্ঠার শব্দসূচী গ্রন্থটির এক অতুলনীয় সম্পদ। এই সুবিপুল শব্দসূচী সম্পাদকের অসাধারণ পরিশ্রমের এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য, 'প্রবাদ সংগ্রহের শব্দসূচী একটু বিস্তৃত ভাবেই সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা কেবল বিশিষ্ট প্রবাদ খুঁজিয়া লইতে সাহায্য করিবে, তাহা নয়; এই শব্দগুলি যে সব বস্তু বা বিষয়ের বাচক, তাহার সম্বন্ধে বিবিধ প্রবাদ

যিনি একত্র আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, এরূপ সূচী তাঁহার সাহায্য করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া, সাধারণ বাংলা শব্দগুলি পৌনঃ পুনিক প্রয়োগ প্রাচুর্যের (word-frequency) ইহা একটা মোটামুটি ধারণা দিবে। ভাষা আলোচনার দিক হইতেও এরূপ বিস্তৃত শব্দসূচীর প্রয়োজন রহিয়াছে। [পৃঃ ॥৶ ; ২য় সংস্করণ] বস্তুতঃ গ্রন্থটির শব্দসূচী পরবর্তীকালের বহু গবেষক ও অনুসন্ধিৎসুর গবেষণা নিচয়ের আকর রূপে গৃহীত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। এককথায় বলতে গেলে, বাংলা প্রবাদ সংক্রান্ত আলোচনায় এই গ্রন্থটি অপরিহার্য। এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবাদের সংখ্যা ৯১০০। এতদ্ব্যতীত ১৩৫টি কৃষি সম্বন্ধীয় খনার বচনও গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। প্রবাদগুলি বর্ণানুক্রমিক সজ্জিত।

বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। সত্যি কথা বলতে কি বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার সূত্রপাত প্রায় দেড় শতাব্দী কালের প্রাচীন হলেও এই চর্চা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, অপরিকল্পিত এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকসাহিত্য ও সংস্কৃত প্রেমিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষ, বিশেষত উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এই ব্যাপারে এক অবজ্ঞা মিশ্রিত অনীহার ভাব দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। ডঃ ভট্টাচার্য্যের প্রধান কৃতিত্ব সাধারণ মানুষ তথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে লোকসাহিত্যের গুরুত্বকে উপযুক্তভাবে উপস্থাপিত করে তাদের এই বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা। বর্ত্তমানে উভয় বঙ্গের বহু পণ্ডিত ও গবেষক বাংলা লোকসাহিত্য গবেষণা ও চর্চায় নিযুক্ত রয়েছেন। এদের সকলেরই ওপর ডঃ ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ডঃ ভট্টাচার্যের প্রভাব যে সুদূর প্রসারী, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ডঃ ভট্টাচার্য

১৯৫৩ সালে দোল পূর্ণিমার সময় শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত সাহিত্য মেলায় প্রথিতযশা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের আমন্ত্রণে 'বাঙলার লোক সাহিত্যে প্রতিবেশী উপজাতির দান' সম্পর্কে একটি মৌখিক ভাষণ দান করেন। এই ভাষণ বহু বিদ্বজ্জনের দ্বারা প্রশংসিত হয় এবং অনেকের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি সক্রিয় ভাবে বাংলার লোকসাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এরই ফলে তাঁর 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থটি। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৬১ বঙ্গাব্দে এবং এই গ্রন্থটি রচনার জন্য লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯ সনে পি, এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তখন থেকেই ডঃ ভট্টাচার্য প্রায় দুই দশকের অধিককাল নিরলস ভাবে বাংলার লোকসাহিত্য বিষয়ক আলোচনাতেই মুখ্যতঃ নিজের মননশীলতা ও গবেষণা শক্তিকে নিযুক্ত রেখেছেন এবং লোক সাহিত্য বিষয়ক বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থটিতে লোক সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনা লিপিবদ্ধ হলেও বর্তমান আলোচনায় আমরা বিশেষ ভাবে প্রবাদ সংক্রান্ত আলোচনাকেই অন্তর্ভুক্ত করব।

'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থটির সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায় 'প্রবাদ সংক্রান্ত আলোচনাতেই ব্যয় হয়েছে। লেখক প্রবাদের সংজ্ঞা, উৎপত্তি, দার্শনিক সত্যের সাথে প্রবাদের পার্থক্য, বিভিন্ন দেশে প্রচলিত প্রবাদের মধ্যেকার সাযুজ্য এবং একই বিষয় অবলম্বনে সৃষ্ট বিভিন্ন দেশের প্রবাদের পার্থক্য ও তার কারণ, চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে ব্যবহৃত প্রবাদের নিদর্শন, প্রবাদের প্রচার লাভের কারণ প্রবাদের মাধ্যমে প্রকাশিত সাহিত্যিক উৎকর্ষ, প্রবাদ রচনার উদ্দেশ্য, বাংলা প্রবাদের শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতি নানা বিষয়ই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। লেখক তাঁর প্রবাদ সম্পর্কিত আলেচনায় বিশেষ-ভাবে ডঃ সুশীল কুমার দে'র আলোচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন

লক্ষ্য করা যায় এবং প্রবাদসম্পর্কিত আলোচনায় ডঃ দে'র সম্পাদিত 'বাংলা প্রবাদ' থেকেই প্রায় সকল প্রবাদ উদ্ধার করেছেন। এর কারণ দ্বিবিধ—প্রথমত লেখকের গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বেই সুশীল কুমারের সংগ্রহটি প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়ত, লেখক সুশীল কুমারের প্রত্যক্ষ সংশ্রবে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ সংগ্রহের কার্যে ব্রতী ছিলেন।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের লোকসাহিত্য আলোচনার পদ্ধতি বিষয়েও উল্লেখ করতে হয়। এই ব্যাপারে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারার সমন্বয় সাধন করেছেন বলা যেতে পারে। প্রাচ্য ধারা বলতে বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত হৃদয় নির্ভর রসোপলব্ধির ধারাকে বোঝান হয়। এক্ষেত্রে রসাস্বাদনই মুখ্য লক্ষ্য। বিপরীতক্রমে বস্তু বিশ্লেষণে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অপরপক্ষে পাশ্চাত্য ধারায় আস্বাদন অপেক্ষা বিশ্লেষণেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অর্থাৎ এই ধারায় হৃদয়ের পরিবর্তে মস্তিষ্ক তথা বুদ্ধিকেই প্রধান ভাবে নির্ভর করা হয়। কিন্তু উভয় ধারাতেই কিছু পরিমাণে অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সুখের বিষয়, ডঃ ভট্টাচার্য তাঁর লোক সাহিত্য আলোচনায় হৃদয় এবং বুদ্ধি—রসাস্বাদন ও বস্তু বিশ্লেষণ এই দুই প্রয়োজনীয় দিকের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। বিশেষত বিজ্ঞান তথা যুক্তিনির্ভর লোক সাহিত্য চর্চার সূত্রপাতে তাঁকে অন্যতম পথিকৃতের সম্মান দান করতে হয়। শিক্ষাগত শৃঙ্খলা রক্ষা [academic discipline] যা বিশেষভাবে এই জাতীয় আলোচনার পক্ষে এক অপরিহার্য অঙ্গ, তা রক্ষিত হওয়ায় ডঃ ভট্টাচার্যের আলোচনা বাঞ্ছিত উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হয়েছে।

সত্যরঞ্জন সেন রচিত 'প্রবাদ-রত্নাকর' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে লেখক মেয়েলী বচন এবং নিত্য ব্যবহারে লাগে না এমন কিছু প্রবাদ বাদ দিয়ে কিছু চলতি কথা বা মুহাত্তরা সন্নিবিষ্ট করে ছাত্রদের ভাষা শিক্ষার সহায়ক রূপে

"সংক্ষিপ্ত প্রবাদ রত্নাকর" প্রকাশ করেছিলেন। লেখকের মূল গ্রন্থে ৬৪৩২টি প্রবাদ সঙ্কলিত হয়েছে। যে সকল প্রবাদের শব্দগত প্রভেদ প্রধানতঃ প্রাদেশিক এবং যাদের সংখ্যা নির্ণয়ের অতীত, সেগুলির অধিকাংশই সঙ্কলনটিতে স্থান পায়নি। প্রবাদগুলি বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী সজ্জিত। লেখক নিতান্ত সহজবোধ্য প্রবাদগুলি ব্যতিরেকে সবগুলির বিশদ ব্যাখ্যা দান করেছেন। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে প্রবাদের একাধিক অর্থও প্রদত্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রচনা থেকে প্রবাদের প্রয়োগও দেখান হয়েছে। অবাঙালী পাঠকের সুবিধার্থে হিন্দী এবং ইংরেজী থেকে তুল্যার্থবোধক প্রবাদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

যে সকল প্রবাদে অশ্লীলতা বা দুর্নীতির ইঙ্গিত আছে, সংগ্রহে তাদের স্থান দেওয়া হয়নি। তবে যে সকল ক্ষেত্রে শালীনতার জন্য বিশেষ কোন শব্দ বাদ দিলে মূল প্রবাদের সমুদয় ব্যঞ্জনা বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা, সেখানে অবিকৃত ভাবেই প্রকাশ করা হয়েছে।

গ্রন্থের অবতরণিকায় লেখক প্রবাদের সংজ্ঞা, লক্ষণ, প্রবাদের আকার, মনোহারিত্ব, প্রাচীনত্ব, উৎপত্তি, প্রেরণা, প্রবাদের রূপান্তর ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বর্তমান সঙ্কলনটিতে কেবল মাত্র বাংলা প্রবাদই নয়, সেই সঙ্গে বহু সংস্কৃত বাক্য ও বাক্যাংশও স্থান পেয়েছে। বেশ কিছু হিন্দী প্রবাদও গৃহীত হয়েছে। অধিকাংশ বাংলা ইডিয়াম পরিত্যক্ত হয়েছে। গ্রন্থে শব্দসূচী অনুপস্থিত। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, 'বর্তমান গ্রন্থ পূর্বসূরীগণের সাধনালব্ধ ফলে পুষ্ট। সুতরাং সংগ্রহের দিক দিয়া কৃতিত্ব নগণ্য। ...বাংলায় প্রবাদ সাহিত্য সংক্রান্ত যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্থানে স্থানে টীকা-টিপ্পনী এবং ইংরাজি অনুবাদ সন্নিবেশিত থাকিলেও, নিছক সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছু নয়। ইহাদের প্রকাশের ফলে বহু বিস্মৃত বা প্রায়

বিস্মৃত প্রাচীন প্রবাদ রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু ইহাও লক্ষণীয় যে, একালে অনেকে এ প্রকার বহু প্রবাদের অর্থ গ্রহণে অক্ষম।

…প্রবাদ সমূহের অর্থ যাহাতে আপামর জনসাধারণের বোধগম্য হয় এই উদ্দেশ্যে, যে সকল প্রবাদ নিতান্ত সহজবোধ্য সেগুলি ছাড়া আর সবগুলির বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন বোধ হইয়াছে।' [পৃঃ ২২]

আচার্য সুনীতিকুমার গ্রন্থটি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন : 'This is a very fine study of Bengali proverbs. In any language its proverb—literature forms a very distinctive part. The present work is meant primarily for the use of students and writers of Bengali. If gives a very representative selection from Bengali proverbs'.

গোপালদাস চৌধুরী এবং প্রিয়রঞ্জন সেন প্রণীত 'প্রবাদ বচন' ১৩৬৭ সনে প্রকাশিত। সঙ্কলিত প্রবাদগুলির অধিকাংশই সেরপুরের জমিদার গোপালদাস চৌধুরী কর্তৃক সংগৃহীত। প্রবাদগুলি বর্ণমালার ক্রম পরম্পরার সজ্জিত। মাঝে মাঝে তুল্যার্থক ইংরেজী প্রবাদও দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু সংস্কৃত প্রবাদও সঙ্কলনটিতে স্থান পেয়েছে। প্রবাদ বিশেষের প্রচলিত পাঠান্তরও লক্ষ্য করা যায়। সম্পাদক গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'হাতের কাছে অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে প্রবাদ বচন পাইলে সমাজের নানা শ্রেণীর পাঠক সুবিধামত প্রবাদ প্রয়োগের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। এজন্য প্রবাদ বচনের একটা স্বতন্ত্র ক্ষেত্র আছে। সেই ক্ষেত্রের কথা মনে করিয়াই ইহা প্রকাশের ব্যবস্থা। [পৃঃ ।০—।/০]

সঙ্কলনটিতে নূতন প্রবাদের তেমন সন্ধান পাওয়া যায় না। আলোচ্য গ্রন্থে পূর্ববর্তী সঙ্কলনগুলিতে প্রকাশিত প্রবাদ সমূহই লক্ষিত হয়ে থাকে।

'সপ্তর্ষি' পত্রিকার ৮ম বর্ষের একটি সংখ্যায় [মাঘ-চৈত্র ; ১৩৭১] রমেন্দ্রনাথ অধিকারী 'উত্তরবঙ্গের লোক সাহিত্য' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত ৫টি প্রবাদের উল্লেখ করেছেন। এই প্রবাদগুলি থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা একদিকে যেমন প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে প্রচলিত হিন্দী ভাষার দ্বারা প্রভাবিত, অপরপক্ষে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা আসামের গোয়াল পাড়ার পূর্ব ও উত্তরদিকে অসমীয়া ভাষার প্রভাবে কিরূপ পরিবর্তিত রূপ প্রাপ্ত হচ্ছে। লেখক পূর্ণিয়ার কিষণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রাম থেকে ১টি প্রবাদ সংগ্রহ করেছেন যেটির সঙ্গে চর্যাপদের একটি পদের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে—

হাড়ীত ভাত নাই ধাপোত চুল্‌হা
ঘরে ঘরে বেড়ায় ধুতি ঝুল্‌হা।

এর সঙ্গে তুলনীয় চর্যাপদের সেই অংশটি—

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী
হাঁড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী।

লেখক সংগৃহীত অপরাপর প্রবাদগুলি হ'ল—

ক। বাপের থাকি বেটায় সিয়ান
পুচি পুচি নেয় গিয়ান।

খ। হাতির পেছলে পাও
সুজন কাণ্ডারী হয়
তারো ডোবে নাও।

গ। যে বাঙা ফোটে
তার দোপাতাতে চিন্

ঘ। যাক কসো তার মুকোৎ
যাক হানমো তার বুকোৎ।

'মধ্যাহ্ন' নামক শিল্প ও সাহিত্য ত্রৈমাসিকের চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যাটিতে [মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬] লোক সাহিত্যের ক্রোড়পত্র

সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই ক্রোড়পত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সনৎ কুমার মিত্রের রচিত 'বাংলা প্রবাদে সাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ। 'সাম্প্রদায়িকতা' বলতে সচরাচর আমরা সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ, বিশেষত হিন্দু ও মুসলমানের সংঘাতকেই বুঝে থাকি। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক ৬৩টি প্রবাদের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে সমাজ কি চোখে দেখে সেই কৌতু-হলোদ্দীপক চিত্রটি উপস্থাপিত করেছেন। লেখকের ভাষায়, 'সমাজে বিভিন্ন স্তরে যে অভিজ্ঞতার পরত পড়েছে, যা দর্পণ হিসেবে পরস্পরের সামনে রাখা হয়েছে যাতে গোটা সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মনের—আচার—আচরণের স্বভাবের ছবি ঘন কালো রেখায় আঁকা হয়েছে, সেই প্রবাদমালা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের নয়; সেখানে কারুর প্রতি আক্রোশ বা শত্রুতা নেই।'

লেখক দেখিয়েছেন, যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রম প্রথায় নিজেকে শ্রেষ্ঠস্থানে অধিষ্ঠিত করে সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র বলে বিবেচিত হত, প্রবাদে তাকেই ঔদরিক, ভিক্ষুকবৃত্তি সম্পন্ন, পূজার্চনা ও শাস্ত্র-চর্চা বিরহিত, সকল প্রকার বাঞ্ছিত গুণপণা থেকে মুক্ত দক্ষিণাভিলাষী অপরের করুণার পাত্ররূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এক দিকে সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ সমাজের অধঃপতন দায়ী, অপরপক্ষে দীর্ঘদিন যে ব্রাহ্মণ তথা পুরোহিত সম্প্রদায় সমাজকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধর্মের ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বঞ্চিত ও প্রতারিত করেছে, তাদের প্রতি সমাজের দীর্ঘদিনের ঘৃণা মিশ্রিত ক্ষোভও বিশেষ ভাবে প্রবাদগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

সমাজে চিকিৎসকদের এক সম্মানিত স্থান স্বীকৃত। নিপীড়িত মানুষের সেবায় যে তাঁরা উৎসর্গীকৃত প্রাণ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা মানবিকতাবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিছক অর্থের লালসায় নিজেদের পবিত্র মানবিক কর্তব্য পালনে অসমর্থ হন

প্রবাদে তাদের প্রতিও চরম দণ্ড বিধান করা হয়েছে নির্লজ্জ, অর্থলোভী রূপে চিত্রিত করে।

আমাদের সমাজে দুই প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়—বৈষ্ণব ও শাক্ত। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যেকার বিবাদ দীর্ঘদিনের। কিন্তু বাংলা প্রবাদে এই বিবাদের এক পক্ষকে বিস্ময়কর রূপে অনুপস্থিত দেখা গেছে। কেবল ভেকধারী পণ্ডিত বৈষ্ণবদেরই তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। লেখক এক পক্ষের অনুপস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ করে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব ও শাক্তদেবীদের প্রতি ভীতির কারণকে দায়ী করেছেন।

শাক্ত ও বৈষ্ণবদের ন্যায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যেকার বিরোধও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে আমাদের সমাজে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সব প্রবাদ রচিত হয়েছে সেক্ষেত্রে 'উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কে পারস্পরিক মন্তব্যে বিদ্বেষের বিষ নেই—আছে ব্যঙ্গ—কৌতুকের দীপ্তি এবং লঘু রসিকতার তারুণ্য।' লেখক হিন্দু ও মুসলমানের সমন্বয় জ্ঞাপক একটি প্রবাদ উদ্ধার করেছেন, যেটি নানা কারণেই বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ—'রাম রহিম কালী,
ভেদ করলেই মলি।'

কায়স্থ, কৃষক, কলু, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরা প্রবাদে কিরূপে চিত্রিত হয়েছে, তারও কয়েকটি নিদর্শন প্রবন্ধটিতে উদ্ধৃত হয়েছে।

সুশীল কুমার ভট্টাচার্য রচিত 'উত্তর বঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে [১৯৭০] 'উত্তরবঙ্গের প্রবাদ' পর্যায়ে উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত ৫৪টি প্রবাদ প্রকাশিত হয়েছে। লোক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান উপকরণ সংগ্রহে কিংবা সেই সম্পর্কিত আলোচনায় সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে উত্তরবঙ্গ দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ও অবজ্ঞাত রয়ে গেছে। এর কারণ দ্বিবিধ—ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা ও

বিশেষত উত্তরবঙ্গের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রেমিক ব্যক্তির অভাব। অথচ উত্তরবঙ্গের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবেই পরিপুষ্ট। প্রথমতঃ উত্তরবঙ্গের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় লাভের জন্য এবং সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে বাংলা লোক সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভের প্রয়োজনেও এই বিশেষ অঞ্চলের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ বিশেষ ভাবে বাঞ্ছনীয়। সেদিক থেকে সংখ্যায় সীমিত সংখ্যক হলেও স্থশীল ভট্টাচার্য মহাশয়ের উত্তরবঙ্গের প্রবাদ সংগ্রহ বিশেষ প্রশংসা লাভের যোগ্য। লেখক প্রতিটি প্রবাদের সঙ্গে তার অর্থও সংযুক্ত করেছেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে অপরিচিত আঞ্চলিক শব্দের অর্থ প্রকাশ করেছেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে—

ক। কুঁতিয়া মৈল দৈবকী,
নাম পাড়ায় যশোদারাণী।

[দেবকী প্রসব বেদনা ভোগ করলেন আর যশোদা কৃষ্ণজননী রূপে আখ্যা পেলেন]

খ। গায় নাই ছাল বাক্‌লা।
মদ খায় আক্‌লা আক্‌লা।

[ছালবাকলা—চর্ম ; আক্‌লা আক্‌লা—অঞ্জলি অঞ্জলি]

গ। দাতার দান বকিলের ফাটে পরাণ।

[কৃপণ নিজে ত দান করেই না, উপরন্তু অপরে দান করলেও সে কষ্ট পায়]

ঘ। ধান বাড়ি দিয়া ঘাঁটা,
চাউল বাড়ি দিয়া ঘাঁটা।
টালিয়া ফেলাইস্ মাথার পাগ,
চওড়েয়া দেখাইস্ ঘাঁটা।

[অনধিকার চর্চায় রত ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত তিরস্কার]

ঙ। যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয়,
চেরাকদারের ঘোড়া।
যার নাও সে যায় তড়ে, ধূমকাড়াটা আসিয়া চড়ে।

[চেরাকদার—আলোকলতা ; এ স্থলে সহিস ; তড়ে—তটে ; ধূমকাড়া—ধূমধামকারী। প্রবাদটি বলপ্রয়োগে অনধিকার প্রবেশকারী ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য হয়]

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের [১৩৬১] প্রথম খণ্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায়টি 'প্রবাদ' সম্পর্কিত। আমরা পূর্বেই এই অধ্যায়টি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এইবার বাংলা প্রবাদ চর্চার ইতিহাসে ডঃ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থটির ষষ্ঠ খণ্ডের [১৩৭৯] স্থান বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় গ্রন্থটির বিশালতা সম্বন্ধে। এ পর্যন্ত বাংলায় যতগুলি প্রবাদ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে আলোচ্য সংগ্রহটিই বৃহত্তম। সর্বমোট ১২৫০৭টি প্রবাদ ও বিশিষ্টার্থক শব্দ গুচ্ছ আলোচ্য সংগ্রহে স্থান লাভ করেছে। অর্থাৎ বর্ত্তমান সঙ্কলনে ডঃ সুশীল কুমার দে'র সংগ্রহের তুলনায় ৩৪০৭টি বেশি প্রবাদ ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ সংযোজিত হয়েছে। সঙ্কলনটির দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি গ্রন্থটির মর্যাদাকে বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি করেছে তা হল—পূর্ববর্তী সবক'টি সঙ্কলনে যেখানে প্রবাদের সঙ্গে বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ এমন কি ছড়া, বা চলতি কথা ও ধাঁধাও একত্রে স্থান পেয়েছে, সেক্ষেত্রে একমাত্র আলোচ্য সঙ্কলনটিতে সঙ্কলক প্রবাদ এবং বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছকে পৃথক ভাবে নির্দেশ করেছেন। তারকা চিহ্নের দ্বারা তিনি বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছকে চিহ্নিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রবাদের সঙ্গে প্রবাদমূলক বাক্যাংশের পার্থক্য বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে।

প্রবাদ একটি সম্পূর্ণ বাক্য। আকৃতিতে যতই ক্ষুদ্র হোক— প্রবাদ সম্পূর্ণ একটি ভাবকে প্রকাশ করে। কিন্তু প্রবাদমূলক

বাক্যাংশ বা বিশিষ্টার্থক শব্দ তা নয়। এটি বাক্যের অংশ মাত্র, তাই স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ ভাব এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। এ পর্যন্ত গেল ভাব বা অর্থগত দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যেকার পার্থক্য। এইবার গঠন প্রকৃতি বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রবাদ যেহেতু একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বাক্য—তাই এটি অবশ্যই বাক্য গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া সম্বলিত হবে। তবে বাংলা বাক্যের গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলি সম্পূর্ণ ভাবে উল্লিখিত নাও হতে পারে, কিন্তু বিশিষ্টার্থক শব্দের ক্ষেত্রে এরকম কর্তা, কর্ম বা ক্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। যেমন 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' এটি একটি প্রবাদ, কিন্তু 'নয় ছয়' বিশিষ্টার্থক শব্দের একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ইংরেজীর মত অবিমিশ্র বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের কোন তালিকা প্রস্তুত হয় নি।

যাই হোক আমরা ইতঃপূর্বে ডঃ সুশীল কুমার দে'র 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থটিকেই বাংলা প্রবাদ সঙ্কলন সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিমত প্রকাশ করেছি, ডঃ ভট্টাচার্যও তাঁর গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে বলেছেন, 'আচার্য দে'র 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থের তুলনায় বর্ত্তমান গ্রন্থে কয়েক সহস্র প্রবাদ অধিক সঙ্কলিত হওয়া ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থের আর কোন গুণ ইহাতে স্পর্শ করিতে পারে নাই।' আলোচ্য সঙ্কলনে ডঃ দে'র গ্রন্থের অনুরূপ শব্দসূচী অনুপস্থিত, এমন কি, লেখক সঙ্কলিত প্রতিটি প্রবাদের সাহিত্যিক প্রয়োগও দেখান নি। তবু শুধুমাত্র সংখ্যাগত দিক ছাড়াও ভূমিকায় প্রবাদের নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করায় বর্ত্তমান সঙ্কলনটির গুরুত্বও বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে স্বীকার করতে হয়। সুদীর্ঘ ৯৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকাংশে প্রবাদের সংজ্ঞা, উদ্ভব, নীতি বাক্য ও প্রবাদ, লৌকিক প্রবাদ ও সাহিত্যিক প্রবাদ, প্রবাদ ও সমাজ-বিজ্ঞান, প্রবাদে রস ও রুচি, রসবচন, প্রিয়বচন প্রভৃতি

নানা বিষয়েই আলোচনা করেছেন লেখক। গ্রন্থের পরিশিষ্টে (ক) রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসু প্রভৃতির নাটকে প্রযুক্ত প্রবাদের একটি সুনির্বাচিত সঙ্কলন গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ 'ধনধান্যে' পত্রিকার স্বাধীনতা সংখ্যায় [১৯৭৪ ; ১৫ই আগষ্ট] বর্তমান লেখক রচিত 'বাংলা প্রবাদে কৃষি ও কৃষক' শীর্ষক একটি স্বল্পায়তন বিশিষ্ট নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নিবন্ধটির নামকরণ থেকেই নিবন্ধটির বিষয়বস্তু অবগত হওয়া যায়। রচনাটিতে কয়েকটি প্রবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান জীবিকা কৃষি ও সেই কৃষিকার্য যাদের বৃত্তি—সেই কৃষকদের কি দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে, সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যে কৃষক সমাজের সর্বাপেক্ষা অধিক হিত সাধনে রত, সেই কৃষককে প্রবাদে নির্বোধ ও হীন রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এইরূপ হীনরূপে উপস্থিত করার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—দীর্ঘদিন ধরে যে কৃষককে বঞ্চিত করা হয়ে আসছে, বঞ্চনার সেই ধারাটিকে অব্যাহত রাখতেই এটা একপ্রকার কৌশলমাত্র।

বাংলা পত্র-পত্রিকা সমূহের মধ্যে 'চতুষ্কোণ' অন্যতম এক প্রগতিশীল পত্রিকা রূপে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও এই পত্রিকার এক বিশেষ ভূমিকা আছে। পঞ্চদশ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় [শারদীয় বিশেষ সংখ্যা ; আশ্বিন ১৩৮২] তুলাল চৌধুরী রচিত 'চাকমা প্রবাদ গঠন শৈলী' নামে একটি নাতিদীর্ঘ ও মনোজ্ঞ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য ত্রিপুরায় বসবাসকারী হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক প্রভাবে প্রভাবিত চাকমাদের প্রবাদের গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে লেখক আলোকপাত করেছেন। লেখক মন্তব্য করেছেন, 'সংগ্রহ ও অর্থ ব্যাখ্যা ব্যতীত প্রবাদ বা লোকসাহিত্যের

সামগ্রিক গঠন রীতির বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ বাংলা ভাষায় অনুপস্থিত বললে চলে।' এই কারণে লেখক সীমিত পরিসরে হলেও আলোচ্য নিবন্ধে জি. বি. মিলনার, ডঃ এলান ডাণ্ডিস, ডঃ রবার্ট জর্জেস প্রমুখ পাশ্চাত্য লোক সংস্কৃতিবিদ্গণের অনুসরণে কয়েকটি চাকমা প্রবাদের মডেলের ইঙ্গিত দিয়েছেন। লেখক প্রতিটি প্রবাদকে রূপগত বিচারে 'মাথা' ও 'লেজ' [Head and Tail] সাধারণ ভাবে এই দুটি বিভাগে, এতদ্ব্যতীত গুণগত বিচারে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক [Positive and Negative] এই দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করার স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এছাড়া কবিতার পংক্তিকে যেমন কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করা হয় ছন্দ বিচারের ক্ষেত্রে, অনুরূপভাবে প্রতিটি প্রবাদকে কয়েকটি অণুতে বিভক্ত করার ব্যাপারে লেখক তাঁর অভিমত দিয়েছেন। বাংলা প্রবাদ বিষয়ক আলোচনায় আলোচ্য প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে এক অভিনব সংযোজন। কারণ, রূপগত দিক দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লোকসাহিত্যের কোন বিভাগেরই বিচার বিশ্লেষণ এ পর্যন্ত করা হয়নি। অথচ আধুনিক গবেষণায় বস্তুগত এই বিচার বিশ্লেষণের গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত।

বাংলা ছড়া-চর্চার ইতিহাস

বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম গভীর ভাবে যুক্ত হয়ে আছে। বাংলা লোক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহের এবং আলোচনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অনেকখানি অবদান রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়' নীতি অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে মৌলিক সৃজনী ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অন্তরের অকৃত্রিম আন্তরিকতা বশতঃই বাংলার লোক সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ ও তার আলোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৭ই চৈত্র মফঃস্বল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী রূপে আগত ও তৎসহ কলকাতার কলেজের ছাত্রদের সম্বর্ধনার জন্য ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ছাত্র সমাজের সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ক্লাসিক থিয়েটারে [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক বিবরণী [১৩৪৯] থেকে জানা যায় যে ১৩১১ সনের ১৭ই চৈত্র রবীন্দ্রনাথ মিনার্ভায় ছাত্রদের স্বদেশ সেবার্থে আহ্বান করে 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। কিন্তু পরিষদের একাদশ বর্ষীয় বিশেষ সভার কার্য বিবরণীতে আমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্য সমর্থিত হয়েছে। কেবল রবীন্দ্রনাথের পঠিত প্রবন্ধটির নাম উল্লিখিত হয়েছে 'ছাত্রদের প্রতি আবেদন'।] সহস্রাধিক ছাত্রের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি ঐ একই বৎসর [১৩১২] 'বঙ্গদর্শনে'র বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে ছাত্র সমাজকে বঙ্গদেশের ও

বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদির অনুসন্ধান কার্য্যে আত্মনিয়োগের কথা বলেছেন, 'সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত পার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এছাড়া গ্রাম্যছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্য পরিষদ্ নিজের কর্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।' [শিক্ষা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ; পঃ বঃ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৫৪৯ ;]

এই একই প্রবন্ধের অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ ছাত্রসমাজকে আবেগপূর্ণ ভাষায় তাদের বয়সোচিত উদ্যম ও শ্রদ্ধা সহকারে পরিষদের নেতৃত্বাধীনে বিশাল কর্মযজ্ঞে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে নিজেদের দেশপ্রেমকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'আজ সাহিত্য পরিষদ্ তোমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছেন তাহার ভাষা মাতৃ-ভাষা ও তাহার কার্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে—দেশের কাব্যে গানে ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাব-শেষে কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায় পল্লীর কৃষি কুটিরে পরিষদ্ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন সেখানে বিদেশী লোক কোনোদিন বিস্ময় দৃষ্টিপাত করেনা, সেখান হইতে সংবাদপত্র বাহন খ্যাতি সমুদ্রপারে জয়-ঘোষণা করিতে যায় না, সেখানে তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই—কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিস্ মাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পারো তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী এই সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা

পুরস্কারে, খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো।' [শিক্ষা; রচনাবলী ; পৃঃ ৫৫৩]।

রবীন্দ্রনাথ প্রকাশিত ছড়ার সংখ্যা ৮১। এছাড়া যে সকল ছড়া তাঁর ছড়া সংক্রান্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাদের সংখ্যা ধরলে মোট সংগৃহীত ছড়ার সংখ্যা দাঁড়ায় শতাধিক। ছড়ার রস সম্পর্কে সকলের মধ্যে ঐকমত্য না থাকলেও ছড়াগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কারণ ব্যক্ত করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে,...আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটোবড়ো অনেক জিনিস অলক্ষিত ভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথের ছড়া সম্পর্কিত আলোচনা বিশেষ ভাবে রস-কেন্দ্রিক। আমাদের ভাষা ও সমাজ ইতিহাসের সঙ্গে ছড়াগুলির সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। দ্বিতীয়ত, এই আলোচনা সমগ্রভাবে বাংলা ছড়া সম্পর্কিত নয়। একান্ত ভাবে ছেলে ভুলানো ছড়া প্রসঙ্গেই তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ। কিন্তু ছড়া শুধুমাত্র ছেলেদেরই নয়, বয়স্কদের উপযোগী ও ব্যবহৃত ছড়াও রয়েছে। তাই এদিক দিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের ছড়া সম্পর্কিত আলোচনা আংশিকতায় সীমাবদ্ধ। এর প্রধান কারণ ররীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ছড়াগুলির অধিকাংশই শিশুকেন্দ্রিক। তাই স্বভাবতঃই শিশু কেন্দ্রিক ছড়ার প্রসঙ্গেই তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ থেকেছে। সংগৃহীত ছড়ার স্বল্পতার কারণেই প্রধানতঃ এবং তদুপরি ছড়ার রস বিশ্লেষণের প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করায় বিষয়বস্তু ও ভাবানুযায়ী ছড়ার শ্রেণীবিভাগে তাঁকে প্রবৃত্ত

হতে দেখা যায়নি। এসব সত্ত্বেও ছড়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন তাঁর গভীর রসানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচায়ক। অবশ্য শুধুমাত্র রসবোধ ও শিল্প পরিমিতি বোধই এক্ষেত্রে সক্রিয় থাকেনি, সেই সঙ্গে তাঁর শৈশবকালীন স্মৃতিও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে স্বীকার করতে হয়। তাই বলে রবীন্দ্রনাথ কৃত ছড়া সম্পর্কিত আলোচনা বিন্দুমাত্র আতিশয্য দুষ্ট হয়নি। বরঞ্চ তাঁর নিজস্ব রসদৃষ্টিতে ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির কারণে ছড়াগুলি নবতর তাৎপর্য লাভ করেছে এবং পাঠক সাধারণের কাছে আপাত তুচ্ছ ছড়াগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

চিরত্ব ছড়াগুলির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ সচেতন প্রয়াসে সৃষ্ট সাহিত্য যখন অনায়াস বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হয়, সেক্ষেত্রে অসচেতন ভাবে সৃষ্ট ছড়াগুলি কিন্তু চিরন্তনত্বের অধিকারী —এটা কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। শিশু যেমন চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়তা শিশু চরিত্রের যেমন এক অপরিহার্য অঙ্গ, ছড়াগুলির ক্ষেত্রেও তদনুরূপ অপরিবর্তনীয়তা এক বিশেষ আকর্ষণের কারণ। এক্ষেত্রে ভাব ও ভাষার অপরিবর্তনশীলতাকে অবশ্য নির্দেশ করা হয়নি, ছড়াগুলির চিরন্তন আকর্ষণের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই কারণে শিশু চরিত্রের সঙ্গে ছড়া চরিত্রের উল্লেখযোগ্য ও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ছড়ার চিত্রধর্মিতা অপর এক উল্লেখযোগ্য দিক। বললে অত্যুক্তি হয় না যে ছড়াগুলি যেন চিত্রের সাম্রাজ্য। বলা বাহুল্য এই চিত্রগুলি অযত্নরচিত। চিত্রগুলি যে শুধু অপরিণত ও বৈষয়িক বুদ্ধিমুক্ত শিশুদের কাছেই জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করে তাই নয়, বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন পরিণত বয়স্ক মানুষের মত সংশয়ীর কাছেও চিত্রগুলির আবেদন অনেকখানি। অথচ এই চিত্রগুলি একটি মাত্র কথার দ্বারাই সৃষ্ট। বৈষয়িক বুদ্ধির মানুষের সৃষ্ট চিত্রের ন্যায় উপকরণ বহুলতা সেখানে অনুপস্থিত।

ছড়ামাত্রই কতকগুলি অসংলগ্ন ভাবকে মূলধন করেই সৃষ্ট। ছড়ার জগতে একদিকে না আছে ভাবের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়াস, অপরদিকে সচেতন সৃষ্ট সাহিত্যের ন্যায় এক্ষেত্রে কার্য-কারণজনিত যোগরক্ষার প্রয়াসও অনুপস্থিত। সচেতন সৃষ্ট সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাবের অসামঞ্জস্যতা মস্ত এক ত্রুটি, কিন্তু ছড়ার ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বালকচিত্তে যেমন একটির পর একটি ভাবের উদয় ঘটে, ছড়ার ক্ষেত্রে সেই অসংলগ্নতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। নিয়মহীন স্বর্গলোক থেকে শিশুর আবির্ভাব। তাই তাদের জন্য রচিত ছড়াতেও নিয়মহীনতার রাজকীয় আধিপত্য।

আপাতভাবে ছড়া রচনা খুব অনায়াস সাধ্য ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যা সহজ, তাই রচনা করা সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। ছড়া রচনা করতে গেলে সচেতন প্রয়াস আপনা আপনি যুক্ত হয়ে তাকে ছড়ার মর্যাদা থেকে নামিয়ে দেয়। ছড়ায় অনেক সময় প্রাচীন ইতিহাস লুক্কায়িত থাকে ঠিকই, কিন্তু ছড়ার মূল্য সে কারণে নয়, ছড়ার গুরুত্ব বর্তমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণ যাদের জন্য ছড়াগুলি রচিত, সেই শিশুদের কাছে অতীতের কোন মূল্য নেই, তাদের আকর্ষণ কেবল বর্তমানের।

রবীন্দ্রনাথ যদৃচ্ছভাসমান মেঘের সঙ্গে ছড়াগুলিকে তুলনা করেছেন—'আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছ-ভাসমান। —দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়া ও কলা বিচার-শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্র নিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া

আলোচনা প্রকাশ করেছেন। মূলতঃ অবশ্য কলকাতা থেকে সংগৃহীত ৩০টি ছড়া এই পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমরা যে ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।' [পৃঃ ১৯২] প্রবন্ধটির শেষে তিনি আবেদন জানিয়ে বলেছেন, 'এক্ষণে সাহিত্য পরিষদের পাঠকগণের নিকট সানুনয় অনুরোধ এই যে, তাঁহারাও যথাসাধ্য আমাদের এই সংগ্রহ কার্যে সাহায্য করিবেন।' [পৃঃ ১৯২]

রবীন্দ্রনাথ লোক সাহিত্য প্রেমিক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু লোক সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিশেষ ভাবে ছড়ার প্রতিই তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ বিষয়ে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। শুধু মাত্র সাহিত্য পরিষদ পত্রিকাতেই নয়, অন্যত্রও তাঁর এই বিষয়ক দুর্বলতায় পরিচয় বিদ্যমান। তাঁর নিজেরই ভাষায়, 'সাধনা পত্রিকা সম্পাদন কালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।' [ভূমিকা—অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মেয়েলি' ব্রত ; ১৩০৩]। ছড়া সংগ্রহ এবং সেই সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার কারণ তাঁর কবি মন ও রসবোধ। বাংলা ছড়ার বিচিত্র ছন্দোমাধুর্য, অপূর্ব চিত্র-নির্মিতি, তদুপরি অনায়াস রচনা কৌশল তাঁর কবি মনকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কবির ভাষায়, 'আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।' এছাড়া বাল্যকালে ছড়া উপভোগের মধুর স্মৃতিও কবির ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকবে।

মোটের ওপর লোক সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ভূমিকা এক স্বীকৃত সত্য, কিন্তু ছড়া সংগ্রহ ও সেই বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই যে প্রথম দিশারী, সার্থক পথ

প্রদর্শক ও পরবর্তীকালে এতৎসম্পর্কিত আলোচনার গতি নিয়ামক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য উদ্ধার করে বলা যেতে পারে, 'পৃথিবীর লোক-সাহিত্য আলোচনার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রতিভাশালী কবির মত কোনও ব্যক্তিকে লোক-সাহিত্য সম্পর্কে এমন সুগভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। পাশ্চাত্য জগতেও যাঁহারা লোক-সাহিত্য লইয়া বর্তমানে আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই জ্ঞান-তপস্বী অধ্যাপক, কিংবা তথ্যানুসন্ধানকারী গবেষক। সুতরাং তাঁহাদের আলোচনা কোন সাহিত্যিক আবেদন সৃষ্টি করিয়া সর্বজনীন রসোপভোগের বস্তু হইয়া উঠিতে পারে নাই। ...রবীন্দ্রনাথ সেই পথ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র নিজের কবি-হৃদয়টি খুলিয়া ইহাদিগকে তাহার মধ্যে বরণ করিয়া লইয়াছেন, রবীন্দ্র-কবি-মানসের শৈশবস্মৃতির পটভূমিকা হইতে ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পরিণত বয়সে ইহাদের রসাস্বাদন করিয়াছেন।'

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার [১৩০৩] বৈশাখ সংখ্যায় [১ম সংখ্যা] 'ছড়া' পর্যায়ে কুঞ্জলাল রায় এবং অম্বিকাচরণ গুপ্ত সংগৃহীত অনেকগুলি ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। কুঞ্জলাল রায়ের ছড়াগুলি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম থেকে সংগৃহীত। এঁর সংগৃহীত ছড়ার সংখ্যা ৪১টি। আমরা কুঞ্জলাল রায়ের সংগৃহীত ১০ সংখ্যক ছড়াটির উদ্ধার করতে পারি—

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম
ঘোড়া ডুম সাজে,
লাল ঘেঘর,
ঘাঘর বাজে,
বাজতে বাজতে,
চল্লো ডুলি,
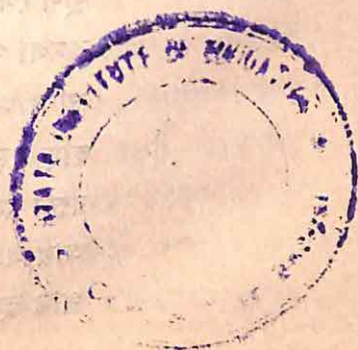
ডুলি গেল সেই কমলাপুলী,
কমলা পুলীর টিয়েটা,
সূর্য্যি মামার বিয়েটা
হাড় মড় মড় কেলে জিরে,
রুসুম কুসুম পানের বিড়ে,
চল পিয়ারী হাটে যাই,
হাটে যেয়ে কি খাই,
পান কোশাটা কিনে খাই,
একটি পান ফোঁপরা,
দু সতীনে ঝগড়া,
শান্তের উপর ধেয়ে নাচে,
জল তোলাবার বয়স আছে,
দিনের ভাগে খায় কি ?
কেলে গোরুর দুধ,
তেল কুচ্‌কুচ্‌ বেগুন ভাজা, কুচ্‌ ॥

এই ছড়াটিরই আর একটি পাঠান্তর কুঞ্জলাল রায়ের সংগৃহীত ছড়া থেকে উদ্ধার করা গেল—

আগাডোম বাগাডোম ঘোড়াডোম সাজে।
ডান সিগড়ি ঘুঁগুর বাজে ॥
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়লো ধুলি।
ধুলি গেল মোর কমলা পুলি ॥
কমলা পুলির টিয়েটা।
সূর্য্যি মামার বিয়েটা ॥
হাড় মড় মড় কাল জিরে।
রসুন কসুন পানের বিঁড়ে ॥
আয় লঙ্গ হাটে যাই।
পান সুপারি কিনে খাই ॥

একটী পান কোঁকড়া
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া ॥
পান খাবি না খিলি খাবি ।
টোস্কা মেরে চলে যাবি ॥
নাচ দুয়ারে ব্যাঙের কুটী ।
ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে একটী মুটী ॥ [১৪ সংখ্যক ছড়া]

রবীন্দ্রনাথ ছড়ার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—কামচারিতা ও কামরূপধারিতার বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে এই ছড়াটিরই অন্ততঃ চারটি পাঠান্তর উল্লেখ করেছেন তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া' নিবন্ধটিতে। কিন্তু কুঞ্জলাল রায় সংগৃহীত ছড়া সেগুলি থেকে পৃথক। 'আগডুম বাগডুম' ছড়াটির অন্য আরও পাঠান্তর অন্যত্রও প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থটির ছড়া পর্যায়ের আলোচনাতে সংগৃহীত এটির আর একটি পাঠান্তর উল্লিখিত হয়েছে। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষভাবে যে ছড়াগুলি পরিচিত ও বহুল প্রচারিত, তন্মধ্যে আমাদের উদ্ধৃত ছড়াটি অন্যতম। বহুল পরিচিত ও প্রচারিত বলেই ছড়াটির অনেকগুলি পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। এখন প্রশ্ন, বিশেষভাবে এই ছড়াটির বহুল প্রচারিত ও পরিচিতির কারণটি কি ? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে ছড়াটির প্রথমে ডোম চতুরঙ্গের বর্ণনা সংযোজিত হওয়ায় স্বভাবতই ছড়াটিতে একপ্রকার বীরত্ব রস সঞ্চারিত হয়েছে। আর এই কারণেই সুকুমারমতি অল্পবয়স্ক বালকেরা এই ছড়াটির প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হত আর তারই পরিণতি স্বরূপ ছড়াটি তাদের খেলার ছড়া রূপে গৃহীত হয়। প্রথমদিকে ছড়াটি বিশেষ ভাবে ছেলেদের সম্পদে পরিণত হলেও পরবর্তী-কালে এটি ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। কারণ ছড়াটির শেষাংশে কিছুটা মেয়েলী ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।

'আগডুম বাগডুম' ছড়ার ন্যায় ঘুম পাড়ানি যে ছড়াটি বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় ও বহুল পরিচিত, সেটি হল 'ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি'র ছড়া। এই ছড়াটিরও বহু পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। কুঞ্জলাল রায় সংগৃহীত ৯ সংখ্যক ছড়াটি, এই বহুল পরিচিত ছড়াটির একটি পাঠান্তর, তাই উদ্ধার করা গেল—

ঘুম পাড়ানী মাসী পিসি ঘুম দিয়ে যেও।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেও॥
ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে ঘুমে লতা পাতা।
হু হুয়োরে ঘুম যায় হুটী মোগল পাতা॥
হেঁসেল ঘরে ঘুম যায়রে, ভ্রমরা ভ্রমরী।
মায়ের কোলে ঘুম যায় হুদের কুমারী॥

ঘুম পাড়ানি ছড়াগুলির তান অন্যান্য ছড়ার তুলনায় কিছুটা প্রলম্বিত। এর প্রধান কারণ প্রলম্বিত সুরের মাধ্যমে অপূর্ব সুরের মায়াজাল সহজেই ঘুমের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক। জননীর মুখ নিঃসৃত এই শ্রেণীর ছড়া শুনতে শুনতে শিশু সহজেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। থেমে যায় তার দুরন্তপনা। ৪০ সংখ্যক ছড়াটি হল ঃ

তাল গাছ কাটম।
বোসের বাটম॥
গৌরী গো ঝি,—।
তোমার কপালে বুড়ো বর আমি কর্বো কি॥
চোক খাক তোর মা বাপ,
চোখ খাক তোর খুড়ো।
এমন বরকে বে দিয়েছে,
তামাক খেকো বুড়ো॥
বুড়োর নল গেল ভেসে।
বুড়ো তামাক খাবে কিসে॥

এই ছড়াটির মূলে প্রাচীনকালে অল্প বয়সী কন্যার সঙ্গে বৃদ্ধের বিবাহ দানের করুণ সামাজিক প্রথাটি কাজ করেছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—'বাপ মায়ের অপরাধ —সমাজ বিস্মৃত হইয়া আসে, কিন্তু বুড়া বরটা তাহার চক্ষুশূল। সমাজ সুতীব্র বিদ্রূপের দ্বারা তাহার উপরেই মনের সমস্ত আক্রোশ মিটাইতে থাকে।' রবীন্দ্রনাথ নিজেও এরূপ একটি ছড়া সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। যেহেতু আমাদের উদ্ধৃত ছড়াটির সঙ্গে সেটির পাঠান্তর লক্ষিত হয়, তাই সেইটিও উদ্ধার করা গেল—

তালগাছ কাটম বোসের বাটম গৌরী এল ঝি।
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী॥
টক্কা ভেঙে শঙ্খা দিলাম, কানে মদন কড়ি।
বিয়ের বেলা দেখে এলুম বুড়ো চাপদাড়ি॥
চোখ খাও গো বাপ—মা, চোখ খাও গো খুড়ো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক খেগো বুড়ো॥
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে, বুড়ো মরে কেশে।
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে।
ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে॥

অম্বিকাচরণ গুপ্ত হুগলীর ভাঙামোড়া থেকে ১৮টি ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন। তন্মধ্যে তাঁর সংগৃহীত ১০ নং ছড়াটি বহুল পরিচিত ছড়ার এক উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর বলে সেটির উল্লেখ করা গেল—

আগডুম বাগডুম, ঘোড়াডুম সাজে,
লাল ঘেঘর, ঘাঘর বাজে,
বাজতে বাজতে চল্লো ডুলি,
ডুলি গেল সেই কমলা পুলী,
কমলা পুলীর টিয়েটা,
সূর্য্যি মামার বিয়েটা,

হাড় মড় মড় কেলে জিরে,
রুস্থম কুস্থম পানের বিড়ে,
চল পিয়ারী হাটে যাই,
হাটে যেয়ে কি খাই,
পান কোলাটা কিনে খাই,
একটি পান ফোঁপরা,
ছু সতীনে ঝগড়া,
শান্তের উপর ধেয়ে নাচে,
জল তোলাবার বয়স আছে,
দিনের ভাগে খায় কি ;
কেলে গোরুর ছুধ,
তেল কুচ্‌কুচ্‌ বেগুনভাজা, কুচ্‌ ॥

রামেন্দ্র স্থন্দর ত্রিবেদী ছিলেন প্রধানতঃ বিজ্ঞান সাধক। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় তিনি উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার সঙ্গেও তাঁর নাম বিশেষ ভাবে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানেই রামেন্দ্র স্থন্দর বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। বাংলার লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণের মূলেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনেকখানি কার্যকরী হয়েছিল অনুমান করা চলে। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' আলোচনা এবং ছড়া সংগ্রহ প্রকাশের পর ১৩০৬ বঙ্গাব্দে 'হাসিখুশী' রচয়িতা প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রকাশ করেন 'খুকুমণির ছড়া'। মনীষী রামেন্দ্রস্থন্দর এই ছড়া সংগ্রহের একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দেন। ভূমিকাটিকে নিছক একটি গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধিজ্ঞাপক দায়সারা প্রমাণপত্র রচনার পরিবর্তে স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রবন্ধরূপে গণ্য করা চলে। সত্যকথা বলতে কি, ছড়া সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের রচনার পর এই ভূমিকাটিকে ছড়া

সম্পর্কিত পরবর্তীকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা বলে অভিহিত করতে হয়। কারণ, ছড়া সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অনুসৃত কাব্যিক দৃষ্টি তথা আস্বাদন পদ্ধতির পরিবর্তে রামেন্দ্রসুন্দর বিশেষভাবে তাঁর স্বভাব সুলভ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিলেন এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। রামেন্দ্র সুন্দর নিজেও তাঁর অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে যে সম্যকরূপে অবহিত ছিলেন, তা ভূমিকার শেষাংশে প্রকাশিত তাঁর মন্তব্যেই জানা যায় ;—'যে পাঠক-সম্প্রদায়ের কোমল করে এই সুরঞ্জিত উপহার প্রকাশক মহাশয় কর্ত্তৃক অর্পিত হইবে, আমি ঠিক তাহাদিগের জন্য এই ভূমিকা লিখি নাই।'

এখন প্রশ্ন হল, শিশুদের জন্য বিশেষভাবে যে গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত, তার ভূমিকা রচনার ক্ষেত্রে লেখক সচেতনভাবে কেন এমন মানসিকতার দ্বারা চালিত হলেন যা নাকি শিশুদের মোটেই উপযোগী নয়? এর সুস্পষ্ট জবাব লেখকের ভূমিকাতেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রকাশ্য সভায় মেয়েলি ছড়া নামক প্রবন্ধ পাঠ, সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রকাশ প্রভৃতি সত্ত্বেও পরবর্তীকালে এই ব্যাপারে তেমন উল্লেখ-যোগ্য উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করে—রামেন্দ্রসুন্দর ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির যেরূপ গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করা উচিত, মানসিক দিক দিয়ে অপ্রস্তুত দেশবাসী সেই মর্যাদা ও গুরুত্ব দানে কুণ্ঠিত। বিশেষত ছড়া ব্যাপারটি বিদ্বজ্জনের কাছে নিছক অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের মনোরঞ্জক এবং তাই গুরুত্বহীন বিষয় বলে বিবেচিত হওয়ায় তাঁরা এই বিষয়ের আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশে বিরত ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ঈষৎ ব্যঙ্গ মিশ্রিত ক্ষোভের সঙ্গে তাই মন্তব্য করেছেন, 'যাহাতে কোনো আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সমাবেশ নাই, এমন কোন কথা আমাদের পণ্ডিত সম্প্রদায়ের অনুরাগ

আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই ;' তত্ত্বাভিমানী গূঢ় রহস্য প্রেমিক শিক্ষিত পণ্ডিতজনের ভ্রান্ত ধারণার নিরসনকল্পে ছড়া—সাহিত্যের প্রতি তাঁদের উপযুক্ত দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই লেখক স্বেচ্ছাকৃত ভাবে ভূমিকাংশে ছড়ার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রতি বিশেষভাবে আলোক-পাত করে মন্তব্য করেছেন, 'আমার প্রবীণ বান্ধবগণের মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বকথার জন্য লালায়িত, তাঁহারা ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে এইরূপ একটা প্রকাণ্ড তত্ত্বানুসন্ধানের অবসর পাইবেন ; একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকার মীমাংসা দ্বারা তাঁহাদের বিজ্ঞতার পরিমাপে তাঁহারা অবকাশ পাইবেন।'

রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ছড়া সাহিত্য থেকে কোন প্রকার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিষ্কাশনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেও ছড়ার মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরবর্তীকালের আলোচক ও গবেষকদের এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির উন্মেষে উল্লেখযোগ্য সহায়তা করেছেন। বললে অত্যুক্তি হয়না, পরবর্তী কালে বিশেষ করে লোক সাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটির উপকরণ বিচারে নির্দিষ্ট আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রচলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়, 'মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সমাজতাত্ত্বিক এই সাহিত্য হইতে বিবিধ সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন। মনুষ্য জীবনের একটা বৃহৎ অংশের দুর্জ্ঞেয় রহস্য এই অনাদৃত সাহিত্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মানুষের শৈশব জীবনের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক সময় এই সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হইবে।'

স্থান, কাল ও ভাষা নির্বিশেষে শিশুর অন্তঃপ্রকৃতির অখণ্ড ঐক্য সকল দেশের ছড়াতেই যে প্রতিফলিত, এবং এদিক দিয়ে ছড়ার রাজ্য বিশেষ কোনো ভৌগোলিক সীমার দ্বারা চিহ্নিত হওয়ার পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে 'শিশুজগতের সাধারণ' সম্পত্তি রূপে বিবেচিত হবার যোগ্য—ছড়ার এই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি বৈজ্ঞানিক

রামেন্দ্রসুন্দর যেন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ তিনি বাঙ্গালীর ছেলের ছড়া ও ইংরেজ ছেলেদের নার্শারি গানের সাদৃশ্যের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকশ্রুতিবিদ্‌কেও আমাদের 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' এই সুপরিচিত ছড়াটির সঙ্গে মার্কিন দেশীয় শিশুদের—

One—ery two—ery ickery Ann,
Fillicy fallacy Nicholas John,
Queever Quaver Irish Mary,
Stinclum Stanclum back.

এই খেলার ছড়াটির সুর ও ছন্দোগত সাদৃশ্য বিষয়ে আলোক-পাত করতে দেখা গেছে। বলাবাহুল্য এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রেও রামেন্দ্রসুন্দরকেই প্রথম পথিকৃতের মর্যাদা দান করতে হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর মূল্যবান অভিমতটি উদ্ধার করা যেতে পারে, 'কেবল শিশু প্রকৃতি কেন, বয়স্ক মনুষ্যের প্রকৃতিতেও যে অংশটুকু মানব জাতির সাধারণ, তাহারও পরিচয় এই বিভিন্ন দেশের ছড়া—সাহিত্যে সুস্পষ্ট পাওয়া যাইবে। স্নেহ বিবশা জননী যখন গৃহ-কোণের অন্ধকার মধ্যে, লোক নয়নের অন্তরালে অস্ফুট বাক্‌ অস্ফুট বুদ্ধি অপত্যের মুখের পানে চাহিয়া আপনার আত্মার নিগূঢ়তম প্রদেশ উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, তখন তাহার বাক্যভঙ্গি কার্যভঙ্গি কোন কোন সামাজিক কৃত্রিম প্রথার বা প্রণালীর কোন ধার ধারিতে চাহে না। তখন স্বাভাবিক মানব চরিত্র কৃত্রিমতার পর্দার অন্তরাল সরাইয়া ফেলিয়া আপনার নগ্ন মূর্তি আবিষ্কার করে; সেই মূর্তি বোধ করি 'চীন হইতে পেরু' পর্যন্ত সকল দেশের মধ্যেই এক।'

অর্থাৎ কেবল শিশুদেরই নয়, সেই সঙ্গে পরিণত মানুষের মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ ঐক্যের রূপটিও অন্ততঃ সীমিত পরিসরে

ছড়াসাহিত্যে প্রতিফলিত এই মূল্যবান সত্যটির প্রতিও বিজ্ঞান সাধক রামেন্দ্র সুন্দরই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এ পর্যন্ত 'খুকুমণির ছড়া'র ভূমিকা প্রসঙ্গেই আলোচনা করা গেল। এইবার 'খুকুমণির ছড়া' নামক সঙ্কলনটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দর ভূমিকায় যদিও বলেছেন, 'এই পুস্তকের সংগৃহীত ছড়ার সংখ্যা আড়াই শতকেরও কম।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সঙ্কলনটিতে ৪১০টি ছড়া স্থান পেয়েছে। এদিক দিয়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের এই সঙ্কলনটিকেই প্রথম বৃহত্তম ছড়ার সঙ্কলনের মর্যাদা দিতে হয়। কারণ ইতিপূর্বে আর কেউ একসঙ্গে একত্রে এতগুলি ছড়া প্রকাশ করেননি। তবে যোগীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্কলনটির পূর্ববর্তীকালে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত ছড়াগুলিকে তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন লক্ষ্য করা যায়। তাই স্বভাবতঃই তাঁর প্রকাশিত ছড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছড়া—সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য যদি শিশুর ওপর ন্যস্ত করা যায়, তবে বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ ছড়া যে কেবল শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য রচিত তাই নয়, বহু ছড়ার নায়কও শিশু। মায়ের নিকটই শুধু নয়, সমগ্র পরিবারে সকলের আদরের ধন হল শিশু। শিশু বাড়ীর সবার প্রিয়। সকলের ওপরই তার আধিপত্য। তার প্রতি বাড়ীর সকলেরই অসীম দুর্বলতা ও সীমাহীন ভালবাসা। তাই শিশুকে ধরে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে উচ্চারিত হতে দেখা যায়—

ধন ধন ধন,
বাড়ীতে ফুলের বন।
এ ধন যার ঘরে নাই
তার কিসের জীবন?
তারা কিসের গরব করে?
আগুনে পুড়ে কেন না মরে? [২১১ সংখ্যক ছড়া]

এই ছড়াটিরই একাধিক পাঠান্তর ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সংকলিত ও পরবর্তীকালে প্রকাশিত একটি ছড়ার সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে—

ক। ধন ধন ধন।
বাড়ীতে নটের বন।
এ ধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন।
তারা কিসের গরব করে।
উনুনে পুড়ে কেন না মরে॥ [১৯ সংখ্যক, বর্ধমান থেকে সংগৃহীত]

এইবার বাঁকুড়া থেকে সংগৃহীত এই ছড়াটিরই ভিন্নতর পাঠ উদ্ধৃত করা হল—

খ। ধন ধন ধন
দর্প নারায়ণ॥
এ ধন যার ঘরে নাই সে কিসের গরব করে।
এ ধন যার ঘরে নাই সে বৃথায় জীবন ধরে॥
[২৩ সংখ্যক]

প্রথম পংক্তিটি তিনটি ছড়াতেই এক। কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তির ক্ষেত্রে তিনটি ছড়ায় তিনটি রূপ বিদ্যমান। চতুর্থ পংক্তির ক্ষেত্রেও কিছুটা বৈসাদৃশ্য রয়েছে আবার শেষ পংক্তিটির ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে।

'খুকুমণির ছড়া'য় সংকলিত ১৩৮ সংখ্যক ছড়াটি নিম্নরূপ ঃ

হড়ম্ বিবির খড়ম্ পায়,
লাল বিবির জুতা পায়।
চল বিবি ঢাকা যাই,
ঢাকা যেয়ে ফল খাই,
সে ফলের বোঁটা নাই।
ঢাকা'য়েরা ঢাক বাজায়,

খালে আর বিলে,
সুন্দরীরে বিয়ে দিলাম,
ডাকাতের মেলে।
আগে যদি জানিতাম,
ডুলি ধরে কাঁদিতাম!

এটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ হল রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ৬২ সংখ্যক ছড়াটি—

হরম বিবির খড়ম পায়।
লাল বিবির জুতো পায়॥
চল্‌লো বিবি ঢাকা যাই—
ঢাকা গিয়ে ফল খাই।
সে ফলের বোঁটা নাই॥

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী সঙ্কলিত 'লোক-সাহিত্যে ছড়া' গ্রন্থে এই ছড়াটিরই একাধিক পাঠান্তর গৃহীত হয়েছে—

ক। অরম দিদির খড়ম পায়।
লাল দিদির জুতা পায়॥
আয় লো দিদি ঢাকা যাই,
ঢাকা যাইয়া ফল খাই
এই ফলের গুটা নাই।
খাইলে ফল মরণ নাই॥ [৩৭ সংখ্যক; টাঙ্গাইল মীর্জাপুর থেকে সংগৃহীত]

খ। নরম বিবির খড়ম পাও,
উঠ্‌ঠ্যা বিবি কালাই খায়।
কালাই খাইয়া ঢাকা যাও।
ঢাকা গিয়া ফল খাও॥
এই ফলের গুটা নাই।
খাইলে ফল মরণ নাই॥ [নেত্রকোণা থেকে সংগৃহীত]

'খুকুমণির ছড়া'য় সংকলিত ১৩৮ সংখ্যক ছড়াটির শেষাংশ রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত ৬৩ সংখ্যক ছড়ায় স্থান লাভ করেছে—

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে।
সুন্দরীরে বিয়া দিলাম ডাকাতের মেলে ॥

এই পর্যন্ত উভয় ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রক্ষিত হলেও রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ছড়াটির পরবর্তী অংশ কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেছে—

ডাকাত আলো মা।
পাট কাপড় দিয়ে বেড়ে নিলে,
দেখতে দিলে না ॥

শেষ পংক্তিদ্বয় আবার প্রথম উদ্ধৃত ছড়াটিরই অনুরূপ—

আগে যদি জান্‌তাম
ডুলি ধরে কান্‌তাম ॥

ছড়ার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে আছে বিবাহ বিষয়ক ছড়া। ২৫ সংখ্যক ছড়াটি বিবাহ-বিষয়ক ছড়ারই একটি নিদর্শন—

খোকনমণির বিয়ে দেবো
হট্টমালার দেশে ;
তারা গাই বলদে চষে ;
তারা হিরেয় দাঁত ঘষে ;
রুই মাছ কাত্‌লা মাছ
ভারে ভারে আসে,
তাই দেখে খোকার মা
পেছন ফিরে বসে !

এই ছড়াটিতে যেহেতু খোকনমণির বিবাহের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, তাই বিবাহ জনিত বিচ্ছেদ বেদনার কথা অনুচ্চারিত থেকে গেছে। বরং 'হট্টমালা' নামক এমন এক দেশে বিবাহ দেবার কথা বর্ণিত হয়েছে, যে দেশ রূপকথার রাজ্যেরই তুল্য।

অবশ্য রূপকথার রাজ্যের ন্যায় অলৌকিক বর্ণনা সমৃদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে স্বচ্ছল গ্রাম বাংলার বাস্তব চিত্রকেই এক্ষেত্রে রূপায়িত করা হয়েছে। কিন্তু খোকনের পরিবর্তে খুকী হলে কিছু পরিমাণে বেদনার সুর হয়ত সমগ্র ছড়াটিতে এক করুণ পরিমণ্ডলের সূচনা করত।

রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে এই ছড়াটি স্থান পেয়েছে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে—

খোকোমণির বিয়ে দেব হটমালার দেশে।
তারা গাই বলদে চষে॥
তারা হীরেয় দাঁত ঘষে
রুই মাছ পালঙের শাক ভারে ভারে আসে॥
খোকোর দিদি কোণায় বসে আছে।
কেউ ছুটি চাইতে গেলে বলে আর কি আমার আছে॥

[৭৭ সংখ্যক]

এক্ষেত্রে 'খোকনমণি' 'খোকোমণি'তে রূপান্তরিত হয়েছে। বলাবাহুল্য এই পরিবর্তনের মূলে নিহিত রয়েছে অন্তহীন স্নেহ। যোগীন্দ্রনাথ সংকলিত ছড়ায় 'হট্টমালা' নামক দেশ এক্ষেত্রে 'হটমালা'র দেশে রূপান্তরিত। দেশের নামের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হলেও উভয় ক্ষেত্রেই প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির চিত্রটি একই রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ছড়াটিতে বর্ণিত খোকোর দিদির আচরণ কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। কারণ আনন্দের দিনে তার এই অস্বাভাবিক আচরণ সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সংকলিত ছড়ার গ্রন্থে এই একই ছড়ার কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ ঢাকা থেকে সংগৃহীত হতে দেখা গেছে—

খোকন মণির বিয়া দিম্
হট্টমালার দেশে,

তারা গাই-বলদে চষে
তারা হীরায় দাঁত ঘসে,
রুই মাছ কাত্‌লা মাছ
ভারে ভারে আসে ;
তাই দেখে খোকার মা
পিছন ফিরে বসে।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে আনন্দের দিনে দিদির বিসদৃশ আচরণ মায়ের ওপর আরোপিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ছড়ায় আঞ্চলিক পরিবেশের যে কিছুটা প্রতিফলন ঘটে, সে বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। বাংলাদেশে এই ছড়াগুলি রচিত বলেই বাংলাদেশের প্রিয় মাছ রুই কাতলা, এখানে বহুল ব্যবহৃত পালংশাক প্রভৃতি স্থান পেয়েছে ছড়াগুলিতে।

যোগীন্দ্রনাথ তাঁর সংগৃহীত প্রতিটি ছড়ার নামকরণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে নিছক সংখ্যার দ্বারা ছড়াগুলিকে চিহ্নিত করেন নি। এর কারণ অবশ্য সহজেই অনুমেয়। বিশেষ ভাবে শিশুদের জন্য রচিত বলেই নামকরণের সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু অনুযায়ী উপযুক্ত চিত্রও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছড়া সঙ্কলিত করলেও কোন ক্ষেত্রেই স্থানের উল্লেখ করেননি। এতদ্ব্যতীত ছড়াগুলির আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তন সাধনও যোগীন্দ্রনাথের সংকলিত ছড়ার এক মস্ত ত্রুটি। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যোগীন্দ্রনাথের অনুসৃত পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেছেন, 'তিনি সমাজ ও ভাষা বিজ্ঞানের দিক হইতে একটি নিতান্ত আপত্তিকর কার্য করেন—বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলের ছড়াগুলি হইতে প্রাদেশিক ভাষা বর্জন করিয়া তিনি তাহাদিগকে কলিকাতার কথ্য ভাষায় আনুপূর্বিক রূপান্তরিত করিয়া লন। ……চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রকাশিত ছড়াও কলিকাতার কথ্য ভাষায়

তাঁহার সংগ্রহে স্থান লাভ করিয়াছে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে যে মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংগ্রহে সেই মূল্য প্রকাশ পাইতে পারে নাই।' অবশ্য লেখককৃত কলকাতার কক্‌নি ভাষায় রূপান্তরিত ছড়ার সংখ্যা নিতান্তই সীমিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁকে অবিকৃত ভাবেই ছড়ার পাঠ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। ছড়ার সংখ্যাধিক্যে এবং তৎসহ বিষয় বৈচিত্র্যের জন্য তাই তাঁর সঙ্কলনটির বিশেষ মূল্য অনস্বীকার্য।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার [১৩০৯] ২য় সংখ্যায় আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক 'চট্টগ্রামী ছেলে ভুলান ছড়া' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। এই আলোচনায় লেখক কর্তৃক চট্টগ্রাম আনোয়ারা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ৭৮টি ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। লেখক রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়েই যে ছড়া সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা লেখকের বক্তব্য থেকেই জানা যায়ঃ

'মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আহ্বানে চট্টগ্রাম আনোয়ারা অঞ্চল হইতে নিম্নপ্রকাশিত ছড়াগুলি সংগৃহীত হইল। চেষ্টা করিলে এরূপ আরও অনেকে ছড়া সংগৃহীত হইতে পারে। সত্য সত্যই আমাদের এই নিজস্ব সম্পত্তিগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ইহাদের রক্ষণের জন্য আমাদের যে একান্ত যত্নপর হওয়া আবশ্যক, তাহাতে আর কথা কি?' [পৃঃ ৭৬]

লেখক, প্রকাশিত ছড়াগুলির মূল ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করেছেন এবং এই পরিবর্ত্তনের কারণ স্বরূপ নিবেদন করেছেন, 'চট্টগ্রামের কথিত ভাষা বাঙ্গালা হইলেও ইহা একটি স্বতন্ত্র উপ-ভাষায় পরিণত হইয়াছে। লিখিত ভাষার সহিত ইহার এতই বৈষম্য যে, চেষ্টা করিলে ইহা হইতে আমরা একটা নূতন পৃথক ভাষার সৃষ্টি করিতে পারিতাম। আমাদের ঘরের কথা বিদেশীয়ের

পক্ষে খুবই দুর্বোধ্য হইবে সন্দেহ নাই। ছড়াগুলিতে চট্টগ্রামের কথিত ভাষার কতকটা নিদর্শন অনেক স্থানেই পরিদৃষ্ট হইবে। কোন কোন শব্দ আমরা যেরূপ উচ্চারণ করি লেখায় তাহার সুর (Intonation) ঠিক বজায় রাখা এক প্রকার অসম্ভব। আর এমন অনেক শব্দও আছে, যাহা বজায় রাখিতে গেলে কেবল টীকা টিপ্পনীর বাহুল্য ভিন্ন অন্য কোন ইষ্ট সিদ্ধি হয় না। এই দুই কারণে ছড়াগুলিতে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিতে হইল।' [পৃঃ ৭৬-৭৭]

লেখকের এই যুক্তির পরেও ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের বিচারে লেখককৃত ছড়াগুলির মধ্যেকার রূপান্তর মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য নয় স্বীকার করা যেতে পারে। একই ছড়া কেমন অনায়াসে পরিবর্তিত হয়ে রূপান্তর লাভ করে, তারই নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি ছড়ার উল্লেখ করা গেল—

ক। তাই তাই তাই।
মামার বাড়ীত্ যাই॥
মামারত্ আছে টুন্যা ভাই।
সঙ্গে খেলা খাই॥
ও দুধে ভাতে খাই।
চল মামার বাড়ীত্ যাই॥ [১ নং ছড়া]

খ। তাই তাই তাই।
মামার বাড়ীত্ যাই॥
মামার বাড়ী বড় ভালা।
কিল চূড়া নাই॥ [২ নং ছড়া]

গ। তাই তাই তাই।
নানার বাড়ীত্ যাই॥
হাম্বার দুধু খাই।
হাম্বার দুধু ন দিলে,
হাতুয়া ভাঙি ধাই।

যে তিনটি ছড়া উদ্ধৃত করা হল, সেই তিনটি মূলতঃ যে একই ছড়ার রূপান্তর সেটা সহজেই বোঝা যায়। এই প্রসঙ্গে এই ছড়াগুলির সদৃশ আর একটি ছড়া উদ্ধৃত করা গেল যেটির সঙ্গে অধিকাংশেরই পরিচয় আছে—

তাই তাই তাই
মামার বাড়ী যাই
মামার বাড়ী ভারী মজা
কিল চড় নাই।

মামার বাড়ী শিশুদের কাছে বড় প্রিয়। এখানে একদিকে ভালো-মন্দ খাওয়ার যেমন সুযোগ, তেমনি অপরদিকে শাস্তি বা বকুনি খাবার কোন সম্ভাবনাই নেই, বরং তার পরিবর্তে অফুরন্ত আদর যত্ন লাভ ঘটে। হাতে তালি দিয়ে তারই তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিশুর সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত মামার বাড়ী যাবার বাসনা প্রকাশিত হয়েছে উদ্ধৃত ছড়াগুলিতে।

পাঠান্তর ছড়ার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আরও দুটি ছড়া উদ্ধার করা গেল যে দুটির মধ্যেও আমরা গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করতে পারব। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রেও একই ছড়ার রূপান্তর ঘটেছে মাত্র—

ক। আয়্ চান্দ আয়্ আয়্।
আইলা দেম্ বাইলা দেম্,
মাছ কুটি মেজা দেম্,
চূড়া ঝাড়ি কুরা দেম্,
কলাছুলি বাকল দেম্
চান্দ্ কপালে পুড়ুস ॥ [৬ নং ছড়া]

খ। আয়্ চান্দ আয়্ চান্দ্।
কলা দিম্ মোলা দিম্ ;
ধেয়ন গাইয়র দুধু দিম্

গাইয়র্ নাম চুঙ্‌রী,
ডেকার নাম ভুঙ্‌রী ॥ পুড়ুস্ ॥

কন্যা-বিদায় অবলম্বনে বাংলায় বেশ কিছু ছড়া রচিত হয়েছে। বিষয়টি বড়ই করুণ। বিশেষতঃ যে সময়ে ছড়াগুলি রচিত হয়েছিল, তখন আমাদের দেশে ছিল গৌরীদান প্রথা। অল্পবয়স্কা কন্যাকে তাই শ্বশুরালয়ে প্রেরণের ব্যাপারটি তার আত্মীয় স্বজনের কাছে গভীর বেদনার সৃষ্টি করত। এই শ্রেণীর ছড়ার মধ্য দিয়ে সমসাময়িক বাংলাদেশের এক বিশেষ সমাজ জীবনের প্রতিফলন তাই লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বাঙালি কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ, বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ, ঘরের দুঃখ, বাঙালীর গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে এরূপ একটি কন্যা বিদায়ের ছড়া প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশিত ছড়াটিতে কেবলমাত্র কন্যার বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর তার আপন জনদের প্রতিক্রিয়ার কথাই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আব্দুল করিম সংগৃহীত কন্যা বিদায়ের একটি ছড়ায় কেবল তার আপনজনদেরই প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়নি, সেই সঙ্গে কন্যার নিজেরও প্রতিক্রিয়াবর্ণিত হয়েছে। বিশেষতঃ বাড়ীর সকলে কোথায় কন্যাকে সান্ত্বনা দেবে, সেক্ষেত্রে এই ছড়াটিতে দেখা যায় কন্যা নিজেই তার মা—বাবাকে সান্ত্বনা দানে প্রয়াসী হয়েছে।

সানাই বাজে জোড়া জোড়া,
কর্ত্তাল বাজে রৈয়া
মা বাপর কি ধন খাইলাম
দূরে ন দ্য বিয়া ॥

দূরে ন দ্য দূরে ন দ্য
গাইলর ভাগী হৈবা।
কাছে ন দ্য কাছে ন দ্য,
চুলাচুলি হৈবা ॥
মধ্যে দিও মধ্যে দিও দিনের সম্বাদ লৈবা।
ছিক্কা ভরি লৈতে টাকা গায়ে কৈল্ল বল।
ডুলি ভরি দিতে কন্যার চক্ষের পড়ে জল ॥
খুড়ী জেঠী কান্দন করে পাক ঘরেতে বসি।
ভায়ারি ঝি অরে নিল পাকঘর শূন্য করি ॥
মায়ে ত কান্দন করে হাতি নাতে বসি।
এ ঝি অরে নিল মোর হাতিনা শূন্য করি ॥
খুড়া জেঠা কান্দন করে গোঞাইর ঘরে বসি।
এ ভাই ঝিয়রে নিল মোর গোঞাইর ঘর শূন্য করি
বাপেত কান্দন করে উঠানে ত বসি।
এ ঝিয়রে নিল মোর উঠান শূন্য করি ॥
ভাইনে ত কান্দন করে খেলার ঘরে বসি।
এ ভইনরে নিল মোর খেলা ভঙ্গ করি ॥
ভাইএত কান্দন করে দোলার খুঁটা ধরি।
এ ভাইনরে নিল মোর দোলা শূন্য করি ॥
ন কান্দিও মা বাপরে সঙ্গে যাইবো ভাই।
পরের পুতরে বান্ধি দিয় কোন দাবি নাই ॥
থাল দিয় লোটা দিয় আরো দিয় গাই।
সেই গাভীর চরাণি দিয় কন্যার ছোট ভাই ॥

ছড়াটিতে বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

ছড়া যে কেবলমাত্র শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যই সৃষ্ট, এগুলির সঙ্গে পরিণত বয়স্কদের কোন সম্পর্ক নেই তা বলা যায় না।

কারণ প্রধানতঃ শিশুদের জন্য রচিত হলেও এগুলির রচয়িতা কখনই শিশু নয়। পরিণত বয়স্ক মানুষই শিশুর মনোরঞ্জনের উপযোগী করে শিশু মনস্তত্বের কথা অবহিত হয়ে এগুলি রচনা করেছে। আবার পরিণত বয়স্ক মানুষ তাদের নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদের ব্যবহারের জন্যেও ছড়া রচনা করেছে। এগুলি স্বভাবতঃই শিশুদের ছড়ার মত বৈষয়িক ব্যাপার মুক্ত নয়। বরং বিপরীতটাই সত্য—অর্থাৎ বৈষয়িক প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়ক হিসাবেই এই বিশেষ ছড়াগুলির উৎপত্তি। এই ছড়াগুলি হল ব্রতের ছড়া এবং ঐন্দ্রজালিক ছড়া।

ব্রত একান্তভাবে স্ত্রী সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নারী জীবনের নানাবিধ আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার উদ্দেশ্যেই যেমন বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন, তেমনি বিভিন্ন ব্রতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং ব্রতের অঙ্গস্বরূপ ছড়াগুলির মধ্যেও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

১৩১০ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ২য় সংখ্যায় ব্রজসুন্দর সান্যাল কর্তৃক 'শরৎ-কালী' নামে একটি দীর্ঘ ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। ছড়াটিকে আমরা পৌরাণিক ছড়া বলে অভিহিত করতে পারি। ছড়াটি কোন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত তার কোন উল্লেখ নেই। তবে সংগৃহীত ছড়াটিতে একই সঙ্গে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের বৈশিষ্ট্য ও বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসবের বৈশিষ্ট্যগুলি সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে।

ছড়াটির বিষয়বস্তু বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের চিরন্তন করুণ কাহিনী। নবোঢ়া কন্যা উমাকে স্বামীগৃহে পাঠিয়ে পর্যন্ত মেনকার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। মেনকার উভয় সঙ্কট। একদিকে প্রাণাধিক প্রিয় উমাকে ঠিক মনের মত পাত্রে অর্পণ করতে সমর্থ হননি। দৈব বিড়ম্বনায় জামাইটি হল পাগল তার ওপর বিবাহ রাত্রেই শ্বশুর জামাইয়ে ঘটে গেল তীব্র মনোমালিন্য।

পিতৃহৃদয় অপেক্ষাকৃত কঠিন, তাই বিবাদের সূত্রে হিমালয় মেয়ে জামাইকে বিস্মৃত হয়ে থাকলেও মাতৃহৃদয় অপত্য বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর। দীর্ঘদিনের অদর্শনজনিত বেদনায় আপ্লুত হৃদয়ে মেনকা তাই হিমালয়কে অনুরোধ করেন কন্যাকে আনার জন্য। বিবেকের দংশন অনুভব করেন মেনকা। তিনি স্বপ্নে উমাকে তাঁর কাছে উপস্থিত হতে দেখেন এবং উমার অন্তহীন অভিযোগ অবগত হন। অবগত হন জামাইয়ের সারাদিন-রাত শ্মশানে অবস্থানের বিষয়। শূন্য পুরীতে অবস্থান করা তাঁর পক্ষে কতখানি মর্মন্তুদ ব্যাপার। ভাঙ প্রস্তুত করতেই তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল। পরণে উমার মলিন বস্ত্র। আসলে এসব তো উমার অভিযোগ নয়। ব্যথিত মাতৃহৃদয়ের বিবেকের দংশনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। অতি কষ্টে হিমালয়কে সম্মত করান মেনকা। শেষ পর্যন্ত হিমালয় উপস্থিত হন কৈলাসে। শিব তো প্রথমে হিমালয়কে কটাক্ষ করলেন তাঁর উপস্থিতির জন্য। শেষে মেনকা প্রেরিত গুটি পাঁচ সাত ভাঙ্গের নাড়ু পেয়েই মহাদেব একেবারে জল। উমা তো দীর্ঘদিন পরে বাপকে দেখে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিমান প্রকাশ না করে পারেন না—পিতার বিরুদ্ধে তাঁর অভিমান বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের খেদোক্তি—তিনি তাঁকে বিস্মৃত হয়েছেন। যাইহোক উমা এরপর যখন শিবের কাছে পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি চাইলেন তখন শিব হিমালয় এবং তাঁর গৃহ সম্বন্ধে কটাক্ষ করলেন। উমাও পিতা ও পিত্রালয়ের নিন্দা শুনতে রাজি নন, তিনিও তার যোগ্য উত্তর দিলেন। শেষে পুত্রকন্যাসহ উমা পিত্রালয়ে উপস্থিত হয়ে উপযুক্ত মর্যাদায় পূজিত হলেন। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর ছড়া সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন:

'...হরগৌরী সম্বন্ধীয় গ্রাম্য ছড়াগুলি বাস্তব ভাবের। তাহা রচয়িতা ও শ্রোতৃবর্গের একান্ত নিজের কথা। সেই-সকল কাব্যে জামাতার নিন্দার স্ত্রী পুরুষের কলহ ও গৃহস্থালির বর্ণনা যাহা

আছে তাহাতে রাজভাব ও দেবভাব কিছুই নাই; তাহাতে বাংলা দেশের গ্রাম্য কুটিরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আম বাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই।'

শরৎ-কালী

শরৎকালে রাণী বলে বিনয়বচন,
আর শুনেছ গিরিরাজ নিশির স্বপন।
মায়া করি শুনায় গৌরী মোর আঙ্গিনায় আসি,
মা বলিয়া কাঁদছে কত মোর নিকটে বসি।
রাণী কেঁদে কন বিবাহ দেন পাগল পতির ঠাঁই,
রাত্রিদিনে শ্মশান বিনে আর না বুঝে তাঁই।
সে কথা বল্‌তে উষ্ণ করে মার্‌তে আসে ধেয়ে,
অন্নবিনে প্রাণ বাঁচে না বঞ্চিব কি খেয়ে।
শূন্যপুরী রৈতে নারি তার করিব কি,
অশোকবনে ছিলেন যেমন জনকরাজার ঝি।
ব্যথিত কুলে মন্দ বলে কেউ না করে দেখা,
ভাং ঘুটিতে জন্ম গেল এও ললাটের লেখা।
বৎসর কত হ'ল গত করছে হরের ঘর,
চল গিরি আনতে গৌরী কৈলাস শিখর।
হিমালয় বলে হায় শুন মেনকা রাণী,
নিদ্রায় দেখেছ কত নিদ্রার ভবানী।
নিশির ঘুমে মন ভ্রমে স্বর্গমর্ত্য দেখে,
স্বপ্নকালে রাজা হলে তাই কতক্ষণ থাকে।
সেই জামাতা পাগল বেটা পরছে বাঘের ছাল,
বম্ বম্ বম্ ফিরছে সদা বাদ্য করে গাল।
বৃদ্ধ যেমন করছে গমন বলদ সঙ্গে চলে,

তাহার কথার সঙ্গে কেউ না পারে পঞ্চমুখে বলে।
তার নাহিক লাজ ফকির সাজ ফিরে সর্বদেশ,

*   *   *   *

পিতার নির্ণয় নাই জেরে বেটা শিব।
কন্যা হলে বিভা দিলে গোত্রত্যাগী হয়,
ধিক থাক্ তোর এমন প্রাণে নাইক লাজের ভয়।
ইচ্ছা যদি থাকে তোর মরছিস্ কেন দুঃখে,
যা কৈলাসে হরের কাছে থাক্‌বি গিয়ে সুখে।
বৃষে চড়ি দড়াদড়ি ফিরবি নানা দেশ,
দেখবি গৌরী ত্রিপুরারি থাক্‌বি বড় বেশ।
গত বৎসর আমার সংগে করেছে লড়ালড়ি,
ফিরে পুনঃ যেতে বল সেই জামতার বাড়ি।
রাণী কয় উচিত নয় দুষ্ট তোমার হিয়া,
কে হয়েছে এত কঠিন কন্যা বিভা দিয়া।
দুষ্ট লোকের নষ্ট কথা কুশল না হয় যাতে,
যাহার নিকটে প্রাণ সপেছে মান কর তার সাথে।
সে যে দেব দেব মহাদেব বসে সর্বঘটে,
ত্রিভুবনের গঙ্গা ছিল কোন্ দেবতার জটে।
বিভার রাত্রে দেখতে জামাই মূর্তি অনুপম,
গোকুলের গোবিন্দ কিবা অযোধ্যার রাম।
সেই জামতার নিন্দা কথা কখনও না বলো,
সেই পাতকে দক্ষরাজার যজ্ঞ নষ্ট হলো।
আমি শম্ভু নামে সেধেছিলাম কত,
দুর্গা সখা শিব জামতা মিলেছে মনোমত।
তবে চল রতি শীঘ্রগতি গৌণ কর কিসে,
তোমার কথায় প্রাণের ব্যথা জারলো যেন বিষে।
আমি হিয়ানলে শোকজলে দুঃখে ডুবে আছি,

তোমার গৌরী ধন্বতরি তারে আন্‌লে বাঁচি।
গিরি বলে এবার গেলে আসবো বিরূপ হয়ে,
যা হ'ক তা হ'ক যাব কোন্ দ্রব্য লয়ে।
তা শুনে মেনকারাণী উঠলেন শীঘ্র করি,
চিনি মণ্ডা মনোহারা দিলেন ভাণ্ড ভরি।
মিছির শর মিছরির নাড়ু স্বস্তি থরে থর,
এলাচদানা চিনির পানা ক্ষীর তক্তিসর।
গুড় চিনি বাতাসা মধু কত লেখা যায়,
ভাঙের নাড়ু সিদ্ধি পেলে পঞ্চমুখে খায়।
তবে গিরি যত্ন করি নিলেন উপহার,
পঞ্চমীতে যাত্রা করেন শাস্ত্রের বিচার।
ভাবি মনে গজাননে করেন দণ্ডবৎ,
গঙ্গা আনতে যেমন চললেন ভগীরথ।
কোথাকার কৈলাসপুরী সভা করি বসেছে দেবগণ,
দেব সঙ্গে নারদমুনি আর পঞ্চানন।
বিপদকালে নারদমুনি তুষ্ট হলেন যাতে,
ছাড়লেন কোন্দলের ঝুলি মহাদেবের মাথে।
শ্বশুর জামতার যখন দরশন হ'ল,
হুতাশন মধ্যে যেন ঘৃত ঢেলে দিল।
বিষনাল ভাঙিলে যেমন ব্যথা পান ফণী,
অমনি, গর্জ্জিয়া উঠিলেন ঠাকুর দেব চূড়ামণি।
বল্‌ছে বাণী শূলপাণি উষ্ণ করে মনে,
জেরে, দেবের মুখ দেখিতে পাষাণ আসছেন কেনে।
তখন বল্‌ছে গিরি কপট করি কি বলিব আর,
গত নিশি দেবদৃষ্টি হয়েছে মেনকার।
অন্নপানি না খায় রাণী ভাবছে সর্বক্ষণ,
জানতে এলাম কোন্ দেবতা করছে বিড়ম্বন।

রোগ ঔষধের কর্তা বটে রক্ষা করেন জীব,
মনে হাসেন কথা কন লজ্জা পেলেন শিব।
তখন সম্ভাষ সম্ভাষ বলি বললেন মহাশয়,
দেবসভাতে প্রণাম লয়ে বস্‌লেন হিমালয়।
গুটি পাঁচসাত সিদ্ধি বড়ি মহাদেবকে দিলেন,
ভক্তিভাবে মহাদেব তৎক্ষণাতে লইলেন।
নিজপুরী থেকে তাহা দুর্গা শুনিল,
যত্ন করিয়া পিতা ডাকিয়া আনিল।
নিঠুর কঠোর হয়েছ তুমি পাসরিয়াছ ঝি,
শিবনিন্দা করছ কত তার বলিব কি।
কওগা বাবা কত কথা তা পাবনি পাছে,
সত্য করে বল বাবা মা কেমন আছে।
তুমি বল নিঠুর কঠোর, শম্ভু বলে শিলে,
ছার মেনকার বাক্য শুনে তোমায় নিতে এলে।
তা শুনিয়া গৌরীমাতা কাঁদিয়া অস্থির,
পাহাড়ে মেঘের বৃষ্টি যেন পড়ছে আঁখিনীর।
মেনকা দিয়াছিলেন সন্দেশ দিলেন দুর্গার হাতে,
ক্ষমা পেলেন নারায়ণী তুষ্ট হলেন তাতে।
যত্ন করি মহেশ্বরী রন্ধন করিলা,
শ্বশুরে জামতায় তাহে ভোজনে বসিলা।
বাপকে বসিতে দিলা রত্ন সিংহাসন,
শিবকে বসিতে দিলা ভাঙা কুশাসন।
শয়নকালে দুর্গা বলে আজ্ঞা দেহ স্বামী,
ইচ্ছা করে পিতার বাড়ী কাল যাইব আমি।
কি দুঃখে যাবে দুর্গা কিছু কি আমার নাই,
দেখেছি তোমার কাঙাল পিতার ঘর দরজা নাই।
দুর্গা বলে আমি ক'লে পাছে দ্বন্দ্ব হবে,

সেই যে আমার কাঙাল পিতা ভিখ্ মেঙেছে কবে।
তারা নানা দান পুণ্যবান দেবকার্য করে,
এক দফাতে কাঙাল বটে ভাং নাই তাদের ঘরে।
নানা রসে ভুলে শেষে বলছেন ত্রিলোচন,
মর্ত্যে গিয়া কি আনিবে আমার কারণ।
গুটি পাঁচসাত বিল্বপত্র এই আমি পাই,
দুর্গা বলে প্রভু ছাড়া কোন্ দ্রব্য খাই।
এইরূপে নানা কথায় পোহাল রজনী,
সকাল বেলা নায়ে চল্লেন জগৎজননী।
উল্কি ফোঁটা সিন্দূরছটা মুক্তা বাঁধা কেশে,
সোণার ঝাঁপা কনক চাঁপা শিব ভুলেছেন বেশে।
গলায় সুচন্দ্র হার নিশ্চন্দ্র তার উপরে,
চন্দ্র যদি অস্ত যান কি করে সে চন্দরে।
চললেন বাপের বাড়ী দেব ভগবতী,
সংগে কার্তিক গণেশ আর লক্ষ্মী সরস্বতী।
জয়া বিজয়া চললেন দিয়া দরশন,
গুপ্তবেশে চললো শেষে দেব পঞ্চানন।
সারি সারি শঙ্খ বাজে উলু ঝাঁকে ঝাঁক

*　　　*　　　*　　　*

উমা এলে রাণী ভাগ্যবান

*　　　*　　　*　　　*

মর্ত্যলোকে পূজে যাহা বড় ভাগ্যবান,
পূজিয়া অভয়পদ পায় পরিত্রাণ।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য আদি সমেত গঙ্গাজল,
দেবগণে সাবধানে গাইছে মঙ্গল।
উমা কোলে রাণী বলে চুম্ব দিয়া মুখে,
কহ তারিণী হরের ঘরে ছিলে কেমন সুখে।

পঞ্চরাজার ধন যেমন অমূল্যরতন,
অযোধ্যায় রামকে পেলে হরষিত যেমন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনুরূপ ছড়ার কিছু কিছু অংশ তাঁর 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে উদ্ধার করে তাঁরই উপযুক্ত ভংগীতে বিশ্লেষণ করেছেন।

১৩১১ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় ডাঃ মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য রচিত 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরি বিষয়ক একটি ছড়া সঙ্কলিত হয়েছে। ছড়াটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল—

ননীচুরি

নন্দরাণী নন্দরাণী বড়ই ভাগ্যবান
সেই ঘরেতে জন্ম নিলেন কৃষ্ণ বলরাম।
রাত দুপুরকালে রাণী ঘাটে চলে যান,
শূন্য ঘর পেয়ে কৃষ্ণ সকল ননী খান।
ননী খেলো কেরে গোপাল ননী খেলো কে,
আমি তো খাই নেই ননী বলাই খেয়েছে।
এক গোপী উঠে বলে ওরে ননী চোর—
এই ত খালি ভাণ্ড ভেঙে হাতে মাখা তোর,
বলাই ত খায় নি ননী কৃষ্ণ বাণ্ডিল পূরেছে।
তখন রাগে রাণী উঠে গিয়ে ঝাপদে ছিড়ে নিয়ে,
গাভী-ছাদন-দড়ি দিয়ে বান্ধলেন কৃষ্ণে গিয়ে।
লাফ দিয়ে ধরলেন কৃষ্ণ কদম গাছের ডাল,
গোপীগণ বলে কৃষ্ণ সামাল সামাল।

১৩১৩ বঙ্গাব্দের ১ম সংখ্যার সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় অক্ষয় চন্দ্র সরকার 'বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতের কথা' শীর্ষক একটি নিবন্ধে সেঁজুতী ব্রত সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সেঁজুতি ব্রতের চিত্র ও প্রকরণও প্রকাশিত হয়েছে নিবন্ধটিতে। লেখক বলেছেন, 'গৃহস্থালী

ব্যাপারে বাঙ্গালীর মেয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আব্দারের কথা অনেক এই সকল ব্রত হইতে জানা যায়। ......খ্যাতনামা লেখকগণ বহু পরিশ্রমে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতেছেন, কিন্তু প্রায়ই এই সকল ইতিহাস শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াও বেশ বুঝা যায় না যে তাঁহাদের বর্ণিত সময়ে বাঙ্গালীর মেয়েরা কিরূপ ছিল। বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতকথা সঙ্কলিত হইলে, হয় ত বুঝিতে পারিব যে বাঙ্গালীর মেয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং আবদার কিরূপ ছিল। [পৃ-২৩]

দীর্ঘ সত্তর বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে লেখক যে খেদোক্তি করেছিলেন, কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত প্রয়াস ছাড়া এই বিষয়ে এ পর্যন্ত সুসংবদ্ধ কোন কাজ দেখা যায়নি স্বীকার করতে হয়। যাইহোক লেখক তাঁর নিবন্ধে সেঁজুতি ব্রতের যে ছড়াটি উদ্ধার করেছেন সেটির উল্লেখ করা গেল—

তুষ তুষলি জাঁতাজাতি।
বাপমার ধন, স্বামীর ধন, নিজের খ্যাতি॥
ঘর করবো নগরে, মরবো ত সাগরে।
জন্মাবত উত্তম কায়স্থ ব্রাহ্মণের ঘরে॥
তূষুলি গো রাই, তূষুলি গো ভাই।
তোমার কল্যাণে খাই ছ বুড়ি ছ গণ্ডা ক্ষীরের নাড়ু।
আমার যেন হয় সবার আগে সুবর্ণের খাড়ু॥

এই ক'টি মাত্র পংক্তির মাধ্যমে আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দী কাল পূর্বের প্রাচীন বাঙ্গলা দেশের সমগ্র নারী সমাজের মনের ভাবটুকুই প্রতিফলিত হয়েছে সার্থক ভাবে।

১৩১৯ সনের ৩য় সংখ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় যোগেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিকের 'বাঘাইর বয়াত' নিবন্ধে ময়মনসিংহের নানাস্থানে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে কৃষক বালকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক উৎসব উপলক্ষে রাখাল বালকদের দ্বারা

ব্যবহৃত 'বাঘাইর বয়াত' শীর্ষক ছ'টিছড়া প্রকাশ করেছেন। লেখক বলেছেন,—

'রাখাল বালকগণ পৌষ সংক্রান্তির পূর্বে দল বাঁধিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া 'বাঘাইর বয়াত' নামে এক প্রকার কবিতা আবৃত্তি করিয়া ভিক্ষা করে। একজন প্রথমে কবিতা বলিয়া দেয় এবং পরে সকলে একস্বরে তাহা আবৃত্তি করে। কয়েকদিন এইরূপ ভিক্ষা করিয়া যাহা লাভ হয় তদ্‌দ্বারা পিষ্টক মিষ্টান্ন প্রভৃতির জন্য আবশ্যক দ্রব্য সমূহ ক্রয় করা হয়। পৌষ-সংক্রান্তি দিন কোনও বনের ধারে রাখাল বালকগণ সকলে সমবেত হয় এবং সেখানে পিষ্টক মিষ্টান্ন ইত্যাদি পাক হয়। খড় দ্বারা ত্রিভুজাকৃতি করিয়া একখানা কুলা তৈয়ার করা হয়। তাহাতে পিঠা ও মিষ্টান্নাদি সাজাইয়া বনের ধারে বাঘাইর উদ্দেশ্যে রাখিয়া আসা হয়। তারপর অবশিষ্ট পিষ্টক ও মিষ্টান্ন সকলে মিলিয়া পরমানন্দে ভোজন করে।' [পৃঃ ১৬৭]

বাঘাইর বয়াতগুলি যে উপলক্ষে সৃষ্ট, তার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে লেখক মন্তব্য করেছেন।

'বাঘাইর অর্থ সম্ভবত ব্যাঘ্রের দেবতা। পূর্বকালে ময়মনসিংহের স্থানে স্থানে ভয়ানক জঙ্গল ছিল এবং তাহাতে বড় বড় ব্যাঘ্র বাস করিত। সম্ভবত ব্যাঘ্র-ভীতি হইতেই এই উৎসবের এইরূপ নাম করা হইয়াছে।' [পৃঃ ১৬৭]

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৮শ বর্ষের ১ম খণ্ডের ৩য় সংখ্যায় [ভাদ্র ১৩৩৭] 'নদীয়া হইতে সংগৃহীত মেয়েলী ছড়া' শীর্ষক আলোচনায় শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়বস্তু দুর্গার আগমনী। ছড়াটি নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত পোছাদহ থেকে সংগৃহীত, অধুনা বাংলাদেশ।

আগমনীর ছড়া

[হিমালয়, মেনকা, হর ও পার্বতী]

মেনকা—

শরত কালে রাণী বলেন বিনয় বচন।
আজ শুনেছ গিরিরাজ নিশির স্বপন॥
মায়া করে সোনার গৌরী মোর অঙ্গনে এসে।
মা বলিয়া ডাক্‌ছে কত মোর নিকটে বসে॥
কেঁদে বলেন বিভা দিলেন পাগল পতির ঠাঁই।
রাত্তির দিনে শ্মশান বিনে আর না বুঝে ঠাঁয়॥
বল্লে পরে উম্মা করে মারতে আসেন ধেয়ে।
অন্ন বিনে প্রাণ বাঁচেনা বঞ্চিব কি খেয়ে॥
শূন্য পুরী রইতে নারি কারে বলিব কি।
অশোক বনে ছিলেন যেমন জনক রাজার ঝি॥
তাই বেথিত কুলে মন্দ বলে কেউ না করে দেখা।
ভাঙ ঘুটিতে জনম গেল এই ললাটের লেখা॥
সে যে ঘর ছেড়ে শ্মশানে থাকে মৃত তুল্য হয়ে।
আজ দেখেছি মলিন বস্ত্র পরেছেন অভয়ে॥
সারা বৎসর গত হল করছে হরের ঘর।
যাও গিরি আনিতে গৌরী কৈলাস শিখর॥

হিমালয়—

হিমালয় বলে হায় শুন মেনকা রাণী।
রাত্তির দিনে ভাবছ মনে নিদ্রায় ভবানী॥
স্বপন কালে নিশির ঘোরে স্বর্গ মর্ত্য দেখে।
স্বপন কালে রাজা বলে তাই বা কোথায় থাকে॥
সে জামাতা পাগল বেটা পরছে বাঘের ছাল।
রাত্তির দিবস ব্যোম ব্যোম বাম্ভি করে গাল॥
বৃদ্ধ যেমন করছে গমন সঙ্গে করে।
তার কথার সঙ্গে কেউ না পারে পঞ্চমুখে বল্লে॥

তার নেইক লাজ ফকির সাজ ফেরে সর্বদিকে।
তার পিতার নির্দ্দিষ্ট নেই জেরো বেটা শিব ॥
বিয়ের রাতে দেখলাম জামাই ভাণ্ড ভোলানাথ।
তুই মেনকা বরতে গেলি ন্যাংটা হল তাতে ॥
ইচ্ছে যদি থাকে তবে মরবা কেন দুঃখে।
যাও কৈলাসে শিবের কাছে থাক্‌বা পরম সুখে ॥
বৃষে চড়ি দৌড়াদৌড়ি দেখবা কত দেশ।
দেখবা গৌরী ত্রিপুরারী থাকবা সুখে বেশ ॥
সে গত বৎসর আমার সনে করেছে হুড়াহুড়ি।
ফের পুনরায় যেতে বল সেই জামাতার বাড়ী।

মেনকা—

রাণী কয় উচিত নয় দুষ্ট তোমার হিয়ে।
কিবা কঠিন হলে তুমি কন্যা বিভা দিয়ে ॥
এখন বল পাগল পাগল তখন ছিলে কোথা।
জেনে শুনে সেই পাগলে কন্যা দিলে বিভা ॥
শোকানলে হিয়ে জ্বলে দুঃখে ডুবে আছি।
আমার গৌরী ত্রিপুরারী দেখলে প্রাণে বাঁচি ॥

হিমালয়—

গিরি বলেন আন্‌তে গেলে আসব বিমুখ হয়ে।
যা হোক তা হোক যাব কোন দ্রব্য লয়ে ॥
সেই কথা শুনে রাণী উঠেন শীঘ্র করি।
খাজা গজা মনোহরা দিলেন ভাণ্ড ভরি ॥
মিছরির নাড়ু মিছরীর সর স্বস্তি থরে থরে।
চিনির ফেনা এলাচ দানা ক্ষীর তক্তি ভরে ॥
গুড় চিনি বাতাসা মধু কত লেখা যায়।
ভাঙের নাড়ু পেলে ভোলা পঞ্চমুখে খায় ॥
তবে গিরি যত্ন করি নিলেন উপহার।
পঞ্চমীতে যাত্রা করেন শাস্ত্রের বিচার ॥

হোথা কৈলাস পুরী কপট করি বসেছেন দেবগণ।
দেব সহিতে নারদ মুনি আর পঞ্চানন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দিবাকর বসেছেন সারি সারি।
দেবরাজ, বরুণ আর পবন আদি করি ॥
নারদ বাজান বীণে ঠাকুর গান গীত।
হেন সময় হিমালয় হলেন উপস্থিত ॥
শ্বশুর জামাতার যখন দরশন হল।
হুতাশনের মধ্যে ঘৃত যেমতে পড়িল ॥

শিব—

বলছে বাণী শূলপাণি উষ্মা করি মনে।
জেরো দেবের মুখ দেখিতে পাষাণ এল কেনে ॥

গিরিরাজ—

বলছে গিরি কপট করি কি বলিব আর।
গত নিশি দেবদৃষ্টি হয়েছে মেনকার ॥
অন্নজল না খেয়ে রাণী ভাবছে সর্ব্বক্ষণ।
জান্‌তে এলাম কোন দেবতা করছে বিড়ম্বন ॥

* * *

সম্ভাষণ করি বসলেন মহাশয়।
দেবসভাতে প্রণাম করে বসলেন হিমালয় ॥
গুটি পাঁচ সাত ভাঙ্গের নাড়ু যত্ন করে দিলেন।
ভক্তিভাবে ভোলানাথ তৎক্ষনাৎ তা নিলেন
সেই কথা শুনে চণ্ডী হরষিত হয়ে।
যতন করিয়া পিতায় নিলেন নিজ পুরে ॥

গৌরী—

কও গো বাবা নিশ্চয় কথা আর কহিব পাছে।
সত্যি করে বল গো বাবা মা কেমনে আছে ॥
তুমি নিঠুর হয়ে পিতা পাশারিয়েছ ঝি।
শিব নিন্দে কর গো বাবা তার বলিব কি ॥

হিমালয়—

তুমি বল নিঠুর পি। শম্ভু বলেন শিলে।
সভার মাঝে গাল দিয়েছে পাষাণ বলিয়ে ॥
ছার মেনকার কথা শুনে তোমায় এলাম নিতে।
নারীর বুদ্ধি বিপরীত জানলাম আজ হতে ॥
শুনে কথা জগতমাতা কাঁদিয়ে অস্থির।
পাহাড়ে মেঘের জল যেমন ঝরছে আঁখিনীর ॥
নয়ন জ'লে ভেসে যায় আকুল হল যদি।
কৈলাসে না রহে ধারা হল একটি নদী ॥

হিমালয়—

কেঁদো না কেঁদো না মা গো ত্রিপুরা সুন্দরী।
কাল তোমারে নিয়ে যাব পাষাণের পুরী ॥
যত্ন করি মহেশ্বরী করিলেন রন্ধন।
শ্বশুর জামাতা দোঁহে করেন ভোজন ॥
শয়ন কালে দুর্গা বলেন আজ্ঞা কর স্বামী।
সাধ করে বাপের বাড়ীর নায়েরে যাব আমি ॥

শিব—

দেবের দেব বলেন তোমার ভাব পড়েছে মনে।
জেনে কাঙ্গাল তোমার পিতা বিভা দিল কেনে ॥
কৈলাস বৈকুণ্ঠ পুরী তুচ্ছ তোমার ঠাঁই।
জানি তোমার কাঙ্গাল পিতার ঘর দরজা নাই ॥
[দুর্গার বাঙ্গালিনী সুলভ বাপের বাড়ীর বড়াই।]

গৌরী—

দেবী বলেন আমি বললে বৃথা দ্বন্দ্ব হবে।
সেই যে আমার কাঙ্গাল পিতা ভিখ মেগেছে কবে ॥
সে রাজার বেটা দালান কোঠা অট্টালিকাময়।
যাগ যজ্ঞ করেন পিতা শ্মশানবাসী নয় ॥

অন্নদানে পুণ্যবান দেবকার্য্য করেন।
এক দফাতে কাঙ্গাল বটে ভাঙ্গ নাই ঘরে॥
মিথ্যা কথা দয়াময় ভোলা মহেশ্বর।
নায়ের নিন্দে বৃথা দ্বন্দ্ব যেতে বাপের ঘর॥
[তখন শিব বলেছেন—ত্রিলোচনী, তুমি মর্ত্ত্যে যাবে, সেখান থেকে আমার জন্যে কি কি আন্‌বে ?]

গৌরী—

বছর অন্তর কিছু মাত্তর বিল্ব পত্তর পাই।
দেবী বলেন প্রভু ছাড়া কোন দ্রব্য খাই॥
সেই কথা শুনে আজ্ঞা দিলেন সোয়ামী।
ত্রিশূল পিনাক নিয়ে পোহাল রজনী॥
প্রাতঃ কালে নায়ের সজ্জা জগত জননী।
বেশ করেছেন ব্রহ্মময়ী ভুবন মোহিনী॥
আলতাছটা সিছঁর ফোঁটা যুক্ত গাঁথা কেশে।
কর্ণতে তার কনক চাঁপা শিব ভুলেছেন বেশে॥
পরবো চাকি বলবো তাকি সোনার কর্ণফুল।
নাসার মূলে বেশর দোলে যার নাইকো মূল।
গলায় তার রত্নহার ছুলছে সোনার পাটা।
চন্দনের চৌদিকে যেমন বিছ্যুতের ছটা॥
তাড় কঙ্কণ খেসো পৈঁচে শঙ্খ বাহুমূলে;
বাঁক পাতা মল সোনার নূপুর কদম ভাসে জলে॥
সিংহ আসন পট্টবসন পরেছেন ভগবতী।
কার্ত্তিক গণেশ সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী॥
জয়া বিজয়া দাসী হয়ে চললেন ছুইজন।
গুপ্ত ভাবে চল্লেন সাথে দেব পঞ্চানন॥
সারি সারি ঘটবারি আর গঙ্গাজল।
শুভদিনে শুভক্ষণে বহিল মঙ্গল॥

উমা পেয়ে আবার কোলে চুম্ব দিল মুখে।
বল্ তারিনী জামাই ঘরে ছিলি কেমন সুখে ॥
ধূপ ধুনা নৈবিদ্য আর শঙ্খে গঙ্গাজল।
নারিকেল রম্ভা আর নানা জাতি ফল ॥
দ্বিজগণ চণ্ডী পড়ে জ্বালালেন হুতাশন।
বিল্বপত্র ঘৃত আর যজ্ঞ আরম্ভন ॥
দুর্গানাম মোক্ষধাম সর্ব্বপাপ হরে।
বিপদ বিষম দিনে শমন কাঁপেন ডরে ॥

১৩১০ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ব্রজসুন্দর সান্যাল প্রকাশিত 'শরৎ-কালী' শীর্ষক ছড়াটির সঙ্গে শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত এই ছড়াটির গভীর সাদৃশ্য আছে। নিঃসন্দেহে একই ছড়া লোকমুখে প্রচারিত হওয়ার ফলে ছড়াটির ভাষান্তর এবং ক্ষেত্রবিশেষে রূপান্তর ঘটেছে। আমরা সেই রূপান্তরের কিছু পরিচয় গ্রহণ করতে পারি। ১৩১০ সনে প্রকাশিত ছড়ার তৃতীয় পংক্তিতে আছে—

মায়া করি শুনায় গৌরী—মোর আঙ্গিনায় আসি, কিন্তু পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়াল—

মায়া করে সোনার গৌরী—মোর অঙ্গনে এসে। —অর্থাৎ 'শুনায়' হয়েছে 'সোনার' 'আঙ্গিনায়' হয়েছে অঙ্গনে। এক্ষেত্রে রূপগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে গেছে—পংক্তিটিতে তা লক্ষ্য করা যায়। যে ব্রজসুন্দর সান্যাল গৃহীত ছড়াটির একটি পংক্তি হল—নিদ্রায় দেখেছ কত নিদ্রার ভবানী।

কিন্তু শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গৃহীত ছড়ায় এই পংক্তিটি রূপান্তর প্রাপ্তির পর দাঁড়িয়েছে—

রাত্তির দিনে ভাবছ মনে নিদ্রায় ভবানী।

শিবের সম্পর্কে প্রথম ছড়াটিতে বলা হয়েছে—

বম্ বম্ বম্ ফিরছে সদা বাদ্য করে গাল।

কিন্তু দ্বিতীয় ছড়াটিতে এই পংক্তিটি রয়েছে এইভাবে—

রাত্তির দিবস ব্যোম ব্যোম বাম্বি করে গাল॥

এইবার 'ভারতবর্ষে' গৃহীত ছড়া থেকে কিছু কিছু পংক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে যেগুলি 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত ছড়ায় অনুপস্থিত—শিব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—

সে যে ঘর ছেড়ে শ্মশানে থাকে মৃত তুল্য হয়ে।
আজ দেখেছি মলিন বস্ত্র পরেছেন অভয়ে॥

হিমালয় মেনকার কাছে শিবের আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করে বলেছেন ঃ

বিয়ের রাতে দেখলাম জামাই ভাঙু ভোলানাথ।

শুধুই কি তাই ?

তুই মেনকা বরতে গেলি ন্যাংটা হল তাতে॥

হিমালয়কে মেনকা বলেছেন—

এখন বল পাগল পাগল তখন ছিলে কোথা।
জেনে শুনে সেই পাগলে কন্যা দিলে বিভা॥

অনেক কষ্টে মেনকা হিমালয়কে উমার গৃহে প্রেরণ করলেন। কৈলাস পুরীতে উপস্থিত হয়ে হিমালয় দেখলেন—

ব্রহ্মা বিষ্ণু দিবাকর বসেছেন সারি সারি।
দেবরাজ, বরুণ আর পবণ আদি করি॥
নারদ বাজান বীণে ঠাকুর গান গীত।

কন্যা উমা পিতাকে দেখে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। আর অপ্রস্তুত হিমালয়েরও তখন কন্যাকে সান্ত্বনা না দিয়ে উপায় রইল না—

নয়ন জলে ভেসে যায়—আকুল হল যদি।
কৈলাসে না রহে ধারা হল একটি নদী॥
কেঁদো না কেঁদো না মা গো ত্রিপুরা সুন্দরী।
কাল তোমারে নিয়ে যাব পাষাণের পুরী॥

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত ছড়ায় এক্ষেত্রে সংযোজিত হয়েছে—

মেনকা দিয়াছিলেন সন্দেশ দিলেন দুর্গার হাতে,
ক্ষমা পেলেন নারায়ণী তুষ্ট হলেন তাতে।

'ভারতবর্ষে' উদ্ধৃত ছড়ায় শিবকে উমার কাছে অনুযোগের সুরে বলতে দেখা গেছে—

দেবের দেব বলেন তোমার ভাব পড়েছে মনে।
জেনে কাঙাল তোমার পিতা বিভা দিল কেনে॥
কৈলাস বৈকুণ্ঠ পুরী তুচ্ছ তোমার ঠাঁই।

শিবের অনুমতি পেয়ে উমা পিত্রালয়ে গমনের জন্য সুচারু রূপে সাজসজ্জা করলেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় গৃহীত ছড়াটিতে নিতান্ত সীমিত পরিসরে উমার সজ্জার বিবরণ প্রদত্ত হলেও 'ভারতবর্ষে' কিন্তু এই বিবরণ বিস্তৃততর পরিসরে প্রকাশিত হয়েছে—

আলতা ছটা সিঁদুর ফোঁটা যুক্ত গাঁথা কেশে।
কর্ণতে তার কনক চাঁপা শিব ভুলেছেন বেশে॥
পরবো চাকি বলবো তাকি সোনার কর্ণফুল।
নাসার মূলে বেশর দোলে যার নাইকো মূল॥
গলায় তার রত্নহার দুলছে সোনার পাটা।
চন্দনের চৌদিকে যেমন বিদ্যুতের ছটা॥
তাড় কঙ্কন খেসো পৈঁচে শঙ্খ বাহুমূলে।
বাঁক পাতা মল সোনার নূপুর কদম ভাসে জলে॥

এইবার সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় গৃহীত ছড়াটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য এই অংশগুলি পরবর্তী-কালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত ছড়াটিতে উল্লিখিত হয়নি।

হিমালয় মেনকাকে শিব সম্পর্কে অভিযোগ করলে মেনকা জবাবে বলেছেন ঃ

দুষ্ট লোকের নষ্ট কথা কুশল না হয় যাতে.
যাহার নিকটে প্রাণ সপেছে মান কর তার সাথে।
সে যে দেবদেব মহাদেব বসে সর্বঘটে.
ত্রিভুবনের গঙ্গা ছিল কোন্ দেবতার জটে।
বিভার রাত্রে দেখতে জামাই মূর্তি অনুপম,
গোকুলের গোবিন্দ কিবা অযোধ্যার রাম।

মেনকা শুধু জামাতার গুণ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, সেইসঙ্গে পতিকে জামাতার নিন্দা করার পরিণাম বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন ঃ

সেই জামতার নিন্দা কথা কখনও না বলো,
সেই পাতকে দক্ষ রাজার যজ্ঞ নষ্ট হলো।

মেনকার যে জামাতা মনোমতই হয়েছিল তার পরিচয় মেলে তাঁরই উক্তিতে ঃ

আমি শম্ভু নামে সেধেছিলাম কত,
দুর্গা সখা শিব জামতা মিলেছে মনোমত।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনকার জন্য হিমালয় শেষ পর্যন্ত কৈলাস উদ্দেশে যাত্রা করলেন। যাবার আগে তিনি ঃ

ভাবি মনে গজাননে করেন দণ্ডবৎ,
গঙ্গা আনতে যেমন চললেন ভগীরথ।

শিবের সংগে হিমালয়ের প্রথম সাক্ষাৎকারের বিবরণে ছড়াটিতে বলা হয়েছে ঃ

বিষনাল ভাঙিলে যেমন ব্যথা পান ফণী,
অমনি, গর্জ্জিয়া উঠিলেন ঠাকুর দেব চূড়ামণি।

'ভারতবর্ষে' ক্রন্দনরতা উমাকে সান্ত্বনা দিতে হিমালয় কেবল স্বীয় গৃহে নিয়ে যাবার কথা বলেছেন। কিন্তু সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

মেনকা দিয়াছিলেন সন্দেশ দিলেন দুর্গার হাতে,
ক্ষমা পেলেন নারায়ণী তুষ্ট হলেন তাতে।

'ভারতবর্ষে' শ্বশুর ও জামাতার ভোজনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে মাত্র, কিন্তু পূর্ববর্তীকালে প্রকাশিত ছড়ায় সেই সংগে যুক্ত হয়েছে—

বাপকে বসিতে দিলা রত্ন সিংহাসন,
শিবকে বসিতে দিলা ভাঙা কুশাসন।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় উমার আরাধনা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

মর্ত্যলোকে পূজে যাহা বড় ভাগ্যবান,
পূজিয়া অভয় পদ পায় পরিত্রাণ।

* * * *

পঞ্চরাজার ধন যেমন অমূল্যরতন,
অযোধ্যায় রামকে পেলে হরষিত যেমন।

'ভারতবর্ষে' অবশ্য দুর্গাপূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোমের কথা উল্লিখিত হয়েছে :

দ্বিজগণ চণ্ডী পড়ে জ্বালালেন হুতাশন।
বিল্বপত্র ঘৃত আর যজ্ঞ আরম্ভন ॥

পরিশেষে দুটি পত্রিকায় গৃহীত ছড়া দুটির মধ্যেকার অপর এক উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ছড়াটি যেখানে একটানা প্রকাশিত, সেক্ষেত্রে 'ভারতবর্ষে'র ছড়াটিতে গৌরী, হিমালয় ও শিব—এই তিন চরিত্রের সুস্পষ্ট সংযোজন অনেকটা নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছে।

নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামীর 'বিশ্বভারতী' প্রকাশিত 'লোক-শিক্ষা গ্রন্থমালা' পর্যায়ে রচিত 'বাংলা সাহিত্যের কথা' [মাঘ, ১৩৪৯] শীর্ষক পুস্তিকাটিতে ছড়া সম্পর্কিত আলোচনা স্থান

পেয়েছে। অবশ্য নিতান্ত সীমিত পরিসরে। লেখক বাংলা ছড়াকে খেলার ছড়া, ছেলে ভুলানো ছড়া, বিবিধ, ডাক ও খনার বচন মূলতঃ এই চারটি বিভাগে ভাগ করেছেন এবং সীমিত সংখ্যক ছড়া প্রকাশ করেছেন। গোস্বামী সঙ্কলিত কয়েকটি ছড়া উদ্ধার করা গেল—

ক। আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে
স্বুর্জ্জি গেছে পাটে
খুকু গেছে জল আনতে
পদ্মদিঘির ঘাটে ॥

খ। খুকুন বালা টাকার থালা
মটকি ভরা ঘি
খুকুমণির বিয়ে হল না
ছি ছি ছি ॥

গ। খুকুমণি দুধের ফেনি কৌ গাছের মৌ
সব ছেলেদের বলব খুকুন হাঁড়ি—খাগীর বৌ

ঘ। আক্কা বাক্কা তিন তলাক্কা
লোয়া লাঠি চন্নন কাঠি
উলুকুটু ঢুলুকুটু নলের বাঁশি
নল ভেঙেছে একাদশী।

তুষতুষুলি ব্রতের একটি ছড়াও উদ্ধৃত করা গেল। লক্ষ্য করা যেতে পারে ব্রতের ছড়া হলেও এটিতে কোন আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ মাত্র নেই, এমন কি পারলৌকিক জগতের কোন কামনা বাসনাও স্থান পায়নি ছড়াটিতে। একান্ত ভাবে ইহলৌকিক আকাঙ্ক্ষাই মূর্ত হয়ে উঠেছে এখানে—

তুষ তুষুলি তুমি কে
ধনে ধানে বাড়ন্ত
তোষলো লো তুষকুণ্ডি
গাইয়ের গোবর সরষের ফুল,

গাই এ গোবরে সরষেরফুল,
কোদাল কাটা ধান পাব,
দরবার—আলো বেটা পাব,
সেঁজ—আলো ঝি পাব,
ঘর করব নগরে,
জন্মাব উত্তম কুলে
তোমায় পূজা করি যে
সুখে থাকি আদি অন্ত,
ধনে ধানে গাঁয়ে গুন্তি,
আসন পিঁড়ি এলোচুল,
ওই করে পূজি বাপ মার কুল।
গোহাল—আলো গরু পাব,
সভা—আলো জামাই পাব,
হাঁড়ি মাপা সিঁদুর পাব,
মরব গিয়ে সাগরে।
তোমার কাছে মাগি এই বর
স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।

'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' রচয়িতা ডঃ সুকুমার সেন কেবল লিখিত তথা অভিজাত সাহিত্যের আলোচনাই করেন নি, বাংলার লোক সাহিত্য বিষয়ক একাধিক আলোচনাতেও তাঁকে ব্রতী হতে দেখা গেছে। তাঁর রচিত 'বিচিত্র সাহিত্য' [২য় খণ্ড ১৩৬৩] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'লোক সাহিত্য' এবং 'ছেলেভুলোনো ছড়া' শীর্ষক সরস রচনাদ্বয়ের এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। দুটি রচনাই প্রথম প্রকাশিত হয় 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় [১৯৫২, ১৯৫৩]।

'লোক সাহিত্য' রচনাটিতে লেখক ছড়া প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, 'এই ধরণের ছড়ার মধ্যেই [ঘুমপাড়ানি ও ছেলেভুলানো ছড়া] লুকিয়ে আছে সর্বদেশের সর্বকালের আদিম

কবিতার বীজ, বাণীর প্রথম অঙ্কুর। আদি মানব জননীর কণ্ঠের অর্থহীন ছড়ার টানা সুর ছন্দের জন্ম দিয়েছে।' [পৃঃ ১৯৩]

ছড়া কবিতার পর্যায়ভুক্ত হলেও নির্মাণ রীতিতে যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে, সেই প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য, 'সাধারণ কবিতা লেখবার সময় কবির কল্পনা বিচরণ করে ভাব থেকে রূপে, রস থেকে ভাষায়। ছড়া কবিতায় লেখকের কল্পনা যায় রূপ থেকে ভাবে, ভাষা থেকে রসে এবং তাতে রূপের ও ভাবের মধ্যে ভাষা ও রসের সঙ্গে কোন রীতিসিদ্ধ যোগাযোগ বা সঙ্গতি আবশ্যিক নয়।' [পৃঃ ১৯৩]

লেখক বেশ কিছু ছড়ার মাধ্যমে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন ব্যক্তি-মানসের অভিব্যক্তি, বাঙ্গালীর সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য, সাহিত্য সরণিতে ছড়ার আত্মপ্রকাশ, আমাদের সমাজে পুত্র সন্তানের তুলনায় কন্যা কতখানি অবহেলার সামগ্রী, বাঙ্গালী জননীর সংসারে স্বীয় কর্তৃত্বকে অটুট রাখার প্রয়োজনে এবং তৎসহ সন্তান যেন শ্বশুরবাড়ীর অনুগত না হয় সে বিষয়ে প্রখর সচেতনতা, শ্বশুরবাড়ীতে মেয়ের অবস্থা সম্বন্ধে ছড়ায় মাতার নীরবতা অবলম্বনের কারণ, বিবাহের ব্যাপারে জামাই সম্বন্ধে কন্যার মাতার বিচিত্র দুর্বলতা, বিপরীতক্রমে জামাই সম্বন্ধে প্রতিবেশিনীদের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী, বিবাহে প্রচলিত পণপ্রথা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

কন্যার বিবাহে পাত্রপক্ষকে পণ দানের কুপ্রথা দীর্ঘকালের, সেই যবে থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন। আমরা যতই সভ্যতার বড়াই করি, এমনকি রকেটের যুগে যখন বাস করি তখনও কিন্তু এই নিন্দনীয় প্রাচীন প্রথাটিকে পরিহার করার কোন লক্ষণ দেখিনা। বরং এই প্রথার আধিপত্য পূর্বাপেক্ষা অধিক বলেই মনে হয়। অতীতকালে কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রভাবে কখনও কখনও কোথাও কোথাও কন্যাপক্ষকেও বিবাহে পণদান করা হত,

তার পরিচয় যেমন লিখিত সাহিত্যে পাওয়া যায়, লোক সাহিত্যেও সে পরিচয় বিদ্যমান। 'ভক্তমালে' বর্ণিত হয়েছে, জামালপুরের এক ধনী ব্যক্তি দেবকীনন্দন সর্বত্র 'ভাইয়া' বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর প্রথমা পক্ষের পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। এজন্য তাঁকে কন্যার পিতাকে পণ দিতে হয়েছিল। কন্যার ভাষায়—

পিতা মাতা না জানি কতেক ধন পাইয়া।
অবলা আমাকে দিল কূপেতে ডারিয়া॥

[সপ্তদশ মালা, বসুমতী সংস্করণ]

ডঃ সেন একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন, যেখানে পাত্রীপক্ষের পণ গ্রহণের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে—

হলুদ বাটা মরিচ কোটা জোড় পুতুলের বিয়ে
অই আসছে নতুন জামাই গামছা মাথায় দিয়ে।
ও গামছা ভালো না
মেয়ের বিয়ে দেব না
মেয়ে দেব সাজিয়ে,
টাকা নেব বাজিয়ে।

আর একটি ছড়ায় কন্যাকে অর্থ গ্রহণকারী পিতার বিরুদ্ধে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে অনুযোগ করতে দেখা গেছে—

এতটাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে,
এখন কেন কাঁদছ বাবা গামছা মুড়ি দিয়ে।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটিতে [১৩৬৯] বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ছড়া ও সেই ছড়াগুলির আলোচনা বিধৃত হয়েছে। বাংলা লোক সাহিত্যের এই সমৃদ্ধ বিভাগটির সুবিস্তৃত আলোচনা ও ছড়ার বৃহত্তম সঙ্কলন হিসাবে বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। অবশ্য সঙ্কলক নিজেই স্বীকার

করেছেন যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন লেখক ও সংগ্রাহক কর্তৃক সঙ্কলিত বাংলা ছড়ার সঙ্কলন ও তদ্বিষয়ক আলোচনার সাহায্য তিনি গ্রহণ করেছেন। তথাপি এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে ডঃ ভট্টাচার্যের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সমাজ বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি, রসবোধ, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও সর্বোপরি বিরল শ্রমশীলতার স্বাক্ষর বিদ্যমান। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের অধিককাল যাবৎ লেখকের একাগ্র সাধনার সার্থক ফলশ্রুতি এই গ্রন্থটি। তাই বলে ছড়া বিষয়ক আলোচনায় এই গ্রন্থেই ডঃ ভট্টাচার্যের প্রথম পদক্ষেপ ঘটেনি উল্লেখ করা যেতে পারে। 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে [১৩৬১] লেখক লোক সাহিত্যের সামগ্রিক আলোচনার সময় অন্যান্য নানা বিভাগের সঙ্গে প্রথম অধ্যায়েই ছড়া সম্পর্কে মননশীল আলোচনা করেছেন। লোকসাহিত্যের অপরাপর বিভাগের তুলনায় ছড়ার স্বাতন্ত্র্য,—বিষয়বস্তু অনুযায়ী বাংলা ছড়ার শ্রেণী বিভাগ, 'ছড়ার ছন্দ' নামে পরিচিত শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি শিশু, নারী ও প্রকৃতি বিষয়ক ছড়াগুলির কিছু কিছু দৃষ্টান্তসহ আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। এই আলোচনার আট বৎসর পরে লেখকের ছড়া সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা ও ছড়ার বিপুল সঙ্কলন প্রকাশিত হল 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। বলা যেতে পারে প্রথম খণ্ডে ছড়া সম্পর্কিত আলোচনার যে বীজ বপন করা হয়েছিল, আট বৎসরে তাই পত্র পুষ্পে শোভিত মহীরূহ রূপে আত্মপ্রকাশ করল দ্বিতীয় খণ্ডে। খুব স্বাভাবিক কারণেই তাই দ্বিতীয় খণ্ডটি ছড়ার সুবিস্তৃত শ্রেণী বিভাগ, একই ছড়ার বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত পাঠান্তর, ষোড়শ শতাব্দী থেকে [কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত চণ্ডীমঙ্গল] বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা ছড়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সহ বিস্তৃত ভূমিকাংশ, খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকদের দ্বারা আধুনিক কালে রচিত সাহিত্যিক ছড়া

[অষ্টম অধ্যায়] প্রথম মুদ্রিত বাংলা ছড়া, কাছাড় জিলা থেকে সংগৃহীত ছড়ার নিদর্শন [পরিশিষ্ট খ ; সংযোজন] প্রভৃতি তথ্য ও আলোচনায় সমৃদ্ধ।

ছড়া সম্পর্কিত আলোচনাতেও লেখক রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত রসানুভূতি ও রামেন্দ্রসুন্দর প্রদর্শিত বিজ্ঞানী-দৃষ্টি এই উভয়বিধ পদ্ধতির সার্থক সমন্বয় সাধন করেছেন। একদিকে অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠা, অপরদিকে বুদ্ধিজাত যুক্তিতর্কের আলোকে ছড়াগুলির রসবিচারে তাঁর আলোচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মননশীল পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

ডঃ ভট্টাচার্য তাঁর ছড়া সঙ্কলনটি কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। এই উৎসর্গ সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র বাংলা লোকসাহিত্যের একজন অকৃত্রিম অনুরাগীই ছিলেন না, সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন বাংলা ছড়ার প্রথম সংগ্রাহক ও আলোচক। তাই এ যুগের সর্ব-বৃহৎ ছড়ার সঙ্কলন রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে উৎসর্গ করায় এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য সিদ্ধ হয়েছে। সেইসঙ্গে ভূমিকাংশে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ছড়া', 'ঠাকুর পরিবার ও জাতীয় ঐতিহ্য' সর্বোপরি 'রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ ও তাহার বিশেষত্ব' শীর্ষক আলোচনাগুলি গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

গ্রন্থটি সর্বমোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ঘুম পাড়ানি বিষয়ক ছড়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছেলে ভুলানো ছড়া, তৃতীয় অধ্যায়ে খেলা, চতুর্থ অধ্যায়ে কন্যা বিষয়ক, পঞ্চম অধ্যায়ে পরিবার, ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রাকৃত জগৎ, সপ্তম অধ্যায়ে অতিপ্রাকৃত ও অষ্টম অধ্যায়ে 'সাহিত্যিক ছড়া' বিষয়ক আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

পাঠান্তর ছড়ার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'কামচারিতা' বলেছেন, লেখক তার কারণ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়ে

বলেছেন, 'একদিন যেভাবে এ'দেশে এক অঞ্চলের অধিবাসীর সঙ্গে আর এক অঞ্চলের অধিবাসীর যোগাযোগ হইত, আজ তাহা সেইভাবে হয়না ; আজ যানবাহন চলাচলের সুবিধার যুগে সেই যোগাযোগ যেমন ব্যাপক, তেমনই ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু একদিন তেমন ছিলনা—একদিন এই যোগাযোগ যেমন এত ব্যাপকও ছিলনা, তেমনই এমন ক্ষণস্থায়ীও ছিলনা। সেইজন্য একদিন এক অঞ্চলের ছড়া অপরিবর্তিত রূপে অন্য অঞ্চলে শুনা যাইত না,' —প্রসঙ্গটি বিস্তৃত আলোচনার দাবী রাখে।

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ছড়ার ক্ষেত্রে যে বিশেষভাবে পাঠান্তরের আধিক্য লক্ষিত হয়, তার কয়েকটি কারণ আমরা অন্যত্র নির্দেশ করেছি, এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। ছড়ার পাঠান্তরের ব্যাপারে নারী-সমাজের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। সে যুগে গৌরীদান প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল। অল্প বয়সী কন্যাদের নানা দূর দূরান্তরে বিবাহ দেওয়া হত। এইভাবে কন্যা বিবাহসূত্রে পিত্রালয়ে শোনা ছড়াগুলি স্মৃতিসূত্রের মাধ্যমে শ্বশুরালয়ে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হত। এক্ষেত্রে ছড়াগুলি একান্তভাবে স্মৃতিবাহিত হবার ফলে স্বাভাবিক কারণেই কিছু কিছু অংশ বিস্মৃত ও পরিবর্তিত হয়ে যেত। কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যা নিজেও কিছু কিছু অংশ স্বয়ং যুক্ত করত। আবার নূতন স্থানের ও পরিবেশের প্রভাবও ছড়াগুলিকে কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত করত। বিশেষতঃ ছড়ার ক্ষেত্রে এটা ঘটত এই কারণে ঘুম পাড়ানি, ছেলে ভুলান, স্নান করান প্রভৃতি দায়িত্ব গুলি একান্তভাবে নারীদের ওপরেই ন্যস্ত। তাই অল্পবয়সী কন্যারা তাদের শৈশবে ও বাল্যে জননী অথবা জননী স্থানীয়াদের মুখ নিঃসৃত এই সকল বিষয়ক ছড়াগুলির সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেত, যা পরবর্তীকালে তাদের গার্হস্থ্য জীবনেও কার্যকরী হত অনেকখানি।

ছড়ার ক্ষেত্রে নারী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ডঃ ভট্টাচার্যের ভাষাতেও জানা যাবে, 'শিশুর পরই ছড়ার আর একটি প্রধান উপজীব্য নারী। নারী জীবনের দুইটি দিক—একটি গার্হস্থ্য বা পারিবারিক জীবন, আর একটি তাহার আচার [বা ritual] জীবন। এই দুইটি বিষয় অবলম্বন করিয়াই লোক-সাহিত্যে অগণিত ছড়া রচিত হইয়াছে, শিশু সম্পর্কিত ছড়ার তুলনায় ইহাদের সংখ্যা অনেক বেশি। পারিবারিক জীবনে ছড়াগুলি নারীর ঘরকন্না রান্নাবাড়ার বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বশুর শাশুড়ী ননদ, জা প্রভৃতির সঙ্গে তাহার সম্পর্কের কথা লইয়া রচিত।'

ডঃ ভট্টাচার্য একই ছড়ার বিভিন্ন পাঠ বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন অঞ্চলে যে প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন; 'ইহাদের মধ্যে যে পরির্বতনের ধারাটি অনুসরণ করা যায়, তাহা স্বেচ্ছাচার প্রসূত নহে বরং মনোবিজ্ঞান সম্মত। আমরা পূর্বেই এর সমাজতাত্ত্বিক কারণটি নির্দেশ করেছি।

লেখক তাঁর সংগ্রহে যেমন চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি অঞ্চলের প্রচলিত ছড়াকে স্থান দিয়েছেন, তেমনি বর্ধমান, ২৪ পরগণা, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলেরও বহুসংখ্যক ছড়া সংকলিত হয়েছে। কিন্তু যে অঞ্চলের ছড়া অত্যন্ত সীমিত সংখ্যায় গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তা হল উত্তরবঙ্গ। এর কারণ অবশ্য লেখকের জবানিতেই জানা যায়, 'উত্তরবঙ্গের ছড়া পত্র পত্রিকায় ইতিপূর্বে যেমন প্রকাশিত হয় নাই, তেমনই আমি নিজে অনুসন্ধান করিয়াও এই বিষয়ে বিশেষ কৃতকার্য হই নাই।'

ডঃ ভট্টাচার্য 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লোক সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কেন সর্বপ্রথম ছড়াকে তাঁর আলোচনার পুরোভাগে স্থাপন করেছেন তার কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'শিশুসাহিত্যই সাহিত্যের প্রাচীনতম বিষয় বলিয়া

অনুমান করা ভুল হয় না; কারণ শিশুই পরিণত বুদ্ধি মানবের অগ্রজ।' অতত্রব লেখকের স্থির সিদ্ধান্ত, 'বাংলার লোক সাহিত্যেও ছড়ারই যে সর্বপ্রথম উদ্ভব হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়।'

লিখিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে [Written Literature] আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে সেখানে প্রথমে পদ্যের আবির্ভাব ঘটেছিল, গদ্য এসেছিল অনেক পরে। সাহিত্যের রাজসভায় গদ্য নব আগন্তুক। কবিগুরুর ভাষায়ঃ

পদ্য হল সমুদ্র ;
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কল কল্লোলে।
গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।

মৌখিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও [Oral Literature] এই একই সত্যের প্রতিফলন ঘটেছিল। বাংলা লোক সাহিত্যের সকল বিভাগের মধ্যে ছড়ার রাজ্যেই ছন্দের রাজকীয় আধিপত্য। তাই কেবল শিশুর সঙ্গে ছড়ার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, মানুষের স্বাভাবিক প্রবণ-তার বিচারেও ছড়ার আবির্ভাব ঘটেছিল প্রথমে। মানুষ তার অন্তরের ভাবরাজিকে ছন্দোবদ্ধভাবে প্রকাশ করতেই প্রথম প্রেরণা লাভ করে। অনন্ত বিশ্বের সর্বত্র এই ছন্দের লীলা বিদ্যমান। আর মানুষ যেহেতু অনন্ত বিশ্বেরই এক অংশ, তাই তার পক্ষেও ছন্দের প্রভাবকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

বর্তমানে বাংলা লোক-সাহিত্য গবেষণায় যাঁরা ব্রতী, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ডঃ দুলাল চৌধুরী। ডঃ চৌধুরী বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিগত কয়েক বৎসর ধরে লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করলেও লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আমাদের বর্তমান আলোচ্য প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে লেখকের পক্ষে এ হেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভবপর ছিল না প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল। পূর্ণাঙ্গ একটি গবেষণার বিষয়কে একটি প্রবন্ধে স্থান দিলে সেই আলোচনায় অসম্পূর্ণতা থাকবেই। এক্ষেত্রেও লেখক বিষয়টির ব্যঞ্জনাটুকুই দান করেছেন, কিন্তু বিস্তৃত উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনাটিকে সম্পূর্ণতা দান করেন নি। লেখক নিজেও স্বীকার করেছেন ঃ

'সমাজ ব্যবস্থার আরও কত বিচিত্র খণ্ড চিত্র বিভিন্ন অঞ্চলের ছড়ার মধ্যে ছড়িয়ে আছে তার অন্ত নেই।' তবু বাংলা ছড়াগুলি অবলম্বনে লেখক বাংলার সামাজিক জীবনে মা—মাসী—পিসি প্রভৃতির স্থান ও তার মূলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব, প্রাচীনকালে গৌড়ের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য, বাংলার প্রসিদ্ধ কুটির শিল্প 'শীতল পাটি', বয়ন শিল্পের উৎকর্ষ, প্রাচীনকালে বাংলাদেশের অন্যতম অন্ত্যজ শ্রেণী ডোমদের শৌর্যবীর্য, বর্গীদের হাঙ্গামা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

বাংলা ছড়া চর্চায় ডঃ ভবতারণ দত্ত সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'বাংলা দেশের ছড়া' [১৩৭৭] গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম-বঙ্গে এযাবৎকাল প্রচলিত ছড়া সঙ্কলনগুলির মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থটিকে অন্যতম সুসম্পাদিত ছড়ার সঙ্কলন বলে অভিহিত করা চলে। সঙ্কলনটিতে চট্টগ্রাম, চব্বিশ পরগণা, পশ্চিম দিনাজপুর, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, সাঁওতাল পরগণা এবং হুগলী—এই কয়টি জেলায় বাংলা ভাষায় প্রচলিত পাঠান্তর ব্যতীত ৮৭২টি ছড়া এবং ধাঁধা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

ভাব, প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সম্পাদক ছড়াগুলিকে প্রধানতঃ ছেলেভুলানো এবং এবং বিভিন্ন খেলায় ব্যবহৃত এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এছাড়া ধাঁধাগুলিকে ছড়ার অন্তর্ভুক্ত করে একটি পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলতে হয়

যে, যদি ধাঁধাগুলিকে ছড়ার অন্তর্ভুক্ত না করে পৃথকভাবে প্রকাশ করা হত, তাহলেই বোধহয় অধিকতর সঙ্গত হত। একথা ঠিক যে ছড়ার ন্যায় ধাঁধাও অনেক সময় ছন্দোবিশিষ্ট একাধিক পদ সমন্বিত হয়। কিন্তু তাই বলে ধাঁধাকে ঠিক ছড়ার অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত হয় না। কারণ ধাঁধার নিজস্ব এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যে কারণে ছড়ার সঙ্গে তার পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। ধাঁধা পরিণত বুদ্ধি মানুষের রচনাই শুধু নয়, এর একটা সুচিন্তিত উত্তর নির্দিষ্ট থাকে। সর্বোপরি সাহিত্যিক মূল্যে ধাঁধা অপেক্ষা ছড়ার দাবীই অধিক। ধাঁধায় মোটামুটিভাবে প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করে চলতে হয়, কিন্তু ছড়ার ক্ষেত্রে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

সম্পাদক অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, 'বিভিন্ন খেলায় ব্যবহৃত ছড়াগুলির আবৃত্তিতে আরও একটু পরিণত মনের প্রয়োজন হয় এবং এগুলির আবৃত্তি বালক বালিকারা নিজেরাই করে। ফলত, পাঠান্তরও বেশী পাওয়া যায়।' অর্থাৎ তাঁর মতে ছেলেভুলানো ছড়াগুলির পাঠান্তর যে কম তার প্রধান কারণ—এগুলি বালক-বালিকারা নিজেরা আবৃত্তি করেনা তাই। অথচ বাস্তবত একই ছেলে ভুলানো ছড়ার বহু পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। আসলে পাঠান্তরের জন্য বিশেষ ভাবে শিশুকে দায়ী করলেই চলবে না। পাঠান্তরের ক্ষেত্রে পরিণত বয়স্কদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। পাঠান্তর নির্ভর করে ব্যবহারের বিস্তৃতির ওপর। যে ছড়াটি নিজস্বগুণে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, সেটি অনেকের দ্বারাই ব্যবহৃত হতে থাকে। এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পায়, সেগুলির পাঠান্তরের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ স্বরূপ 'ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি' ছড়াটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি যদিও বয়স্কদের ব্যবহারোপযোগী ছড়া, তবু এটির পাঠান্তরের সংখ্যা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থের শেষাংশে 'টীকা' পর্যায়ে সম্পাদক কোন ছড়াটি কোন সূত্র থেকে সংগৃহীত এবং ছড়া বিশেষের পাঠান্তরের উল্লেখ করেছেন। এরপর সংযোজিত হয়েছে 'দুরূহ শব্দার্থ'। এই অংশে সঙ্কলিত ছড়াগুলি থেকে দুরূহ শব্দাবলীর অর্থ প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য শব্দার্থগুলি মৌলবী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদকৃত। এরপর প্রতিটি ছড়া ও ধাঁধার প্রথম ছত্রের সূচি সংযোজন করেছেন সম্পাদক, যা সহজেই পাঠককে নির্দিষ্ট ছড়া বা ধাঁধার সন্ধান লাভে সহায়তা করে। সবশেষে 'নির্ঘণ্টে' ছড়াগুলিতে ব্যবহৃত আদরের ডাক, প্রসাধন দ্রব্য, বাদ্য, গাছপালা, ফুল, জীব জন্তু, পক্ষী ও পতঙ্গ, মাছ, বিকৃতরূপ প্রাণী, ব্যক্তি বিশেষের নাম, স্থান বিশেষের নাম, কয়েকটি জায়গা, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সাংসারিক দ্রব্য, সম্পর্ক নির্দ্ধারক শব্দ, তরীতরকারী এবং খাদ্যদ্রব্যের নামের তালিকা পৃথক পৃথক ভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন লেখক। গ্রন্থটির ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'শ্রেণীবিভাগের দুরূহতা স্মরণে রেখে সঙ্কলয়িতা এই সংগ্রহে ছড়াগুলিকে শ্রেণী' বিভক্ত করেননি। গ্রন্থে সঙ্কলিত ছড়াগুলি বিষয়বস্তু নির্বিশেষে বর্ণমালার ক্রম-পরম্পরায় স্থান লাভ করেছে। কিন্তু এইটিই গ্রন্থটির একটি মস্ত ত্রুটি। এমন একটি ছড়ার সঙ্কলন বিষয় অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া উচিত ছিল। এইবার গ্রন্থটির অন্য একটি দিক্ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে—সেটি হল গ্রন্থটির ভূমিকাংশ।

স্বনামধন্য ডঃ সুকুমার সেনের দীর্ঘ ও মূল্যবান ভূমিকাটি কেবল যে আলোচ্য গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে তাই নয়, সেই সঙ্গে ছড়া সাহিত্য সম্পর্কে ডঃ সেনের মূল্যবান আলোকপাত বিশেষ ভাবে আকর্ষণীয় হয়েছে। ডঃ সেন 'শিশু বেদ' শীর্ষক ভূমিকাংশে তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে শুষ্ক পাণ্ডিত্যের নীরসতা থেকে মুক্ত হয়ে ছড়া সম্পর্কে কিছু নূতনতথ্য প্রকাশ করেছেন। প্রথমেই তিনি ছড়াকে বেদের পর্যায়ভুক্ত করে ছড়াগুলির

উপযুক্ত মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'যে রচনা কোন ব্যক্তি বিশেষের তৈরী বলে নির্দিষ্ট করা যায় না, যা কোন এক মানব গোষ্ঠীকে প্রায় অনাদিকাল ধরে জন্মে-কর্মে-চিন্তায় নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে তাকে যদি বেদ নাম দিয়ে থাকি তবে অপৌরুষেয় ছেলেমি ছড়া গান গল্পকে শিশু বেদ বললে বোধ করি খুব অসঙ্গত হয় না। ...শিশু বেদ হল মানুষের আদিম "সাহিত্য" যা পরবর্তী সাহিত্যের কোন ভাষায় কিছু উদ্ভূত হয়ে থাকলে বীজ। · শিশু বেদ বয়স্কের সাহিত্য ভুবন ধরে আছে বাসুকির মতো। শিশু-বেদের মধ্যে ধরা রয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্ম পত্রিকা।'

ডঃ সেন ছড়াগুলিকে সম্পূর্ণ নবতর পর্যায়ে বিভক্ত করার পক্ষপাতী। তাঁর ভাষায়, 'শ্রোতার বয়স এবং বক্তার অথবা শ্রোতার অথবা উভয়েই প্রয়োজন অনুসারে ছেলেমি ছড়াকে তিন শ্রেণীতে ফেলা যায়—ঘুম পাড়ানি, মন ভোলানি ও খেলা-চালানি।' কিন্তু ছড়ার এবং বিধ শ্রেণীবিন্যাস কতখানি যুক্তি-সঙ্গত সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ এই তিনটি বিভাগের বাইরেও অনেক ছড়া আছে--যেমন ঐন্দ্রজালিক ছড়া, ব্রতের ছড়া ইত্যাদি। এছাড়াও 'ঘুম পাড়ানি' ছড়াকেও 'মন ভোলানি' ছড়ার অন্তর্ভুক্ত করতে কোন অসুবিধা দেখা যায় না। কারণ শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য তার মনকেই জয় করতে হয় প্রথমে, বহির্জগৎ থেকে শিশুর মনকে ভুলিয়ে নিদ্রার জগতে প্রেরণ করতে হয়।

পরিশেষে ডঃ সেনের ছড়া কথাটির ব্যুৎপত্তিগত আলোচনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষাতাত্ত্বিকের বক্তব্য হল, 'ছড়া শব্দটি পুরানো, কিন্তু এ অর্থে নয়। কবিতা, কবিতাছত্র, কবিতা-ছত্রাংশ অর্থে শব্দটির ব্যবহার উনবিংশ শতাব্দীর আগে পাই নি! তবে লোক ব্যবহারে এ অর্থ ছিল সন্দেহ নেই।

সাধারণ লোক গদ্য জানত না, 'পদ্য' শব্দও অপরিচিত ছিল। মঙ্গল-গান, পাঁচালি, যাত্রা, কথকতায় গদ্য কিছু থাকলে তা শুধু গায়েন কথকদের মন্তব্যে, সুতরাং তা সাধারণ শ্রোতার মনোযোগ টানত না। যা টানত তা হল গান আর কবিতাছত্র, অথবা কবিতা ছত্রের অংশ আবৃত্তি। এই শেষোক্তই "ছড়া"—শব্দটির দুই প্রতিষ্ঠিত অর্থে। [১] প্রকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো ; [২] গ্রথিত গাঁথা-মালা তারপরে অর্থ হল ছুটকো ছন্দময় রচনা।'

"উষা ও প্রভাত যেমন একই প্রাতঃ সন্ধ্যার দুইরূপ, তেমনই একই মায়ের দুটি রূপ ফুটে উঠেছে বাংলার ব্রতে ও ছেলেভুলানো ছড়ায়। ব্রতে সন্তান কামনায় উন্মুখ মায়ের ব্রতচারিণী মূর্তি। এ যেন সূর্যোদয়ের পূর্বে শুভ্রজ্যোতি পূর্বাশার তপস্যা। এই তপস্যার ফলে ক্রমে অরুণ আভা জাগে, বাল সূর্য উদিত হয়। তখন আলোয় উদ্ভাসিত কলকাকলিতে মুখরিত প্রভাত। এইটেই ছড়ায় জননীমূর্তি।" —অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে মা' গ্রন্থে [১৯৭৩] বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঙ্গ জননীকে আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়ে বাংলা ছড়ায় যেভাবে এই জননী মূর্তিটি সংরক্ষিত রয়েছে তাকে দৃঢ় পিনদ্ধ ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করেছেন 'ছেলে ভুলানো ছড়ায় মা' শীর্ষক নিবন্ধটিতে।

সাধক দীর্ঘ সাধনার শেষে যখন তার ঈপ্সিত ধনের সন্ধান লাভ করেন, তখন হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে সোচ্চার কণ্ঠে তাঁর সেই পরম প্রাপ্তির কথা বিশ্বচরাচরের কাছে ঘোষণা করেন। অনুরূপ ভাবে ছেলেভুলানো ছড়াগুলি মূলতঃ সৌভাগ্যবতী বঙ্গজননীর মাতৃত্বের অভিব্যক্তি। বৃক্ষের পরিপূর্ণতা যেমন ফুল ও ফলের সৃষ্টিতে, অনুরূপভাবে নারীজীবনের চরম সার্থকতা মাতৃত্বে। আপাত দৃষ্টিতে সন্তানের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এই ছড়াগুলি রচিত বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি সন্তান গরবে গরবিনী জননীর আনন্দোচ্ছ্বাস। কিংবা বলা যায়, অপত্য স্নেহে সিক্ত ছড়া হল

বাৎসল্য রসের আধার—আর এগুলি রচনার উদ্দেশ্য হ'ল শিশু দেবতার মনোরঞ্জন রূপ পূজা। তাই রূপকথায় মায়েদের অনেক সময়ে আমরা বিষাদ-মলিন যে রূপটির সাক্ষাৎ পাই, ছড়ায় সেই মলিনতার লেশমাত্র অনুপস্থিত। এখানে বঙ্গজননীর হাস্যোজ্জ্বল গরবিনী রূপ—'ছড়া পরিতৃপ্ত মাতৃত্বের উল্লাস, যেন চন্দ্রোদয়ে স্ফীত তটিনীর কলোচ্ছ্বাস' [পৃঃ ২৫]।

লেখক ছড়ায় চিত্রিত জননী মূর্তিকে অঙ্কিত করে বলেছেন ঃ 'সাধারণত বাঙালী মায়ের মূর্তি দুঃখিনী মূর্তি। কিন্তু ছড়ার মাতৃ-মূর্তি কৌতুকময়ী ও হাস্যোজ্জ্বল। মা এখানে পূর্ণকাম ও পরিতৃপ্ত। বুক জুড়ানো ধনকে নিয়ে তিনি উল্লসিত, উচ্ছলিত ও ধন্য। পরিতৃপ্ত জননীর এই হাসিভরা মুখখানি ছড়ার দর্পণে প্রতিবিম্বিত' [পৃঃ ২১]।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন বাংলার ব্রতে বঙ্গজননীর শিল্পীসত্তার পরিচয়টি বিধৃত, অনুরূপভাবে ছড়ার মাধ্যমে বঙ্গ জননীর কল্পনাময়ী রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তার সুর স্রষ্টার মহিমান্বিত পরিচয়টিও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বস্তুত, 'ছড়ার মা ছন্দের রাণী, সুরের সম্রাজ্ঞী। আনন্দ ও সোহাগ এখানে ছন্দে ও সুরে সুরেলা।'

পূর্ণ মনস্কাম, পরিতৃপ্ত জননীর হাস্যকরোজ্জ্বল চিত্রটি ছড়ার রাজ্য থেকে উদ্ধার করে উপহার দানের জন্য বাঙ্গালী পাঠক মাত্রই অধ্যাপক চক্রবর্তীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে নিঃসন্দেহে। যে জননীর সঙ্গে আমাদের প্রতি মুহূর্তের পরিচয়, সেই অতি পরিচিত রূপটিকেই তিনি যুক্তিতর্কের মাধ্যমে উপস্থিত করে আমাদের পরিচিতিকে সুদৃঢ় ভিত্তি ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছেন।

বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় বিরচিত 'বাঙলার গ্রাম্যছড়া' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থটিতে সর্বমোট ১৭টি গ্রাম্য ছড়া সঙ্কলিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরি, গোপাল নাচানো, কৃষ্ণকালী, গোষ্ঠ, রাধাকৃষ্ণের রাস, মানভঞ্জন,

বিরহ, আগমনী, হর পার্বতীর কোন্দল, গাজন ইত্যাদি। এই ধরণের গ্রাম্য ছড়ার সংকলন এ পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্যে' এই ধরনের কিছু ছড়া খণ্ডিত অবস্থায় স্থান পেয়েছে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের সংকলক তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধে কাহিনী ভিত্তিক দীর্ঘাকৃতির ছড়াগুলির বিষয় বস্তু, জনপ্রিয়তা, রচনারীতি, ছন্দ, নাটকীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু 'পূর্বকথা'য় প্রকাশিত তাঁর মন্তব্য 'পূর্বগামীদের সংগ্রহ যতদূর সম্ভব, দেখার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের পর আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে সাহিত্য—পরিষৎ পত্রিকায় ডাঃ মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য এবং ব্রজস্থন্দর সান্যাল দু'টি ছড়া বের করেছিলেন। ......আর কারুর মৌলিক সংগ্রহ নজরে পড়ে নি।" —বাংলা ছড়া সম্পর্কে এই বক্তব্য যথার্থ নয় স্বীকার করতে হয়। আমাদের 'ছড়া-চর্চার ইতিহাসে'ই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবে লেখকের সংকলন গ্রন্থটির গুরুত্ব দ্বিবিধ কারণে—ডাঃ স্থকুমার সেনের ভাষায়, 'এই সংকলনটি টাটকা গ্রাম্য ছড়া। এগুলিতে বিষয়ের গৌরব নেই, ভাষার ছটা নেই, ছন্দের বাঁধুনি নেই, কাব্য রস নেই তবু এগুলি মূল্যহীন নয়।' কিন্তু সংগৃহীত ছড়ার বিষয় মূল্য ব্যতিরেকে গ্রন্থে সংযোজিত সতেরটি ছড়ার টীকা—অংশটি গ্রন্থটির মর্যাদাকে বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছে। এই অংশে সংকলক ছড়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা, ছড়ায় প্রকাশিত কাহিনীর সঙ্গে সেই সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য, ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ বিশেষ অংশের পাঠান্তরের উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থে সংকলিত ছড়াগুলি অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণ এবং শিব দুর্গা সম্পর্কিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—আমাদের দেশে কৃত্তিবাসী রামায়ণের দৌলতে রামকাহিনী বহুল

পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও 'কৃষ্ণকাহিনী' এবং 'শিব কথা'ই বিশেষভাবে স্থান লাভ করেছে। আচার্য ডাঃ সুকুমার সেন অবশ্য এর কারণ বিশ্লেষণ করে যথার্থই বলেছেন, "কৃষ্ণ-কাহিনী ও শিবকথা বাংলা-দেশে যত দীর্ঘকাল ধরে জনসমাজে প্রচলিত আছে রূপকথা ততদিন নয়। রামকথার প্রচার হয়েছিল আনুমানিক ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে এবং তাও পণ্ডিত সমাজে ও রাজসভায়। লোকে রাম-সীতার নাম জানত এই পর্যন্ত।"

রবীন্দ্রনাথ এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, "রামায়ণ কথায় একদিকে কর্ত্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য, একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্যের যত প্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয় বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রকার হৃদয় বৃত্তিকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যে নাই। বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য।"

বাংলাদেশে স্বল্পায়তন বিশিষ্ট ছেলেভুলানো এবং নানাবিধ খেলার ছড়ার প্রাচুর্য যেমন, সেই পরিমাণে কিন্তু কাহিনী ভিত্তিক দীর্ঘ গ্রাম্য ছড়ার সংখ্যা নিতান্তই সীমিত। এর প্রথম এবং বোধ করি প্রধান কারণ আয়তন্। কারণ ছেলেভুলানো জাতীয় ছড়া সহজেই স্মৃতিতে ধরে রাখা যায়। কিন্তু সে তুলনায় কাহিনী ভিত্তিক দীর্ঘ ছড়া প্রখর স্মৃতিশক্তি ব্যতীত মনে রাখা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়তঃ ছেলেভুলানো জাতীয় ছড়া আনুপূর্বিক মুখস্থ করারও তেমন বাধ্যবাধকতা ছিল না। অনেক সময়ে শ্রোতা নিজেও সাধ্যমত স্বরচিত অংশ যুক্ত করে দিত। এক্ষেত্রে প্রয়োজন

ছিল শুধু ছন্দ রক্ষার। কারণ অর্থহীন শব্দের ব্যবহারেও এই জাতীয় ছড়ায় কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু কাহিনী ভিত্তিক ছড়ায় আনুপূর্বিক মুখস্থের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্বরচিত অংশের সংযোজনের জন্য বিশেষভাবে ক্ষমতার দরকার যা অনেকেরই থাকে না। সঙ্কলক যথার্থই অভিমত প্রকাশ করেছেন 'ছেলেভুলানো ছড়ার পরমায়ু গ্রাম্য ছড়ার চেয়ে দীর্ঘই হবে।'

অধ্যাপক ডঃ শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় বর্তমানে মূলতঃ শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ের আলোচনায় খ্যাতি অর্জন করলেও এক সময়ে ছোট গল্পকার ও প্রাবন্ধিক হিসাবে যথেষ্ট জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'বাংলা পড়ানোর নূতন পদ্ধতি' [পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৭৬] গ্রন্থটি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত হলেও লোক-সাহিত্যের কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিভাগ বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা সংযোজিত হওয়ায় আমাদের আলোচনায় গ্রন্থটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল।

বাংলা ছড়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী এবং অন্যান্য আরও অনেকেই আলোচনা করেছেন। এই সকল আলোচনায় বাংলা ছড়ার কবিত্ব, চিত্রধর্মিতা, সমাজ চিত্র, ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি নানা বিষয় স্থান লাভ করেছে। কিন্তু ডঃ সুধীরচন্দ্র রায় লিখিত 'ছড়ায় কি বিষয় আছে' নিবন্ধটি ছড়া সম্পর্কিত এ যাবৎকাল রচিত ও আলোচিত বিষয়গুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শিক্ষকতার কার্যে ছড়া সম্পর্কে কিরূপ প্রয়োগ রীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন, লেখক সেই প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনার সূত্রপাত করলেও শেষ পর্যন্ত বাংলা ছড়া রচনার মনস্তত্ব ও ব্যাকরণ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় বর্তমান নিবন্ধটি পর্যবসিত হয়েছে।

ছড়ার সঙ্গে শিশুর যোগ খুব নিবিড়। কারণ প্রায় প্রতিটি

ছড়ার কেন্দ্রবিন্দুই হল শিশু। কিন্তু তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে ছড়া রচয়িতারা কেউই শিশু নয়, বরং তারা সকলেই পরিণত বয়স্ক মানুষ। শুধু তাই নয়, ছড়ার বিষয় বস্তুও অনেক ক্ষেত্রেই শিশুর বোধগম্য নয়। তবু শিশু যে ছড়ার রস আস্বাদন করে, তার মূলে যত না থাকে ছড়ার ভাববস্তুর প্রভাব, তার থেকে বেশি কার্যকরী হয়, 'ছড়া যিনি বলেন তাঁর মুখ-ভঙ্গিমা, বক্ষের উত্তাপ, চক্ষুর স্নেহ—নির্ঝর দৃষ্টি এবং শারীরিক অনুভূতির অনুভাবনা।'

এ গেল ছড়ার উপলক্ষের দিক, এইবার ছড়া রচনার আসল উদ্দেশ্যটি কি দেখা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

'শিশু কিছু না-ই বা বুঝুক, নিজের বোবা ভাবটা তো কেটে যায়। এ ভাবে দেখলে কখনো মনে হয় না যে, ছড়াগুলো শিশুর স্তব। রুদ্ধ আবেগ শিশুকে অবলম্বন করে বেরিয়ে যায় মাত্র!'

প্রাত্যহিক জীবনে নানা প্রতিকূলতায় নারী জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে, অথচ নিজের দুঃখ বেদনা বা অনুযোগ জানাবার কোনও উপায় নেই। ছড়াগুলি যেন অভিমান বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে পরোক্ষভাবে প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। লেখক সেইজন্য মন্তব্য করেছেন :

'ছড়াকে লৌকিক সাহিত্য বলা যায় না, কিন্তু লৌকিক সাহিত্য তার কাঠামো। ছড়াকে নিতান্তই মেয়েদের গার্হস্থ্য সাহিত্য বলা যায়। গার্হস্থ্যের যেটুকু মেয়েদের সুকুমার মনটির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে সেইটুকুর উপর স্নেহের প্রলেপ ঘটিয়েই এর রচনা।'

কিন্তু লেখকের এই মন্তব্য পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। প্রথমতঃ ছড়াগুলিকে লৌকিক সাহিত্য পদবাচ্য না করলে ত্রুটি থেকে যায়। ছড়াগুলির রচয়িতা কে তার কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ

আমরা পাই না। সংহত সমাজেই যে ছড়াগুলির সৃষ্টি হয়েছিল, একথা অস্বীকার করার মত যুক্তি নেই। দ্বিতীয়ত, ছড়াগুলিকে যে লেখক 'মেয়েদের গার্হস্থ্য সাহিত্য' বলে অভিহিত করেছেন, তাতে ছড়া সম্পর্কে আংশিক সত্য প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। তাবৎ ছড়াকে আমরা তাই বলে লেখক কথিত অভিধায় অভিহিত করতে পারিনা। খেলা সম্পর্কিত ছড়াগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ছড়া রচনার পরিবেশ সম্পর্কে লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন ঃ

'ছড়া বোধ হয় কেবল গ্রামীণ পরিবেশেই রচিত হয় নি। ছড়া যে কেবল গ্রামেই হবে এমন কোন কথা নেই।' এই প্রসঙ্গে লেখক যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, তা বেশ দুর্বল এবং গ্রহণযোগ্য নয় বলেই স্বীকার করতে হয়—'এখনও প্রায় প্রচুর গ্রাম আছে আর গ্রামের মা-মাসিরাও বহাল তবিয়তেই আছেন, তবু তাঁদের মুখে এখন ছড়া হয় না। আরও একটা কথা এই যে, ঠাকুরমার মুখে আমরা গল্প বা 'শাস্তর' শুনতে পেলেও ছড়া শুনতে পাই না ; ওটা যেন বেমানান।'

শহরের তুলনায় গ্রামের জীবন যে অনেক বেশি সংহত তা আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। আর লোক সাহিত্য যেহেতু সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যষ্টি মনের সচেতন প্রয়াস সৃষ্ট রচনা নয়, এই কারণেই ছড়াগুলি গ্রামীণ পরিবেশে রচিত হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য তাই বলে ছড়ায় যে সব সময় গ্রামীণ পরিবেশটি প্রতিফলিত হবে বা হয়েছে তা স্বীকার করা যায় না। সেই সংগে একথাও বলা প্রয়োজন যে অনেক গ্রামের মা-মাসীরা যেহেতু ছড়া বলেন না তাই সেই যুক্তিতে ছড়াগুলির সৃষ্টি গ্রামীণ পরিবেশে হয়নি—এমন যুক্তি গ্রাহ্য হতে পারেনা এই কারণে যে সর্বোপরি লোক সাহিত্যও সাহিত্য। কেবলমাত্র পরিবেশই তো আর সাহিত্য সৃষ্টির একমাত্র অবলম্বন নয়, রচনা শক্তি তথা

কবি প্রতিভারও প্রয়োজন। সব মা-মাসীই যে প্রয়োজনীয় কবিত্ব শক্তির অধিকারী হবেন, এমনটা আশা করাই অন্যায়। এর ওপর বিশেষ বিষয়ে আকর্ষণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। আর ঠাকুরমার মুখে ছড়া শোনা যায় না কিংবা তা বেমানান—এও তেমন যুক্তি প্রতিষ্ঠিত অভিমত নয়। এমন অনেক ঠাকুমা বা ঠাকুমা স্থানীয়া বয়স্কা মহিলা দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা অনর্গল ছড়া বলে যান।

এ পর্যন্ত গেল ছড়া সম্পর্কিত লেখকের রচনার একটা দিক, অপর দিক হল—বাংলা ছড়ার ভাষা ও ব্যাকরণগত আলোচনা। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে লেখককে নির্বাচিত কিছু সংখ্যক ছড়াকে অবলম্বন করেই আলোচনা করতে হয়েছে ও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে। এই ক্ষেত্রটিতে লেখকের যে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, আমরা তাকে বাংলা ছড়া সম্পর্কিত আলোচনায় সম্পূর্ণ অভিনব সংযোজন রূপে অভিহিত করতে পারি। বাংলা ছড়ার নানা দিক নিয়ে এ পর্যন্ত বহু আলোচনা হলেও ছড়াগুলির ভাষা-তাত্ত্বিক আলোচনা বর্তমান লেখকের আগে কেউই করেন নি। অতএব বাংলা ছড়ার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় বর্তমান লেখককে পথিকৃতের স্থান দিতে হয়। লেখক তাঁর আলোচনায় মোট ষাটটি ছড়াকে বিশ্লেষণ করে বাংলা ছড়ার ভাষাতাত্ত্বিক দিক নিয়ে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন। লেখক প্রদত্ত হিসাবটির উল্লেখ এক্ষেত্রে বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবেনা—

নামপদ	৫২%
ক্রিয়া পদ	৩০'৭০%
বিশেষণ	৭'২১%
সর্বনাম	৬'২২%
ক্রিয়া-বিশেষণ	'৬১%
ধ্বন্যাত্মক	১'০৫%
দ্বিত্ব প্রয়োগ	১'২৩%
অব্যয়	১'০৬%

প্রদত্ত চিত্র থেকে বোঝা যায় বাংলা ছড়ায় সর্বাধিক প্রাচুর্য হল নামপদের। আর তার পরেই ক্রিয়া পদের স্থান। ভাষা তাত্ত্বিক দিক নিয়ে বাংলা ছড়া রচনার কাল নির্ণয় করতে গিয়ে লেখক এগুলি পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তীকালের রচনা নয় বলে সিদ্ধান্তে পোঁচেছেন। আবার পরিবেশগত শব্দে বাংলা ছড়া যে ইংরেজী সভ্যতার যুগে রচিত হয়েছিল, তারও সুস্পষ্ট প্রমাণের উল্লেখ করেছেন। ক্রিয়া বিশেষণ, বিশেষণ, 'ইতে', 'ইয়ে' প্রভৃতির যোগে দ্বিত্ব করে শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা থেকে এবং সর্বোপরি উচ্চারণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ছড়ায় বাংলা ভাষার আদি রূপটি স্থান পেয়েছে বলে লেখক মন্তব্য করেছেন। বাংলা ছড়ায় পারিবারিক সম্পর্ক যুক্ত, সামাজিক সম্পর্ক যুক্ত, বিভিন্ন প্রকারের আসবাবপত্র, মাছ, জীবজন্তু, অন্যান্য শ্রেণীর প্রাণী, পোশাক, যাতায়াত সংক্রান্ত, সাজসজ্জার বিভিন্ন উপকরণ, বাজনা, গাছ ও শাক, ধান শস্য ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যাদি, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বয়স, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অনুষ্ঠানপর্ব সম্পর্কিত যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তারও একটি সুনির্বাচিত তালিকা রচনাটিতে সংযোজিত হয়েছে। বাংলা ছড়ার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় লেখকের সুগভীর পাণ্ডিত্য, মননশীলতা ও গভীর পরিশ্রমের প্রমাণ পাওয়া যায়। পরিশেষে আধুনিক কবিদের সযত্ন প্রয়াসে রচিত সাহিত্যিক ছড়াগুলির বিশেষত্ব সম্পর্কেও লেখককে আলোকপাত করতে দেখা গেছে।

বাংলা ধাঁধা-চর্চার ইতিহাস

বাংলার লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের ন্যায় ধাঁধাও বেশ বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ। অথচ উল্লেখযোগ্য যে, ধাঁধা দীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষিত হয়ে থেকেছে। প্রথিতযশা লোক-সংস্কৃতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ধাঁধা সম্পর্কে আমাদের অনীহার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ইহার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ছড়া, গান এবং কথা সম্পর্কে তাঁহার যে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা প্রকাশ পাইয়াছে, ইহার সম্পর্কেও যদি তাহা প্রকাশ পাইত, তবে তাহা দ্বারা বাঙালী সংগ্রাহক এবং সমালোচক অনুপ্রাণিত হইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়াই, ইহার প্রতি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি যথাযথ আকৃষ্ট হইতে পারে নাই।'

ডঃ ভট্টাচার্যের প্রদর্শিত যুক্তি—ধাঁধা সম্পর্কে সংগ্রাহক ও সমালোচকদের অনীহার অন্যতম কারণ হলেও এইটাই একমাত্র কারণ নয়, বলা চলে। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশে ধাঁধাকে যে উপেক্ষা করে আসা হয়েছে, তার প্রতি যে প্রয়োজনীয় মনোনিবেশ করা হয়নি, তার কারণ ছড়া, প্রবাদ, লোককথা কিংবা লোকসংগীতকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখেছি, ধাঁধাকে সে দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। নিছক বালখিল্যদের অর্থহীন ব্যাপার বলেই একে অবজ্ঞা করে আসা হয়েছে। প্রবাদ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে সহায়তা করে। কর্তব্য নির্দ্ধারণে ত বটেই, তাছাড়া সার্থকভাবে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রেও প্রবাদের ভূমিকা ছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রবাদকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। লোক সংগীতও আমাদের সংহত সমাজের পূজা-পার্বণের সংগে যুক্ত, দৈনন্দিন নানা ব্যবহারিক ক্রিয়া কলাপের সংগে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, তাই লোক সংগীতও তার বাঞ্ছিত মর্যাদা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

ছড়া মুখ্যতঃ শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হলেও এবং ছড়ার জগতের একচ্ছত্র অধিপতি শিশুরা হলেও বেশ কিছু ছড়া বয়স্কদের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই রচিত। এমন কি শিশুদের জন্য রচিত ছড়াও বয়স্কদের নানা প্রয়োজন সিদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক, তাই ছড়াও তার ন্যায্য মর্যাদা লাভ করেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ধাঁধা। অথচ প্রাচীনকালে ধাঁধার ব্যবহারিক উপযোগিতা লোক সাহিত্যের অন্যান্য উপাদানের তুলনায় কম তো ছিলই'না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশিই ছিল স্বীকার করতে হয়।

For it is obvious that the solving of riddles was a technique anciently and primitively employed at times of crisis or on occasions when fate of some one or even a whole tribe hung in the balance. Rain making, grain growing and harvesting, circumcision, wedding, funerals and buryings, all these were critical times. [১]

লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের তুলনায় ধাঁধা যে সাহিত্য শ্রীথেকে মুক্ত তা নয়, বরং বহু যুগের চিন্তা ও অধ্যবসায়ের ফলে সৃষ্ট ধাঁধায় সার্থক শিল্পরূপ সহজেই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তবু পরবর্তীকালে নিছক পরিহাস রসিকতা ও অবসর বিনোদনের অন্যতম উপকরণ হিসাবেই ধাঁধার ব্যবহার হয়ে এসেছে। আসলে মনে হয়, যে আদিম মন ধাঁধা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল, সেই মন তথাকথিত সভ্যতায় পরিবর্তিত হওয়ার ফলেই ধাঁধা সম্পর্কে নিরাসক্ত হয়ে পড়ে। প্রসংগত ধাঁধার উৎপত্তি বিষয়ে পাশ্চাত্য সমালোচকের মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে—

From older times, as an early exercise of the primitive mind in its adjustment to the world about it, comes the riddle........The fesher the

vision, when the world was young, so much keener was the interest in the phenomena of nature, in the phenomena of life, and in the simple institution which surrounded man. All harmonies and fitness, all discrepancies and inconsistencies attract the notice of children and children like man. [২]

মানুষ তার শিশুসুলভ দৃষ্টিভংগী তথা মানসিকতা হারিয়ে ফেলার পরিণামেই ধাঁধা তার প্রাপ্য মর্যাদা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে বললে বোধ করি অন্যায় না। অথচ প্রবাদ কিংবা ছড়ার মতই ধাঁধাও একটা সংহত সমাজের নিজস্ব আচার আচরণ, ব্যবহার রীতি নীতির সার্থক পরিচয়বাহী রূপে, সর্বোপরি একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবেও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের দেশে ধাঁধা দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত হয়ে এলেও এবং ধাঁধার সংগ্রহ সীমিত পরিসরে হলেও এর সংগ্রহ কার্যের সূচনা কিন্তু লোক সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বেশ আগেই হয়েছিল বলা চলে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য চট্টগ্রামের মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদকেই বাংলা ধাঁধার প্রথম সংগ্রাহক রূপে অভিহিত করেছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে তিনি যে নিশ্চিত নন, তা এই প্রসঙ্গে তাঁর 'সম্ভবত' শব্দটির ব্যবহারই প্রমাণ করে। ডঃ ভট্টাচার্য প্রসঙ্গত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩১২ সনে সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক প্রকাশিত 'চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাঁধা' রচনাটির উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যাচ্ছে আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের অনেক আগেই, এক দশকেরও পূর্বে অন্য এক পত্রিকায় এবং অপর এক ব্যক্তি কর্তৃক ধাঁধা সংগ্রহের সূচনা হয়েছিল। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে [১৮৯৩ ফেব্রু-

য়ারী] 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় নবীনচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ১০০টি প্রহেলিকা বা হেঁয়ালী প্রকাশিত হয়েছে। অতএব বাংলা ধাঁধার প্রথম সংগ্রাহকের মর্যাদা এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে নবীনচন্দ্র দত্তকেই প্রদান করতে হয়। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যাতেও যথাক্রমে ১০টি করে, প্রহেলিকা প্রকাশিত হয়েছে। বামাবোধিনীর ৩৪৫ ও ৩৪৬ সংখ্যা দু'টিতেও আরও যথাক্রমে ৯টি ও ৭টি করে ধাঁধা প্রকাশিত হয়েছে। স্মরণ রাখতে হবে বাংলা লোকসাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৩০১ বঙ্গাব্দে।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড কে, কে, জি, সরকার রচিত 'মধ্যভারতে প্রচলিত প্রবাদের সঙ্কলন' গ্রন্থেও ২৫টি প্রহেলিকা সঙ্কলিত হয়েছে। এমন কি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাতেও সাহিত্য বিশারদের ধাঁধার সংগ্রহ প্রকাশের পূর্বে ১৩১১ সনে প্রকাশিত ২য় সংখ্যায় মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্যের প্রকাশিত 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা' প্রবন্ধেও ৩টি ধাঁধা উত্তরসহ প্রকাশিত হয়েছিল। সংখ্যার দিক দিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও ধাঁধা চর্চার ইতিহাসে এর যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে তা স্বীকার করতে হয়।

বাংলায় ধাঁধা সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'হেঁয়ালী রহস্য' [১৯২৪ ; ৪র্থ সংস্করণ]। গ্রন্থটির রচয়িতা শ্রীআশুতোষ মিত্র মহাশয়। বৈষ্ণব চরণ বসাক সম্পাদিত 'বঙ্গভূমি' নামক মাসিক পত্রিকায় হেঁয়ালী সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশকে কেন্দ্র করেই লেখকের সর্বপ্রথম ধাঁধা চর্চার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ ঘটে।

'হেঁয়ালী রহস্যে' ধাঁধার আঙ্গিক ও তাত্ত্বিক গত আলোচনা ছাড়াও এবং আলোচনার ক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহৃত ধাঁধা ব্যতীত সাড়ে তিন শতাধিক ধাঁধা উত্তরসহ সঙ্কলিত হয়েছে। অতএব এই সকল তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

মহাশয় 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে [ধাঁধা] যে মন্তব্য করেছেন, 'ধাঁধা সম্পর্কিত কোন আলোচনাই আজ পর্যন্ত বাংলায় প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং বাংলার লোক-সাহিত্যের বর্তমান খণ্ডখানি এই বিষয়ে সর্বপ্রথম বলিয়াই এক অতি দুঃসাহসিক প্রয়াস'—যথার্থ বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। তবে সেই সঙ্গে এও স্বীকার্য যে ডঃ ভট্টাচার্যের প্রকাশিত গ্রন্থটি ধাঁধা সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম পথিকৃতের মর্যাদা লাভ থেকে বঞ্চিত হলেও এর গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোনই কারণ নেই।

তবু একথা ঠিক যে লোক সাহিত্যের অপরাপর বিভাগের তুলনায় ধাঁধা প্রসঙ্গটি উপযুক্ত গুরুত্ব লাভ আজও করেনি।

এইবার আমরা বাংলা ধাঁধা চর্চার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি। আমরা ধাঁধা চর্চার প্রথম সংগ্রাহক রূপে নবীনচন্দ্র দত্তের নাম পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ১২৯৯ সনের [১৮৯৩; ফেব্রুয়ারী] মাঘ মাসের 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় [৫ম কল্প; ১ম ভাগ, ৩৩৭ সংখ্যা ও ৩৩৮ সংখ্যা] নবীনচন্দ্র সংগৃহীত সর্বমোট ১০০টি 'প্রহেলিকা বা হেঁয়ালী সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির পাদটীকায় বলা হয়েছিল—

'যে পাঠিকা সংগৃহীত ১০০ প্রহেলিকার সদুত্তর দিবেন, সংগ্রহকার বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত তাঁহাকে স্বপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির এক একখণ্ড পুরস্কার দিবেন—ভূগোল বিবরণ, ব্যবহারিক জ্যামিতি, সঙ্গীত রত্নাকর, জমিদারী দর্পন ও সাহিত্য মঞ্জরী।'

পাদটীকায় সংযোজিত বিজ্ঞাপন থেকে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে নবীনচন্দ্র দত্তের আকর্ষণ ছিল বিভিন্নমুখী। ভূগোল, জ্যামিতি, সঙ্গীত থেকে শুরু করে জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়, সাহিত্য—সকল বিষয়েই তাঁর আগ্রহ ছিল। এছাড়াও ধাঁধার রহস্য ভেদের ব্যাপারে পাঠিকাদের [পাঠকদের নয়] পুরস্কারের

প্রলোভনে প্রলুব্ধ করা—বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা।

এইবার নবীনচন্দ্র দত্ত সংগৃহীত কয়েকটি প্রহেলিকার উল্লেখ করা গেল। বলাবাহুল্য, এগুলির উত্তর দেওয়া হয়নি।

ক। বল সে কি ঠাকুর হয়
পেলে যারে মৃত্যু হয়॥

খ। ইংরাজিতে হয় গালি
বাঙ্গলাতে শোভে ডালি॥

গ। কহ দেখি হে সত্য কথা।
কোন্ জনের একুশ মাথা॥

ঘ। ইংরাজিতে ঠাণ্ডা অর্থ বাঙ্গালাতে ফল।
কি হয় সে শব্দে ওগো বল নারীদল॥

ঙ। অজ্ঞানে পরেন বস্ত্র, সজ্ঞানে উলঙ্গ।
মাথায় শিবের জটা, ভিতরে সুরঙ্গ॥

'বামাবোধিনী' পত্রিকার ৩৪৩ সংখ্যা [শ্রাবণ : ১৩০০ ; ৫ম কল্প ; ২য় ভাগ ; আগষ্ট ১৮৯৩] এবং ৩৪৪ সংখ্যায় [ভাদ্র : ১৩০০ ; সেপ্টেম্বর ১৮৯৩] যথাক্রমে ১০টি করে প্রহেলিকা প্রকাশিত হয়েছে। ঐ একই বৎসরে প্রকাশিত ৩৪৫ সংখ্যাতেও [আশ্বিন ১৩০০ ; অক্টোবর ১৮৯৩] ৯টি প্রহেলিকা প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যাতেও [কার্তিক ১৩০০ ; নভেম্বর ১৮৯৩] আরও ৭টি প্রহেলিকা প্রকাশিত হতে দেখা গেছে।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড কে. কে. জি, সরকার 'মধ্যভারতে প্রচলিত প্রবাদের সঙ্কলন' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির নামকরণ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে এটি প্রবাদের একটি সঙ্কলন। এবং বাস্তবতও তাই। এক সহস্রের মত হিন্দী ও বাংলা প্রবাদ গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে। এছাড়াও লেখক উত্তরসহ ২৫টি হেঁয়ালী ও প্রহেলিকা প্রকাশ করেছেন গ্রন্থটিতে।

১৩১১ সনে প্রকাশিত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ২য় সংখ্যায়

মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্যের 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা' শীর্ষক একটি মূল্যবান ও সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিরক্ষর কবি দ্বারা রচিত গান, ছড়া, ধাঁধা প্রভৃতির মধ্যে প্রকাশিত স্বভাব কবিত্বের আস্বাদন। এই প্রবন্ধে ৩টি ধাঁধাও প্রকাশিত হয়েছে—

ক। তিন আখুরে নাম ইহা সর্ব ঘরে আছে,
প্রথম আখর ছেড়ে দিলে গোয়ালায় নিয়ে যাচে,
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে হরিগুণ গায়,
শেষ আখর ছেড়ে দিলে লোকে ভয় পায়।
কও লো সজনি সেই কোন্ বস্তু হয়,
ভাতারে করিলে রাগ যা করে আশ্রয়। [বিছানা]

খ। কাজলের ফেলে জল যে আখর রয়,
পাঁঠার পা ছেড়ে মিল করিয়ে তায়।
লবঙ্গের বঙ্গ রেখে পার যা আনিতে,
পান্তা ভাতে খাবো তাই নুন্ দিয়ে তাতে।
[কাঁঠাল]

গ। সতত অন্দরে থাকে না হয় রমনী,
যুবায় না চাহে বুড়ায় আদরিণী।
কহে, কবি রঙ্গিনী পিল্লিকার ছন্দ,
মূর্খেতে বুঝিতে নারে পণ্ডিতে লাগে ধন্দ।
[পান]

বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে আব্দুলকরিম সাহিত্য-বিশারদ একটি স্মরণীয় নাম। মুখ্যতঃ প্রবাদ সংকলক রূপেই তাঁর পরিচিতি। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার দ্বাদশ বর্ষের [১৩১২] চতুর্থ সংখ্যায় আবদুলকরিম সাহিত্য-বিশারদের 'চট্টগ্রামী ছেলেঠকান ধাঁধা' নামে নিবন্ধে সর্বমোট ১৫০টি ধাঁধা উত্তর সহ সঙ্কলিত হয়েছে। নিবন্ধটিতে সঙ্কলিত ধাঁধাগুলিতে ব্যবহৃত দুরূহ শব্দগুলির

ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হয়েছে। সাহিত্যবিশারদ সঙ্কলিত কয়েকটি বিচিত্র ধাঁধার পুনরুদ্ধার করা গেল—

ক। ছ চরণে চাইর চলে।
দুই মুহে এক বোলে॥
দুই পোঁদে এক লেজ।
থাউক মূখে ভাঙি দিব
পণ্ডিতে ভাঙ্‌তে বাঝে পেঁচ ॥ [অশ্ব ও সোয়ার]

খ। আগা খসখস্যা।
ধরে ধুম্ ধুম্যা ॥ [চালকুমড়া]

গ। এত আঁড়ু পানিৎ লাগাইলাম ফুল।
ছটাক পানি ফুটোক ফুল॥ [ভাত]

১৩০৯ বঙ্গাব্দে সাহিত্যবিশারদ প্রথম বাংলা ছড়ার সংগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর সংগৃহীত ছড়াগুলি ছিল চট্টগ্রাম আনোয়ারা অঞ্চলের। কিন্তু লেখক পাঠকের সুবিধার্থে সংগৃহীত ছড়াগুলিকে অবিকৃত ভাবে প্রকাশের পরিবর্তে সেগুলির কিছুটা ভাষান্তর তথা রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। সুখের বিষয়, সংগৃহীত ধাঁধাগুলির ক্ষেত্রে লেখক ছড়ার মত ভাষার পরিবর্তন সাধন করেন নি। ফলে এক্ষেত্রে লোক-সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহে বৈজ্ঞানিক রীতিটি লঙ্ঘিত হয়নি।

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার ১৩১৪ সনের ৪র্থ সংখ্যায় রাজকুমার কাব্যভূষণের 'গ্রাম্য শব্দকোষ ও পাবনায় গ্রাম্য শব্দাদি সংগ্রহ' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে লেখক পাবনা জেলা থেকে সংগৃহীত গ্রাম্য শব্দকোষের সঙ্গে ৯টি হেঁয়ালীও উত্তর সহ প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হ'ল—

ক। আমারও নাই তোমারও নাই।
ভেঙে দিলাম বোঝও নাই॥ [নাভি]

খ। ভোন্ ভোন্ করে ভোমরাও না।
গলায় পৈতা বামুনও না॥ [চরকা]

গ। বোন থেকে বার হল টিয়া।
সোনার মুটুক মাথায় দিয়া॥ [মোচা]

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার পঞ্চদশ ভাগের ৩য় সংখ্যায় [১৩১৫] প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'কোচবিহারের হেঁয়ালী' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। লেখক প্রথমেই দাবী করেছেন, 'কোচবিহারের হেঁয়ালী এই প্রথম সংগৃহীত হইল।' [পৃঃ ১৭১]

সর্বমোট ৪১টি হেঁয়ালী উত্তরসহ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি উদ্ধার করা গেল—

ক। বল দেখি ভাই।
ঘর কোণা আছে তার, দুয়োর কোণা নাই॥ [ডিম]

খ। ওপারে কালিয়া গুটি লাল টিক্ টিক্ করে।
কার বাপের সাধ্য আছে কাটি আনতে পারে॥
[প্রাতঃসূর্য]

গ। জঙ্গলবাড়ী হাতে চিরাইল টিয়া,
সোনার টুপুলি মাথায় দিয়া। [কলার মোচা]

ঘ। এথি গেনু উথি গেনু, গেনু বাউড়ার হাট।
এমনি বস্তু দেখে আইনু, ফলের উপর পাত॥
[আনারস]

ঙ। খস্ খস্ কুমড়ার পাত।
দেখতে লাগে উৎপাত॥ [মধ্যাহ্ন সূর্য]

লেখক তাঁর সঙ্কলিত হেঁয়ালীগুলির সকল দুরূহ প্রাদেশিক শব্দগুলিরই অর্থ ভেঙ্গে দিয়েছেন। লেখকের সঙ্কলিত অপর হেঁয়ালীগুলি মাকড়সা, জামা, বোলতা, বৃষ্টি, ভাত, হাতী, কাঁঠাল, বড়শী, সূঁচ, দোয়াত-কলম, মানুষ, ছড়ি, বাতি, মৌচাক, ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত।

১৩১৯ সনের বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কতিপয় হেঁয়ালি' শীর্ষক প্রবন্ধটি

প্রকাশিত হয়। লেখক ৯০৭টি হেঁয়ালী উত্তর সহ প্রকাশ করেছেন এই সংখ্যাটিতে। কয়েকটি হেঁয়ালী উদ্ধৃত হল—

ক। বন থেকে বেরুল টিয়ে,
লাল গামছা গায়ে দিয়ে। [পলাণ্ডু]

খ। তুমি থাক ডালে, আমি থাকি জলে,
ছুজনে দেখা হবে মরণের কালে। [তেঁতুল ও মৎস্য]

গ। কাল কাসিন্দের মাঠে রে ভাই কাল হরিণ চরে,
রাজার বেটার সাধ্য নাই যে ধরে খেতে পারে ॥
[উকুন]

ঘ। একর পুরের পাখাটি, টেকর পুরে চড়ে,
হরিশ্চন্দ্রপুরে ধরা দেয়, লক্ষীকান্তপুরে মরে। [উকুন]

ঙ। এক জীব তার আশী মাথা,
শুনে যা মজার কথা। [নৃমুণ্ডমালিনী কালী]

চ। একশ আটটী কন্যা, একটী তার বর,
কন্যার নাম হরিপ্রিয়া স্থূত নগরে ঘর।
[হরিনামের মালা]

ছ। হলদে ডুবু ডুবু বিনোদিনী রাই
ধরিয়ে চুমো খেয়ে কাঁদায়ে পলায়। [বোল্‌তা]

১৩২৬ সনের সাহিত্য পরিষৎপত্রিকার ২য় সংখ্যায় বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে চট্টগ্রামের গ্রাম্য ভাষা সম্বন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটির পরিশিষ্টে লেখক চট্টগ্রামের ভাষার নিদর্শন স্বরূপ কতিপয় প্রবচনের সঙ্গে ৪টি হেঁয়ালীও প্রকাশ করেছেন—

ক। এগ হৈলর ছুই মাতা, হৈল গেল্ গৈ্য কৈলকাতা।
[একটা শোল মাছের ছুটি মাথা—
শোল মাছ চলে গেল কলকাতা] [নৌকা]

খ। রাজা ভাত খায়, ছুআ পোআ চাই খায় [হাঁটু]

গ। রাজার ঘাণ্ডা তুয়ারৎ বরই গাছ ঝিকিমিকি করে।
রাজা আইয়ের বাদশা আইয়ের থিয়েই সালাম করে॥
[রাজার লাছ তুয়ারে কুলগাছ ঝিক্‌মিক্ করে।
রাজা আসুক বাদশা আসুক দাঁড়াইয়া প্রণাম করে]
[দুর্গাপূজা]

বাংলা ধাঁধা চর্চার ক্ষেত্রে শ্রীআশুতোষ মিত্র প্রণীত 'হেঁয়ালী রহস্য' [১৯২৪, ৪র্থ সংস্করণ] একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

বৈষ্ণব চরণবসাক সম্পাদিত 'বঙ্গভূমি' নামক মাসিক পত্রিকায় লেখক হেঁয়ালী বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত এই পত্রিকাটিতে মাঝে মাঝে প্রশ্নমালার মধ্যেও কিছু কিছু হেঁয়ালী প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে আশুতোষ মিত্র 'হেঁয়ালী রহস্য' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। ১ম খণ্ডে হেঁয়ালীর বৈশিষ্ট্য, উপযোগিতা, বিষয় বৈচিত্র্য, সংস্কৃত হেঁয়ালী প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত উদাহরণ সহ মূল্যবান আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে মোট ২৬টি অনুচ্ছেদে।

হেঁয়ালীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লেখক মন্তব্য করে বলেছেন—'মনোযোগ, অধ্যবসায় ও এককালে অনেকগুলি বিষয়ে ধারণা শক্তি বৃদ্ধি করিতে, তরুণ বয়সে হেঁয়ালি বড় উপকার।' [পৃঃ ৫; ২য় অনুচ্ছেদ]

চতুর্থ অনুচ্ছেদে লেখক হেঁয়ালীর সংজ্ঞায় বলেছেন—'যাহার আপাততঃ একটি অর্থ, প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্য অর্থ, এইরূপ বাহিক ও আভ্যন্তরিক দুইটি অর্থ আছে—অথবা কতকগুলি পদবিন্যাস যাহার অর্থের জন্য ধোকা দেওয়া হয়, এরূপ গদ্য বা পদ্য লিখিত প্রশ্নকে হেঁয়ালি বা সমস্যা বলা যায়।'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ধাঁধার সঙ্কলন বহুপূর্ব থেকে শুরু হলেও ধাঁধার তাত্ত্বিক আলোচনা বিশেষতঃ ধাঁধার সংজ্ঞা নিরূপণ বাংলায় এই প্রথম। সেদিক দিয়ে লেখকের মন্তব্য ও সেইসঙ্গে আমাদের

আলোচ্য গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অষ্টম অনুচ্ছেদে লেখক জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার ন্যায় হেঁয়ালীকে প্রতিপাদ্য ও সম্পাদ্য—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন—বিষয় বিশেষের কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ করেপ্রশ্ন করা হলে—তাকে প্রতিপাদ্য এবং যাতে কার্য্য ও কারণের এক পক্ষ মাত্র প্রকাশ করে তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হয় তাকে সম্পাদ্য বলে অভিহিত করেছেন।

লেখক হেঁয়ালীর উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন ঃ

বিধাতা নির্মিত ঘর নাহিক দুয়ার,
যোগীভাবে জীব তায় আছে অনাহার।
যখন যে জীব তায় হয় বলবান,
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খানখান। [ডিম]

সম্পাদ্য বা ধাঁধার উদাহরণটি নিম্নরূপ—

একঘর খালি থাকে জোড়া জোড়া থাকি,
একা ত্রকি থাকি রহে একজন বাকি।
কতজন বাসাড়িয়া ঘর কয় খান,
ব্যাপার বুঝিয়া তার করহ বাখান।

[ঘর ৩টি ও লোক ৪ জন]

একাদশ পরিচ্ছেদে লেখক গদ্য অপেক্ষা পদ্য হেঁয়ালীর রূপ দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকার কারণটি নির্দেশ করেছেন—গদ্য অপেক্ষা পদ্য সহজেই স্মৃতিতে থেকে যায় বলে পদ্য হেঁয়ালী দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় জীবিত থাকতে পারে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বাংলায় পদ্য হেঁয়ালীর প্রাচুর্যের কারণটি নির্দেশ করা হয়েছে, 'সকল ভাষারই আদিম অবস্থায় পদ্যের আদর বেশী থাকে। সংস্কৃতে ব্যবহার শাস্ত্র, রাজনীতি, চিকিৎসা, জ্যোতিষ প্রায়ই পদ্যে। বাঙ্গালায়ও কিছুদিন পূর্বে যখন সকলই পদ্যময় ছিল, তখন হেঁয়ালিও পদ্যময় হইবে বিচিত্র কি! ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে পদ্য অপেক্ষা গদ্য হেঁয়ালী অধিক।

তাহার কারণ, ভাষার কলেবর পুষ্টির সহিত পদ্য অপেক্ষা গদ্য প্রচারের আধিক্য দেখা যায়।'

লেখক তাঁর গ্রন্থে কয়েকটি হিন্দী হেঁয়ালীর দৃষ্টান্ত উদ্ধার করেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মোট ২১৮টি পদ্য হেঁয়ালী উত্তর সহ প্রকাশিত হয়েছে। আর তৃতীয় খণ্ডে ৯৩৮টি গদ্য হেঁয়ালী ও তার উত্তর প্রদত্ত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি ধাঁধা চর্চার প্রথম যুগে কেবল ধাঁধা সংগৃহীত হতেই দেখা গেছে। নবীনচন্দ্র দত্ত, রেভারেণ্ড কে, কে, জি সরকার, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্রনাথ রায় এঁরা সকলেই ধাঁধা সংগ্রহের উপরই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু ধাঁধা সম্পর্কিত আলোচনায় তেমন কারুর শক্তিই নিয়োজিত হয়নি। সেদিক দিয়ে আশুতোষ মিত্রের প্রয়াস নিঃসন্দেহে সপ্রশংস উল্লেখের দাবী রাখে। বাংলা ধাঁধা সম্পর্কিত আলোচনায় এঁকে প্রথম পথিকৃতের মর্যাদায় ভূষিত করলেও কোন অন্যায় হয় না।

শ্রীমহাম্মদ ইউনছ প্রণীত 'ধন্ধহাসি বা পিলিকা' নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত। গ্রন্থটি আয়তনে খুবই ক্ষুদ্র। আমরা এই ক্ষুদ্র সংকলনটির পঞ্চম সংস্করণ পেয়েছি। প্রকাশকাল ১৩৩২ সন। মোট ৭৭টি পদ্যে রচিত ধাঁধা সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থ শেষে লেখক প্রতিটি ধাঁধার উত্তর প্রকাশ করেছেন। ধাঁধাগুলি দোকান, বিছানা, বন্দুক, কাগজ, ফড়িং, আছাড়, হাসা, কাঁঠাল, মরিচ, জুতা, চক্ষু, হরিণ, বাতাস, পৃথিবী, ঘড়ি, কমলা প্রভৃতি নানা বিষয় অবলম্বনে রচিত। 'মরিচ' অবলম্বনে রচিত ধাঁধাটি—

অতীত হইয়া আমি গেনু বেড়াইতে।
নানীর বাড়ী যাই আমি দেখি একটা লাল ॥
হিসাব করিয়া দেখি ত্রই বিষম কাল।
আমিত মূর্খ বটে না চিনি তাহারে ॥
নানীয়ে বলে নাম তিন অক্ষরে ধরে।

মধ্য অক্ষর লোপ করিলে যাও নাইর বাড়ী ॥
শেষ অক্ষর লোপ করিলে দুনিয়ার আশা ছাড়ি ।

'চক্ষু' অবলম্বনে রচিত ধাঁধা—

এক গর্ভে জন্মিয়াছে দুই সহোদর ।
এক স্থানে থাকে দোহে নহে অন্যতর ॥
একের বিপদ হৈলে কান্দে দুইজন ।
কিন্তু এ জীবনে দোহের নাহিক দর্শন ॥

'কাঁঠাল' অবলম্বনে রচিত ধাঁধা—

যৌবনে নাহিক রস রসিক যুবতী ।
বৃদ্ধকালে হয় সেই অতি রসবতী ॥
বুঝহ ইহার ভাব রসিক সুজন ।
ভাবিলে অবশ্য হবে ভাবের মিলন ॥

'খেঁজুর' গাছ অবলম্বনে রচিত ধাঁধা—

নিম্নেতে উৎপত্তি যার মকরেতে কাঁটা ।
তাহারে পালিতে হয় বহু যত্ন ঘটা ॥
তাহার শোণিত দেখ সর্বলোকে পিয়ে ।
কাটিলে তাহার মুণ্ড তবুও সে জিয়ে ॥

'নয়ন' অবলম্বনে রচিত আর একটি ধাঁধা—

এক ঘরে জন্ম হয় দুই সহোদর ।
এক নাম ধরে তারা দুই কলেবর ॥
জীবের শরীর মাঝে খুঁজে দেখ পাবে ।
জীবনের পথ সেই বল দেখি ত্রবে ॥

'বিছানা' অবলম্বনে রচিত ধাঁধা—

তিন অক্ষরে নাম তার সর্ব ঘরে আছে ।
শেষ অক্ষর লোপ করিলে কেহ না যায় কাছে ॥
প্রথম অক্ষর বাদ করিলে সর্ব্ব লোকে খায় ।
মধ্য অক্ষর লোপ করিলে কানাইর হাতে যায় ॥

কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট পত্রিকায় ১৩৭১ সনে [আশ্বিন মাস, নব পর্যায়ে দশম সংখ্যা] মানস মজুমদার রচিত 'বাংলার লোক সাহিত্যে ধাঁধা' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। লেখক বীরভূম জেলার মল্লারপুর গ্রাম থেকে সংগৃহীত মোট ৩৮টি ধাঁধার সাহায্যে বাংলা ধাঁধা বিষয়ে একটি সামগ্রিক আলোচনা করেছেন। এমনিতেই বাংলা লোক সাহিত্যের অপরাপর বিভাগের তুলনায় ধাঁধা সম্পর্কিত আলোচনা নিতান্তই স্বল্প। তাই সেই দিক থেকে লেখকের প্রবন্ধটির এক বিশেষ গুরুত্ব আছে, স্বীকার করতে হয়। তদুপরি আলোচনায় লেখকের নিজস্ব সংগৃহীত ধাঁধাগুলির সংযোজন প্রবন্ধটিকে বিশেষ মূল্যবান করে তুলেছে।

ইদানীং কেউ কেউ ধাঁধার মধ্যে শিল্প গুণের পরিচয় লাভ করা যে সম্ভব, সে সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু লেখক সংগৃহীত 'মেঘ' অবলম্বনে রচিত—

কালো কালো কালসা।
দুধ দেয় এক মালসা॥
যদি গাই হাঁকুড়ে।
সাত সমুদ্র সাঁতুরে॥

—ধাঁধাটি অনবদ্য শিল্পগুণ মণ্ডিত ও সূক্ষ্ম কবি কল্পনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে গৃহীত হবার দাবী রাখে। ভাবগৌরব, চিত্রধর্মিতা এবং উপমা প্রয়োগ নৈপুণ্যেও ধাধাগুলির রচয়িতাদের মুন্সীয়ানা যে যথার্থই প্রশংসনীয়, তা লেখক সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত ধাঁধাগুলিই প্রমাণ—

তিন ইঞ্চি বাবাজি গঙ্গাজলে ভাসে।
পাছায় তার হাত দিলে ফিক্ করে হাসে॥
[প্রদীপের সলতে]

কিংবা,

লিক লিক গাছ চিকি চিকি পাতা।
মালেক ডাণ্ডা সাড়ে ষোল হাত॥
খেতে মধু মধু ফেলতে কাপাস॥ [আখ]।

আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধাঁধা উদ্ধার করা গেল—

ক। আমিও তো ডুবেছি, তুমিও তো ডুববে।
চৈতন্যটি ডুবে গেলে কি আর মজা লুটবে॥
[ছিপের সূতো ও ফাত্‌না]

খ। তোমাকে দেখে যাচ্ছি আমি।
আমাকে দেখে আসছ তুমি॥
ঐখানে দাঁড়াও তুমি।
তোমাকে নিয়ে আসি আমি॥ [বৃষ্টি ও জল]

গ। হিম হিম কাজল লতা।
এ ফলটি পেলে কোথা॥
রাজার ভাণ্ডারে নাই।
বেনের দোকানে নাই॥ [বরফ]

ঘ। অজগর তো নই আমি এঁকেবেঁকে চলি।
স্থানে স্থানে প্রাণী খাই উগ্‌লে উগ্‌লে ফেলি॥
[রেলগাড়ী]

ঙ। আগে ধারাটি শিবমূর্তি পেছনে গৌর নিতাই।
তিলক ছাপটি নিয়ে প্রভু দেশে দেশে যায়॥
[পোষ্ট কার্ড]

চ। আগ্‌না টলো বেচন কালো।
মুখ নাই তার বলে ভালো॥
পা নাই তার যায় দূর।
তার বাড়ী মথুরাপুর॥ [চিঠি]

লেখক তাঁর প্রবন্ধে লৌকিক ধাঁধা কেমন করে সাহিত্যিক

ধাঁধায় রূপান্তরিত হয়, উপযুক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্যিক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লৌকিক এমন ৩টি ধাঁধারও উল্লেখ করেছেন। এছাড়া বাংলা ধাঁধায় গৃহীত সংস্কৃত ও হিন্দী শব্দের অনুপ্রবেশের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি ধাঁধার উল্লেখ করেছেন। সীমিত পরিসরে হলেও বৈচিত্র্য সম্পন্ন বাংলা ধাঁধার বিভিন্ন দিকের উল্লেখে প্রবন্ধটি যথার্থই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে স্বীকার করতে হয়।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সপ্তর্ষি'র লোক সাহিত্য সংখ্যায় [১৩৭২] প্রকাশিত সুশান্ত হালদার রচিত 'বাংলালোক সাহিত্যে ধাঁধা' নিবন্ধটি বাংলা ধাঁধা চর্চার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে ধাঁধা সম্পর্কিত যে আলোচনাটি প্রকাশিত হয়েছে, সেটি ধাঁধা সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিস্তারিত আলোচনা। কালানুক্রমিক বিচারে সুশান্ত হালদার রচিত নিবন্ধটিকে তৃতীয় বিস্তারিত আলোচনার মর্যাদা দিতে হয়। অবশ্য রচনাটির গুরুত্ব যে কেবল এর বিস্তৃতিতেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। ডঃ ভট্টাচার্য তাঁর ধাঁধা সম্পর্কিত আলোচনায় [বাংলার লোক-সাহিত্য গ্রন্থের ১ম খণ্ডে] ধাঁধার সংজ্ঞা, ধাঁধা ব্যবহারের প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধাঁধা ব্যবহারের পরিচয়, ধাঁধার আচারগত মূল্য প্রভৃতি বিষয়েই মূলতঃ আলোকপাত করেছেন। কিন্তু বাংলা ধাঁধার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। সেদিক দিয়ে সুশান্ত হালদারের প্রবন্ধেই বিশেষ ভাবে বাংলা ধাঁধা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা স্থান পেয়েছে। ডঃ ভট্টাচার্যের 'বাংলারলোক-সাহিত্য' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে বিধৃত রচনাটিকে আমরা ধাঁধা সম্পর্কিত আলোচনার ভূমিকা স্বরূপ গ্রহণ করতে পারি। আর সুশান্ত হালদারের রচনাটিকে বাংলা ধাঁধার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়

দানকারীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে হয়।

'বাংলা লোক সাহিত্যে ধাঁধা' শীর্ষক আলোচনায় আকৃতি ও প্রকৃতি অর্থাৎ গঠন বৈশিষ্ট্য এবং বিষয়ের বিচারে বাংলা ধাঁধাকে ৮টি পৃথক পৃথক বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। লেখক আকৃতিগত বিচারে বাংলা ধাঁধাকে ১। লৌকিক ধাঁধা [Flok riddle], ২। আক্রমণাত্মক ধাঁধা [challenging riddle], ৩। প্রাচীন ধাঁধা [classical riddle] ৪। সাহিত্যিক ধাঁধা [Literary riddle, ৫। নয়া সাহিত্যিক ধাঁধা [New—Literary riddle], ৬। মার্জিত লৌকিক ধাঁধা ৭। ছড়ামূলক ধাঁধা ও ৮। বিদেশী ধাঁধা [Foreign riddle] এই ৮টি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

প্রকৃতি বা বিষয় ভেদে লেখককৃত বিভাগগুলি হল যথাক্রমে —১। প্রকৃতি বিষয়ক ; ২। গার্হস্থ্য জীবন বিষয়ক ; ৩। আচার-গত ধাঁধা ; ৫। পারিবারিক সম্পর্কমূলক ; ৬। আখ্যানমূলক ; ৭। গাণিতিক ধাঁধা এবং ৮। আলংকারিক ধাঁধা।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে বাংলা ধাঁধার সংখ্যা ও বিষয়বস্তুগত প্রাচুর্য এতই অধিক যে সেগুলিকে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা সম্ভব নয়—এই বক্তব্য ধাঁধার আকৃতি ও প্রকৃতি—উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধাগুলিকে গাছ পালা, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি ভেদেও আবার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পশু-পক্ষী যদিও প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত, তবু শুধু এদের নিয়েই রচিত ধাঁধাগুলিকে আর একটি পৃথক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তৈজস-পত্রাদি অবলম্বনে রচিত ধাঁধার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। তাই এগুলিও আর একটি পৃথক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্যতা রাখে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবলম্বনে রচিত ধাঁধাগুলির সংখ্যাও বেশ উল্লেখযোগ্য। এরকম ভাবে বহুতর নতুন বিভাগে ধাঁধাগুলিকে বিভক্ত করা যায়। সে যাইহোক বিষয় বস্তু অবলম্বনে

শ্রীযুক্ত হালদার কৃত বিভাগগুলির সমীচীনতা সম্পর্কে কিছু বলার না থাকলেও আঙ্গিক বিষয়ে তাঁর কৃত বিভাগগুলি সম্পর্কে কিন্তু সংশয় থেকে যায়।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 'বিদেশী ধাঁধা' নামে লেখককৃত বিভাগটির উল্লেখ করতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, যে সকল বিদেশী ধাঁধা বাংলায় গৃহীত হয়েছে, লেখক বুঝি সেগুলির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু বস্তু ত তা নয়। যে সকল বিদেশী ধাঁধার সঙ্গে বাংলা ধাঁধার সাদৃশ্য আছে, সেগুলিকেই লেখক 'বিদেশী ধাঁধা' অভিধায় অভিহিত করেছেন। কিন্তু এইরূপ বিভাগ সঙ্গত কারণেই সমর্থনযোগ্য নয় যেহেতু তা বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারক।

সাহিত্যিক ও নয়া সাহিত্যিক ধাঁধা বিভাগ দুটির পরিবর্তে শুধু মাত্র সাহিত্যিক ধাঁধা বিভাগটি রাখাই যুক্তি সঙ্গত বলে আমাদের ধারণা। যেহেতু দুটি ক্ষেত্রেই সমাধান জনশ্রুতিমূলক ও স্মৃতিনির্ভর নয়। তবু আমাদের আলোচ্য 'বাংলা লোক সাহিত্যে ধাঁধা' শীর্ষক আলোচনাটিতেই প্রথম বাংলা ধাঁধাকে সুনির্দিষ্ট কয়েকটিবিভাগেবিভক্ত করা হয়েছে, যা পরবর্তীকালে ধাঁধা বিষয়ক আলোচনায় বহুলাংশে পথ নির্দেশের কাজ করবে বা করেওছে।

'সপ্তর্ষি' পত্রিকার লোক সাহিত্য সংখ্যায় [১৩৭২] প্রকাশিত রমেন্দ্রনাথ অধিকারী রচিত 'উত্তরবঙ্গের লোক সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে সামগ্রিক ভাবে কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ এই পাঁচটি জেলার লোক সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ধাঁধা ও হেঁয়ালী সম্পর্কেও লেখক আলোকপাত করেছেন। লেখক উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত সর্বমোট ৪টি ধাঁধার উল্লেখ করে বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলে প্রকাশিত ধাঁধার সঙ্গে এই অঞ্চলের ধাঁধার ঐক্য ও বৈচিত্র্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

খ্যাড়বাড়ী হাতে বিড়াইল টিয়া
সোনার টুপি মাথায় দিয়া।

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও এই ধাঁধাটি দেখা গেছে। উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত এই ধাঁধাটি 'কলারমোচা' অবলম্বনে রচিত। অপর পক্ষে আনারস অবলম্বনে রচিত ও লেখক কর্তৃক সংগৃহীত ধাঁধাটি হল—

এক গাছে এক ফল
পা কি আছে টলমল।

সুপারি গাছকে কেন্দ্র করে রচিত ধাঁধাটির মধ্যে ছন্দোচাতুর্য ও রচয়িতার প্রশংসনীয় রসবোধ পরিস্ফুট হয়েছে —

একনা নাটি [৩]
পির গির গাঁটি [৪]
গালাৎ ঘুগ্‌রা [৫]
মাথাৎ ছাতি।

পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এবং ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ত্রৈমাসিক লোক-সাহিত্য সংকলন 'লোকশ্রুতি'র তৃতীয় সংখ্যাটি [১৩৭৫] ধাঁধা সংখ্যা হিসাবে চিহ্নিত। সংখ্যাটিতে সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছাড়াও মোট ছটি প্রবন্ধ স্থান লাভ করেছে। বলাবাহুল্য সব ক'টিই ধাঁধা সম্পর্কিত। প্রথম প্রবন্ধটি 'প্রহেলিকা'। রচয়িতা-সুশান্ত হালদার। ধাঁধা সম্পর্কে সুশান্ত হালদারের এটি দ্বিতীয় প্রবন্ধ। তাঁর প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 'সপ্তর্ষি' পত্রিকায় বছর তিনেক আগে। সে সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে লেখক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়—যেমন মারাঠী, গুজরাটি, হিন্দী, কানাড়ী, তামিল, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, রাজস্থানী, উড়িয়া প্রভৃতিতে ধাঁধাকে কি নামে অভিহিত করা হয় এবং সেই সঙ্গে এই সকল প্রাদেশিক ভাষায় রচিত এক বা

একাধিক ধাঁধার উল্লেখ করেছেন। মাঝে মাঝে বাংলা ধাঁধার সঙ্গে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য সমূহে প্রচলিত ধাঁধার বিষয় বস্তুগত সাদৃশ্যের উল্লেখ করেছেন। এক ধাঁধা যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে কত বিচিত্র নামে পরিচিত ও প্রচারিত রয়েছে প্রবন্ধটি থেকে সেই পরিচয় জানা যায়। প্রবন্ধটি যে সুলিখিত তা স্বীকার করতে হয়।

'লোকশ্রুতি'র তৃতীয় সংখ্যার দ্বিতীয় প্রবন্ধটি হ'ল 'ধাঁধার আলোকে দু'টি গ্রাম : ডোমজুড়ি, তালিয়া নাম'। লেখক-জয়ন্ত রায়। রচনাটির নামকরণ থেকেই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু সহজেই অনুমিত হয়। পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর ও ওড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার সীমান্তবর্তী বিহার রাজ্যের অন্তর্গত সিংভূম জেলার দুটি গ্রাম হল ডোমজুড়ি এবং তালিয়া। লেখক এই দু'টি গ্রাম থেকে সংগৃহীত ধাঁধাগুলি সম্পর্কেই বর্তমান প্রবন্ধে আলোকপাত করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে লেখক পূর্বোল্লিখিত গ্রাম দু'টি থেকে সংগৃহীত ধাঁধাগুলির নানা দিক নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন—আলোচনা করেছেন এ অঞ্চলের ধাঁধার গঠন প্রকৃতি নিয়ে, আলোচনা করেছেন বিষয় বস্তুগত বৈচিত্র্য নিয়ে, এমন কি এই দুটি গ্রাম থেকে সংগৃহীত ধাঁধার প্রাচুর্য ও ধাঁধাগুলির ভাষা সম্বন্ধেও লেখককে আলোকপাত করতে দেখা গেছে।

লেখক কখনও উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছেন উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলে রচিত ধাঁধার ওপর কেমন করে ওড়িয়ার প্রভাব পড়েছে, আবার এখানে ধাঁধার প্রাচুর্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এখানকার Socio Economy-র প্রসঙ্গটি ওল্লেখ করেছেন। লেখকের ভাষায় : 'জীবিকার তাগিদেই সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা যদি আবর্তিত হতো, প্রয়োজনীয় অবকাশ যদি জীবনে না থাকতো, তাহলে সেই নৈরাশ্য-পীড়িত কর্মক্লান্ত জীবনের অতলান্ত থেকে লোক-গীতি সৃষ্টি হতে পারতো, কিন্তু ধাঁধা নৈব নৈব চ' [পৃঃ ১৯০]।

অর্থাৎ আর্থিক স্বাচ্ছল্য এবং প্রয়োজনীয় অবকাশ এই দু'টি বিষয়ই গ্রামের মানুষকে ধাঁধা রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে বলে লেখকের ধারণা। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায়, লোক সাহিত্যের অপরাপর বিভাগের অন্তর্গত বিষয়গুলির সৃষ্টিতেও কি পূর্বোক্ত দু'টি উপাদান বাঞ্ছিত নয়? অর্থাৎ কেবল আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং অবকাশই নয়, সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং নির্মল পরিহাস সৃষ্টির মানসিকতাও ধাঁধা রচনার ক্ষেত্রে একান্তভাবে প্রয়োজন বলা চলে।

ধাঁধার শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য, 'লোকশ্রুতিবিদ্‌রা ধাঁধাকে বিষয় অনুসারে 'প্রকৃতি ও গার্হস্থ্য' এই দুটো ভাগে ভাগ করে থাকেন [পৃঃ ১৮৯]। কিন্তু লেখক নিজেই যে সকল ধাঁধার উল্লেখ করেছেন তাঁর প্রবন্ধে, তাতেও দেখা যায় যে ধাঁধার শ্রেণীবিভাগ আরও বিস্তৃত আরও সুদূর প্রসারী। শেষে লেখক নিজেই অবশ্য পুরাণ কাহিনী ভিত্তিক ধাঁধাগুলিকে পৌরাণিক বিষয় অবলম্বিত ধাঁধা রূপে উল্লেখ করে কর্ণ, দ্রৌপদী ও সীতা অবলম্বনে রচিত তিনটি ধাঁধার উল্লেখ করেছেন। লেখক এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: 'বিষয়ের অভিনবত্বের জন্যই শুধু নয়, সাহিত্যের রসাদর্শে গুণগত উৎকর্ষে ও সংখ্যাগত প্রাচুর্যে এই জাতীয় ধাঁধা স্বতন্ত্র শ্রেণীর মর্যাদা লাভের যথার্থ অধিকারী বলেই আমরা মনে করি [পৃঃ ১৯০]। লেখককৃত এই বিভাগের মূলে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বর্ণিত ধাঁধার শ্রেণী বিভাগ যে কাজ করেছে তা স্পষ্টতঃই বোঝা যায়। কিন্তু 'সপ্তর্ষি' পত্রিকার 'লোক-সাহিত্য সংখ্যা'য় [১৩৭২] সুশান্ত হালদার বাংলা ধাঁধাকে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বেশ কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করেছেন এবং এই বিভাগগুলির অন্যতম পৌরাণিক ধাঁধা। স্মরণ রাখতে হবে 'লোকশ্রুতি' পত্রিকার ধাঁধা সংখ্যা প্রকাশের অন্ততঃ তিন বছর আগেই সুশান্ত হালদারের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। লেখক কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত

ধাঁধাগুলির মধ্যে বিষয়বস্তুগত তেমন নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায় না— যেমন চাষের মই, বিড়ি, ঢেঁকি, কেয়াফুল, পান, চন্দনের পাটা, চালের মটকা, গাছের ছায়া, আখ, নারকেল প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের অতিপরিচিত বিষয়গুলিই লেখক প্রকাশিত ধাঁধায় স্থান লাভ করেছে। যাইহোক তবু প্রবন্ধটি সুরচিত ও বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

'লোকশ্রুতি'র [৩য় সংখ্যা] তৃতীয় প্রবন্ধটি হল 'মাঠা শিবির ও ধাঁধা সংগ্রহের অভিজ্ঞতা'। লেখক ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। বর্তমান প্রবন্ধে লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক সাহিত্য বিভাগের ছাত্র হিসাবে পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত মাঠায় যে শিবিরে যোগদান করেছিলেন এবং ধাঁধা সংগ্রহের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, সেই শিবির জীবন ও বিশেষতঃ লোক সাহিত্যের অন্যতম উপাদান ধাঁধা সংগ্রহ বিষয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। প্রবন্ধটিতে লেখক সংগৃহীত কিছু ধাঁধাও স্থান পেয়েছে।

পত্রিকাটির চতুর্থ প্রবন্ধটির রচয়িতা সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধটির নাম 'পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের ধাঁধা'। প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং সুলিখিত। লেখক হাতিবাড়ী, দহমুণ্ডা, ডোমজুড়ি, কুইলাপাল প্রভৃতি পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের প্রান্তবর্তী গ্রামগুলি থেকে সংগৃহীত কিছু ধাঁধার আকৃতি ও বিষয় গত দিক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। লেখকের সংগ্রহের মাধ্যমে বোঝা যায় মোটামুটি ভাবে প্রায় সকল শ্রেণীর ধাঁধাই এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। শালুক ফুল, বাঁশের কোঁড়, তাল, ভালিয়া ফল, চিচিঙ্গে, ব্যাঙের ছাতা, মুড়ি, খই, দাঁতন কাঠি ইত্যাদি প্রতিদিনের পরিচিত ও নিত্যকার ব্যবহার্য বস্তুগুলি এই প্রান্তবর্তী গ্রামগুলি থেকে প্রাপ্ত ধাঁধায় স্থান লাভ করেছে। পরিশীলিত সাহিত্যে যেমন সম-সাময়িক সমাজ জীবনের নির্ভরযোগ্য পরিচয়টুকু প্রতিফলিত

হয়, বিশেষ অঞ্চলের লোক সাহিত্যে তেমনি সাধারণ লোক জীবন ও সেই সঙ্গে অঞ্চল বিশেষের নিজস্ব জীবন যাত্রা প্রণালী ও দৈনন্দিন জীবনচর্চার চিত্র ও উপকরণাদি রূপায়িত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে সেই সত্যটির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

লেখক পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের মানুষদের প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সুবর্ণ-রেখা আর অসংখ্য মানুষের দল পাশাপাশি বাস করে। এই 'সুবর্ণরেখার মত এ অঞ্চলের অসংখ্য নদনদী এই সব মানুষের মনের রসের উৎস স্থান।......সুবর্ণরেখা এদের জীবন, তাই শিলাবতী, দারুকেশ্বর, কংসাবতী, রূপনারায়ণ—যাই হোক না কেন—নদীই এদের জীবনীশক্তির উৎস। নদী যেমন চাষের জল ও তৃষ্ণার জল দেয়, তেমন মনের মণিকোঠায় যে গোপন রস-নির্ঝর আছে, সেখানেও ধারা যোগায়। নদীকে বাদ দিয়ে তাই এদের জীবনের কোন অনুষ্ঠানই সম্ভবপর নয়।' —কিন্তু লেখক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে একটি ব্রতানুষ্ঠানের পরিচয় দিলেও কোন ধাঁধার উল্লেখ করেন নি। ধাঁধা সংক্রান্ত প্রবন্ধে সুবর্ণরেখা বা অন্য কোন নদী সংক্রান্ত অন্ততঃ একটি ধাঁধার উল্লেখ করলে লেখকের বক্তব্যটির সারবত্তা আরও সার্থকভাবে প্রমাণিত হতে পারত।

'ধাঁধা সংখ্যা'র পঞ্চম প্রবন্ধটির নাম 'মূর্খে বুঝিবে কিবা'। প্রবন্ধটির রচয়িতা অজিত কুমার বেরা। লেখক এই প্রবন্ধে বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে ধাঁধার চিত্রকল্পের ওপরই মুখ্যতঃ আলোকপাত করেছেন। অনেকেই ধাঁধার সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু ধাঁধার মধ্য দিয়েও যে পল্লী কবিদের কতখানি শিল্পীমনের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে সেই পরিচয়টিকেই বর্তমান প্রবন্ধে মুখ্যরূপে তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনায় উল্লিখিত ধাঁধাগুলি লেখক কর্তৃক মেদিনীপুর জেলা থেকে সংগৃহীত। তবে লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন পাঠকের সুবিধার্থে ভাষা কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি

নিজেই মার্জিত করেছেন। এতে বৃহত্তর পাঠক সমাজের পক্ষে প্রকাশিত ধাঁধাগুলি সহজে বোধগম্য হলেও সংগ্রহ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে স্বীকার করতে হয়।

পত্রিকাটির শেষ প্রবন্ধ 'ধাঁধায় আনারস'। প্রবন্ধটির রচয়িতা সম্পাদক স্বয়ং। এককথায় বলা যায় প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে পত্রিকাটির ধাঁধা সংখ্যার 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হয়েছে। আনারস যেমন উপাদেয়, পত্রিকার এই শেষ প্রবন্ধটিও তেমনি উপাদেয় হয়ে উঠেছে। আনারস বাংলা দেশের এক অতি পরিচিত ফল। যদিও স্মরণ রাখতে হবে অন্যান্য নানা জিনিষের মত এই সুস্বাদু ফলটি বিদেশ থেকেই আমাদের দেশে এসেছে। পর্তুগীজদের মাধ্যমেই আমরা এই ফলটির সঙ্গে পরিচিতি অর্জন করি। আনারস ফলটিকে অবলম্বন করে বাংলায় প্রচুর সংখ্যক ধাঁধা রচিত হয়েছে। লেখক নদীয়া, ফরিদপুর, বরিশাল, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, বীরভূম, কুচবিহার, হাওড়া প্রভৃতি অবিভক্ত বাংলা দেশের নানা স্থান থেকে এতদসম্পর্কিত সংগৃহীত ৪২টি ধাঁধার পরিচয় দিয়েছেন। কোন একটি বিশেষ বিষয় অবলম্বনে রচিত বহু সংখ্যক বিচিত্র ধাঁধাঁকে অবলম্বন করে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা হিসাবে বর্তমান রচনাটির গুরুত্ব অনেকখানি।

একই বিষয় অবলম্বনে রচিত—বেশ কিছু ধাঁধা প্রকাশিত হওয়ায় অনেক সময় একই স্থানের ধাঁধার সঙ্গে অন্য স্থানে প্রচলিত ধাঁধার মধ্যেকার সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা গেছে।

নানাবিধ ফলের মধ্যে বিশেষ ভাবে আনারস অবলম্বনে যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধাঁধা রচিত হয়েছে তার কারণ নিহিত রয়েছে এই ফলটির বিশেষত্বে। আনারস ফলের ওপরের পাতা, এর গায়ে যে চোখ, এগুলিই ধাঁধা রচয়িতাদের ধাঁধা রচনায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। প্রচলিত ধারণানুযায়ী যে বস্তুটির যেখানে প্রাচুর্য

সেই অঞ্চলে সেই বস্তুটি অবলম্বনে রচিত ধাঁধার সংখ্যাও অধিক হয়—

'Certain objects may predominently be found in the riddles of a certain geographical region because of its abundance and importance in a particular area and may be left out entirely in another'

কিন্তু লেখক বর্তমান প্রবন্ধে এর বিপরীত চিত্রটির পরিচয় দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে বিশেষত মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম মহকুমার বেলপাহাড়ী অঞ্চলে আনারসের প্রাচুর্য না থাকলেও এই অঞ্চল থেকেই অধিক সংখ্যক আনারস বিষয়ক ধাঁধা সংগৃহীত হয়েছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করে লেখক যথার্থই বলেছেন। 'দুর্লভ বস্তু সম্পর্কেই মানুষের কৌতূহল বেশী থাকে সেইজন্য তাহার সম্পর্কে অধিক পরিমাণে ধাঁধা রচিত হইতে পারে।'

ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় পত্রিকায় 'সেকালের ধাঁধা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মুখ্যতঃ আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে ধাঁধার ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। বৈদিক সংহিতা, মহাভারত, বৌদ্ধজাতক, বেতাল পঞ্চবিংশতি, কথাসরিৎ সাগর প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্য থেকে প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত সহযোগে লেখক আমাদের দেশে ধাঁধা ব্যবহারের সুপ্রাচীন রীতি ও ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'লোকশ্রুতি' পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যাটি [অক্টোবর ১৯৬৮] 'গ্রাম সমীক্ষা সংখ্যা' রূপে চিহ্নিত হয়েছে। এই সংখ্যায় পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত ধনুটী, লোয়াকুই মুদিডি, কিতাডী প্রভৃতি গ্রামগুলির সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। এইসব গ্রামগুলি থেকে সংগৃহীত লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান যেমন লোকসঙ্গীত, লোককথা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি

কিছু সংখ্যক ধাঁধাও সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ধাঁধাগুলি সংগৃহীত হয়েছে লোয়াকুই নামক গ্রাম থেকে। সংগৃহীত ধাঁধার সংখ্যা ২৪। লোয়াকুই বা সরদারডি গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই সরদারের বংশধর। অর্থাৎ এরা সবাই নায়া বা মুড়া। সকলেই আদিবাসী। এইবার এই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ধাঁধাগুলির কিছু পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে মনকে সাপের জিহ্বার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কারণ সাপের জিহ্বার মত মন অত্যন্ত চঞ্চল। সংগৃহীত একটি ধাঁধায় মনের সেই চাঞ্চল্যকে রূপ দেওয়া হয়েছে—

ক। হাই গেল হাই আলো। [মন]

প্রাত্যহিক জীবনে যাঁতির ব্যবহার বহুল। যাঁতি দিয়ে আমরা সুপারি ইত্যাদি নানা কঠিন জাতীয় জিনিষ ভাঙ্গি। একটি ধাঁধা সেই প্রয়োজনীয় যাঁতিকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে—

খ। আঁকা বাঁকা নদীটি বেলচরে খায়,
হাজার টাকা গুলি খায় আরো কত খায়।

'লোয়াকুই' গ্রামের মানুষদের জীবিকা হল চাষ্‌বাস। তাই স্বভাবতঃই এই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ধাঁধায় চিঁড়ে কোটার বিষয়ও স্থান পেয়েছে—কারণ চিঁড়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানটি কৃষি-কার্যের মাধ্যমেই উৎপন্ন হয়।

গ। কাল ধানে চাপট মারে, তার ঘর ওপারে।

মানুষ যখন বিচরণ করে বিশেষতঃ পথে ঘাটে, তখন তার পদচিহ্ন ধূলায় অঙ্কিত হয়ে যায়। এটাই ক্ষণিকের স্মৃতিরূপে বিরাজ করে, কিন্তু মানুষটি অদৃশ্য হয়ে যায়, চলে যায় স্থানান্তরে। এই বিষয়টিকে নিয়ে রচিত ধাঁধাটি হল—

ঘ। গাছটা গেল চলি
পাতাটা রইল বসি [পায়ের পাতার দাগ]

পোস্ত বাঙ্গালীর এক প্রিয় খাদ্য। রসনা তৃপ্তিতেই যে

তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তাই নয়, তার ক্ষুদ্রাকৃতি এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে তুলেছে তাকে। তাই সহজেই ধাঁধার রাজ্যে তার স্থান হয়ে গেছে—

ঙ। হাড় টিম্ টিম্ বোহাল মাছের ডিম্,
আছড়ালে না ভাঙ্গে, তার নাম সর্বলোকে জানে।

লঙ্কার ঝাঁঝ যতই হোক, তার মনোহরণ রূপটি কিন্তু কোন মতেই অস্বীকার করার নয়। এমন কি যারা এর রসে বঞ্চিত, তাদের পক্ষেও লঙ্কারাণীর সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। লঙ্কা নিয়ে বাংলায় অসংখ্য ধাঁধা রচিত হয়েছে। এখানেও একটি উদ্ধৃত করা গেল—

চ। মা ঝাঁপড়ি বিটি সুন্দরী।

জল, মাছ এসব তো বাংলা দেশের বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। তাই জল ছেঁচার ডিঙি বা ডব্‌কা, মাছ ধরার ঘুণি, মাছ এসব নিয়েও অজস্র সব ধাঁধা রচিত হয়েছে। লোয়াকুই গ্রাম থেকে সংগৃহীত এইরকম একাধিক ধাঁধার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে—

ছ। এক হাত বোল্‌তা বার হাত শিং
নাচে বোল্‌তা ধিতিং ধিং। [ডব্‌কা]

জ। আপনাকে দেখতে আইলো,
আমাকে লইয়া গেল। [ঘুণি ও মাছ]

আমাদের সমাজ জীবনে কুমোরের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যতই না কেন আমরা সভ্যতার উত্তুঙ্গ শীর্ষে আরোহণ করি, তবু মৃৎপাত্র ও মৃৎ নির্মিত অন্যান্য দ্রব্যাদি ছাড়া আমাদের একেবারেই চলে না। ধাঁধা কখনই সাধারণ বিষয় বস্তু অবলম্বনে রচিত হয় না। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত হয়, যা খুব পরিচিত অথবা কোন না কোন বিরল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, সেইসব বিষয়ই ধাঁধায় স্থান লাভ করে। তাই কুমোর ধাঁধায় স্থান লাভের

অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও স্থান লাভ করেছে কুমোরের ব্যবহৃত চাক—

ঝ। এক টাপ্‌নি [ইঞ্চি] ঝাঁটাটি,
ছাতার পারা মাথাটি।

ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোক সাহিত্য' [১৯৬৯] গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পর্বে হাতিবাড়ী, কুইলাপাল, ডোমজুড়ি, দহমুক্ত ইত্যাদি পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের গ্রামগুলি থেকে সংগৃহীত কিছু ধাঁধার উল্লেখ সহ আলোচনা করা হয়েছে। সংগ্রহের তালিকায় আছে পৌরাণিক আখ্যানমূলক ধাঁধা, গাণিতিক সংখ্যা-মূলক, আচারগত বিচিত্র শ্রেণীর ধাঁধা ইত্যাদি।

প্রকৃতি যে আদিম যুগে মানুষের মনে কেবল ভীতিরই সঞ্চার করেছিল এবং সেই কারণে সৃষ্ট হয়েছিলেন নানা দেব দেবী তা নয়, সেই সঙ্গে মানুষের সৌন্দর্য বোধ এবং কল্পনা শক্তির উন্মেষ ঘটেছে প্রকৃতির বিচিত্র উপকরণে। আকাশের তারকা, চন্দ্র এবং সূর্যকে নিয়ে রচিত ধাঁধাটি তার প্রমাণ :—

ক। আকাশ গুড় গুড় পাথর ঘাটা,
সাত শত ডালে দুটি পাতা।

এক্ষেত্রে আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রকে সাত শত ডাল কল্পনা করা হয়েছে এবং চাঁদ ও সূর্যকে সেই ডালের দুটি পাতার সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। আকাশ ও তারকা প্রসঙ্গে রচিত আর একটি ধাঁধা—

খ। সুফল ফুইট্যা রইছে তুলুইয়া নাই।
সুমরা মর্‌যা রইছে কান্দাইয়া নাই।
সুবিছানা পইড়া রইছে শুউইয়া নাই॥

—অর্থ হল সুন্দর ফুল প্রস্ফুটিত অথচ তাও চয়নের কেউ নেই। সুমরা মৃত অবস্থায়, অথচ কেউই ক্রন্দনরত নয় ; সুন্দর শয্যা রয়েছে অথচ কেউ শয়ন করে নেই।

কেউ কেউ বলেন ধাঁধায় নাকি সাহিত্যের কিছুই নেই। সৌন্দর্যানুভূতি ও তার প্রকাশ যদি সাহিত্য হয়, তবে ধাঁধাকে কেন সাহিত্য পদবাচ্য বলে বিবেচনা করা হবে না, তার কোন কারণ নেই। আবার ধাঁধার স্রষ্টারা কেবল রোমান্টিক মানসিকতারই অধিকারী ছিলেন না, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির সঙ্গে তাঁদের বাস্তবতা বোধও যে কতখানি সক্রিয় ছিল, ধাঁধাগুলি থেকে আমরা সে পরিচয়ও পাই। বরং আজকের দিনে অতি বাস্তববাদী সাহিত্যিকও যা সহজে ভাবতে পারেন না ধাঁধায় সেই বাস্তব সচেতনতা অপূর্ব কবিত্বমণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কেরোসিনের বাতি একটি অতি সাধারণ ও অতি পরিচিত বস্তু। আপাত দৃষ্টিতে এর মধ্যে সৌন্দর্যের কিছু সন্ধান না পাওয়া গেলেও লৌকিক প্রতিভা এরই মধ্যে অনবদ্য সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন—

গ। শেকড় আছে নদীতে
ফুল ফুটেছে পর্বতে।

আকৃতি ও বিষয় ভেদে এতদঞ্চলের ধাঁধাগুলিকে লেখক কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। আকৃতির দিক দিয়ে ছ'টি —লৌকিক, প্রাচীন, সাহিত্যিক, আক্রমণাত্মক, আধুনিক ও তাত্ত্বিক ধাঁধা এবং বিষয়গত ভাবে প্রকৃতি, পৌরাণিক, আচারগত, গার্হস্থ্য জীবনমূলক ও সংখ্যামূলক—এই ছ'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

ডোমজুড় গ্রামটি মেদিনীপুর ও সিংভূম জেলার সীমান্তে অবস্থিত। তাই এখানকার কিছু কিছু ধাঁধায় পশ্চিমা হিন্দী ভাষার প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

ঘ। নদী সেপাথুরত আইলা ঝঁনে
তার পাছায় খড় পণে। [ময়ূর]

ঙ। নদীর সেপাথুরত আইলা ঝনে
বাঁশি কাঁধে করি
গাছ চারা ফল জিন্তা, কাটমু কেমন করি।
[চালকুমড়া]

চ। আইলা রণরণাই বসলা গোড় মেলাই
মাইলা জন্তু খাইলা নাই। [জাল]

ছ। ধব কুঁকড়া নেজা মুকুড়া, ফুঁকি দিলে বলে উঁ। [শঙ্খ]

মুড়ি বাংলাদেশের গ্রাম্য মানুষের এক অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। ভাতের পরই মুড়ির স্থান। কিন্তু চাল থেকে মুড়ি হওয়ার ব্যাপারটি বেশ এক কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার। একটু আগেও যেগুলি ছিল চাল, সেগুলিই রূপান্তরিত হয়ে যায় মুড়িতে। সেই সঙ্গে মুড়ি হওয়ার শব্দ তো আছেই। স্বভাবতই তাই চালের মুড়ি হওয়া নিয়ে বহু ধাঁধা রচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দুটির উল্লেখ করা গেল—

জ। মাঠের মাদল খেড়েক বুবা
নাচছে নাচছে বুড়ি কুবা কুবা। [মুড়ি]

ঝ। সমুদ্র বালিরে কি ফুল ফুটে
বালুতে দেখিনি ভূঁইরে লুটে। ["]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন খাদ্য বস্তুকে কবিতায় স্থান দেওয়া হয় না। লিখিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি সত্য হলেও মৌখিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই মানসিকতা অনুপস্থিত দেখা গেছে। নতুবা মহুয়া ফুল, বেগুন, তাল, ভালিয়াফল, কুমড়া, লাউ, শালুক ফুল, ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে অজস্র ধাঁধা রচিত হত না। লেখক সংগৃহীত ও প্রকাশিত পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের ধাঁধা পর্যায়ে এগুলি প্রকাশিত হতে দেখা গেছে।

সুশীল কুমার ভট্টাচার্য রচিত 'উত্তর বঙ্গের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি' [১৯৭০] গ্রন্থটিতে উত্তরবঙ্গের কিছু হেঁয়ালী

সঙ্কলিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গে ধাঁধা মুখ্যতঃ 'ছিল্কা' নামে পরিচিত। লেখক উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত মোট ৬২টি হেঁয়ালী প্রকাশ করেছেন। যে সকল বিষয় বস্তু অবলম্বনে ধাঁধাগুলি রচিত তাদের মধ্যে আছে যেমন ওল, শামুক, সুপারি, কলার ছড়া, কাঁঠাল, ঝিনুক, ডালিম, আম, শসা, কলাপাতা ইত্যাদি, তেমনি স্থান পেয়েছে চিঠি, ক্ষুর, বন্দুক, স্তূপ ইত্যাদি। কয়েকটি ধাঁধা উদ্ধার করা গেল।

ক। বাপ সিন্‌ সিন্‌ মাও পাতারী—
ভাই হুহুম ধুম বইন সুন্দরী ॥ [শসা]

খ। মুঁহ মরা মচ্চ মেকে ধরি আচ্চে।
হুদ্দেখ বচ্চে তোক নিবার আচ্চে ॥ [বঁড়শী]

গ। উয়াকে দিয়া উয়াকে রান্ধচোঙ্‌,
উয়াকে পাড়ি বইস।
এই ছিল্কা ভাঙ্গি দিয়া ভাত খাবার আইস ॥

ঘ। আকাশেতে থাকে, নাটী নাম ধরে,
নহেত কামিনী।
আকাশেতে গঙ্গা বন্দী হইল কেমনি ॥ [নারিকেল]

ঙ। বিনি বোঁটায় ফুটে ফুল, দেখিতে সুন্দর।
[সিন্দূর বিন্দু]

চ। ধরিয়া উবুত করিয়া চিত।
ভিতরে গেলেই মন পিরীত ॥ [ভাত]

ছ। গাছ কাট গাছালি কাট গাছের কাট মাজা।
শও শও কুড়ালে কাট তবু না যায় কাটা ॥ [ছায়া]

জ। ধোবায় না দেয় ধুইয়া দর্জি না দেয় সিয়া ॥
সেই কাপড় খান পরিয়া গেনু বামুন পাড়া দিয়া ॥
[কলাপাতা]

গ্রন্থে ধাঁধাগুলি সঙ্কলনের সঙ্গে সঙ্গে ধাঁধা সম্পর্কে কিছু

আলোচনাও স্থান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'ছিল্কা' কথাটির উৎপত্তি বিষয়ে লেখকের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থটির পঞ্চম খণ্ড ধাঁধা বিষয়ক। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে। ডঃ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে লোক সাহিত্যের অপরাপর নানা বিভাগের সঙ্গে ধাঁধা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তবে স্বাভাবিক কারণেই এই আলোচনা ছিল স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। তবে ধাঁধা সম্পর্কিত আলোচনার মোটামুটি সূত্রপাত ঘটেছিল ১ম খণ্ডে বলা চলে। লেখক ধাঁধার সংজ্ঞা, লোক সাহিত্যে ধাঁধার স্থান, ধাঁধার বৈশিষ্ট্য, ধাঁধা ব্যবহারের ইতিহাস, বিশেষত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধাঁধার ব্যবহার, মধ্যযুগে বাংলার সমাজ জীবনে ধাঁধার আচারগত মূল্য, বাংলা ধাঁধার রচনারীতির বৈশিষ্ট্য, ধাঁধার বিষয় বস্তু, একই ধাঁধার বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত রূপ এবং পরিশেষে প্রকৃতি ও গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বনে রচিত ধাঁধার বিস্তারিত পরিচয় দান করেছেন। ১৩৬৮ সনে এই গ্রন্থটি প্রকাশের এক দশক পরে প্রকাশিত হয় লেখকের 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থটির ৫ম খণ্ডটি [ধাঁধা]। একটি সুবিশাল গ্রন্থে একটি মাত্র বিষয়ের আলোচনা স্থান পাওয়ায় স্বভাবতঃই ধাঁধা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ রচনার মর্যাদা লাভে সমর্থ হয়েছে বর্তমান গ্রন্থটি। তদুপরি এই সুদীর্ঘ এক দশকে লেখক বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে বহু সংখ্যক বিচিত্র ধাঁধা সংগ্রহ করায় একদিকে বহুসংখ্যক ধাঁধা সঙ্কলিত করা যেমন সম্ভবপর হয়েছে, সেই সঙ্গে ধাঁধা সম্পর্কিত আলোচনারও সম্পূর্ণতা লাভ সম্ভব হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থটি সর্বমোট দ্বাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। গ্রন্থের প্রারম্ভেই বিস্তৃত ভূমিকা সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিস্তৃত ভূমিকায় লেখক তাঁর ধাঁধা সম্পর্কিত

পূর্ববর্তী আলোচনাকেই [১ম খণ্ডে প্রকাশিত] বিস্তৃত পরিসরে স্থাপন করেছেন। তবে সেই সঙ্গে কিছু কিছু নূতন বিষয়েরও উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায়। পূর্বের আলোচনায় লেখক ধাঁধাকে বিষয় বস্তুগত ভাবে মুখ্যতঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন—সে দু'টি বিভাগ হল—প্রকৃতি ও গার্হস্থ্য জীবন বিষয়ক। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে বাংলা ভাষায় রচিত ধাঁধাগুলিকে দশটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—যেমন নরনারী, পশুপক্ষী, তৈজসপত্র, গাছপালা, গ্রহ-নক্ষত্র, প্রকৃতি, ব্যবহার, আচারমূলক, কাহিনীমূলক, গাণিতিক ও কাব্য ধাঁধা। এছাড়াও একটি পৃথক অধ্যায়ে 'কালিদাসের হেঁয়ালী' শীর্ষক আলোচনাটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ধাঁধার এই বিভাগগুলি থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে লেখক তাঁর পূর্বকৃত বিভাগ দুটিকেই অনেকগুলি পৃথক পৃথক উপবিভাগে বিভক্ত করেছেন। তবে বর্তমান গ্রন্থে ধাঁধাগুলির বিষয় বস্তুর ওপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সে তুলনায় ধাঁধার গঠন প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনা কিছুটা সীমিত পরিসরে স্থান পেয়েছে। তবে স্মরণ রাখতে হবে গ্রন্থটি মুখ্যতঃ ধাঁধার সঙ্কলন হিসাবেই রচিত। প্রসঙ্গত কিছু কিছু আলোচনা স্থান পেয়েছে। বিশেষত আমাদের দেশে প্রচলিত ধাঁধার সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশে একই বিষয় অবলম্বনে রচিত ধাঁধার দৃষ্টান্ত দেওয়ায় তুলনা মূলক আলোচনার ক্ষেত্রে বর্তমান সঙ্কলনটি বিশেষ সহায়ক হয়েছে। সেই সঙ্গে ধাঁধা রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মানুষের মানসিকতা ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে দৃষ্টিভঙ্গিগত ঐক্যের সন্ধান লাভ করা যায়। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ধাঁধা সঙ্কলিত হওয়ায় একই ধাঁধা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কেমন ভাবে প্রচলিত আছে, সেটা জানাও সম্ভবপর হয়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত নানাবিধ সামাজিক সংস্কার ও প্রথা সম্পর্কেও বহু তথ্য জানা যায়।

গ্রন্থটির দ্বাদশ অধ্যায়টি বিশেষ মূল্যবান সংযোজন। এই অধ্যায়ে লেখক মুখ্যতঃ ধাঁধার তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। ধাঁধা সংগ্রহের পদ্ধতি, বর্তমান কালে ধাঁধা সংগ্রহের অসুবিধা, ধাঁধার সংজ্ঞা প্রস্তুতিতে জটিলতা, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত ধাঁধা বিষয়ক গ্রন্থগুলির অসম্পূর্ণতা, ধাঁধার গঠন ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ, ধাঁধার ব্যবহারিক দিক, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ধাঁধার ভিন্ন ভিন্ন নাম ইত্যাদি বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরিশিষ্টে সঙ্কলনে গৃহীত বিভিন্ন ধাঁধার উত্তরের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্ণমালার নির্দিষ্ট ক্রম পরম্পরায় তা স্থান লাভ করেছে। তাই সকল দিক বিবেচনা করে স্বীকার করতে হয় যে বর্তমান গ্রন্থটি ধাঁধা বিষয়ক বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত এ যাবৎ সকল রচনা ও গ্রন্থাবলীর মধ্যে কেবল আয়তনেই নয়, সেই সঙ্গে বহুবিধ তথ্য ও আলোচনার জন্যেও শ্রেষ্ঠ স্থান লাভের অধিকারী।

তবু পরিশেষে একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। লেখক দ্বাদশ অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট বিবিধ আলোচনার প্রথমেই অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, 'বাংলার লোক-সাহিত্যে ধাঁধার কোন স্বতন্ত্র সংগ্রহ গ্রন্থাকারে এই পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই; কিংবা এ'যাবৎ লোক-সাহিত্য লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই ধাঁধার বিষয়টি তাহার মধ্যে আলোচনা—যোগ্যও বিবেচনা করেন নাই [পৃষ্ঠা ৫৮২]।' কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাতেই লেখকের এই বক্তব্যের অযথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে।

---

১. C. F. Potter ; [S. D. F. L]—Page—940
২. Maurice Bloomfield ; [S. D. F. L.] Page—939
৩. লাঠি
৪. ঘন ঘন গাঁটি
৫. গলায় সুপারি ঘুঙুরের মত।

বাংলা লোক কথা-চর্চার ইতিহাস

বাংলা গদ্য চর্চার ইতিহাসে যেমন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও ইউরোপীয় মিশনারীদের অবদান অনেকখানি, বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার ইতিহাসেও তেমনি ব্রিটিশ রাজকর্মচারী, এঁদের আত্মীয়বর্গ ও ইউরোপীয় মিশনারীদের উল্লেখযোগ্য অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রবাদকে বাদ দিলে এই সব বিদেশীয়দের অবদান সব থেকে বেশি যে ক্ষেত্রে, সেটি হল লোক-কাহিনী। অথচ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সেখানকার জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ নিজ দেশের লোক-সংস্কৃতি তথা ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিতি অর্জনের অভিপ্রায়ে লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমাদের দেশে বিদেশীয়দের লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করার পেছনে ছিল অনেকগুলি কারণ। কারণ-গুলিকে আমরা প্রধানতঃ রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক—এই তিন ভাগে বিভক্ত করতে পারি। লোক-কাহিনী তথা লোক-সংস্কৃতির অন্যান্য উপাদান সংগ্রহের মূলে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তা হল—ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা আমাদের দেশে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখার প্রয়োজনে, এদেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, এদেশীয় জনগণের জীবনযাত্রা সার্থক ভাবে উপলব্ধি করতে লোক-ঐতিহ্য সংগ্রহ ও তার সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

ইউরোপীয় মিশনারীরা এদেশে প্রধানতঃ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই এসেছিলেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা এদেশের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্য, এদেশের মানুষের অন্তরঙ্গ

হওয়ার জন্য, এখানকার জনসাধারণের আচার আচরণ, বিশ্বাস, লোক-ঐতিহ্য প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই কারণেই ইউরোপীয় মিশনারীদের বাংলাদেশ তথা ভারত উপমহাদেশের লোক-ঐতিহ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হতে দেখা গিয়েছে।

বহু পূর্ব থেকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও গবেষকদের এরকম ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে ভারত উপ-মহাদেশ লোক-কাহিনীতে সমৃদ্ধ, সমৃদ্ধ পৌরাণিক কাহিনীতেও। তাই ইংরাজ কর্মচারী, কর্মচারীদের আত্মীয় স্বজন এবং ইউরোপীয় মিশনারীগণ এদেশের নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্যাদি সংগ্রহের সময় লোক-কাহিনী সংগ্রহেও ব্যাপৃত ছিলেন আর এঁদের মধ্যে অনেকেই তৎকালীন প্রচলিত লোক কাহিনীর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন ও সংগ্রহ রীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই সমালোচক যখন বলেন, 'ব্রিটিশ রাজকর্মচারী তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও খ্রীষ্টান পাদরীরা যে তাগিদে বাংলাদেশে ভারতীয় লোক-ঐতিহ্যের সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন, তার অনেকটাই ছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিত' [১]—তখন সেই যুক্তির সারবত্তা অনুধাবনে আর কোন অসুবিধা থাকে না।

লোক-সাহিত্যের অপরাপর উপাদানের ন্যায় এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য উপাদানের তুলনায় [যেমন ধাঁধা] বাংলা লোক কাহিনীর ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির কারণ বাংলা লোক কাহিনী একদিকে যেমন রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, জাতক কাহিনী, বৃহৎকথা, কথা সরিৎ সাগর, বেতাল পঞ্চ বিংশতি, বিক্রম চরিত প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য থেকে বহু বিষয় গ্রহণ করেছে, তেমনি অপর পক্ষে আলেফ লায়লা, কাসাসুল আম্বিয়া, সয়ফুল মুলুক, বদিউজ্জামাল প্রভৃতি সংখ্যাতীত ফারসী কাহিনীর সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেছে। অথচ মজার কথা হ'ল ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারী কিংবা ইউরোপীয় মিশনারীরা ভারত

বর্ষের অপরাপর অঞ্চল থেকে লোক কাহিনী সংগ্রহে যে পরিমাণ উদ্যম ও নিষ্ঠা নিয়োগ করেছিলেন, বাংলাদেশের লোক-কাহিনী সংগ্রহে সে পরিমাণ উদ্যম নিযুক্ত করেন নি। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে বিদেশীয়দের দ্বারা সংগৃহীত ও সম্পাদিত ভারতীয় লোক কাহিনীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সঙ্কলনের উল্লেখ করা যেতে পারে—

ক। স্যার রিচার্ড টেম্পল সম্পাদিত 'Papers of Reverend S. Hiss. Lop Relating to Aboriginal Tribes of the Central Provinces. [১৮৬৬]

খ। মিস্ মেরী ফ্রেরে সম্পাদিত 'Old Deccan Days.' [১৮৬৮]

গ। চার্লস সোইনারটন রচিত 'The Adventure of the Punjab Hero Raja Rasalu and other Folk Tales of the Punjab. [১৮৮৪]

ঘ। এডওয়ার্ড জেবিট রবিনসনের রচিত—'Tales and Poems of South India' [লণ্ডন, ১৮৮৫]

ঙ। জেম্‌স হিনটন নোওলেস্ রচিত 'Folk tales of Kashmir' [১৮৮৬, লণ্ডন]

চ। ডক্টর এ. ক্যাম্বেল রচিত 'Santhal Folktales [১৮৯১]

ছ। উইলিয়াম ক্রুকের রচিত 'The Popular 'Religion and Folklore of Northern India [২য় খণ্ড ; ১৮৯৩ ; লণ্ডন]

জ। জেম্‌স ড্রুমণ্ড এণ্ডার্সন রচিত 'A Collection of Kachari Folktales and Rhymes' [১৮৯৫, শিলং]

ঝ। রিচার্ড কার্ণাক টেম্পল রচিত 'The Legends of the Punjab' [১ম খণ্ড ১৮৮৪ ; ২য় খণ্ড ১৮৮৫ ; ৩য় খণ্ড ১৯০০]

ঞ। চার্লস সোইনারটন রচিত 'Romantic Tales of the Punjab' [১৯০৪ ; লণ্ডন]

ট। উইলিয়াম ক্রুক রচিত 'Folktales of Northern India' [১৯০৬]

ঠ। এলিক এলিজাবেথ রচিত 'Simla Village Tales' [১৯০৬ ; লণ্ডন]

ড। ইভ্‌লিন মাস্টন গর্ডনের রচিত 'Folklore in the Central Provinces of India' [১৯০৮ ; লণ্ডন]

ঢ। সিসিল বম্পাস রচিত 'Folklore of the Santhal Parganas' [১৯০৯ ; লণ্ডন]

ণ। ক্যাপ্টেন এইচ. এল. হার্ডটনের 'Sport and Folklore in the Himalaya' [১৯১৩ ; লণ্ডন]

ত। মিসেস রবার্ট্‌স রচিত 'Khasi Folktales' [১৯১৪ ; লণ্ডন]

থ। চার্লস অগাষ্টাস কিনকেড রচিত 'Deccan Nursery Tales' [১৯১৪ ; লণ্ডন]

দ। মিস্‌ সি. ড্য. বুডোয়া স্টকস্‌ রচিত 'Folklore and customs of the Lepchas of Sikim' [১৯২৫]

ধ। আর গ্রেস্‌ লিউইসন রচিত 'Folklore of the Assamese' [১৯৩৬]

ন। উইলফ্রিড, ই. ডেক্সটার রচিত 'Marhathi Folktales' [১৯৩৮ ; লণ্ডন]

প। থিওফিল. এইচ. টোয়েন্টস রচিত 'Folktales of Chhatisgarh' [১৯৩৮ ; নিউইয়র্ক]

ফ। ভেরিয়ার এলউইন রচিত 'Folklates of Mahakosal' [১৯৪৪ ; লণ্ডন]

এইবার আমরা বাংলাদেশের লোক কাহিনী সংগ্রহ ও তার প্রকাশ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব এবং সেই আলোচনায় বিধৃত গ্রন্থ ও রচনাগুলিই আমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্যকে প্রমাণ

করবে যে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলাদেশের লোক কাহিনী সংগ্রহ দীর্ঘদিন উপেক্ষিত থেকেছে।

বাংলাদেশে লোক-কাহিনী সংগ্রহের সূত্রপাত ঘটে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। কলকাতা থেকে এই সময় প্রকাশিত হয় The Indian Antiquary এবং Descriptive Ethnology of Bengal। Antiquary-তে প্রকাশকাল থেকেই বাংলা লোক কাহিনীর বিভিন্ন উপকরণ প্রকাশিত হতে থাকে। Antiquary পত্রিকা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে যাঁর নাম স্মরণ করতে হয়, তিনি হলেন জি, এইচ, ড্যামাণ্ট। ড্যামাণ্ট এই পত্রিকায় সর্বমোট বাইশটি উপকথা এবং পরীকাহিনী প্রকাশ করেন। জার্নালের ১ম খণ্ডে ড্যামাণ্ট 'Bengali Folklore from Dinajpur' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। সত্যিকথা বলতে কি ড্যামাণ্টই বাংলাদেশের লোক কাহিনীকে পাশ্চাত্য দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেন। আর বাংলা লোক-কাহিনী সংগ্রহ ও চর্চার ইতিহাসেও ড্যামাণ্টের নাম চিরকাল পথিকৃৎ হিসাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'Descriptive Ethnology of Bengal' গ্রন্থটিও বাংলা লোক কাহিনী সংগ্রহ ও চর্চার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই গ্রন্থটির সঙ্গে যুক্ত উল্লেখযোগ্য নামটি হল Edward Tweit Delton। অবশ্য ডেল্টন ড্যামাণ্টের মত যত না লোক কাহিনী সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সে তুলনায় তাঁর বেশি লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনায়। এঁরা কেউই বাংলা লোক কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হননি। কিন্তু সেকথা বাদ দিলেও ড্যামাণ্ট এবং ডেল্টনের নাম বাংলা লোক কাহিনী সংগ্রহ ও চর্চার ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হবে।

বাংলা লোক কাহিনী সংগ্রহের প্রথম দিকের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত দু'জন বিদেশীয়ের অবদানের পর যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয়,

তিনি একজন বাঙ্গালী মিশনারী। নাম রেভারেণ্ড লালবিহারী দে [১৮২৪-১৮৯৪]। 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' রচয়িতা দোম এণ্টোনিও, যিনি ছিলেন ভূষণার রাজপুত্র ও পরবর্তীকালে ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান হন ও বাংলা গদ্য সাহিত্য রচনার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন, অনুরূপভাবে লালবিহারী দে'র নামও বাংলা লোক-কাহিনী তথা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইনিও ছিলেন ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান। তাঁর রচিত গ্রন্থটি হল 'Folktales of Bengal'। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি ইংরাজিতে রচিত হয় এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। রেভারেণ্ড দে তাঁর গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন আর, সি, টেম্পলকে; কারণ এই টেম্পলই এই ধরণের গ্রন্থ রচনায় লালবিহারীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। লালবিহারীর ভাষায়ঃ

'Captain Temple wrote to me to say how interesting it would be to get a collection of the unwritten stories which old women recite to children in the evenings, and to ask whether I could not make a collection.' [২]

এইবার লালবিহারীর বাংলা লোক-কাহিনী সংগ্রহের সূত্রটির সন্ধান করা যেতে পারে।

ছেলেবেলাতে তখনকার অপরাপর বাঙ্গালী ছেলেদের মত তিনিও বহু সংখ্যক লোক কাহিনী শুনেছিলেন। শুনেছিলেন এক বৃদ্ধার কাছ থেকে। কিন্তু এই সময়ের শোনা গল্পগুলি আর পরবর্তীকালে লেখকের প্রকাশিত সঙ্কলনে স্থান পায় নি। সঙ্কলিত গল্পগুলি বহু পরবর্তীকালের শোনা। এইবার সঙ্কলিত গল্পগুলির সূত্র লেখকের বক্তব্য থেকে উদ্ধার করা যাক—

'I found a Bengalee christian woman, who, when a little girl and living in her heathen home, had heard many stories from her old grand mother.

She was a good story teller, but her stock was not large; and after I had heard ten from her I had to look about fresh sources. An old Brahmin told me two stories, an old barber, three; an old servant of mine two; and the rest I had from another old Brahmin.' [৩]

লালবিহারীর সঙ্কলনটি বাংলা লোক কাহিনী সংগ্রহের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় সংযোজন হয়ে আছে। তবু এই সঙ্কলনটি যে আদর্শ সঙ্কলনের মর্যাদা লাভ থেকে কেন বঞ্চিত হয়েছে, সেই বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।

লোক কাহিনী সংগ্রহের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি আনুষঙ্গিক কাজ আছে, সেগুলি হ'ল—'বিস্তৃত টিপ্পনী, ব্যাখ্যামূলক নির্দেশিকা, পাদটীকা, পরিশিষ্ট, সূচী প্রণয়ন, ঐতিহাসিক ও সমালোচনা মূলক বিষয় পরিক্রমা এবং সুনির্বাচিত গ্রন্থ নির্দেশিকা সংযোজন করা।' [৪]

কিন্তু দুঃখের বিষয় লালবিহারীর গ্রন্থে এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট হয়নি। এর থেকেই প্রতীয়মান হয় যে তিনি সমসাময়িক কালের লোক কাহিনী সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। অথচ ড্যামান্ট ও ডেল্টন—তাঁর পূর্ব-বর্তীকালের এই দু'জন সংগ্রাহকের তুলনায় তাঁর পক্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লোক-কাহিনী সংগ্রহ করা ছিল অনেকখানি সহজতর। কারণ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দেই লণ্ডনে 'Folklore Society' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সময় থেকেই 'Folklore Record' নামে জার্ণালও প্রকাশিত হতে থাকে। এর ফলে লোক-কাহিনী সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটির সঙ্গে লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চাকারীরা অবহিত হন। বাস্তব ক্ষেত্রেও এর পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে যে সমস্ত লোক-কাহিনী সংগ্রাহক বাঞ্ছিত পদ্ধতিতে কাহিনী সংগ্রহ করতে অসমর্থ হতেন, তাঁরা নিজেদের ত্রুটির কথা প্রকাশ করে দিতেন

নিজেদের প্রকাশিত গ্রন্থের মুখবন্ধে বা ভূমিকায়।

লালবিহারী তাঁর সংগৃহীত কাহিনী সংগ্রহের সূত্র সম্বন্ধে যা বলেছেন, প্রয়োজনের তুলনায় তা প্রায় কিছুই নয় বলা চলে। কাহিনী কথকদের বিস্তৃত পরিচয় দান তিনি অনাবশ্যক বিবেচনা করেছিলেন। অথচ এদের বিস্তৃত পরিচয় ব্যতিরেকে কখনই সংগৃহীত কাহিনী উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করতে পারেনা। এছাড়াও রেভারেণ্ড দে তাঁর কাহিনীগুলি কথকদের কাছ থেকে শুনে সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেননি। কথকদের কাছ থেকে শুনে নিয়ে পরে বাড়ী এসে সেগুলি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ 'None of my authorities knew English, they all told the stories in Bengali and I translated them into English when I came home।'[৫] এর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে একটি কাহিনীর সঙ্গে অপর কাহিনী মিশে গেছে।

বাঙ্গালীদের জাতিতত্ত্বের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে ডেল্টনের পর যিনি স্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন, তিনি হলেন এইচ, এইচ, রিসলে। রিসলে রচিত 'The Tribes and customs of Bengal' গ্রন্থটি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি যে কেবল বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বহুবিধ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রকাশ করেছেন তাই নয়, সেই সঙ্গে বহু স্থানীয় কাহিনী ও লোককাহিনীও সংগ্রহ করে ছিলেন। এর পরই উল্লেখ করতে হয় একজন বিদেশীয় মিশনারীর, যিনি বাংলা লোক-কাহিনী সংগ্রহের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। তিনি হলেন উইলিয়াম ম্যাক্কুলোচ। ইনি ছিলেন নিম্নবঙ্গের United Free Church এর একজন ভূতপূর্ব মিশনারী। এঁর সঙ্কলিত লোক-কাহিনীর নাম হল 'Bengali House hold Tales'। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলনটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

অবশ্য সংকলক সঙ্কলনটি প্রকাশের দীর্ঘকাল পূর্বেই সঙ্কলিত কাহিনীগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। কাহিনী সংগ্রহের দীর্ঘকাল পরে সেগুলিকে প্রকাশ করার কারণ সংকলনটিতেই বিধৃত রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ২৮টি কাহিনী সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে। কাহিনীগুলি সঙ্কলক বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে-ছিলেন। সঙ্কলনে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সঙ্কলিত কোন কাহিনীই স্থান পায়নি। ম্যাক্‌কুলোচ [ম্যাককালুক] এর কাহিনী সঙ্কলনকেই প্রথম সার্থক বাংলা লোক-কাহিনী সঙ্কলনের মর্যাদা দিতে হয়। প্রথমতঃ তাঁর সঙ্কলিত প্রতিটি কাহিনীর সঙ্গে পূর্বভারত থেকে সংগৃহীত সমান্তরাল কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। যার ফলে পাঠকের পক্ষে সংগৃহীত কাহিনীগুলির তুলনামূলক আলোচনা করার সুযোগ লাভ সম্ভব। দ্বিতীয়ত, সঙ্কলনে গৃহীত কাহিনীগুলি সম্পূর্ণ মৌখিক ঐতিহ্য [Oral Tradition] থেকে সংগৃহীত। তৃতীয়ত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিশিষ্টের সংযোজন। তবে সঙ্কলনটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে ত্রুটি, তা হল সঙ্কলক কথকের উপযুক্ত পরিচয় প্রদান করেননি। কথক সম্পর্কে সঙ্কলক এইটুকু মাত্র জানিয়েছেন যে ইনি ছিলেন একজন খুব বুদ্ধিমান যুবক, জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং একজন রক্ষণশীল হিন্দু। এই কথকের বাসস্থান ছিল এক অতিশয় দূরবর্তী গ্রামে।

সঙ্কলনটি থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে সংকলক লোক কাহিনী সংগ্রহ ও সেগুলির আলোচনার জন্য উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবেই পরিচিত ছিলেন। সেই পরিচয়ের প্রমাণ তাঁর সংকলনটিতে বিধৃত রয়েছে।

বঙ্গভারতীর আমৃত্যু সেবক, বাংলা সাময়িক পত্র পরিচালক ও সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত এবং উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অঘোর কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। অঘোরনাথের

উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে আছে 'শ্রীনিবাস আচার্য চরিত', 'ভক্তচরিতামৃত' 'শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন চরিত' 'শ্রীহরিদাস ঠাকুর' ইত্যাদি। ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করে বলেছেন, 'বৈষ্ণব মহাপুরুষদের জীবনী লিখিলেন অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়। ইঁহার রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ভক্ত চরিতামৃত' ও 'হরিদাস ঠাকুর' [১৮৯৬] [৬]। ভক্তচরিতামৃতের সপ্রশংস সমালোচনা সেকালের অনেক মনীষীই করেছিলেন। এঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলা লোক সাহিত্য-চর্চার ইতিহাসে যে কারণে তিনি অন্তর্ভুক্ত হবার অধিকারী তা হল তাঁর অনন্য রচনা 'মেয়েলী ব্রত' [১৩০৩]। প্রকাশক সুর এণ্ড কোম্পানী। গ্রন্থের নামকরণ থেকেই সহজে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনুমিত হয়। প্রস্তাবনায় লেখক বলেছেন, 'আমাদের স্ত্রী সমাজে প্রচলিত ব্রতগুলির মধ্যে কতকগুলি শাস্ত্রীয়, যেমন সাবিত্রী ব্রত, অনন্ত ব্রত ইত্যাদি। আর কতকগুলি অশাস্ত্রীয় বা 'মেয়েলি শাস্ত্রীয়' যেমন সাঁজ পূজনী, পুণ্যিপুকুর, ও যমপুকুর ইত্যাদি। পুরোহিতের পুঁথিপত্রে এগুলির কোন বিধি বিধান পাওয়া যায় না। ...আমরা এইগুলিকেই 'মেয়েলি ব্রত' নামে অভিহিত করিয়াছি।'

গ্রন্থে যে সকল মেয়েলি ব্রতকথা স্থান পেয়েছে সেগুলি হ'ল— রা'ল দুর্গা বা পূর্ণিমার ব্রত, মঙ্গলবার বা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, সাঁজ পূজনী বা সেঁজোতি ব্রত, দশপুত্তল ব্রত, হরিচরণ ব্রত, ইন্দ্রপূজা, তোষলা ব্রত, পুণ্যি পুকুর ব্রত, যমপুকুর ব্রত, গোকুল ব্রত, অশ্বত্থ পাতার ব্রত, পৃথিবী ব্রত ইত্যাদি। এগুলি প্রথমে প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকায়।

গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ভূমিকাংশ থেকে জানা যায় যে মেয়েলি ব্রতকথাগুলি সংগ্রহ ও গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথই বিশেষ প্রেরণা দান করেছিলেন।[৭]

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন 'সাহিত্য সম্রাট' অভিধায় ভূষিত, 'কথা সাহিত্য সম্রাট' অভিধায় তেমনি সার্থক ভাবে ভূষিত হয়েছেন যিনি, তিনি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

দক্ষিণারঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, ঢাকা জেলার অন্তর্গত উলাইল গ্রামে। মাত্র ন'বছর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। এরপর তিনি তাঁর পিসিমা রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণীর দ্বারা লালিত পালিত হন। মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার অধীনে দীঘাপতিয়া স্থানে সন্তানহীনা পিসিমার কাছেই দক্ষিণারঞ্জন থাকতেন। রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণী ছিলেন বাংলার লোক কথার এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এঁর কাছ থেকেই দক্ষিণারঞ্জন লোক কথার প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হন। বাংলা লোককথা সংগ্রহের সংকল্পের মূলে তাঁর পিসিমার প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী।

দক্ষিণারঞ্জন গতানুগতিক শিক্ষায় খুব বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যদিও এফ, এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা শেষ করতে পারেননি।

খুব অল্প বয়সেই দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্যিক প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল। মাত্র ১৩ বছর বয়সেই 'প্রকৃতি' নামক তাঁর রচিত প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয়। ৩৫ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর পিতৃমাতৃ-হীন দক্ষিণারঞ্জন তাঁর বিধবা পিসিমার কাছে পুনরায় ফিরে যান। পিসিমাকে দেখাশুনা করা ছাড়া তাঁর সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্বও তাঁরই ওপর ন্যস্ত হয়। এই উপলক্ষেই তাঁকে সুদূর গ্রামাঞ্চলে পর্যটন করতে যেতে হত। আর এই গ্রামাঞ্চল পর্যটনের ফলেই তিনি গ্রামীণ সংস্কৃতি ও লোক জীবনের সঙ্গে যেমন গভীর ভাবে পরিচিত হন, তেমনিই এই সংস্কৃতি ও জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীকালে যে তিনি লোককথা সংগ্রহের ক্ষেত্রে এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তার পেছনে পিসিমার প্রভাব ছাড়া এই গ্রামাঞ্চল পর্যটন ও

তজ্জনিত গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ অনেকখানি কার্যকরী হয়েছিল।

এক বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ে দক্ষিণারঞ্জন লোককথা সংগ্রহ শুরু করেন। তখন আমাদের দেশ পরাধীন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যখন এই দেশ প্রভাবিত, গ্রাম্য সাহিত্য তথা লোক-সাহিত্যের প্রতি যখন কেউইদৃষ্টি দেবার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করত না, সেই সময়ে লোক সাহিত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি যথার্থ এক স্বাদেশিক কর্তব্য পালন করেছিলেন—'Through western education, this country was then becoming Europeanized in thoughts and manners when at the same time the Spirit of independence was drawing in the heart of the country folk. The result of this was the foundation of the National Congress. ....As till then the unsophisticated country folk was beyond their consideration. Dakshinaranjan did not fail to see this fact and be engaged himself in the services of the country, specially of the province of Bengal by placing before the countrymen the line of literature which is truly their own and which can make them feel their country in their heart and help them to proceed to independence in proper channel.' [৮]

মাত্র ২৯ বছর বয়সে [১৯০৬] দক্ষিণারঞ্জন কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। তখন কলকাতা রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তাল বিক্ষুব্ধ। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনে সারাটা দেশের তখন অগ্নিগর্ভ অবস্থা। দীনেশচন্দ্র সেন দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে। দক্ষিণা-রঞ্জন স্বর্ণকুমারীকে তাঁর সংগৃহীত 'পুষ্পমালা' গল্পটি দিলেন। স্বর্ণ-কুমারী গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ করলেন।

দীনেশচন্দ্র যখন দক্ষিণারঞ্জনের সংগৃহীত লোক কথাগুলির পরিচয় পেলেন, তিনি যারপরনাই মুগ্ধ হলেন এবং তিনিই স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে প্রকাশক ভট্টাচার্য এণ্ড সন্সের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এঁরাই প্রকাশ করলেন দক্ষিণারঞ্জনের সেই বহুখ্যাত 'ঠাকুরমার ঝুলি' [১৯০৭]। তারপর একে একে প্রকাশিত হল 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' [১৯০৯]; 'ঠানদিদির থলে' [১৯০৯]; 'দাদা মহাশয়ের থলে' [১৯১৩] ইত্যাদি।

আমরা ইতিপূর্বেই দক্ষিণারঞ্জনের লোককথা সংগ্রহের সূত্র ও প্রবণতা বিষয়ে উল্লেখ করেছি। তবু এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা এইবার করা যেতে পারে। পিসিমা রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবেই দক্ষিণারঞ্জন নানা শ্রেণীর গ্রামীণ মানুষের পরিচিতি অর্জন করেন। এ ছাড়া পিসিমার কাছ থেকেই তিনি ব্রতকথা ও গীতিকথা শিক্ষা করেন।

'ঠাকুরমার ঝুলি'র প্রথম সংস্করণে তিনি গল্পগুলি যে ভাবে সংগ্রহ করেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই অবিকৃত রূপে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার সরকার এবং অন্যান্যদের পরামর্শে সাধারণের বোধগম্য করার জন্য দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে গল্পগুলিকে পরিবর্তিত ভাষায় প্রকাশ করেন। কারণ তা না হলে সংগৃহীত গল্পগুলির ভাষাতত্ত্বগত মূল্য রক্ষিত হলেও সাধারণ পাঠকের পক্ষে এগুলির রসাস্বাদন করা সম্ভবপর হত না। লোক-কথাগুলির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এগুলির কথন রীতি। লিখিত ও পরিশীলিত সাহিত্যের মত এগুলি শুধু পড়ার নয়, আবৃত্তিরও। ছড়ার মত এগুলির রস উপযুক্ত আবৃত্তি ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। এগুলি পদ্যধর্মী গদ্য। কিংবা বলা চলে গদ্য কবিতার আদিম রূপ এগুলি। বিশেষ পরিবেষণের রীতি এগুলির আবেদনকে সার্থক করে তুলতে সহায়তা করে আর এই রীতির মূল বৈশিষ্ট্য হল কাব্যধর্মিতা। দক্ষিণারঞ্জন সর্বজন বোধ্য করার জন্যে সংগৃহীত

লোককথাগুলিকে মূল কথ্য ভাষা থেকে প্রকাশ করলেও কথাগুলির বর্ণনা ভঙ্গীকে বিসর্জন দেননি। বরং আবৃত্তির মূল বৈশিষ্ট্যটিকে সযত্নে রক্ষা করেছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করে বলেছেন ঃ '......এই বিষয়ে তিনি যে একটি আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পরবর্তী অনেক সংগ্রাহকই অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু কেহই সার্থক হইতে পারেন নাই।' রবীন্দ্রনাথও দক্ষিণারঞ্জনের বাক্‌রীতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, '—তিনি ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা বিশেষ রীতি তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।'

প্রথম বাঙ্গালী লোককথা সংগ্রাহক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। কিন্তু তিনি তাঁর সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ইংরেজিতে। সেদিক দিয়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বাংলা লোককথার প্রথম সংগ্রহ হিসাবে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র এক বিশেষ গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মূলতঃ এটি রূপকথার সঙ্কলন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় এই গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন ঃ 'The book has marked out an epoch in our literature'। তিনি এই আশাও করেছিলেন যে এই গ্রন্থটি দক্ষিণারঞ্জনকে খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিকদের সমপর্যায়ভুক্ত করবে। ঋষি অরবিন্দের ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হয়েছে।

এইবার 'ঠাকুরমার ঝুলি' থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধার করে উপরোক্ত বক্তব্যের যাথার্থ উপলব্ধি করা যেতে পারে—

'এক রাজার সাত রাণী। দেমাকে, বড়রাণীদের মাটিতে পা পড়ে না। ছোটরাণী খুব শান্ত। এজন্য রাজা ছোটরাণীকে সকলের চাইতে বেশি ভালবাসিতেন।

কিন্তু, অনেকদিন পর্য্যন্ত রাজার ছেলেমেয়ে হয় না। এত বড় রাজ্য, কে ভোগ করিবে? রাজা মনের দুঃখে থাকেন।

এইরূপে দিন যায়। কতদিন পরে,—ছোটরাণীর ছেলে হইবে। রাজার মনে, আনন্দ ধরে না; পাইক-পেয়াদা ডাকিয়া, রাজা, রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন,—রাজা রাজভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, মিঠাই মণ্ডা মণি-মাণিক যে যত পার, আসিয়া নিয়া যাও।' [দুধের সাগর / সাত ভাই চম্পা]

কিংবা, 'কুমীর ভাবিতেছে, "কাল তো আমার ছেলেরা বিদ্যা গজ্ গজ্ ধনুর্দ্ধর হইয়া আসিবে, আজ একবার দেখিয়া আসি।" ভাবিয়া কুমীররাণীকে বলিল, "ওগো, ইলিশ-খলিশের চচ্চড়ি, রুই কাত্লার গড়্গড়ি, চিতল-বোয়ালের মড়্মড়ি সব তৈয়ার করিয়া রাখ, ছেলেরা আসিয়া খাইবে।" বলিয়া কুমীর, পুরাণ চটের থান ছেঁড়া জালের চাদর, জেলে ডিঙ্গির টোপর পরিয়া একগাল শেওলা চিবাইতে চিবাইতে ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে গিয়া উপস্থিত।' [চ্যাং চ্যাং / শিয়াল পণ্ডিত]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই 'ঠাকুরমার ঝুলি' জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

'ঠানদিদির থলে' গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ব্রতের প্রণালী ও সেইসব ব্রতের কথাগুলি দক্ষিণারঞ্জন প্রকাশ করেছেন। তবে লেখক এই ব্রতের প্রণালীগুলি বর্ণনায় যতখানি আন্তরিকতারপরিচয় দিয়েছেন, ব্রতকথা সঙ্কলনের ব্যাপারে ঠিক ততখানি নিষ্ঠা দেখাননি স্বীকার করতে হয়।

জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত প্রণীত 'উপকথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সালে। গ্রন্থটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ডে ১৩টি করে গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। সঙ্কলনটিতে অবশ্য সব ধরণের গল্পই স্থান লাভ করেছে। শেয়ালের গল্প, বাঘের গল্প, হিরামন তোতার গল্প প্রভৃতি জীবজন্তুবিষয়ক উপকথা যেমনস্থান পেয়েছে, তেমনি রাজপুত্রের

গল্প, সওদাগর পুত্রের গল্প, সুবর্ণবরিষণ রাজার গল্প, শঙ্খ কুমারের গল্পের ন্যায় রূপকথা জাতীয় গল্পও সঙ্কলিত হয়েছে। গল্পগুলি অবিকৃত ভাবেই সঙ্কলিত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা লোক কথা চর্চার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী [১৮৬৪-১৯১৬]। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছোটদের মহাভারত', পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতি রচনার জন্য শিশু সাহিত্যিক হিসাবে সুপরিচিত। কিন্তু লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে তিনি যে কারণে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, তা হ'ল তাঁর 'টুনটুনির বই' [১৩১৭]। একথা ঠিক যে উপেন্দ্রকিশোরের বহু পূর্ব থেকেই বাংলা লোককথা সংগ্রহ মূলতঃ রূপকথার মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। অথচ লোককথার আর একটি উল্লেখযোগ্য যে বিভাগ উপকথা—সেগুলির প্রতি তেমন নজর দেওয়া হয়নি। কিন্তু লোককথা বা Animal Tales এর গুরুত্বও যে কম নয়, উপেন্দ্রকিশোরই সেটা সার্থক ভাবে প্রথমে উপলব্ধি করেন এবং তাঁর সেই উপলব্ধিরই ফলশ্রুতি আলোচ্য গ্রন্থটি 'টুনটুনির বই'।

'টুনটুনির বই'টিতে সর্বমোট ২৬টি গল্প সংগৃহীত হয়েছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে গল্পগুলি সবই উপকথা শ্রেণীভুক্ত—অর্থাৎ প্রতিটি গল্পে মনুষ্যেতর প্রাণী স্থান পেয়েছে। অবশ্য তাই বলে এই গল্পগুলি থেকে যে মানুষ একেবারে পরিত্যক্ত হয়েছে তা নয়। অধিকাংশ গল্পেই মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণী একসঙ্গে স্থান পেয়েছে। আবার শুধু মনুষ্যেতর প্রাণী অবলম্বনে রচিত গল্পের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। অবিমিশ্রভাবে মনুষ্যেতর প্রাণী অবলম্বনে রচিত গল্পের সংখ্যা হল ৯৭। মানুষের মধ্যে আছে রাজা, ব্রাহ্মণ, নাপিত, চাষা, বুড়ী, গৃহস্থ প্রভৃতি। অপর পক্ষে মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে একদিকে আছে যেমন শিয়াল, বাঘ, হাতী, বিড়াল, ভাল্লুক, ষাঁড়, ছাগলছানা, কুমীর ইত্যাদি তেমনি আছে কাক, চড়াই, টুনটুনি পিঁপড়া ইত্যাদি। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় মোট ২৬টি

গল্পের মধ্যে শিয়াল স্থান পেয়েছে ১৪টি গল্পে, এর পরই বাঘের স্থান। বাঘের স্থান ১১টি গল্পে। হাতী স্থান পেয়েছে মাত্র ৩টি গল্পে। বিড়াল ও কুমীর যথাক্রমে ২টি করে গল্পে স্থান লাভ করেছে। মোটামুটি ভাবে এর থেকেই বোঝা যায় যে বাংলা লোককথায় কি ধরনের জীবজন্তু স্থান পেয়েছে। আর শৃগাল ও বাঘই যে বাংলা লোককথার প্রধান দুই চরিত্র—সেই তথ্যটিও সুপরিস্ফুট।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে মন্তব্য করেছেন :

'......যদিও বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনে গোরু, কুকুর ও বিড়ালের মত পরিচিত জীব আর নাই, তথাপি তাহাদের সম্পর্কিত কোনও উপকথার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায় না। অথচ কুকুর কিংবা বিড়ালের বুদ্ধি-সম্পর্কিত বিশ্বাস দেশের সমাজে অপ্রচলিত থাকিবার কোনও কারণ নাই।' [৯]

কিন্তু 'টুনটুনির বই'য়ের সংগ্রহে উল্লিখিত জীবজন্তুর মধ্যে বিড়াল ও ষাঁড়ের স্থান লাভ যে ঘটেছে তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। গ্রন্থটিতে বিড়াল অন্ততঃ দুটি গল্পে স্থান লাভ করেছে। এমন কি ডঃ ভট্টাচার্যের নিজের সঙ্কলিত গ্রন্থেও [১০] একাধিক গল্পে বিড়াল স্থান পেয়েছে লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'অন্তিম হাসি' [পৃঃ ৫২০], 'বিড়ালের দোষ' [পৃঃ ৫৪৬] 'কালো বিড়াল' [পৃঃ ৫৫৭]। 'অন্তিম হাসি' শীর্ষক গল্পটির শেষাংশে সংযোজিত লেখকের মন্তব্যটিও এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে—

'বাংলার লোক কথায় বিড়াল চরিত্রের বিশেষ কিছুই স্থান নাই। ইহার কারণ বড়ই অস্পষ্ট। বিড়াল এবং কুকুরের মত পরিচিত জীব বাঙ্গালীর আর কিছুই নাই। অথচ ইহাদের সম্পর্কে কোন লোক-কথা প্রায় নাই বলিলেই চলে। বিড়ালের কোন গুণ নাই। দুধ মাছ চুরি করিয়া খাওয়া তাহার অভ্যাস। এই নিন্দিত আচার—আচরণের জন্য তাহার সম্পর্কেও কোন কাহিনী রচিত

হয় নাই। একমাত্র অরণ্য ষষ্ঠীর ব্রত কথায় তাহার একবার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এই কাহিনীটি একটি ব্যতিক্রম।' [পৃঃ ৫২২]।

কিন্তু ডঃ ভট্টাচার্যের কথামত 'অন্তিম হাসি' গল্পটিই যে একমাত্র ব্যতিক্রম নয়, তার প্রমাণ তাঁরই সঙ্কলিত বিড়াল সম্পর্কিত অপর দুটি উপকথা।

যাই হোক, উপেন্দ্রকিশোরের প্রসঙ্গে ফের ফিরে আসা যাক। উপেন্দ্রকিশোর জন্মগ্রহণ করেছিলেন মৈমনসিংহ জেলার মসূয়া নামক গ্রামে। গীতিকা'র সঙ্গে মৈমন সিংহের নাম বিশেষ ভাবে জড়িত ও লোক সাহিত্য রসিকদের কাছে পরিচিত। কিন্তু কেবল গীতিকা'ই নয়, লোক সাহিত্যের অপরাপর উপাদানেও মৈমনসিংহ যে বিশেষ সমৃদ্ধ, নানাভাবেই তা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি লোক কথাতেও এই জেলাটি যে কতখানি সমৃদ্ধ, উপেন্দ্র কিশোরের সঙ্কলনটিই তার প্রমাণ। উপেন্দ্রকিশোর মৈমনসিংহ জেলা থেকেই তাঁর গ্রন্থে সঙ্কলিত উপকথাগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। তবে তিনি মৈমনসিংহের প্রাদেশিক রূপটি ভাষার ক্ষেত্রে রক্ষা করেননি। কাহিনীগুলির ভাষা সর্বজনবোধ্য করার অভিপ্রায়ে পরিমার্জন করেছেন। এতে অবশ্য কাহিনীগুলি যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী প্রকাশিত হয়নি, স্বীকার করতে হয়। তবু মোটের ওপর লেখক কথা বলার ভঙ্গীটি রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন লক্ষ্য করা যায়। সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

'উপকথা বলিবার যে ভাষাটি আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, ইহার মধ্যে সেই ভাষাই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। উপকথাগুলির প্রধান রস কৌতুকরস, তাঁহার ভাষার ভিতর দিয়া কৌতুক রস সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন আছে বলিয়াই ইহাদের প্রাণ শক্তি যে রক্ষা পাইয়াছে তাহাই অনুভূত হইবে।' [১১]

'প্রতিভা'য় ১৩১৮ সনের চৈত্র সংখ্যায় 'বিধিলিপি' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটি হ'ল—

বনের ধারে ক্ষুদ্র একখানি কুটীরে এক বিধবা ব্রাহ্মণী একমাত্র পুত্রসহ বাস করিতেন। নিকটস্থ পাঠশালার গুরুমহাশয় দয়া করিয়া বিনা বেতনে ব্রাহ্মণ কুমারকে শিক্ষা দিতেন। গুরুমহাশয় একদিন স্নেহভরে ব্রাহ্মণ কুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, বাবা, আমার বিদ্যা ও জ্ঞান সবই তোমাকে দিয়াছি। এখন তুমি বিদেশে কোথাও কোন কাজ লইয়া দুঃখিনী মায়ের কষ্ট দূর কর। ব্রাহ্মণকুমার কর্মের অনুসন্ধানে দূর দেশে চলিয়া গেল। এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পর সে কর্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিল। মা সন্তানকে কত আদর করিলেন। মা ও ছেলে পাঁচ বৎসরের কত কথাই বলিল। কয়েক দিন পর মা ছেলেকে বিবাহ করিবার জন্য খুব করিয়া ধরিলেন। মায়ের আদেশ না মানিয়া চলিলে পাপ হয় বলিয়া ছেলে বিবাহে সম্মতি দিল।

বিবাহের পর ছেলে কর্মস্থলে চলিয়া গেল। এদিকে ব্রাহ্মণী নির্জন বনের ধারে সেই ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে বধূকে রাখা নিরাপদ নয় মনে করিয়া তাহাকে তাহার বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। আবার দুই বৎসর পর ছেলে প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিল। চারি পাঁচ দিন পর মা ছেলেকে বলিল, বাবা, এবার তুমি শ্বশুর বাড়ী যাইয়া বউমাকে লইয়া আইস। মায়ের আশীর্বাদ লইয়া পরদিন ছেলে শ্বশুর বাড়ী চলিল। কত দূর অগ্রসর হইলে একজন ভদ্রবেশধারী পথিক ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত মিলিত হইল। আগন্তুকের চেহারা ও ভাব স্বভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণ কুমারের মন কেন জানি দমিয়া গেল। দুইজন কেবলি হাঁটিতেছে। এমন সময় দূর মাঠে কতকগুলি গরু চরিতেছে দেখা গেল। আগন্তুক কি এক মন্ত্রে কৌশলে ব্যাঘ্র সাজিয়া তন্মধ্য হইতে দুইটি গরু মারিয়া ফেলিল। সংহার কার্য শেষ করিয়া সে ভদ্রলোকের মত ব্রাহ্মণ কুমারের নিকট ফিরিয়া আসিল। আবার দুইজনে চলিতে লাগিল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই এইবার দেখিতে পাইল, একটা খালে দাঁড়াইয়া

একজন ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছে। আগন্তুক কুমীর সাজিয়া জলে নামিল এবং ব্রাহ্মণকে বিনষ্ট করিল। আবার সে নিজ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণ কুমারের সঙ্গে চলিতে লাগিল। এসব দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণ কুমারের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু মন্ত্র-মুগ্ধের মত সেই অপ্রার্থিত সহযাত্রীর সহিত হাঁটিতে লাগিল। সে যেন কাহারও অধীন হইয়া পড়িয়াছে। আরও কতকটা পথ অতিক্রান্ত হইয়াছে, এমন সময় তাহার সঙ্গী বনের কাষ্ঠ আহরণ রত একটি কাঠুরিয়াকে অজগর হইয়া গিলিয়া ফেলিল।

অতঃপর আগন্তুক এক দিব্য মূর্তি ধারণ করিল এবং ব্রাহ্মণ কুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিল, দেখ, আমিই মানবের ভাগ্য বিধাতা। তুমি আমার কার্যপ্রণালী দেখিয়া বড়ই ভীত হইয়াছ দেখিতেছি। কিন্তু সংসারে এই ভাবেই অদৃষ্টের খেলা হইয়া থাকে। কর্মফলপ্রসূত ভাগ্যলিপির অন্যথা হইতে পারেনা। এই যে অকালমৃত্যু ও অপমৃত্যু দেখিলে, ইহাও ভাগ্যলিপি। আমার কার্যপ্রণালী তোমাদের নিকট অদ্ভুত। তুমি শ্বশুর গৃহে চলিয়াছ, এই দুই পাত্রে দধি দিলাম, সকলকে খাইতে দিও। সাবধান, তোমার জ্যেষ্ঠ শ্যালককে ইহার অংশ দিও না, তাহা হইলে সে বাঁচিবে না। আর তোমার নিজ অদৃষ্ট সম্বন্ধে জানিয়া রাখ, আজ হইতে দুই বৎসর পর পূর্ণিমা রজনীতে শূলে প্রাণ হারাইবে। আমিও তোমার সঙ্গে আসিতেছি, আজ রাত্রে তোমার শ্বশুর বাড়ীতে গৃহান্তরে অন্য এক প্রাণীর আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। তোমার সঙ্গে এই শেষ দেখা। আমাকে নির্মম অদৃষ্ট বলিয়া জানিও। এই কথা বলিয়া অদৃষ্ট দেবতা অদৃশ্য হইলেন। ব্রাহ্মণ কুমার দধি সহ শ্বশুর বাড়ী আসিল। জামাতার অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাবনায় জামাতার হৃদয় অবসন্ন।

পূর্ব কথামত অদৃষ্ট দেবতা অন্য গৃহ হইতে একজনের প্রাণবায়ু

লইয়া গেলে হরিবোল ধ্বনি শুনিয়া ব্রাহ্মণ কুমারের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। সে আপন স্ত্রীকে অদৃষ্ট দেবতার ভবিষ্যৎ বাণী বলিতে পারিল না।

গৃহিণীর মুখে কুটুম্বের আনীত দধির অপূর্ব স্বাদের কথা শুনিয়া গৃহস্বামীর দধি খাইবার বড় ইচ্ছা হইল। স্ত্রী অবশিষ্ট দধিটুকু স্বামীকে আনিয়া দিল। দধি খাইয়া শ্যালকের পেটে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হইল। ভগ্নীপতি যখন শুনিল, তাহার শ্যালক গোপনে দধি খাইয়াছে, তখনি সে বুঝিল, ইহার আর জীবনের আশা নাই। রাত্রি শেষ না হইতেই সব ফুরাইল, অদৃষ্টের জয় হইল।

শ্বশুরগৃহে কয়েকদিন থাকিয়া পত্নীসহ ব্রাহ্মণ কুমার মার নিকট ফিরিয়া আসিল। নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া সে আর কর্মস্থলে না যাইয়া মণিকর্ণিকার ঘাটের নিকট একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কুমারের মনে বড় আশা। গঙ্গার উপর থাকিলে শূলের ভয় নাই। দেখিতে দেখিতে শেষ পূর্ণিমা রজনী আসিয়া উপস্থিত। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত প্রায়, তবুও ব্রাহ্মণকুমারের ভয়।

এদিকে অদৃষ্ট দেবতা বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। গঙ্গার উপর শূলে মৃত্যু অসম্ভব, কি করিয়াই বা ব্রাহ্মণকুমারকে তীরে আনা যায়। ঠাকুর আর এক বিষম ফাঁপড়ে পড়িয়া মহাশক্তি ভগবতীর শরণাপন্ন হইলেন। মা বলিলেন, 'তুমি ভাবিও না, বিধিলিপি অখণ্ডনীয়।' অদৃষ্ট দেবতা চলিয়া গেলেন। সেই সময় সেই দেশের রাজার প্রিয়তমা মহিষী একাকিনী গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া দৈবযোগে পথ হারাইয়া গেলেন। ভগবতী মহিষী মূর্তিতে রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণকুমারের নৌকায় উঠিলেন। মহামায়ার মায়ায় ব্রাহ্মণকুমার দেখিল, দেশ হইতে তাহার স্ত্রী আসিয়া তাহাকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য কত সাধ্য সাধনা করিতেছে। কিন্তু শত অনুরোধ চাতুরী সবই বিফল হইল। মৃত্যুর করাল মূর্তি যাহার

হৃদয়ে অঙ্কিত, রমণীর মায়াজাল তাহার কি করিতে পারে? বিফল মনোরথ হইয়া রাণী ব্রাহ্মণকুমারের পার্শ্বে আঁচলা বিছাইয়া শুইয়া রহিলেন। এদিকে রাণী ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর রাজা দেখিলেন, তাঁহার প্রাণতুল্যা মহিষী এক ব্রাহ্মণকুমারের পার্শ্বে শুইয়া আছে। এ চিত্র দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। রাত ভোর না হইতেই ভীষণ মশানে ব্রাহ্মণ কুমারকে শূলে চড়াইবার হুকুম হইল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণকুমারের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। অদৃষ্টের জয় হইল।—

গল্পটিতে একাধিক অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়েছে। অভিপ্রায়গুলি হল—নিষেধাজ্ঞা [Taboo : Eating certain things ; c220] নিষেধ ভঙ্গ জনিত মৃত্যু [c920], অদৃষ্ট [N. Chance and Fate] ইত্যাদি। নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত ত্রুটি প্রসঙ্গে আভিধানিক উদ্ধৃতিটি 'বিধিলিপি' গল্পটির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ধৃত করা গেল : 'The basic motif of countles folk-tales Occuring every where in the world, in which the life, happiness, success or failure of the character depends upon the observation or violation of some tabu....There are numerous stories also involving eating and drinking tabus, looking, touching, speaking, saying tabus, boasting, laughing etc.' [১২]

অর্থাৎ শ্যালক যে মারা গেল তার কারণ অদৃষ্টদেবতা প্রদত্ত দধি ভক্ষণ—যা ভক্ষণ করতে অদৃষ্টদেবতা নিষেধ করেছিলেন। আর ব্রাহ্মণকুমারের শত চেষ্টাতেও যে জীবন রক্ষা হ'ল না তার কারণ আর কিছুই নয়, অদৃষ্ট।

বাংলা লোক কথা চর্চায় যে ক'টি পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে একটি হ'ল 'প্রতিভা'। 'প্রতিভা'র ১৩১৯ সালের কার্তিক সংখ্যায় 'ছদ্মবেশী' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে।

গল্পটি নরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক মৈমনসিংহ জেলা থেকে সংগৃহীত।

'এক দরিদ্র গৃহস্থ। দিন আনে দিন খায়—কোন রকমে কায়-ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া আছে ; কিন্তু দুঃখের উপর আরও দুঃখ—তাহার স্ত্রীর সন্তান হইয়া বাঁচে না, কোনটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া এক দিন, কোনটি দুই দিন কোনটি তিন দিনের হইতে না হইতেই মরিয়া যায়। এইরূপে একুশটি সন্তান মারা গেল। একে দারিদ্র্য দুঃখ তাহাতে আবার পুত্রশোক। গৃহস্থ ও গৃহস্থপত্নী একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। দিন যাইতে লাগিল। একদিন গৃহস্থপত্নী অন্নজল ত্যাগ করিয়া প্রাণ বিসর্জনের উদ্দেশ্যে 'হত্যা' দিয়া পড়িয়া রহিলেন। ক্রমে একদিন দুই দিন করিয়া তিন দিন চলিয়া গেল। গৃহস্থ পত্নী জলও গ্রহণ করিলেন না।

ভগবানের একটু দয়া হইল ; তিনি এক ভিখারী ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত। লোকজন কেহ নাই, গৃহিণী শয্যাগত, উত্থানশক্তি রহিত। ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণীর নিকটবর্তী হইয়া বলিলেন : 'মা' তোমার কি হইয়াছে, আমায় বল ;—আমি ভিক্ষুক তোমার দ্বারে উপস্থিত।' গৃহিণী সহসা এই মা সম্বোধন শুনিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন ; দেখিলেন, সম্মুখে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তিনি করযোড়ে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিল,—'মা গাত্রোত্থান কর, এবং আমায় বল, তোমার কি হইয়াছে।' গৃহস্থপত্নী তখন বলিলেন,—'আর উঠিয়া কি হইবে, এ প্রাণ আর রাখিব না।'

ব্রাহ্মণ দেখিলেন বড় বিপদ। তাই বলিলেন—'মা আমি ব্রাহ্মণ, আমার কথা শুন, তুমি উঠ এবং আমার নিকট তোমার মনের দুঃখের কারণ খুলিয়া বল।' তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং ব্রাহ্মণের নিকট আপন দুঃখ দারিদ্র্যের কথা খুলিয়া বলিলেন। ব্রাহ্মণের মন ভিজিল, তিনি বলিলেন, 'মা, তুমি একচোরা ব্রত কর।

তোমার মঙ্গল হইবে, তোমার সন্তানের কোন অমঙ্গল হইবে না।' গৃহস্থ পত্নী জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রভু, ব্রতের নিয়ম কি?'

তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মা, তুমি দরিদ্রা, কোন প্রকারে ভক্তি ভাবে একচোরা ঠাকুরকে পূজা কর, তোমার মনোবাসনা সিদ্ধ হইবে। এই ব্রতে চাউলের গুঁড়া লাগিবে। তুমি আতপ চাউল সংগ্রহ করিতে পারিবে কি? না পার, সিদ্ধ চাউল ব্যবহার করিও। তাতে বাধা নাই। কলার পাতে চাউলের গুঁড়া দিয়া ভোগ দিও: পারিলে দধি দুগ্ধ দিও, না পারিলে দিও না। সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ব্রতিনীকে সেদিন থাকিতে হইবে জানিও।' ভিখারী ব্রতের নিয়মগুলি বলিয়াই অদৃশ্য হইলেন।

গৃহিণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া শুদ্ধ ভাবে স্নান আহ্নিক করিয়া ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। প্রতি মাসে নিয়মিত রূপে ব্রত করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তাহার গর্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে একটি ছেলে হইল। গৃহস্থ ও তাহার পত্নী আনন্দে আটখানা হইয়া গেল।

ছেলে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। গৃহস্থের অবস্থা এখন বেশ সচ্ছল। অভাবে পড়িলেই দেবতার আদর হয়, সুতরাং এখন আর গৃহস্থ পত্নী সেই একাচোরা ব্রত প্রতি মাসে না করিয়া তিন মাস পরে করিয়া থাকেন। কখনও ছয় মাস চলিয়া যায়।

আজ ছেলের অন্নারম্ভ। দেবদেবীর পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালী বিদায়ের মহা ঘটা; কিন্তু একচোরা ব্রতের কোন আয়োজন নাই; গৃহিণী ভুলিয়া গিয়াছেন। এমন সময় এক ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ক্রমে ব্রাহ্মণ ভিতরে গিয়া বাড়ীর দাসীকে বলিল, 'ঝি, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে চারটি চাউলের গুঁড়া আর একটি বীচিকলা দিতে পার? তাহা হইলে আমার ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারি।'

ঝি বাড়ীর ভিতরে গৃহিণীকে ব্রাহ্মণের কাতর প্রার্থনা জানাইল। গৃহিণী শুনিয়া চটিয়া উঠিলেন। আমার বাড়ীতে আজ রাজভোগ তোর কাছে চাউলের গুঁড়া, কলা চাহিল কে। এখানে ঐসব কিছুই নাই।

ব্রাহ্মণ গৃহিণীর কথা শুনিয়া চটিয়া গেল এবং বলিল—'শুন ঝি! তোমার কর্ত্রীর বড় অহঙ্কার হইয়াছে, আচ্ছা!' এ কথা শুনাইয়া ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিল; কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে বালক ঘুমাইতেছিল, কেহ আর তাহার খবর লইতেছে না। কিছুকাল পরে যখন তাহার খোঁজ পড়িল, তখন বালককে জাগাইতে যাইয়া দেখে সর্বনাশ! বালক জীবিত নাই তাহার সর্বাঙ্গ শীতল। বাড়ীতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। আমোদ প্রমোদ থামিয়া গেল। বাদ্যভাণ্ড সব বিদায়। গৃহিণী মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছেন।

সহসা গৃহিণীর মনে পড়িল, তিনি যে দেবতার বরে ছেলে পাইয়াছিলেন, সেই একচোরার ব্রতেরই কোন আয়োজন নাই। তখন তাহার মনে জাগিল—দাসীর কাছে যিনি চাউলের গুঁড়া চাহিয়াছিলেন, তিনিই সেই ছদ্মবেশী একচোরা ঠাকুর। তাড়াতাড়ি গৃহিণী পূজার 'আগ' রাখিয়া ঝিকে সঙ্গে লইয়া একচোরা ঠাকুরের উদ্দেশে বাহির হইলেন। পথে তাহাদের সঙ্গে সেই ঠাকুরের সাক্ষাৎ হইল। গৃহপত্নী সেই ব্রাহ্মণের পা জড়াইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন 'ঠাকুর, দোহাই তোমার, আমার ছেলেকে বাঁচাও। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তোমার বড় অহঙ্কার হইয়াছে। তুমি আমার বরে সন্তান লাভ করিয়াছ, আর এখন আমাকে তুচ্ছ করিতেছ। এক মুষ্টি চাউলের গুঁড়া দিতে যার এত শৈথিল্য, তার সন্তানের আবশ্যকতা কি? তুমি যেমন অলক্ষী, তেমনই থাক।' গৃহস্থপত্নী বড় কাঁদাকাটি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাহার আবদার ছাড়াইতে পারিলেন না। তাহার মন ভিজিয়া গেল। তিনি

বাঁচাইয়া দিলেন আর বলিলেন, 'একচোরা ব্রত কখনও ভুলিও না। ভুলিলে তোমার সর্বনাশ হইবে।'

গৃহস্থপত্নী এখন হইতে কায়মনে আবার ব্রত আরম্ভ করিলেন। তাহার সংসার সুখের হইল। সেই অবধি জগতে একচোরা ব্রত প্রচলিত হইল।'

গল্পটির মাধ্যমে 'একচোরা' ব্রতের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে বাংলা লোককথার এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হ'ল ব্রতকথা। ব্রতকথায় যেসব দেব দেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা সকলেই লৌকিক দেব দেবী। গার্হস্থ্য—কল্যাণে ব্রতকথাগুলির সুদূর প্রসারী ভূমিকা সম্পর্কে বাংলার লোক জীবন গভীর ভাবে বিশ্বাসী। এককালে ধাঁধার আচারগত মূল্য ছিল, কিন্তু আজ আর তা নেই। অথচ ব্রত ও তার অচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বরূপ কথাগুলির আচারগত মূল্য আজও অটুট রয়েছে। একটা জিনিষ লক্ষ্য করার যে ব্রতকথায় দেবতা ও মানুষ একাকার হয়ে গিয়েছে। ব্রতের উৎস প্রসঙ্গে যথার্থই বলা হয়েছে, 'ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, কোন ধর্ম বিশেষের কিংবা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এটাও বেশ বলা যায় যে, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা বিপর্যয় ঘটত—সেই গুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষে বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত। [১৩]

আমাদের দেশের গ্রাম্য সমাজে যেসব ব্রত প্রচলিত আছে সেগুলির অধিকাংশই কৃষিসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত। আর এদের অধিকংশই গুহ্য যাদু ও প্রজনন শক্তির পূজার নামান্তর মাত্র। আমাদের আলোচ্য ব্রতকথাটি মূলত প্রজনন শক্তি লাভের সঙ্গেই যুক্ত দেখা গেছে।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত রচিত 'পিসীমার গল্প' দু'টি খণ্ডে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৩২০ বঙ্গাব্দ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ

কাল ১৩২১ বঙ্গাব্দ। গ্রন্থটি বাংলা লোককথার সঙ্কলন। প্রথম খণ্ডে শান্তিজল, রাজভৃত্য, বিচক্ষণ, স্বর্ণদ্বীপের রাজা, হীরামতি, রূপের বিষ, সংসার, চারিবন্ধুর বিদেশ ভ্রমণ, লাবণ্যবতী ও রামু এবং রাক্ষস এই ন'টি গল্প স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে মোট ১১টি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। গল্পগুলি হ'ল যথাক্রমে বাঘের বিয়ে, দেওয়ান ও রাজগুরু, খুড়া ভাইপো, যম ও নাই আঁকড়ে, গরীব কবি, সাত মামা এক ভাগ্নে, রাজা ও রাজপুত্র, দানের ফল, প্রেম ও প্রতিহিংসা, ফুল ঝুর-ঝুরি ও পুণ্যের পুরস্কার।

গ্রন্থের ১ম খণ্ডের মুখবন্ধে বলা হয়েছে :

"চৌধুরী বাড়ীর বৃদ্ধা গৃহিণী বড় সৌভাগ্যবতী, তাঁহার পুত্র-পৌত্র, দুহিতা দৌহিত্র, বৌ-ঝি অনেক। বৃদ্ধা সংসারের কিছুই দেখাশুনা করেন না, কেবল সন্ধ্যাহ্নিক, জপ তপ লইয়াই দিন রাত্রি অতিবাহিত করেন, কেবল অপরাহ্ণে একটিবার স্বপাক আহার করেন। কিন্তু সন্ধ্যাকালে তাঁহার ছোট ছোট পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রীরা তাঁহাকে ছাড়ে না, তাহাদিগকে উপকথা শুনাইতে হয়। সন্ধ্যাকালে উপকথার সৎ শিক্ষা দিবার প্রথা আজিকালি সহরে-ত নাই, মফস্বলেও প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। চৌধুরী বাড়ীর শিশুরা কিন্তু উপকথা না শুনিয়া বৃদ্ধা চৌধুরী গিন্নীকে ছাড়িত না বলিয়া, তিনিও তাহাদিগকে গল্প শুনাইতে কৃপণতা করিতেন না। তিনি বহুদিনের অভ্যাস ছাড়িবেন কেমন করিয়া, তজ্জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যার দীপ জ্বলিতে আরম্ভ করিলে শিশুরা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিত, তিনিও কোনদিন একটি, কোনদিন দুইটি, গল্প ছোট হইলে কোন দিন তিনটিও বলিতেন। আমরা সেই গল্পগুলি ক্রমশঃ "দিদিমার গল্প" নাম দিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"

গল্প বলার ভঙ্গিতেই সঙ্কলিত গল্পগুলি রচিত।

এ পর্যন্ত গেল 'পিসিমার গল্পে'র অন্তর্গত গল্পগুলি সংগ্রহের ইতিহাস। শুধু সূত্র বলেই নয়, সেই সঙ্গে আমাদের সমাজ জীবনে

লোক-কথার স্থান কি ছিল, শিক্ষাদানের মাধ্যম যেমন ছিল রামায়ণ মহাভারতের গান, কিংবা কথকতা, যাত্রা ইত্যাদি, তেমনি লোক-কথাগুলি আপাত দৃষ্টিতে নিছক ছেলে ভুলানো ব্যাপার বলে মনে হলেও শেষ পর্যন্ত এইসব গল্প যে নীতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতো, লেখকের মুখবন্ধে তার সুন্দর ইঙ্গিতটি লক্ষ্য করার মত।

'বিক্রমপুর পত্রিকা'য়, বৈশাখ সংখ্যায় [১৩২০] প্রকাশিত 'শিকড়ের গুণ' গল্পটি নিম্নরূপ।

'এক মস্ত বড় সওদাগর। সওদাগরের দুই স্ত্রী প্রথমার নাম রতনমালা, আর দ্বিতীয়টার নাম কাঞ্চনমালা। রতনমালার কোন ছেলে মেয়ে নাই। কাঞ্চনমালার এক পুত্র ও এক কন্যা নাম নারায়ণ ও কমলা। রতনমালার গর্ভে কোন ছেলে মেয়ে না হওয়ায় সওদাগর বৃদ্ধ বয়সে কাঞ্চনমালাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে পুত্র ও কন্যা লাভ করিয়া সওদাগর হাতে স্বর্গ পাইলেন। দিন রাত কাঞ্চন-মালার পুত্র ও কন্যা লইয়া আনন্দে দিন কাটান। রতনমালার কিন্তু সতীনের ছেলেমেয়ের প্রতি সওদাগরের এত আদর যত্ন বড় ভাল লাগিত না। তবু উপায় কি? সওদাগরের ভয়ে সতীন ও তাহার পুত্র এবং কন্যাদিগকে কিছু বলিতে পারিতেন না। নারায়ণ ও কমলা নিজ মায়ের চেয়েও বড়মাকে বেশী ভালবাসিত।

কিছুদিন পরে সওদাগর বাণিজ্যে গেলেন। বাণিজ্যে যাইবার সময় উভয় স্ত্রীকে ছেলেমেয়ে দুইটিকে লইয়া মিলিয়া মিশিয়া শান্তি সুখে থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া গেলেন। সওদাগর বাড়ী হইতে যাওয়ার পর হইতেই রতনমালার আধিপত্য বাড়িল। কাঞ্চনমালা নিজের ছেলে মেয়ে দুইটিকে লইয়া অতি সতর্কে দিন কাটান। তাহার বাপের বাড়ীর বুড়ী দাসীও কাজ কর্মে সকল বিষয়েই তাহাকে খুব সাহায্য করে। মানুষ হাজার সাবধান থাকিলে কি হয়? দুষ্ট লোকের কূটচক্র ভেদ করা বড় সহজ কথা নয়।

একদিন দুই সতীনে মিলিয়া গঙ্গা স্নান করিতে গেলেন। দুষ্ট রতনমালা কাঞ্চনমালার চুল ধুইয়া দিবার ছল করিয়া একখানা শিকড় যেমনি চুলের গোড়ায় বাঁধিয়া দিল, অমনি সে একটা কচ্ছপের আকার ধারণ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। রতনমালা কৃত্রিম ভাবে নানা ছাঁদে কাঁদিয়া বাড়ী ফিরিল। সওদাগর বিদেশে, তিনি এই ঘটনার কিছুই জানেন না। কাঞ্চনমালার দাসী প্রমাদ গণিল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিয়া সে নারায়ণ ও কমলাকে লইয়া গঙ্গার তীরে একখানা কুটীর নির্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল। রাত্রি গভীর হইলে সে নদীর তীরে আসিয়া বলিত,—

'ওঠ, ওঠ, কাঞ্চনমালা,
দুধ দাও তোমার নারায়ণ কমলা,
আসিবেন সওদাগর বাঁধিবেন রতনমালা,
রাজ্যভোগ করবে তোমার নারায়ণ কমলা ॥'

বুড়ীর ডাকে একটা মস্ত বড় কাছিম জল হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া কুটীরে প্রবেশ করিত এবং কয়েকটা ডিম পাড়িয়া পুনরায় নদীর গভীর জলে ডুবিয়া যাইত।

এইরূপে এক বৎসর যায়। সওদাগর বাড়ী ফিরিবার পথে ঐ কুটীরের পাশ দিয়া নৌকায় করিয়া চলিয়াছেন। অমাবস্যার ভীষণ অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না; সওদাগরের নৌকা সেই কুটীরের ঘাটেই আসিয়া লাগিল। সওদাগর কুটীরের ভিতর আলোক দেখিয়া চাকরকে বলিলেন, ঐ যে লোকের বসতি দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকে আগুন নিয়ে এসে রান্নার যোগাড় কর। কুটীরের দ্বারে আসিয়া দেখে যে একটি প্রাচীন স্ত্রীলোক 'ওঠ ওঠ কাঞ্চনমালা' বলিয়া ডাকা মাত্র মস্ত বড় একটা কাছিম জল হইতে উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ডিম পাড়িয়া চলিয়া গেল। চাকর এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি যাইয়া তাহার প্রভুর নিকট সব কথা খুলিয়া বলিল। ইহাও বলিল যে সেই

ঘরে তাঁহার পুত্র কন্যা কর্ত্রীমার দাসীকেও দেখিয়াছে। চাকরের মুখে এ সব শুনিয়া সওদাগর দ্রুতপদে সেই কুটীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দাসী ঐরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে সওদাগরকে সেখানে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পুত্র ও কন্যা পিতাকে দেখিয়া তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সওদাগর দাসীর মুখে সব কথা শুনিয়া পুনরায় কাঞ্চনমালাকে ডাকিতে বলিলেন। দাসী যেমনি ডাকিল—

ওঠ ওঠ কাঞ্চনমালা,
দুধ দাও তোমার নারায়ণ কমলা।
এসেছেন সওদাগর বাঁধিবেন রতনমালা,
রাজ্যভোগ করবেন তোমার নারায়ণ কমলা॥

অমনি কচ্ছপরূপী কাঞ্চনমালা আবার সেই কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সওদাগর কচ্ছপটিকে ধরিয়া যেমন মাথায় হাত দিয়া আদর করিবেন, অমনি একটা শক্ত বস্তু হাতে লাগিল। উহা কি দেখিবার জন্য আলোর নিকট যাইয়া দেখিলেন যে একটা শিকড়,—সওদাগর তাড়াতাড়ি ছুরি দিয়া যেমন শিকড়টাকে কাটিয়া ফেলিলেন, অমনি কাঞ্চনমালা পুনরায় মনুষ্য দেহ ধারণ করিল। সওদাগর পরম সন্তুষ্ট মনে পুত্র কন্যা ও স্ত্রী সহ নৌকায় গেলেন এবং পর দিবস খুব ভোরে যাইয়া বাড়ীর ঘাটে পৌঁছিলেন। চাকর বাড়ীতে যাইয়া বলিল যে, কর্তার আদেশে তাঁহার দুই স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ নদীর ঘাটে যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবেন।

রতনমালার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এখন উপায়? রতন মালার দাসী বলিল, ভয়কি? আমি তোমাকে নিয়ে নৌকায় যাচ্ছি। তুমি সওদাগরকে বলবে কাঞ্চনমালা নদীতে স্নান করতে যেয়ে জলে ডুবে মারা গিয়েছে। কত খুঁজেছি, কোথাও তার সন্ধান পাই নাই। দাসী বেটীকে কত বোঝালেম, ছেলেমেয়ে দুটিকে কত আদর যত্ন কল্লেম; কিন্তু দাসী তাদের নিয়ে কোথায়

যে চলে গেল, আমি কোন খোঁজই পাচ্ছিনে। সেই অবধি বড়ই মনের কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। দাসীর কথামতই কাজ হইল। রতন মালা নৌকায় উঠিয়া কাঁদিয়া পড়া মাত্রই কাঞ্চনমালা পুত্রকন্যা সহ বাহিরে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। রতনমালা ও তাহার দাসীর মুখ একেবারে শুকাইয়া গেল। প্রাণের ভয়ে উভয়ে সওদাগরের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা চাহিল। কাঞ্চনমালার অনুরোধে সওদাগর তাহাদিগকে প্রাণে না মারিয়া বনবাস দিলেন; আর সুশীলা পত্নী কাঞ্চনমালা ও পুত্র কন্যা নারায়ণ ও কমলাকে লইয়া মনের সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।'—

এই কাহিনীতে অনেকগুলি অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। যেমন—মানুষের শুশ্রূষাকারী পশু [B530], দুষ্কার্যের জন্য শাস্তিলাভ [Q200–Q399]; কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায়টি হ'ল ঐন্দ্রজালিক উপায়ে রূপান্তর ঘটা [Transformation by magic ; D200]। কাঞ্চনমালা শেকড়ের স্পর্শে কচ্ছপে রূপান্তরিত হয়েছেন। বলাই বাহুল্য যে শেকড়টা ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন। ঐন্দ্রজালিক উপায়ে রূপান্তর ঘটা ব্যাপারটি একটা আদিম বিশ্বাসের ফল। অনেক লোককথাতেই এই অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হয়েছে। এই সম্পর্কে অভিধানে বলা হয়েছেঃ

The changing of human beings, mythical characters, animals and even inanimate objects, into a different form is a literary device freely used in North American Indian tales. Transformation is effceted for a variety of reasons, some of which are : that the hero of tale may escape death, be able to reach a difficult place, kill his enemies, seduce women, win a Combat or receive food. [১৪]

ঢাকা বিক্রমপুর থেকে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও

'বিক্রমপুর পত্রিকা'য় [কার্তিক, ১৩২১ সাল] প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত গল্পটির নাম 'বাঘের দয়া'।

'এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। তাহার সন্তানাদি নাই। এক দিবস ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে, রাস্তায় অসময়ী নারায়ণী তাহাকে বলিল, 'ব্রাহ্মণ, কোথায় যাও আমাকে ভিক্ষা দাও।' ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, 'আমি নিঃসন্তান, অত্যন্ত দুঃখী। আমার নিত্য ভিক্ষা তন্নুরক্ষা।' অসময়ী নারায়ণী বলিল, 'তুমি এই হলদি দু'খানা নাও, তোমার অভাব মোচন হইবে। তোমার স্ত্রী ঋতুস্নান করিয়াছে, ইহাতেই সে অন্তঃসত্তা হইবে এবং তাহার একটি ছেলে জন্মিবে। ছেলের ষষ্ঠী, অন্নারম্ভ, বিবাহ প্রভৃতিতে আমায় তৈল সিন্দূর দিও— এবং পৃথিবীতে আমার ব্রত প্রচার করিয়া দিও।'

কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণের একটি ছেলে হইল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত বাড়ী চলিয়াছে—পথিমধ্যে এক বাঘের সহিত সাক্ষাৎ। বাঘ বলিল, 'ব্রাহ্মণ তোকে খাই।' ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, 'আমার ছেলে হইয়াছে পুরোহিত বাড়ী যাইতেছি, আমাকে খাইও না। 'বাঘ বলিল, 'বার বৎসর যাবৎ লোহার খাঁচায় আবদ্ধ বাঘিনীকে আনিয়া দিতে পারিলে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।' ব্রাহ্মণ 'তথাস্তু' বলিয়া চলিয়া গেল এবং বাড়ী আসিয়া অসময়ীর নিকট বাঘিনীর উদ্ধারের জন্য মানস করিল।

একদিন বাঘ বসিয়া আছে, এমন সময় দেখিল, সোনার খাঁচায় বাঘিনী আসিয়া উপস্থিত।

দৈবযোগে ঐ পথে এক পথিক যাইতেছিল। ব্যাঘ্র পথিককে হত্যা করিল এবং তাহার ধনরত্ন লইয়া ব্রাহ্মণকে পুরস্কার দিতে গেল। ব্রাহ্মণের বাড়ী আসিয়া বাঘ ডাকিল, 'বাবা, বাবা! বাহিরে আসুন, প্রণাম করিব।' ব্রাহ্মণ ভয়ে ছেলেটিকে উপরে রাখিয়া দ্বারপথে উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিল যে বাঘ কি করে। বাঘ বারান্দায় ধনরত্ন রাখিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল এবং বলিল, 'ভ্রাতার অন্নারম্ভে যেন নিমন্ত্রণ করেন।'

ব্রাহ্মণের ছেলের অন্নারম্ভ। সমস্ত স্ত্রী-আচারাদি সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু অসময়ী নারায়ণীর তৈলসিন্দূর দেওয়া হয় নাই। ছেলে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণী নানা ছাঁদে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ ব্রাহ্মণের মনে হইল যে অসময়ীর তৈলসিন্দূর দেওয়া হয় নাই। ক্ষিপ্রহস্তে ব্রতের নিয়মিত দ্রব্যাদি একত্রিত করিয়া উপস্থিত সকলে অসময়ী নারায়ণীর ব্রত করিল, ব্রতের গুণে ছেলে বাঁচিয়া গেল। ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে প্রচার করিয়া দিল যে, অসময়ে অসময়ী নারায়ণীর ব্রত করিলে কাহারও দুঃখ থাকে না, যে যাহা মানস করিয়া ভক্তিভাবে এ ব্রত করে, তাহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয়।'

গল্পটিতে যে সব অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশই পশু কেন্দ্রিক। যেমন মানুষের সেবায় নিযুক্ত পশু [B 292], বাক্‌শক্তি সম্পন্ন পশু [B 210], উপকারী বন্য পশু [B 430] ইত্যাদি। বাংলা উপকথার এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র হ'ল বাঘ। সচরাচর বাঘকে নির্বোধ রূপেই চিত্রিত হতে দেখা গেছে। কিন্তু আলোচ্য গল্পে বাঘের নির্বোধ রূপের পরিবর্তে তার এক ভিন্নতর পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। এর কারণ, আদিমযুগে ভগবানের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সঙ্গে ইতর শ্রেণীর পশুর পার্থক্যকে তেমন গণ্য করা হ'ত না। আকৃতি ব্যতিরেকে পশু ও মানুষের আচার আচরণ ছিল প্রায় একই—'To early man the animals were different only in shape, not in nature. He witnessed their acuteness and wisdom, in many cases also their superior strength and cunning....' [১৫]। অতএব আলোচ্য গল্পটিতে যে বাঘকে বাক্‌শক্তি সম্পন্ন, কৃতজ্ঞরূপে দেখা গেছে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই বলা চলে।

বিক্রমপুর থেকে ইন্দুবালা সেন কর্তৃক সংগৃহীত 'ঘাটাই' শীর্ষক নিম্নোদ্ধৃত গল্পটি 'প্রতিভা' পত্রিকায় ভাদ্র, ১৩২৪ সালে প্রকাশিত।

'এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর স্ত্রী এক গ্রামে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া কোন রকমে তাঁহাদের সংসার চালাইতেন। কিছুদিন পরে তাঁহাদের একটি মেয়ে হইল। তাহার নাম রাখিলেন ষাটাই। মেয়েটি বেশ বড় হইলে ব্রাহ্মণ তাহার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর একমাত্র সন্তান বলিয়া যাটাইকে তাহাদের কাছেই রাখিলেন।

বহুদিন গেল, যাটাইর আর সন্তান হয় না। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বড়ই দুঃখিত। ছেলেপিলে না থাকাতে বাড়ীই নিরানন্দ। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কত ব্রত, কত পূজা মানৎ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই যাটাইর সন্তান হইল না।

একদিন ব্রাহ্মণ দূরে ভিক্ষা করিতে গিয়াছেন; দেখিতে পাইলেন, একটা বটগাছের নীচে অনেকগুলি স্ত্রীলোক কি একটা পূজার আয়োজন করিতেছে। ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন; 'মা, এখানে কি পূজা হইতেছে?' স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে বলিল, 'আমরা মা ষষ্ঠীর পূজা করিতেছি।' ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ ব্রতের ফল কি? আর ইহার নিয়ম কি? তাঁহারা বলিলেন, এই ব্রত করিলে নিঃসন্তানের সন্তান হয় এবং যাহাদের সন্তান হইয়াছে, তাহাদের কোন অমঙ্গল হয় না। আর এই ব্রত শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীতে করিতে হয়; এবং যিনি ব্রত করিবেন, তিনি মাছ খাইবেন না, মাথায় ও শরীরে তেল মাখিবেন না।' ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, এই ব্রত আমার যাটাইকে দিয়া করাইলে যদি তাহার সন্তান হয়, তবে তাহাকে দিয়া এই ব্রত করাইব।

ব্রাহ্মণ ষষ্ঠীর কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী চলিয়াছেন। এদিকে মা ষষ্ঠী এক বৃদ্ধার বেশে পথে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মণের দেখা হইল। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রাহ্মণ, তুমি কোথায় চলিয়াছ? কি ভাবিতেছ?' ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার মেয়ে যাটাইর কোন সন্তান হইল না। তাই আমরা বড়ই দুঃখিত। আজ অনেকগুলি মেয়েকে ষষ্ঠীর ব্রত করিতে দেখিলাম। শুনিলাম,

এই ব্রত করিলে নাকি লোকের সন্তান জন্মে এবং সন্তানের মঙ্গল হয়। ষাটাইকে দিয়া ব্রত করাইলে তাহার সন্তান হইবে, তাই ভাবিতেছি। বৃদ্ধাবেশী ষষ্ঠী তখন বলিলেন, তুমি নিয়ম মত তোমার ষাটাইকে দিয়া ব্রত করাও, নিশ্চয়ই তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কিন্তু বাড়ীর সকলকে বলিয়া রাখিও, ষাটাইর যাহাই জন্মুক না কেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়া না দিয়া যেন যত্ন করিয়া রাখে।

ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিয়া ষাটাই ও তাহার মাকে সমস্ত কথা বলিলেন এবং তারপর হইতে ষাটাই নিয়ম মত ষষ্ঠীর ব্রত করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে ষাটাই সন্তান সম্ভাবনা হইল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী মহা আনন্দে ষাটাইকে পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত, সাত মাসে সপ্তামৃত, আট মাসে অষ্টামৃত ও নয় মাসে সাধ দিলেন। ব্রাহ্মণ যখনই ভিক্ষায় বাহির হইতেন তখনই ব্রাহ্মণীকে বলিয়া যাইতেন, 'ষাটাইয়ের যাহাই হউক না কেন, ফেলিয়া দিও না।'

একদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইয়া গেলে পর ষাটাইর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া সন্তানের পরিবর্তে একটা ঝুলি হইল। সকলেই ইহা দেখিয়া আশ্চর্য ও দুঃখিত হইলেন। এতদিনে বেশী বয়সে ষাটাইর যা ও সন্তান হইল, তা—ও একটা ঝুলি। ঝুলিটাকে রাখিয়া কি হইবে, ইহা ভাবিয়া সকলে বাঁশঝাড়ের নীচে সেটাকে ফেলিয়া আসিল। ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিলে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ব্রাহ্মণ শুনিয়া ব্রাহ্মণীকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন এবং ঝুলি কোথায় ফেলিয়াছে, তাহা জানিয়া বাঁশগাছের তলায় গেলেন। গিয়া দেখেন; ঝুলিটাকে কাকে ঠোকরাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। ঝুলির ভিতর হইতে ষাটটি ছেলে ও একটি মেয়ে বাহির হইয়া কিল্‌বিল্ করিতেছে। ব্রাহ্মণ একটি ঝুড়ি আনিয়া ছেলেগুলিকে ও মেয়েটিকে উঠাইয়া লইলেন এবং এতগুলি শিশু প্রতিপালন করা অসম্ভব ভাবিয়া রাজবাড়ীতে নিয়া গেলেন।

রাজাকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া বলিলেন, 'আমি এতগুলি শিশু প্রতিপালন করিতে পারি, এমন সাধ্য আমার নাই। আপনি যদি ইহার উপায় না করেন, তবে যত্নাভাবে এতগুলি ব্রহ্মহত্যা হইবে।' রাজা ব্রাহ্মণের কথায় স্বীকার হইলেন। রাজার হুকুমে ষাট মহল বাড়ী নির্মিত হইল এবং উহাদের জন্য ষাটটি ধাই, ষাটটি গাই, ষাটটি নফর দেওয়া হইল। ষাটটি গ্রাম ইহাদের ভরণ পোষণের জন্য দিলেন। যথা সময়ে ষাটাইর ষাট পুত্রের ষষ্ঠী, অন্নারম্ভ, বিদ্যারম্ভ, চূড়াকরণ, উপনয়ন হইল এবং যথাসময়ে তাহাদের বিবাহ ও সন্তানাদি হইল।

এদিকে ব্রাহ্মণী ও ষাটাই মহা দুঃখিত। এতকাল কত ভক্তি করিয়া মা ষষ্ঠীর অর্চনা করিলেন, কিন্তু একটা ঝুলি ভিন্ন আর কোন সন্তানই হইল না। ঘরে একটি শিশু নাই; গাছের ফল পাকিয়া তলায় পড়িয়া যায়, অথবা পক্ষী খায়, আর সন্তানের অভাব তাঁহাদের বেশী করিয়া লাগে। ঘরে তাঁহাদের মন টিঁকে না।

একদিন ষাটাই এই সব কথা লইয়া পিতার নিকট দুঃখ করিতেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মা, তোমার আবার সন্তানের দুঃখ কি? তোমার ষাট পুত্র, এক কন্যা। রাজা তাহাদের প্রতিপালন করিতেছেন।' ষাটাইর এ কথায় আর বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা নাই। তখনই ছেলে, মেয়ে, বউ, জামাই দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং তাহাদের দেখিতে গেলেন। সেদিন সেখানে গিয়া বাড়ী খুঁজিয়া ছেলেমেয়ে, বউ, জামাই, নাতি–নাতনীদের দেখিতে দেখিতে পা ব্যথা হইয়া গেল। ছোট ছেলের বাড়ী আসিয়াই ষাটাই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। ছোট ছেলের বউ তাড়াতাড়ি ষাটাইর মাথায় তেল জল দিয়া স্নান করাইয়া, তাঁহাকে বোয়াল মাছের ল্যাজা দিয়া ভাত খাওয়াইয়া দিলেন।

অমনি ষষ্ঠীর কোপে ষাটাইর ষাট ছেলে, মেয়ে, বউ, জামাই, নাতি, নাতনী সকলেই ঢলিয়া পড়িল। সমস্ত পুরী আঁধার হইয়া

গেল। ষাটাই তো ছেলেমেয়েদের পাইয়াই হারাইয়া কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির। তখনই রাজার কাছে ও ব্রাহ্মণের কাছে খবর গেল।

ব্রাহ্মণ আসিয়া সমস্ত দেখিলেন। দেখিয়া ষাটাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ষষ্ঠীর ব্রত করিয়াছ?' ষাটাই বলিলেন, 'না, ভুলিয়া—গিয়াছিলাম।' ব্রাহ্মণ তখন বুঝিতে পারিলেন। কেন উহারা ঢলিয়া পড়িয়াছে। তিনি সকলকে ঘরে রাখিয়া মা ষষ্ঠীর উদ্দেশে বাহির হইলেন। পথে এক আম গাছ। তাহাতে হল্‌দে হল্‌দে পাকা আম হইয়া রহিয়াছে। কেউ সেই আম খায় না। এমন কি, কাকেও সেই আম খায় না। আম গাছটা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিল, 'ঠাকুর কোথায় চলিয়াছ? ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মা ষষ্ঠীর উদ্দেশে।' গাছটা ব্রাহ্মণকে বলিল, 'আমার ফল কেউ খায় না। এমনকি পাখীতেও না। ষষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিও, কেন আমার এ দুর্দশা?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আচ্ছা'। আবার কিছু দূর যাইতে যাইতে এক নদী। নদী বলিল 'আমার জল কেউ খায় না কেন, তাহা ষষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিও।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আচ্ছা'। তার পরে অনেক দূর গিয়া এক বট গাছের নীচে বসিয়া ব্রাহ্মণ এক মনে ডাকিতে লাগিলেন। অনেক ডাকিতে ডাকিতে মা ষষ্ঠীর মনে দয়া হইল। তিনি বলিলেন, 'এখন আবার আমাকে ডাকিতে আসিয়াছ কেন? আমাকে ডাকিয়া তোমার কি হইবে? মেয়েকে গিয়া বোয়াল মাছের ল্যাজা দিয়া ভাত খাওয়াও।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মা, অপরাধ হইয়াছে, এবার ক্ষমা কর। আর কখনও এ রকম হইবে না। আমার ষাটাইর সন্তানদের বাঁচাইয়া দাও।' বহু অনুনয়ে ষষ্ঠীর রাগ কমিল। ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'এখানে যে অমৃত কুণ্ডে জল আছে, তাহা নিয়া বাড়ী যাও। এই জল যাহারা ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের গায়ে তিনবার ছিটাইয়া দাও। তবেই তাহারা বাঁচিয়া উঠিবে। প্রত্যেক ষষ্ঠীতে ব্রত

পালন করা সহজ হইবেনা তাই জন্ম হইলে, ষষ্ঠীর দিন, অন্নারম্ভে, বিবাহে ষষ্ঠীর কথা শুনিবে।' ব্রাহ্মণ তখন আমগাছ ও নদীর কথা বলিলেন, ষষ্ঠীও তাহাদের কি করিতে হইবে বলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ অমৃতকুণ্ডের জল লইয়া ফিরিবার সময় নদীকে বলিলেন, 'তুমি তৃষ্ণার্তকে অত্যন্ত তৃষ্ণার সময় জল খাইতে দাও নাই বলিয়া তোমার এ অবস্থা। কোন সৎ ব্রাহ্মণকে জল খাইতে দিলেই তোমার দুঃখ ঘুচিবে।' নদী বলিল, 'ভাল বাহ্মণ আর কোথায় পাইব? তুমিই আমার জল খাও।' এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ নদী হইতে অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া জল খাইলেন। কিছুদূর গিয়া আম গাছ। ব্রাহ্মণ বলিলেন 'তোমার কথা মা ষষ্ঠীকে বলিয়াছি, তিনি বলিলেন, তুমি কোন ক্ষুধার্ত সৎ ব্রাহ্মণকে তাহার ক্ষুধার সময় আম খাওয়াইলেই তোমার এই দুঃখ দূর হইবে।' গাছ বলিল, 'সৎ ব্রাহ্মণ আর কোথায় পাইব? তুমিই আমার আম খাও, তবেই হইবে।' ব্রাহ্মণ পেট ভরিয়া আম খাইলেন ও কতকগুলি আঁচলে বাঁধিয়া লইয়াই বাড়ী রওয়ানা হইলেন। বাড়ী আসিয়া সেই অমৃতকুণ্ডের জল ছিটাইয়া সকলকে বাঁচাইলেন, তারপর সকলেরই খুব আনন্দ, খুব সুখ। সেই হইতে ষাটাই নিয়মিতভাবে ষষ্ঠীর ব্রত করিতেন এবং দেশে বিদেশে এই ব্রত প্রচার করিয়া দিলেন।'

এইবার গল্পটির মাধ্যমে যে সব অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। অমৃতকুণ্ডের জল সিঞ্চনে ষাটাইএর সন্তানাদির পুনর্জীবনলাভ গল্পটির একটি অন্যতম অভিপ্রায়। স্টীথ টম্‌সনের ভাষায়, 'Most popular of all in folk tales is revival through the water of life [E 80]।

বাক্‌শক্তি সম্পন্ন বৃক্ষ গল্পের আর একটি অভিপ্রায়। [Talking Tree, F 811·15]

অনেকগুলি সন্তানের একসঙ্গে জন্মলাভ গল্পটির অপর এক অভিপ্রায় [Multiple Birth T 586]

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার [১৩২৬] দ্বিতীয় সংখ্যায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে চট্টগ্রামের গ্রাম্য ভাষা বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটির পরিশিষ্টে লেখক চট্টগ্রামের ভাষার আদর্শ স্বরূপ কতিপয় প্রবচন ও 'হাজার মারার পরচ্ তাপ' ও 'গোলবদন হাতীর পরস্তাপ'—নামে দু'টি লোক-কথাও প্রকাশ করেছেন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় গল্প দুটি প্রকাশ করে পাদটীকায় কলকাতার ভাষায় গল্প দু'টি লেখক বর্ণনা করেছেন।

'গোলবদন হাতীর প্রস্তাব' গল্পটি সংক্ষেপে উল্লিখিত হল—

এক রাজার এক হাতী ছিল। হাতীটির নাম গোলবদন। হাতীটি ছিল রাজার বড় প্রিয়। হাতী রাজার অনেক কাজ করত। বুড়ো হয়ে হাতীটা মরে গেলে রাজা তাকে নদীতীরে ফেলে দিলেন। একটা ক্ষুধার্ত শৃগাল আহার অন্বেষণে এসে হাতীটা দেখে ভাবলে—তার দিনটা ভাল। হাতীর মাংসে তার এক বছর চলবে। এই বলে সে হাতীর পেটে গিয়ে ঢুকলে। ঠিক করলে প্রথমে হাতীর বুকটা খাবে। কিন্তু পেটে ঢুকে সে আর বের হতে পারেনা। শেয়াল শেষে হাতীর পেট থেকে বলতে লাগল, আমি রাজার এত কাজ করলুম আর এখন আমার একটু জ্বর হতে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে। শেয়াল এমন ভাবে বলতে লাগল যাতে রাস্তায় যেতে যেতে মানুষ এই কথা শুনতে পায়। একদিন রাজার পদাতিক একথা শুনে রাজাকে গিয়ে বললে। রাজা শুনে পাগলের মত হয়ে হাতীর কাছে এসে হাজির হলেন। রাজা গোলবদনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে? কি দিলে ভাল হবে?

গোলবদন বললে যে সে এতদিন রাজার এত উপকার করলে আর এখন তার একটু জ্বর হতেই রাজা তাকে ফেলে দিলেন। গোলবদন বললে তাকে বাঁচাতে হলে তার গুহ্যদেশে দশ মণ ঘি

দিতে হবে আর দশজন ব্রাহ্মণকে চণ্ডীপাঠ করাতে হবে। রাজার আদেশে মন্ত্রী এসবের ব্যবস্থা করলে। ঘি মলতে মলতে শেয়াল দেখলে যে এবারে সে পেট থেকে বের হতে পারবে। তখন শেয়াল বললে সাবধান গোলবদন উঠছে। একথা শুনে সকলে পালিয়ে গেল। যাবার সময় ব্রাহ্মণেরা পুঁথি ফেলে গেল। শিয়াল তখন পেট থেকে বার হয়ে একখানা পুঁথির পাতা নিয়ে দৌড় দিলে। সকলে বললে—গোলবদন দৌড় দিল, গোলবদন দৌড় দিল, রাজা কোন ঠাওর পেলেন না।

শেয়াল একদিন খালের কূলে বসে পুঁথির পাতাগুলো কামড়াচ্ছে আঁচড়াচ্ছে। একটা কুমীর এমন সময় ভেসে উঠল। সে ভাবলে পণ্ডিতে ছাত্র পড়াচ্ছে। সে জলের ভেতর থেকে এসে শেয়ালের কাছে হাজির হয়ে তার সাতটা ছেলেকে পড়াবার জন্যে বললে। শেয়াল রাজি হল। শেয়াল প্রতিদিন একটা করে কুমীর বাচ্চা খেয়ে ফেলতে লাগল। এদিকে কুমীর প্রত্যহ ছেলেদের সংবাদ নিতে আসত। শেয়াল বললে, প্রত্যেকদিন কুমীর এলে ছেলেরা পড়তে চায়না। তাই সাতদিন পরে কুমীর এসে ছেলেরা পড়া পারে কিনা জিজ্ঞাসা করলে শেয়াল বললে, 'পারে, আমার পেটের ভেতর। কুমীর সেদিন কিছু বললে না। অন্য একদিন সে জলের ভেতর দিয়ে এসে কাঁকড়া ও অন্যান্য ময়লা মেখে পড়ে রইল। শিয়াল জল খাবার জন্যে জলে নামলে কুমীর তার পা কামড়ে ধরলে।

চালাক শেয়াল বললে, তুই কতকগুলো কাঁকড়া ধরে ভেবেছিস আমাকে ধরেছিস। কুমীর শুনে পা ছেড়ে দিলে।

আর একদিন বানের জল উঠেছে। কাঁকড়া খেতে শেয়াল কুমীর দু'জনেই গেছে। কুমীর শেয়ালকে দেখে ময়লা মেখে রইল। শেয়াল কুমীরের গর্তের কাছে গিয়ে তাকে দেখতে পেলে। বললে —একটা পা না সরালে সে খাবেনা। কুমীর একটা পা সরাল।

এবার শেয়াল বললে, হাত একটা না সরালে খাবেনা। অমনি কুমীর একটা হাতও সরাল। শেয়াল কুমীরকে বুঝতে পেরে বললে, ওরে দুষ্ট, তুই আমাকে খেতে এসেছিস? এবারেও তোকে লম্বা লাঠি দেখালাম।

এইবার মূল চট্টগ্রাম ভাষায় গল্পটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল—

আর এগ্‌দিন বানর পানি উঢ্যে আর কাঁঅড়া টাঁঅরা খাইত্য হিয়ালো গেইয়ে। কুঁইরো গেইয়ে। কুঁইর হিয়ালরে দেই আরে ছেরাই ভেরাই আরে রোইয়ে। হিয়াল যা'তে য'াতে কুঁইরর্ গাতর কাছে গেইয়ে আর দেইল যে হেই কুঁইর ইডা। তে সতান্যামি করি কয়েজ্জে ঠেং এক্কান ন কুরাইলে ন খাইওম্। তোই কুঁইরে ঠেং এক্কান কুড়ায়। আর একবার কয়েজ্জে হাত এক্কান ন কুরাইলে ন খাইয়োম্। তোই তে হাত এক্কান কুড়াইল্। ইন্ হিয়ালে বুঝিওারি কুঁইররে কয়েজ্জে, ও বান্‌চোৎ তুই আঁরে খাতি আস্‌চ্যাস্ এই বারেও তোরে বুর্গ্যা লাডি দে আইলাম।

লেখক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর আলোচনার শেষে মন্তব্য করেছেন, 'চট্টগ্রামে অবস্থিতি কালে তত্রত্য ভাষা শিখিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতে অবগত হইয়াছি যে, হাজার মারা ও গোলবদল হাতীর প্রস্তাবের ন্যায় বহু প্রস্তাব সেখানে লোকমুখে প্রচলিত আছে। সেই সমস্ত প্রস্তাব সংগৃহীত হইলে কেবল যে ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সৌকর্য ঘটিবে, তাহা নহে; উপরন্তু গ্রাম্য সাহিত্যের [folklore] কোঠায় তাহাদের সবিশেষ সমাদর হইবে। কারণ এই গল্পগুলির এমন একটা বৈশিষ্ট্য, এমন একটা চমৎকারিত্ব, এমন একটা নিজত্ব আছে যে, তাহাতে জাতি নির্বিশেষে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিবে।' [পৃঃ ১৩৫]

কালীমোহন ভট্টাচার্য রচিত 'ঠাকুরদাদার রূপকথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থটি চারিটি খণ্ডে বিভক্ত। চারিটি

খণ্ডে সর্বমোট ১৮টি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে সন্নিবিষ্ট গল্পগুলি হল যথাক্রমে—সোনার পুতুল, চারিবন্ধু, কবিরাজ পুত্র, কনকলতা ও ফুলকুমার। দ্বিতীয় খণ্ডের গল্পগুলি হ'ল—স্বর্ণপদ্ম, ভণ্ড সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট এবং দৈত্য ও দেবতা। তৃতীয় খণ্ডের গল্পগুলি হ'ল—মান্ধাতার আমল, আশ্চর্য দেশ, পরীর দয়া ও ভূতের ভয়। চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি হল যথাক্রমে আশ্চর্য স্বপ্ন, লাউবিচিতে বড় লোক, ব্যাঙের খোলস, মাতালের বুদ্ধি এবং অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি। সব ক'টি গল্পই সাধু ভাষায় রচিত। গ্রন্থটি চিত্র সম্বলিত। অবশ্য গ্রন্থে সঙ্কলিত সবক'টি গল্পই যে লোককথার শ্রেণীভুক্ত, তা কিন্তু নয়। ভিন্ন গল্পও স্থান পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ 'আশ্চর্য দেশ' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গল্পে ইউরোপের এক বৈজ্ঞানিকের দেশ পর্যটনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে।

অতীতে বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কেবল কথা সংগ্রহেই একাধিক মহিলাকে আত্মনিয়োগ করতে দেখা গেছে। আগে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ছিল খুবই সীমিত। তার ওপর সাহিত্য চর্চায় বঙ্গনারীর আত্মনিয়োগের ঘটনা বিরল বলেই বিবেচিত হবার যোগ্য। অতএব লোক সাহিত্যের চর্চায় স্বভাবতঃই তেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলাকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়নি। তবু যে সব সীমিত সংখ্যক মহিলা এই ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছেন তাঁদেরই অন্যতমা ইন্দুমতী দেবী। ইন্দুমতীর সংগ্রহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে তাঁর ব্যক্তি পরিচয়টুকু নিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

ইন্দুমতী দেবী ছিলেন পাঁচথুপীর [মুর্শিদাবাদ] কৃষ্ণদয়াল সিংহের কন্যা এবং পাঁচথুপীর জমিদার মধুসূদন ঘোষ মৌলিকের পত্নী। ইন্দুমতী জন্মগ্রহণ করেন ১২৭৬ সালে এবং তাঁর মৃত্যুকাল ১৩৩৪। ইন্দুমতী সম্পর্কে বলতে গিয়ে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

'একালের পরিবেশ হলে ইন্দুমতী নিশ্চয় তাঁর প্রতিভার

উন্নততর প্রকাশ করতে পারতেন। সেকালের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় পল্লী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেও তিনি যে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে মহতী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন—আজকের শতবর্ষের পট-ভূমিকায় গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ যোগ্য।' [১৬]

এইবার ইন্দুমতীর সাহিত্যিক প্রয়াস সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। ইন্দুমতী রাঢ় মুর্শিদাবাদে প্রচলিত বিভিন্ন ব্রতকথা সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে এগুলি 'বঙ্গ-নারীর ব্রতকথা' এই নামে প্রকাশিত হয়। সংকলনটিতে রাঢ় অঞ্চলের বিশেষ করে মুর্শিদাবাদে ফতেসিংহ প্রচলিত ব্রতকথাগুলি সংগৃহীত হয়েছে। সংগৃহীত ব্রতকথাগুলি ক] মঙ্গলচণ্ডী ; খ] লক্ষ্মী ; গ] যঠী এবং ঘ] সাধারণকথা—এই চারটি স্তবকে বিভক্ত। 'বঙ্গনারীর ব্রতকথা' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন ইন্দুমতী দেবীর পুত্র বিভূতি ভূষণ ঘোষ। প্রকাশকের ভূমিকায় বিভূতিবাবু এরকম একখানি সংকলন প্রকাশের কারণ বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

'আমার জননী দেবী এই পুস্তক লিখিত ব্রতকথাগুলি সংগৃহীত করিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন, আধুনিক কালে নানাবিধ কারণে এই অমূল্য কথাগুলি প্রকাশযোগ্য ভাবিয়া আমি প্রকাশের প্রয়াসী হইয়াছি। এই ধরণের প্রচেষ্টা এই প্রথম। বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন অবধি বহুবার বহুপ্রকারের ব্রতকথা প্রকাশিত হইয়াছে। পরলোকগত আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে আমার রাঢ়দেশের কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় কুলমহিলা সংকলিত একখানি ব্রতকথা পুস্তকে এতদ্ অঞ্চল প্রচলিত সমস্ত কথা পাওয়া যায় না এবং সে কথাগুলির কথঞ্চিৎ বিভিন্নতাও আছে।'

অতএব নিছক মাতৃভক্তির কারণেই নয়, সংকলনটি প্রকাশের পেছনে প্রকাশকের স্বচ্ছ যুক্তিশীল মনও যে ক্রিয়াশীল ছিল তা প্রমাণিত হয়।

ব্রতকথাটির ভূমিকা লিখেছেন মহোমহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। ভূমিকায় শাস্ত্রীমশাই বিশেষতঃ ব্রতকথার ভাষা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন :

'আমরা ছেলেবেলাতে ঢের ব্রতকথা শুনিতাম, তার অনেক ইহাতে নাই। আর সংগ্রহ কর্ত্রী হইতে আমরা ভিন্নপ্রদেশ ও ভিন্ন জেলার লোক। ব্রতকথাগুলি বাংলার পুরান গন্থ ও পন্থ রচনার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কারণ ইহাতে সংস্কৃতের গন্ধ নাই পণ্ডিতির গন্ধ নাই! মেয়েদের লেখা সোজা বাংলা। পন্থের চেয়ে গন্থ আরো সোজা এবং বোধহয় একটু বেশী পুরাতন—অনেকগুলি কথার মানে জানিনা। সেগুলি হয়ত জেলাভেদে নতুনরূপ হইয়া গিয়াছে। না হয়, তখন প্রচার থাকিলেও এখন নাই, আর যতদিন যাইতেছে ভাষাটা প্রায় সব জায়গায় একই হইয়া যাইতেছে।' [২৬ শে আগষ্ট, ১৯২৬]

সংকলনে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা পর্যায়ে স্থান লাভ করেছে সঙ্কটা মঙ্গলবারের কথা, বারমাস শুভ মঙ্গলচণ্ডীর কথা, সিদ্ধিমায়ের মঙ্গল-বারের কথা, পথ মঙ্গলবারের কথা, হর্ষ মঙ্গলবারের কথা, দশামঙ্গল-চণ্ডীর কথা, আশা মঙ্গলচণ্ডীর কথা, স্থির মঙ্গলচণ্ডীর কথা, সংক্রান্তি মঙ্গলবারের কথা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় স্তবকে ষষ্ঠীর কথা অংশে আছে অরণ্য ষষ্ঠীর কথা, গর্ভ-ষষ্ঠীর কথা, মাঘ মাসের শীতল ষষ্ঠীর কথা, অশোক ষষ্ঠীর কথা, নোটোন ষষ্ঠীর কথা, ভাদ্রমাসের চাপরা ষষ্ঠীর কথা, আশ্বিন মাসের দুর্গাষষ্ঠীর কথা, অগ্রহায়ণ মাসের মূলাষষ্ঠীর কথা ইত্যাদি।

তৃতীয় স্তবকস্থিত লক্ষ্মী-কথায় সংকলিত হয়েছে লক্ষ্মীদেবীর আহ্বান, কোজাগরী লক্ষ্মীর কথা, পৌষ ও চৈত্র মাসের লক্ষ্মীকথা ইত্যাদি। আর সবশেষে চতুর্থ স্তবকে আছে মনসাদেবীর কথা, পূর্ণিমার কথা, ভ্রষ্টরাজার কথা, নিষ্কলঙ্ক বাসুদেবের কথা, শনির কথা, ইতুর কথা, যমপুকুরের কথা, হরিচরণ ব্রত ইত্যাদি।

বাংলা লোক সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা ও এতদ্বিষয়ক গবেষণা মূলতঃ স্বাধীনতা লাভের পরবর্ত্তীকালের ঘটনা হলেও সৌভাগ্যের বিষয় এই আলোচনায় যাঁরা শরিক হয়েছেন তাঁদের মধ্যে যেমন একনিষ্ঠ লোক-সাহিত্য প্রেমিক আছেন, তেমনি মূলতঃ পরিশীলিত সাহিত্য আলোচনায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ যাঁরা সেইসব খ্যাত-কীর্তি ব্যক্তিরাও নীরব থাকেননি। কারণ পরিশীলিত সাহিত্য আলোচনা কালে এঁরা স্বতঃই উপলব্ধি করেছেন যে অনেকাংশে এই সাহিত্যের ভিত্তি ভূমি রচিত হয়েছে আমাদের দীর্ঘকালের অবহেলিত লোক সাহিত্যে। তাই লোক সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনাকে বাদ দিয়ে নিছক পরিশীলিত সাহিত্য আলোচনায় আর যাইহোক সামগ্রিক ভাবে দেশীয় সাহিত্যালোচনা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘকাল যে সাহিত্যকে আমরা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে এসেছি, সেই সাহিত্যেও যে যথার্থ আস্বাদনযোগ্য রস বিদ্যমান এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করলে সেই লোক সাহিত্যেও যে আমাদের অতীত সমাজ তথা জাতীয় জীবনের সন্ধান লাভ সম্ভব, বিলম্বে হলেও আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সমালোচকেরা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' খ্যাত লব্ধ প্রতিষ্ঠ সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত মননশীল বোদ্ধাকেও দেখা গেছে 'রূপকথা' বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করতে [১৩৩৩] এবং রূপকথার রস বিশ্লেষণে প্রয়াসী হতে। 'রূপকথা' প্রবন্ধটি যে কেবলমাত্র বাংলা লোক সাহিত্য আলোচনার ইতিহাসে বিশেষতঃ রূপকথার আলোচনায় এক অনবদ্য সংযোজন হিসাবে বিবেচিত হবে তাই নয়, সার্থক প্রবন্ধ রচনাশৈলীর আদর্শ হিসাবেও প্রবন্ধটি উল্লেখ করার মত। প্রসঙ্গত বলতে হয় আলোচ্য প্রবন্ধটি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের প্রথম বাংলা প্রবন্ধ রচনা। প্রবন্ধটি লেখকের ছাত্রাবস্থায় রচিত। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় রচিত এই প্রথম প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে লেখক যে একজন প্রথম শ্রেণীর

সাহিত্য সমালোচকের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও রসবোধ তথা বিশ্লেষণী প্রতিভা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন, তার সার্থক পরিচয় দান করে।

'রূপকথা' প্রবন্ধটিকে মোটামুটি ভাবে নাতিদীর্ঘ বলা যায়। মোট চারটি বিভাগে প্রবন্ধটি বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে লেখক রূপকথা ও উপকথা শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনটি ব্যাকরণগত ভাবে শুদ্ধ সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করে নিজের রস পিপাসুর দৃষ্টিতে 'রূপকথা' নামটিকেই নির্বাচন করেছেন। কারণ লেখক রূপকথা ও উপকথাকে মোটামুটিভাবে সমগোত্রীয় বলেই মনে করেছেন। কিন্তু আসলে এক্ষেত্রে সমস্যাটা ব্যাকরণগত নয়, ভাব ও বিষয়গত।

উপকথা বলতে Animal Tale-কেই বোঝান হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে সকল কাহিনী পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বনে রচিত। কিন্তু রূপকথা সম্পূর্ণ এক পৃথক শ্রেণীর রচনা। রাক্ষস, ডাইনী, রাজা-রাণী, রাজপুত্র, রাজকন্যা প্রভৃতিদের নিয়েই রূপকথার জগৎ। জার্মান 'Marchen' সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে আমাদের রূপকথা সম্বন্ধে সেই বক্তব্য প্রযোজ্য—'fable of some length involving a succession of motifs or episodes. It moves in an unreal world without definite locality or definite characters and is filled with the marvellous. In this never—never land humble heroes kill adversaries succeed to kingdoms, and marry princesses.'

লেখক লোক সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত জনের দৃষ্টিপাতের কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন: 'এই অতীতে প্রত্যাবর্তন সকল দেশের সাহিত্যেরই একটা সনাতন রীতি। ইংরেজী সাহিত্যেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অতীতে প্রত্যাবর্তন, মধ্যযুগের পল্লীগাথার রসাস্বাদন চেষ্টা একটা নূতন যুগের সূত্রপাত করিয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে এই অতীতের প্রতি মোহের কতকগুলি

গূঢ় কারণ আছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ, বর্তমানের তীক্ষ্ণ, জটিল সমস্যা হইতে একটা পলায়নের উপায় আবিষ্কার, তাহার শত নাগপাশের বেষ্টন হইতে আত্মগোপনের চেষ্টা। অতীতের সরল, সমস্যা-বিরল মুক্ত বায়ু আমাদের প্রশ্নসংকুল জীবনকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করে।' আমরা লোক সাহিত্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের পিছনে মূলতঃ জাতীয়তাবোধের কার্য্যকরী ভূমিকার কথাই নানাভাবে নানাজনকে বলতে দেখেছি; কিন্তু লোক সাহিত্যের স্নিগ্ধ সহজ সরল পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণের অন্যতম কারণ যে যুগ যন্ত্রনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া তথা পলায়নকর মনোবৃত্তি, প্রথম ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমাদের এই মনস্তাত্ত্বিক কারণটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

লোক সাহিত্যের আকর্ষণ যত না তার বিষয়ে তদপেক্ষা অনেক বেশী অনুকূল পরিবেশ ও পরিবেষণকারীর পরিবেষণ ভঙ্গী ও কণ্ঠ মাধুর্যে—এই সত্য কেবল ছড়ার ক্ষেত্রেই যে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য তা নয়, পরন্ত রূপকথা, ব্রতকথা, লোককথার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, লেখকের রচনায় সেই প্রয়োজনীয় বক্তব্যটিও উপস্থাপিত।

প্রবন্ধটির দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে রূপকথা যতই কেন কতকগুলি অসম্ভব অবাস্তব বাহ্য ঘটনায় পূর্ণ বলে মনে হোক, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে আপাত অলীকতার অন্তরালে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিদ্যমান রয়েছে। লেখকের ভাষায়,……'এই ছদ্মবেশ খুলিলেই ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র সুস্পষ্ট হইবে। বাস্তব জগতে যে ব্যক্তি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে, যে আদর্শের সন্ধান করি, রূপকথার রাজ্যেও সেই মানব-মনের আদিম সনাতন নীতিরই আধিপত্য। লেখকের এই প্রবন্ধ রচনার দীর্ঘকাল পরে এক পাশ্চাত্য সমালোচকের বক্তব্যেও একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যাবে—'Many folktales at least among people of

quick wits and intellectual capacity have not merely the surface meaning of the narrative but contain also a less explicit, perhaps in the main unconscious meaning, which we may call allegorical or symbolic, of value as a general with bearing some relation to human nature and experience something very much wider and deeper than the plain surface meaning of the story. [১৭]

প্রবন্ধটির তৃতীয় পর্যায়ে লেখক আলোকপাত করেছেন রূপকথায় প্রকাশিত সমাজ জীবনের প্রতি। আপাতদৃষ্টিতে যে রূপকথাকে আমরা অবাস্তব ও অলীকতা দোষে দুষ্ট বলে মনে করি, সেই রূপকথার মধ্যেই আমাদের সামাজিক জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যের কাছে আমাদের যে দাবী সমসাময়িক জীবনের চিত্ররূপ পরিবেশন, সেদিক থেকে রূপকথায় সেই দাবী রক্ষিত হওয়ায় সঙ্গত কারণেই রূপকথা যে সাহিত্য পদবাচ্য হবার অধিকারী তা স্বতঃই প্রমাণিত হয়েছে। লেখকের ভাষায় 'সমস্ত রূপক ও বর্ণনা-বাহুল্যের অন্তরালে আমাদের বঙ্গদেশের পরিবার ও সমাজের একটি নিখুঁত ছবি ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের বহুবিবাহ, আমাদের গৃহের সপত্নী বিরোধ, সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার, রূপসী প্রণয়িনীর মোহ ও পরিশেষে সেই মোহভঙ্গ, আমাদের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কল্পনার উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়।'

প্রবন্ধটির চতুর্থ ও শেষ পর্যায়ে লেখক আমাদের বিশেষতঃ পরিশীলিত সাহিত্যের স্রষ্টার ওপর রূপকথার প্রভাব বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। আদর্শ উপস্থাপনা, চমকপদ বিশ্লেষণ ভঙ্গী ও সর্বোপরি অনবদ্য ভাষা প্রবন্ধটিকে রসোত্তীর্ণ সৃষ্টিতে পরিণত করেছে স্বীকার করতে হয়। প্রশংসা করতে হয় লেখকের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও রসবোধের।

'অর্চনা' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় [১৩৩৩] যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক ঢাকা জেলা থেকে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত 'শঙ্খকুমার' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে।

এক রাজা। তাঁহার রাজ্য-শাসন-প্রণালী অতি উত্তম। প্রজামাত্রেই সুখে শান্তিতে কালযাপন করুক, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। তিনি ছিলেন পরম ধার্মিক ও নিপুণ যোদ্ধা। তাই তাঁহার রাজ্যের সর্বত্রই সর্বদা শান্তি বিরাজ করিত। এমন যে নানা সদ্‌গুণশালী নরপতি, যিনি পরের সুখ শান্তির নিমিত্ত সদাই যত্নশীল, তিনি কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও মনে শান্তি পাইতেন না। কারণ, তিনি ছিলেন পুত্রধনে বঞ্চিত।

পুত্রলাভের আশায় রাজা ক্রমান্বয়ে সাতটি বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাণীদের কেহই সন্তানবতী হইলেন না। তাই তাঁহাদের চিত্তও শান্তিহীন।

একদিন অতি প্রত্যূষে রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; কিন্তু আলস্য-বশতঃ শয্যা ত্যাগ করিতে একটু বিলম্ব হইল। বাহিরে আসিয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন, তখনও উঠানে ঝাঁট দেওয়া হয় নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, মালী তখনও রাজবাটীতে উপস্থিতই হয় নাই। ইহাতে রাজা রাগান্বিত হইলেন। তখনই তিনি কোতোয়ালকে আদেশ করিলেন, এখনই মালীকে দরবারে আনিয়া হাজির কর।

হুকুম পাইয়া কোতোয়াল তৎক্ষণাৎ মালীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং দেখিতে পাইল, সে খাইতে বসিয়াছে। ইহা দেখিয়া কোতোয়াল হাড়ে চটিয়া গেল এবং কর্কশ স্বরে বলিল,—ওরে বে আক্কেল? তুই কোন্ সাহসে রাজবাড়ীর কাজ না করিয়া খাইতে বসিয়াছিস? বেলা যে কতটা হইল, তাহা কি বুঝিতে পারিস নাই? মালীর স্ত্রী কোতোয়ালকে বসিতে আসন দিল; কিন্তু সে বসিল না; মালীকে বলিল,—চল্ হারামজাদা, এখনই

রাজবাড়ী। তোর বরাতে যে আজ কি আছে, সেখানে গেলেই তা টের পাবি।' মালীর খাওয়া তখন শেষ হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া আসিয়াই সে কোতোয়ালকে বিনীত ভাবে বলিল, —'আমার বেয়াদপি মাফ করবেন। কথাটা আমি আপনাকেই বলি; রাজার কাছে বলিবার আমার সাহসে কুলাইবে না। মহাশয় কাচ্চা বাচ্চা নিয়া আমাকে ঘর-সংসার করতে হয়। প্রতিদিনই রাজবাড়ীতে খুব সকালে ঝাঁট দিতে যাই, যাইয়া প্রথমেই দেখিতে পাইব, আঁটকুড়ো অনামুখো রাজার মুখ। এই জন্যই বুঝি একটা দিনও আমাদের ভালয় ভালয় যায় না; খাওয়া-দাওয়া কোন দিনই ভাল হয়না। তাই আজ ইচ্ছা হইল, আগে অপরের মুখ দেখিব ও কিছু খাইব, পরে রাজবাড়ী গিয়া ঝাঁট দিব।' ইহা শুনিয়া কোতোয়াল আশ্চর্যান্বিত হইল। সে মালীকে ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিল,—'চুপ কর্ হারামজাদা। চল্, এখনই আমার সঙ্গে।' কোতোয়াল মালীকে রাজদরবারে হাজির করিয়া, তাহাকে প্রহরীর জিম্মায় রাখিয়া রাজার নিকট গেল এবং তাঁহার নিকট মালীর বিলম্বের কারণ বর্ণনা করিল।

এ কথা শুনিয়া রাজা একেবারে দমিয়া গেলেন। তাঁহার মনের ভিতর অশান্তির ঝড় বহিতে লাগিল। স্তম্ভিতের মত ক্ষণকাল কোতোয়ালের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া তিনি জড়িত স্বরে বলিলেন,—'কোতোয়াল! এ মুখ আর আমি কাউকে দেখাইব না। তুমি গিয়া এখনই মালীকে ছাড়িয়া দাও। তার কোনই অপরাধ নাই। সে ঠিক কথাই বলিয়াছে।' কোতোয়াল হেটমুখে চলিয়া গেল। রাজাও শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শয্যায় আশ্রয় লইলেন। শয্যার উপর অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকিয়া তিনি নিজ দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্রমেই বেলা বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইল। রাজা কিন্তু দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন না।

ইহাতে রাণীরা ও রাজবাটীর আর সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সকলেই কত সাধ্য সাধনা করিলেন, কিন্তু রাজা দ্বার খুলিলেন না। এমনই ভাবে সেদিন চলিয়া গেল। রাজা অনাহারে রহিলেন। কাজেই রাণীদের, এমনকি রাজবাড়ীর সকলেরই সেদিন অনশনে অতিবাহিত হইল। রাজবাটীস্থ সকলেরই মুখ-মণ্ডল বিষাদ-কালিমা মাখা।

পরদিন সকালবেলা, রাজকার্য না-করিলে নয় বলিয়া মন্ত্রী ও অন্যান্য সভাসদগণ রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং সকলেই নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিলেন। শূন্য সিংহাসনের দিকে চাহিয়া সকলেই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সকলেই মনের দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া কার্যে রত হইলেন। এমন সময় 'জয় মা তারা' বলিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এক সন্ন্যাসী ঠাকুর। তৎক্ষণাৎ পারিষদগণ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপযুক্ত আসনে বসাইলেন। রাজাকে সভায় দেখিতে না পাইয়া সন্ন্যাসী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় মন্ত্রী তাঁহাকে তাহা অকপটে জানাইলেন। সন্ন্যাসী ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'রাজাকে আমার আগমনের সংবাদ জানাও এবং বলিও তিনি যেন এখনই আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন।' মন্ত্রী মহা বিপদে পড়িলেন। রাজাকে বাহিরে আসিতে বলিলে তিনি বিরক্ত হইবেন, আবার এ সংবাদ না দিলে সন্ন্যাসীও রুষ্ট হইবেন। অবশেষে, অন্য উপায় না দেখিয়া, বৃদ্ধ মন্ত্রী অন্দরে যাইয়া রাণীদিগকে এ কাজের ভার দিলেন। রাণীরা রাজাকে সন্ন্যাসী ঠাকুরের আগমন সংবাদ দিলেন। এবং তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য বিনীত ভাবে বার বার বলিতে লাগিলেন। অভ্যাগত সন্ন্যাসীকে নিজে আদর আপ্যায়নে তুষ্ট করা অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করিয়া, রাজা দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বরাবর সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর নিকট অগ্রসর হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী

তাঁহাকে হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং সিংহাসনে বসিতে বলিয়া বলিলেন—'মহারাজ! আমি আপনার মনঃকষ্টের কারণ জানিতে পারিয়াছি। শীঘ্রই আপনার দুঃখের অবসান হইবে।'

লিয়া একটি শিকড় রাজার হাতে দিয়া পুনরায় বলিলেন,—'এই ঔষধটি বাটিয়া কিঞ্চিৎ মধু ও পানের রসের সহিত রাণীরা সেবন করিলে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সুসন্তান হইবে। তবে আপনাকে এই সত্য করিতে হইবে যে, আমার পছন্দ মত একটি ছেলে আমি যখন আসিয়া চাহিব, তখনই আমাকে দিতে হইবে।' রাজা ভাবিলেন, মোটেই ছেলে নাই, সাতটি হইলে একটি না হয় দিবই। পরে প্রকাশ্যে বিনীত ভাবে বলিলেন,—'যে আজ্ঞে।'

সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন। রাজা শিকড় নিয়া রাণীদিগকে দিলেন ও তাহাদিগকে ঔষধ সেবনের নিয়ম বলিয়া দিলেন।

সকল রাণীর চেয়ে ছোট রাণীকেই রাজা বেশী ভালবাসেন। রাজার ভয়ে সতীনরা তাঁহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখিলেও, অন্তরে সকলেই তাঁহার প্রতি কু-ভাব পোষণ করিতেন। ছোট রাণী যখন একটি পরিচারিকার সাংসারিক অভাব অনটনের কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, সেই অবসরে তাঁহার সতীনেরা ঔষধ সেবন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরই তিনি সেখানে আসিয়া তাঁহাদের নিকট ঔষধ চাহিলেন। বড় রাণী বলিলেন—'তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে, বোন! তোমাকে বলিয়াছিলাম, শীঘ্র আসিয়া ঔষধ খাইতে; তা তুমি আর আসিলেই না। আমরা শিল হইতে ঔষধ নিয়া খাইয়াই তাহার দিকে চাহিয়া দেখি, উহাতে ঔষধ নাই। তখন আমরা সকলেই আপশোস করিতে লাগিলাম। যাহা হউক শিল নোড়াতে এক আধটুকু লাগিয়া আছেই; তাহাই তুমি জল দিয়া গুলিয়া খাও, তাহাতেই ফল হইবে।' ছোট রাণীর মনটা বড়ই সরল। তিনি তাঁহাদের কোন কথাই অবিশ্বাস করিলেন না। শিল নোড়া ধুইয়া যে ঔধষ মাখা জল পাইলেন, তাহাই তিনি ভক্তি করিয়া খাইলেন।

ঔষধ সেবনের পরই রাণীরা গর্ভবতী হইলেন। দশ মাস দশ দিন পর বড় রাণী ও তাঁহার পাঁচ সতীন একটি করিয়া ছেলে প্রসব করিলেন। আর ছোট রাণী প্রসব করিলেন একটি শঙ্খ। ছেলেদের একটিও দেখিতে সুন্দর নয়। রাজা পুত্রদিগকে, চেহারা কুৎসিত হইলেও, দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। ছোট রাণী শঙ্খ প্রসব করায় রাজা ও অপরাপর সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

রাজকুমারদের জন্ম সংবাদ রাজ্যের সর্বত্রই প্রচারিত হইল। এ শুভ সংবাদ যে শুনিল, সেই পুলকিত হইল। এই শুভ জন্ম তারিখ হইতে কয়েক দিন পর্যন্ত শত শত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ও অসংখ্য দীন দুঃখীকে রাজা অকাতরে ধন রত্নাদি দান করিলেন। এবং প্রত্যেককে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন। এই রূপে কয়েকদিন ব্যাপিয়া নানাবিধ আমোদজনক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা হইল।

শঙ্খ প্রসব করায় ছোট রাণীকে সকলেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে লাগিল; এমন কি, রাজার ভালবাসায়ও তিনি বঞ্চিত হইলেন। সতীনরা সদা সর্বদাই কারণে অকারণে তাঁহার প্রতি কু-ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাক্যবাণে তাঁহার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। সতীনদের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া, ছোট রাণী রাজার অনুমতি লইয়া শঙ্খটি সহ বাগানের মধ্যস্থ দালানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ছয় রাণীরই ছেলে হইল, তাঁহাদের সকলকেই রাজা আদর যত্ন করিতে লালিলেন। তাঁহাদের সুখের সীমা নাই। যাহা কখনও হয় নাই, তাহাই হইল ছোট রাণীর, তিনি প্রসব করিলেন, একটি শঙ্খ! এজন্য তাঁহার মনে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। ইহার উপর আবার স্বামীর ঘৃণাভাজন হইয়া এবং সতীনদের উৎপীড়নে অধৈর্য হইয়া, তিনি এই স্থানে আসিলেন। তিনি

মনে করিয়াছিলেন, দূরে সরিয়া আসিলেই বুঝি কতকটা শান্তি পাইবেন। কিন্তু তাহা হইল কৈ? একাকী থাকিয়া তাঁহার মন আরও উতলা হইয়া পড়িল, তাঁহার আহারে রুচি নাই, শুইলে ঘুম হয় না। একলাটি বসিয়া শুধু নিজের দুরদৃষ্টের বিষয়ে চিন্তামগ্ন থাকেন। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। চিন্তায় চিন্তায় তাঁহার শরীর বড়ই খারাপ হইয়া পড়িল।

ছোট রাণী সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতেন। তিনি দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িলে দেবীকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রার্থনা করিতেন; ভক্তি গদগদ চিত্তে বলিতেন,—'মা মঙ্গলচণ্ডী! এ দুঃখ যে আমার সহ্য হয় না। সন্তাপহারিণি! তোমার এ অধম সন্তানের মনের সন্তাপ দূর কর, মা।' যখন তিনি এইরূপ প্রার্থনায় রত থাকিতেন, তখন যেন তাঁহার মনের অস্থির ভাব একটু কমিয়া যাইত। তখন তাঁহার মনে হইত, মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় একদিন এ অসহনীয় দুঃখ দূর হইবে। এই আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজ দেহের প্রতি দৃক্‌পাত না করিলেও, শঙ্খটিকে বড়ই যত্নে রাখিতেন।

এইরূপে অনেক দিন চলিয়া গেল। একদিন তিনি খাবার প্রস্তুত করিয়া তাহা ভালরূপে ঢাকিয়া রাখিয়া বাগানের পুকুরে গেলেন রোজকার মত স্নান করিতে। ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, কে যেন ঢাকনিটি সরাইয়া রাখিয়া অন্ন ব্যঞ্জনের কতকটা খাইয়াছে। ইহার পর প্রত্যহই এইরূপ ঘটিতে লাগিল। ক্রমাগত কয়েক দিন এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল। কে যে এ কাজ করে, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। এক দিন তিনি এরূপভাবে খাবার ঢাকিয়া রাখিলেন এবং স্নান করিতে যাইবার ভান করিয়া বারান্দায় আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ঘরের ভিতরে কি হয় তাহা দেখিবার জন্য জানালার ফাঁক দিয়া চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরেই তিনি দেখিতে পাইলেন,

শঙ্খের ভিতর হইতে একটি পরম সুন্দর ছেলে বাহির হইয়া আসিয়া ঢাক্‌নিটি সরাইয়া রাখিয়া খাইতে বসিয়া গেল। দেখিয়া রাণীর চিত্ত পুলকে শিহরিয়া উঠিল। দেবী মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তিনি ঘরে ঢুকিয়াই ছেলেটিকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং কোলে লইয়া আদর করিয়া বলিলেন—'সোনার চাঁদ ছেলে আমার, তুই থাক্‌তে আমার এত দুর্দশা! এমন করে তুই আমায় ফাঁকি দিয়াছিস? আর তোকে আমি ছাড়ব না।' এই বলিয়া তিনি প্রাণের চেয়ে প্রিয় আপন পুত্রকে নিজ হাতে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর ছেলেকে ক্রোড়ে লইয়া তিনি শঙ্খটি ভাঙ্গিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া রাজপুত্র ভীতকণ্ঠে বলিলেন,—'মা, তুমি এ কি করিলে? এখনই যে সন্ন্যাসীর মাথায় টনক নড়িবে।'

আপন সন্তানের মুখে মা ডাক শুনিয়া রাণীর চিত্ত আনন্দ রসে আপ্লুত হইল। তিনি বলিলেন,—'বাছা! আর কি ইহা তোমার চোখের সামনে রেখে দিতে পারি? শঙ্খটি থাকলে আবার যদি তুই ঐটির ভিতর প্রবেশ করিস, এই ভয়ে উহা ফেলে দিলাম।'

মাতা পুত্রের এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছিল। ঠিক সেই সময় রাজবাড়ীর এক ভৃত্য বাগিচার ভিতর কোন কাজে আসিয়াছিল। ঐ স্থান দিয়া যাইবার সময় এই অভিনব দৃশ্য তাহার নজরে পড়িল। দেখিয়াই সে দৌড়াইয়া গিয়া রাজাকে এই শুভ সংবাদ দিল। রাজা তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া ছোট রাণীর ক্রোড়ে এমন সুন্দর ছেলে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং রাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। রাণী পুলকিত মনে কুমারকে রাজার ক্রোড়ে দিলেন। রাজা ছেলেকে ক্রোড়ে লইয়া রাণীর হাত ধরিয়া নিজ গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই সংবাদ তখনই রাজ্যময় প্রচারিত হইয়া পড়িল। দূর দূরান্তর হইতে

দলে দলে নরনারীবৃন্দ কুমারকে দেখিতে আসিতে লাগিল। স্বরূপ সুসন্তানের জননী ছোট রাণীকে রাজা আবার পূর্বের মত ভালবাসিতে লাগিলেন। এই পুত্রকেই যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করা হইবে ইহাই রাজা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন।

রাজা এখন পরম সুখী। রাজপুত্রদের বয়স এখন পাঁচ বৎসরের অধিক হইয়াছে। তিনি উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে তাহাদের শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন।

এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইল। একদিন হঠাৎ সেই সন্ন্যাসী আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল; মুখমণ্ডলে সে প্রফুল্ল ভাব তখনই অন্তর্হিত হইল। ভয়ে ভয়ে তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। সন্ন্যাসী রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—'মহারাজ! এখনই আমার পছন্দমত আপনার একটা ছেলে আমাকে দান করিয়া আপনার সত্য রক্ষা করুন।' রাজা কুমার দিগকে তথায় আনাইলেন। সন্ন্যাসী তাহাদের মধ্যে ছোট রাণীর পুত্র শঙ্খকুমারকে পছন্দ করিলেন। রাজা বিনীত ভাবে বলিলেন,—'ঠাকুর! আপনি শঙ্খকুমারের পরিবর্তে আর যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করুন।' সন্ন্যাসী বলিলেন, 'কিছুতেই তাহা হইতে পারে না। এইটিকেই আমার চাই।' এই বলিয়া তিনি কুমারকে লইয়া রাজবাটী হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইহার অনেকক্ষণ পরে ছোট রাণী এই নিদারুণ সংবাদ শুনিতে পাইলেন। শুনিবামাত্র তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন। চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। তখন তিনি সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী দেবীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—'মা! তোমার কৃপায় পুত্র ধন লাভ করিয়াছিলাম। আমার নয়নের মণি শঙ্খকুমারকে হঠাৎ সন্ন্যাসী আসিয়া আমার অলক্ষ্যে লইয়া চলিয়া গেল! পূর্ব জন্মে না জানি কি মহাপাপ করিয়াছিলাম; সেই পাপের ফলেই

এই জন্মে আমি পুত্র পাইয়াও হারাইলাম! আমার শঙ্খকুমারকে আমায় ফিরাইয়া দাও, মা।' ইহার পরই তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন শূন্য হইতে বলিলেন—'ভয় নাই, ছোট রাণী। কিছুকাল ধৈর্য ধরিয়া থাক, তোমার পুত্র তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবেই।' রাজবাড়ীর প্রধানা মহিলারা তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—'মা! তুমি যখন সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করিয়া থাক তখন নিশ্চয়ই তুমি দেবীর কৃপায় শঙ্খকুমারকে ফিরিয়া পাইবে।' ছোটরাণী কতকটা আশ্বস্ত হইলেন এবং দেবীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—'আমার শঙ্খকুমার যেখানেই গিয়া থাক, তাহাকে তুমি রক্ষা করিও মা! বাছা যেন মঙ্গলমত শীঘ্র ফিরিয়া আইসে।'

রাজা ও ছোট রাণী শঙ্খকুমারের বিরহে সদাই বিষণ্ণ। শঙ্খ কুমার রূপে গুণে সকল বিষয়েই তাহার ভাইদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এমন যে রত্ন ছেলে, তাহাকেই লইয়া গেল সন্ন্যাসী। রাজার চেয়ে রাণীর কষ্ট বেশী। কেন না, রাজার এখনও ছয় পুত্র বর্তমান; তাহার মধ্যে সবে ধন নীলমণি শঙ্খকুমার তাঁহার চক্ষের আড়ালে, দূরে—বহুদূরে। মায়ের কাছে পুত্র হইতে প্রিয়তর আর কি আছে? সেই সন্তানকে কেহ যদি মায়ের কাছ ছাড়া করিয়া হইয়া যায়, তবে কি তাহার মনস্থির থাকিতে পারে? শঙ্খকুমার চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই ছোটরাণীর খাওয়া পরার সাধ মিটিয়া গেল। কোথায় গেল বা সেই অপরূপ রূপ। রাজা আসিয়া সাধ্য সাধনা না করিলে তাঁহার স্নান, আহার কিছুই হইত না। শঙ্খকুমারের কথা ভিন্ন তাঁহার অন্য কথা নাই, শঙ্খকুমারের চিন্তা ছাড়া তাঁহার অন্য চিন্তা নাই। চিন্তায় চিন্তায় তাঁহার প্রায় সারারাত্র অতিবাহিত হয়, যদি কখনও একটু তন্দ্রার ভাব আইসে, সেই তন্দ্রার ঘোরেও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর শঙ্খকুমারকে দেখেন।

এদিকে সন্ন্যাসীর সঙ্গে রাজকুমার যন্ত্রচালিতের ন্যায় হাঁটিয়া চলিল। পথে পিতা, মাতা ও অন্যান্য পরিজনদের কথা তাহার

পুনঃ পুনঃ মনে পড়ায় সে বড়ই কষ্ট বোধ করিতে লাগিল। সে জননীর নিকট শুনিয়াছিল, দেবী সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ করিলে যে কোন সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়। তাই সে এই বিপদকালে ভক্তি সহকারে দেবীর নাম স্মরণ করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল। তাঁহারা কয়েকদিন ধরিয়া কত নগর-পল্লী, কত নদ-নদী, বিস্তৃত ময়দান ও গহন বন অতিক্রম করিলেন, তাহার অন্ত নাই। অবশেষে তাঁহারা খুব বড় একটা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীর আদেশে কুমার তাঁহার হাত ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া রহিল। আবার আদেশ পাইয়া নয়ন মেলিয়া দেখিতে পাইল, তাহারা নদীর অপর পারে পৌঁছিয়াছে। এপারে গ্রাম নগর কিছুই নাই, আছে শুধু সুদূর বিস্তৃত বিজন বন। বন্য পথ অতিশয় অপ্রশস্ত; দুই ধারে ছোট বড় নানা জাতীয় তরুলতা। গাছের শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় এত মিশামিশি যে চন্দ্র সূর্যের কিরণ প্রবেশের পথটিও যেন কোথাও নাই। এই বনে প্রবেশ করিলে দিবসও রজনী বলিয়া ভ্রম হয়। রাজপুত্র সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কোথাও জন মানবের সাড়াশব্দও পাইল না; কিন্তু নানা জাতীয় পশু পক্ষীর গম্ভীর রব তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। হাঁটিতে হাঁটিতে পরিশেষে তাঁহারা এক অপরিসর প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। ইহার এক প্রান্তে শঙ্খকুমার এক মন্দির দেখিতে পাইলেন। মন্দিরের চারিদিক প্রাচীর দিয়া ঘেরা; ভিতরে আরও ঘর আছে। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলেন। কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা স্নান করিয়া আসিলেন। রাজপুত্রকে নিজের ঘরে বসাইয়া রাখিয়া সন্ন্যাসী পূজার জিনিসপত্র যোগাড় করিতে গেলেন। যাইবার পূর্বে তিনি তাহাকে বলিয়া গেলেন,—'তুমি এই গৃহের এক উত্তরদিক ছাড়া আর সব দিকই ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে পার।'

উত্তর দিকের কোন কিছু দেখিতে নিষেধ করায় রাজপুত্রের সন্দেহ হইল এবং এই দিকটাই তাহার আগে দেখিবার ইচ্ছা হইল, তাই সে সেই দিকেই প্রথম লক্ষ্য করিল এবং দ্বারা খুলিয়াই দেখিতে পাইল, একটি রক্তের পুকুরে অনেকগুলি মনুষ্যের মুণ্ড পদ্মের মত ভাসিতেছে, দেখিয়াই সে অবাক্ হইল, বিস্মিত রাজপুত্রকে দেখিয়া মুণ্ডগুলি হাসিতে লাগিল। কাটা মাথা, আবার তাহাও হাসে। ইহা ভাবিয়া শঙ্খকুমারের আশ্চর্যের সীমা রহিল না। সে মাথাগুলিকে জিজ্ঞাসা করিল,—'তোমরা কেন আমাকে দেখিয়াই হাসিতেছ ?' মুণ্ডগুলি সব সমস্বরে বলিল,—'হ্যাঁ' তোমারও যে আজ আমাদেরই মত অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিয়াই আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। মন্দিরে যে কালী আছেন, তাঁহার সম্মুখে সন্ন্যাসী আমাদিগকে বলি দিয়াছেন। আমরা একশত সাতটি। মায়ের সম্মুখে আর একটি বলি দিতে পারিলেই তিনি সিদ্ধ হইবেন।' ইহা শুনিয়া রাজপুত্র ভীত হইল এবং ভক্তিভরে দেবী সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ করিতে লাগিল।

তখনও সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসেন নাই। শঙ্খকুমার হাঁটিতে হাঁটিতে মন্দিরের দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দর্শন করিয়া করজোড়ে বলিল,—'মা! এই সঙ্কট হইতে তোমার এ অধম সন্তানকে উদ্ধার কর। দেবী কুমারের প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'শঙ্খকুমার! তোমার কোন ভয় নাই। সন্ন্যাসী যখন তোমায় আমাকে প্রণাম করিতে বলিবে, তখন তুমি বলিও যে, প্রণাম কিভাবে করিতে হয়, তাহা তুমি জান না। তারপর সে যখন নিজে প্রণাম করিয়া দেখাইয়া দিবে, তখনই তুমি আমার হাতের তরবারি লইয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিবে, ইহার পর আমার পাদোদক লইয়া কাটা মুণ্ডগুলির উপর ছিটাইয়া দিও। উহারা বাঁচিয়া উঠিবে।' মায়ের অমৃত মাখা কথা শুনিয়া রাজপুত্রের মনের ভয় দূর হইল। পুনরায় যাইয়া সন্ন্যাসীর ঘরে বসিয়া রহিল। কিছুকাল

পর সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিলেন এবং শঙ্খকুমারকে বলিলেন,—'আমি এখন দেবীর পূজা আরম্ভ করিব। যখন তোমাকে ডাক দিব, তখন তুমি সেখানে উপস্থিত হইও।' এই বলিয়া তিনি মন্দিরে গিয়া পূজা আরম্ভ করিলেন। যথাকালে তাঁহার আহ্বানে রাজপুত্র তথায় উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—'শঙ্খকুমার! দেবীকে প্রণাম কর।' শঙ্খকুমার দেবীকে মনে মনে প্রণাম করিয়া বলিল—'প্রণাম? কি ভাবে প্রণাম করিতে হয় তাহা ত' আমি জানি না, আপনি দেখাইয়া দিন।' ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ঐ অবস্থাতেই বলিলেন—'কেমন দেখিলে ত'? 'আর একটু কাল ঐ ভাবে থাকুন, ভাল করিয়া দেখিয়া লই।' বলিয়াই কুমার দেবীর হাতের অসি লইয়া সন্ন্যাসীর মাথাটি কাটিয়া ফেলিল। তৎপর দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার পাদোদক লইয়া সেই মুণ্ডগুলির উপর ছিটাইয়া দিল। অমনি সমস্ত মাথাই নিজ নিজ দেহ সংযুক্ত হইল, সকলেই বাঁচিয়া উঠিল। শঙ্খকুমার তাহাদের পরিচয় লইয়া জানিল, তাহারা সকলেই রাজপুত্র।

রাজপুত্রগণ সেদিন সেইখানে পরমানন্দে যাপন করিল। সকলেই স্থির করিল, পরদিন তাহারা নিজ নিজ গৃহে গমন করিবে। শঙ্খকুমারের চিন্তা হইল, ইহার পর প্রতিদিন দেবীর পূজা হইবে কি রূপে? পরদিন সকালে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইয়া সে দেখিতে পাইল, দেবীর দিকে মুখ করিয়া বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছেন এক শান্তমূর্তি ব্রাহ্মণ। তাঁহার তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি ধীর স্বরে বলিলেন, 'অদ্য অতি প্রত্যূষে সেই দস্যু প্রকৃতির সন্ন্যাসীর নিধন সংবাদ অবগত হইয়াই আমি এখানে আসিয়াছি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা প্রত্যহ দেবীর পূজা করিয়া কৃতার্থ হইব।' শঙ্খকুমার ভাবিল, সকলই দেবীর ইচ্ছায় হইয়া থাকে। একে একে সকল রাজপুত্রই সেখানে উপস্থিত হইল! সকলেই দেবীকে ও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সকলেই

নিজ নিজ গৃহাভিমুখে রওনা হইল।

ছোটরাণী সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতেছিলেন। ব্রত শেষে বাহিরে আসিবা মাত্রই তিনি দেখিতে পাইলেন, শঙ্খকুমার তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়া তিনি পরম পুলকিত হইলেন এবং তখন ঘট হইতে নির্মাল্য আনিয়া পুত্রের মাথায় দিলেন। ইহার পর শঙ্খকুমার পিতা, বিমাতা ও অপরাপর সকলের সঙ্গে দেখা করিল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

ইহার পর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। রাজপুত্রদের বিবাহের বয়স হইল। নানা স্থান হইতে ঘটক আসিয়া সম্বন্ধের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। রাজা পাত্রী নির্বাচন করিয়া এক শুভ দিনে মহাসমারোহে সাত পুত্রকে বিবাহ দিলেন।

ছোটরাণী যথাকালে খুব ঘটা করিয়া সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিলেন। দেবীর কৃপায় যে তিনি পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিল। ক্রমে ক্রমে দেবীর মাহাত্ম্য দূর দূরান্তরে প্রচারিত হইল। রাজা দেবীর পরম ভক্ত বলিয়া সকলেই জানিতে পারিল। তিনি পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগলেন।'

এইবার গল্পটিতে প্রকাশিত অভিপ্রায় গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। শঙ্খকুমার গল্পটি আকারে যেমন বড়, তেমনি এই গল্পে অনেকগুলি অভিপ্রায় প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। শঙ্খকুমার সন্ন্যাসীকে হত্যা করে তারপর দেবীর পাদোদক একশত সাতটি নরমুণ্ডে সিঞ্চিত করায় সেগুলি পুনর্জীবন লাভ করেছে। অতএব পুনর্জীবন দান গল্পটির একটি অভিপ্রায় [Resuscitation Eo—E199]

সন্ন্যাসী প্রদত্ত শিকড়ের কারণে রাণীরা গর্ভবতী হয়েছেন ও সন্তান লাভ করেছেন। Stith Thompson এর লোককথার

বিভাগ অনুযায়ী এটি 'magic remedies for barrenness' [591. 1] অভিপ্রায়ের অন্তর্গত।

শঙ্খকুমার সন্ন্যাসীকে হত্যা করে একদিকে নিজের জীবন যেমন রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে, তেমনি ১০৭টি হতভাগ্য রাজপুত্রের পুনর্জীবন দান করেছে। তাই বিজয়ী কনিষ্ঠ সন্তান এই অভিপ্রায়টি এখানে পরিস্ফুট হয়েছে [Successful youngest son L10]।

বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। যাঁদের কাছে আমাদের ঋণের অবধি নেই, আমরা অতি সহজেই তাঁদের বিস্মৃত হই। ইতিহাসের প্রায় অব্যবহৃত প্রকোষ্ঠে তাঁদের স্থান দিই। দিই যে, তার প্রমাণ দীনেশচন্দ্র। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন [১৮৬৬-১৯৩৯] ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক রূপেই নন, পরন্তু প্রথম বাংলা সাহিত্যের সার্থক ইতিহাস রচনা এবং অসংখ্য পুঁথি আবিষ্কারের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বহু অজ্ঞাত তথ্যের আবিষ্কার ও তাদের যথাযথ মূল্যায়নে পরম বৈষ্ণব দীনেশচন্দ্রের অবদান এক কথায় অতুলনীয়। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই মনীষির ছিল কি সীমাহীন অনুরাগ, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাঞ্ছিত সাহিত্যিক প্রতিভা ও বিরল দূরদৃষ্টি। আজ বাংলা সাহিত্য সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্য রসিক সমাজে পরিচিত। কিন্তু এই পরিচিতি ও বহুল ব্যাপ্তির পশ্চাতে দীনেশচন্দ্রের অবদান অপরিসীম। শুধুমাত্র লিখিত সাহিত্যের আবিষ্কার ও আলোচনাতেই দীনেশচন্দ্রের প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিলনা। আজ সমগ্র পৃথিবীর বিস্তৃততর অঞ্চলে যে বাংলা লোক-সাহিত্যের রাজকীয় কদর, সেই কদর লাভের মূলেও দীনেশচন্দ্রের অবদান অনেক খানি। অথচ আশ্চর্যের কথা তাঁর উত্তর সূরীরা বেশ সযত্নে ইচ্ছাকৃত ভাবেই এই পথিকৃতের অবদান সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করেন।

দীনেশচন্দ্রের লোক-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির মূলে তাঁর

মাতুলালয়ের অবদান অনেকখানি। তাঁর মাতামহ ছিলেন যাত্রার অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক। আর এছাড়া তিনি খুব ভাল গল্প কথকও ছিলেন। বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্রের ভূমিকা ছিল বহুধা বিস্তৃত। তিনি নিজে লোক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করেছেন নিরক্ষর মানুষের কাছ থেকে, প্রকাশ করেছেন লোক-সাহিত্য সম্পর্কিত গ্রন্থ এবং সর্বোপরি লোকসাহিত্যের উপাদানসংগ্রহ ব্যাপারে দান করেছেন উৎসাহ। দীনেশচন্দ্র বাংলা লোক সঙ্গীত শিক্ষা দানের জন্য একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বাংলা লোক কাহিনী সংগ্রাহক হিসাবে বহুল পরিচিত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। দীনেশচন্দ্র দক্ষিণারঞ্জনকেও লোক কাহিনী সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র যদিও বিশেষভাবে বাংলা গীতিকা সম্পাদনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, তবু স্মরণে রাখতে হয় যে বাংলা লোক কাহিনীর পাঠান্তর বিষয়ে তাঁর আলোচনার গুরুত্বও নয়। বাংলা লোক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুধ্যানের ফসল হল 'ফোক লিটারেচার অব বেঙ্গল' [১৯২০]। এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে ইংরাজীতে রচিত হওয়ায় এদেশীয় ও বিদেশীয়দের দৃষ্টি আমাদের লোক সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হবার অনুকূল সুযোগ লাভ করে। অধ্যাপক Heinz Mode-এর ভাষায় বলতে গেলে বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার অন্যতম পথিকৃত দীনেশচন্দ্র সম্বন্ধে বলতে হয়—'if Bengali folk-literature is known all over the world as high-lightmerit within the realm of Indian folk-literature this knowledge is based on efforts and publication of the great Bengali Scholar : Dinesh Chandra Sen.'

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৩৫শ বৎসরের ৪র্থ সংখ্যায় [১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ৪র্থ সংখ্যা] সতীশচন্দ্র আঢ্যের 'পূজায় বৈচিত্র্য' নামে একটি

নিবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। এই নিবন্ধে লেখক আশ্বিন সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত 'নলডাকা' পূজা, মহিষাদলের গাছতলায় অনুষ্ঠিত 'পঞ্চদেবতা'র পূজা, তমলুক মহকুমার 'দোরো' অঞ্চলে অনুষ্ঠিত 'বদর' পূজা, মেদিনীপুরের নুড়ি জাতিদের দ্বারা শ্রীপঞ্চমীর দিন অনুষ্ঠিত রঙ্কিনী দেবীর পূজা, লালগড় অঞ্চলে অনুষ্ঠিত ধান পাকার পর'বেঘাশিনি' বা 'বাঘাৎ', 'বরাশিনি' ও 'নেকড়াশিনি'র পূজা ও উপকরণাদি এবং ক্ষেত্র বিশেষে ব্রতকথার উল্লেখসহ মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

পৌষ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত, সোনার বেনেদের মধ্যে প্রচলিত 'সুয়োদুয়ো' পূজার ব্রতকথাটি উল্লেখ করেছেন লেখক।—

একজন সওদাগর ছিল। তার সাত পুত্র ও এক কন্যা। ঐ সাত পুত্র পিতার বৃদ্ধ বয়সে ডিঙ্গা নিয়ে সওদাগরিতে যাত্রা করে ও পথিমধ্যে নৌকা লাগিয়ে এক ডাকাতের বাড়ীতে পাকশাকের আয়োজন করে। ঘটনাক্রমে ঐ বাড়ীটি তাদের ভগ্নীর ও ডাকাতের। ডাকাতের মা ঐ সাত ভাইকে আদর করতে লাগল ও পুত্রদের আসার অপেক্ষায় তাদের দেরী করিয়ে দেবার জন্য ভিজে কাঠ, ভিজে উনান ও ছেঁড়া কলাপাতা দিল। ভগ্নীর কৌশলে ভাইয়েরা যখন জানতে পারল যে তারা ডাকাতের বাড়ী এসেছে, তখন তারা একে একে নৌকা খুলে পালিয়ে গেল। ডাকাতেরা চেষ্টা করেও যখন ধরতে পারলেনা, তখন সাত ভাইকে বললে, 'যারে বেটা যা তোর মা কলা দিয়ে পূজেছিল, গলা এড়িয়ে গেলি; যারে বেটা যা, তোর মা সিম দিয়ে পূজেছিল, সিমসিমিয়ে গেলি; যারে বেটা যা. তোর মা কুল দিয়ে পূজেছিল, কুলকুলিয়ে গেলি; যারে বেটা যা, তোর মা ক্ষীর দিয়ে পূজেছিল, বীর হয়ে গেলি; যারে বেটা যা, তোর মা বেতো দিয়ে পূজেছিল, কলা দেখিয়ে গেলি। তোর মা মূল দিয়ে পূজেছিল, মূলমূলিয়ে গেলি। যারে বেটা যা, তোর

মা সুয়ো হুয়োর পূজা করেছিল, তাই বেঁচে গেলি” ইত্যাদি। [পৃঃ ১৯৫]।

বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে একটি স্মরণীর নাম মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। জীবিত লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের মধ্যে তিনিই প্রবীণ-তম। 'হারামণি' খ্যাত মনসুরউদ্দীন মূলতঃ বাংলা লোকসংগীত সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও বাংলা লোক কথা চর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অস্বীকার করার নয়। এই প্রসঙ্গে আমরা তাঁর 'শিরনী' পুস্তিকাটির উল্লেখ করতে পারি। পুস্তিকাটির প্রকাশকাল ১৯৩২। এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি বর্তমানে দুর্লভ। স্বয়ং শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটির আশীর্বানী লিখে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর অশীর্বানীতে বলেছেন :

'বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে মুহম্মদ মনসূর উদ্দীন নানা কথা কাহিনী প্রভৃতি সংগ্রহ করে চলেছেন তা তিনি নিজের দপ্তরে বদ্ধ না রেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করে চলেছেন এটা অতি আনন্দের কথা।

এভাবের সংগ্রহের যে কতখানি মূল্য তা সকলের জানা না থাকতে পারে কিন্তু দেশের সাহিত্য নিয়ে যাঁরা চর্চা করতে চাইবেন তিনি সংগ্রহকারকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারবেন না, এবং এই সংগ্রহ যত দ্রুত অগ্রসর হয় তারি চেষ্টা করবেন কেননা আর বেশী দেরী করলে সংগ্রহে নানা কারণে ব্যাঘাৎ ঘটতে পারে।

এবার মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন পাবনা জেলা হ'তে যে সুন্দর গল্পটী সংগ্রহ করেছেন সেটি 'দরজীর শাস্তর' নামে প্রকাশিত হ'ল।'

কিন্তু মনসুরউদ্দীন স্বয়ং গল্পটির নামকরণ করেছেন 'শিরনী'। তাঁর ভাষায়, 'দুধের মত সুস্বাদু এবং মধুর মত মিষ্টি বলিয়া এই উপকথার নাম রাখিলাম শিরনী।' গল্পটিকে সংগ্রাহক 'উপকথা' বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু বাংলা লোক সাহিত্যে উপকথা বলতে আমরা 'Animal Tale' কে বুঝিয়ে থাকি।

উপকথায় জীব জন্তর সংযোজন আবশ্যিক। কিন্তু 'দরজীর শাস্তরে' সেরকম কোন চরিত্রের উপস্থিতি ঘটেনি। তাই গল্পটিকে আমরা রূপকথার শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। গল্পটি পাবনা জেলার অন্তর্গত মুরারীপুর গ্রাম নিবাসী মুহম্মদ আমির উদ্দিন সরদার সাহিবের কাছ থেকে সংগৃহীত। সংকলকের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব যে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গল্পটি সংগ্রহ করেছেন এবং সেই মত প্রকাশও করেছেন। আর সেইজন্য একদিকে যেমন পাবনার খাঁটি প্রাদেশিক ভাষায় গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি সংগ্রহ সূত্রেরও উল্লেখ করতে ভোলেননি লেখক। গল্পটির কিছু অংশ উদ্ধার করা গেল—

'মহর ছাশে এক মহর বাদশা ছিল। তা সে ছয়ডা বিয়্যা করছিলো, সন্তানাদি কিছুই নাই। এক দিবসে সে বড়ই আক্ষেপ করলো, যে আমার সন্তানাদি নাই, সকলে আমাকে আঁটকুড়্যা বাদশা বলে। তখন সমস্ত উজির নাজির যত ছিল সমস্ত বস্যা মছলত করলো, যে ছ্যাহো বাদশার কোন সন্তানাদি আছে কিনা। এই ঠিক কর্যা নিয়্যা একটা বাঁওন আন্যা গুন্যা দেহ্‌লো। সেই বাঁওনে গুন্যা দেহ্‌লো বাদশার একটা সন্তান আছে।'—'দরজীর শাস্তর' গল্পটির সঙ্গে 'আরব্য উপন্যাস' এবং 'কথা সরিৎসাগরে'র অন্তর্গত গল্পের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। লেখক উর্দু ভাষার অনুসরণে গল্পটিকে ডানদিক থেকে লিখে প্রকাশ করেছেন।

বিক্রমপুর [ঢাকা] 'অর্চনা'য় ১৩৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় 'মুস্কিল আসান' গল্পটি।

'এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। প্রত্যহ এক পাড়াতেই ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। তাই একদিন গৃহস্থের'বধূরা ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিল না। বলিল যে, এই ঠাকুর প্রত্যহ এক জায়গাতেই ভিক্ষা করে, আজ আমরা ভিক্ষা দিব না।

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ঐ দিন ভিক্ষা না পাইয়া মনের কষ্টে ঠাকুরকে

বলিল—আমার জীবিকা-নির্বাহের সম্বল একমাত্র ভিক্ষা, আজ তাহাও জুটাইলে না। কাজেই আজ আমি প্রাণ দিব। আমাকে উদ্ধার কর। একদিন সকলেরই প্রাণ যাইবে; কাজেই ভিক্ষা যখন পাইলাম না, তখন আজই প্রাণ দিব। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ দুপুর বেলা রৌদ্রের সময় চাষাদের ক্ষেতের ধারে শুইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, ঠাকুর, এখন আমার প্রাণ নিয়ে যাও।

এই প্রকারে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ক্ষেতের ধারে শুইয়া আছেন। ক্ষুধায় কাতর, প্রাণ যায়, এমন সময় মুস্কিল আসান ঠাকুর মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে ব্রাহ্মণের আয়ু থাকিতে প্রাণ দিতে আসিয়াছে এবং আমাকে এক মনে ডাকিতেছে; সুতরাং ব্রাহ্মণকে আয়ু থাকিতে উদ্ধার করিতে পারি না। কিন্তু বর্তমানে কষ্টভোগ হইতে উদ্ধার করিব।

এই বলিয়া স্বয়ং মুস্কিল আসান ঠাকুর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে তিনবার ডাক দিলেন। তিনবার ডাকের পর ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সকাতরে উত্তর দিলেন, কে আমাকে অনর্থক ডাকিয়া বিরক্ত করিতেছ? আমি মাঠের ধারে শুইয়া আছি, আমি'ত কাহারও অনিষ্ট কোনও করিতেছি না, তুমি আমাকে কেন ডাকিতেছ?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমি মুস্কিল আসান ঠাকুর। তুমি উঠ এখানে শুইয়াছ কেন?'

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বলিলেন, কোথায়, তোমাকে ত ঠাকুরের মত দেখা যায় না। আমি শুনিয়াছি, আমার ঠাকুরের চারি হাত, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী; কিন্তু তাহার ত কিছুই দেখিনা। ছদ্মবেশী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবশেষে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দেখা দিলেন, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন, "ঠাকুর আমাকে এখন উদ্ধার কর।"

ঠাকুর বলিলেন, তোমাকে আমি কি প্রকারে উদ্ধার করিব,

তোমার আয়ু আছে, কাজেই এখন তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি না। তুমি এখন যে পাড়ায় ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলে, সেই পাড়ায় ভিক্ষা করিতে যাও। আজ অন্যান্য দিন অপেক্ষা বেশী ভিক্ষা পাইবে। তাহা হইতে মুস্কিল আসান ঠাকুরের সিন্নির জন্য কতক চাউল উঠাইয়া রাখিবে এবং আগামী কল্য মুস্কিল আসানের সিন্নি দিবে।

এই বলিয়া ঠাকুর অন্তর্ধান হইলেন এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণও ভিক্ষায় বাহির হইলেন। ভিক্ষায় যাইয়া সত্য সত্যই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ঠাকুরের অনুগ্রহে বেশী পরিমাণে আতপ তণ্ডুল ও তাহার সঙ্গে কিছু তরকারীও পাইলেন। পরদিন ব্রাহ্মণ ঐ তণ্ডুল হইতে মুস্কিল আসানের জন্য কিছু রাখিয়া আর অন্যান্য বিক্রী করিয়া জিনিষ-পত্র ক্রয় করিলেন।

তৎপরে ব্রাহ্মণ মুস্কিল আসানের সিন্নি তৈয়ার করিয়া পূজা দিতেছেন। এমন সময়ে এক কাঠুরিয়া কাঠ বিক্রয় করিতে আসিয়াছে এবং ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল,—ঠাকুর এই সিন্নি তৈয়ার করিয়া কি কর। ব্রাহ্মণ তাহাকে সকল কথা বলিল।

কাঠুরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর! প্রসাদ পাইতে পারি কি? ব্রাহ্মণ কাঠুরিয়াকে অনায়াসে প্রসাদ দিলেন। কাঠুরিয়া প্রসাদ খাইয়া মানস করিল যে, সে যদি কাষ্ঠ বিক্রী করিয়া উন্নতি করিতে পারে, তাহা হইলে সে মুস্কিল আসানের সিন্নি দিবে। যাহা হউক, মুস্কিল আসান ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মণের দিন দিন দুঃখ—দারিদ্র্য দূর হইতে লাগিল।

এদিকে কাঠুরিয়া মানস করিয়াছে পর, পরদিনই কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া দ্বিগুণ লাভ করিল, এই ভাবে সে কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া উন্নতি করিল। অতঃপর একদিন সকল কাঠুরিয়া নদীর পারে মুস্কিল আসানের সিন্নি তৈয়ার করিয়া পূজা দিতেছে, এমন সময় ধনপতি সওদাগর উহাদের পূজার আয়োজন দেখিয়া উপরে উঠিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহারা কিসের পূজা করিতেছে ; তদুত্তরে কাঠুরিয়া বলিল যে, তাহারা মুস্কিল আসানের পূজা করে। সওদাগর পূজার ফলাফল জিজ্ঞাসা করায় কাঠুরিয়াগণ বলিল, এই পূজা করিলে অপুত্রার পুত্র, নির্ধনের ধন, দুঃখীর দুঃখ দারিদ্র্যনাশ ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। সওদাগর পূজার শেষে প্রসাদ খাইয়া মানস করিলেন যে, যদি তাহার সন্তান হয়, তবে তিনি একশত মুদ্রা দিয়া মুস্কিল আসানের পূজা দিবেন।

ইতিমধ্যে সওদাগরের স্ত্রী ঋতুস্নান করিয়াছিলেন। কতক দিনের মধ্যেই সওদাগরের স্ত্রী গর্ভবতী হইলেন এবং দশ মাস দশ দিন পর একটি কন্যা প্রসব করিলেন। কন্যা ক্রমেই বড় হইতে লাগিল এবং স্বর্গের উর্বশীর ন্যায় সুন্দরী হইল। কন্যার রূপ ও গুণ দেখিয়া পূজার কথা সকলই ভুলিয়া গেলেন। কন্যা ক্রমেই বড় হইতে লাগিল। দ্বাদশ বর্ষীয়া হইল তবু কন্যার বিবাহ হইতেছে না। এমন কি, সম্বন্ধও আসে না। তখনই সওদাগরের পূজার মানসিকের কথা স্মরণ হইল এবং মুস্কিল আসান ঠাকুরকে এক মনে ডাকিতে লাগিলেন, আমার কন্যার বর যোগাড় করিয়া দাও। আমার অপরাধ ক্ষমা কর। মুস্কিল আসান ঠাকুর তাহার করুণ ডাকে সন্তুষ্ট হইয়া কন্যার বর যোগাড় করিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে ঐ দেশেরই রাজা মারা গেলেন। রাজার একটি মাত্র ছেলে। রাজার রাজত্বও ছারখার হইয়া গেল। রাজপুত্র শেষে কোন উপায় না দেখিয়া দেশ ত্যাগ করিয়া কোন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মুনিকে গুরু বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং বলিলেন যে, আমি আপনার আশ্রমে থাকিতে চাই। ডাক দেওয়াতে মুনি ঠাকুর ধ্যান ভঙ্গ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুই গুরু বলিয়া সম্বোধন করিলি বলিয়া তোকে রক্ষা করিলাম। তাহা না হইলে তোকে এখনই ভস্মসাৎ করিতাম, তুই কি চাস এখানে?

রাজপুত্র বলিল আমি আপনার নিকট থাকিব, পূজার ফল ফুল

যোগাড় করিব। মুনি শান্ত হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিল, পরে একদিন বলিল যে, তুই এখানে থাকিতে পারিবি না। তোর ভবিতব্য আসিতেছে।

রাজপুত্র বলিল, আমি কোথায় যাইব? আমার কেহই নাই, মুনিঠাকুর! মুনি তথাপি তাহাকে রাখিলেন না।

রাজপুত্র বাহির হইয়া শেযে পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ধনপতি সওদাগরের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বাড়ীর মালিকের নিকট জল পান করিতে চাইলেন। এমন সময় ধনপতি সওদাগর বাহির হইয়া দেখিলেন, কে জল চায়; তাহার পরিচয় লইলেন, পরে তাহাকে আদর—যত্ন করিয়া বাড়ির ভিতর লইয়া গেলেন। ধনপতি সওদাগর রাজপুত্রের সঙ্গে তাহার মেয়ের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে রাজপুত্র বলিলেন যে, আমার পাঁচশত টাকা পিতৃঋণ আছে, সেই টাকা দিতে পারিলে আমি বিবাহ করিব। ধনপতি সওদাগর তাহাই স্বীকার করিলেন এবং কন্যার বিবাহ দিলেন। কিন্তু মুস্কিল আসানের পূজা আর দিলেন না।

কতদিন পরে ধনপতি সওদাগর জামাতাকে সঙ্গে লইয়া বাণিজ্যে চলিলেন। বাণিজ্যে যাইয়া মুস্কিল আসানের অনুগ্রহে বিস্তর লাভ হইল। বাণিজ্যের লাভের গুণে ধনপতি সন্তুষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে চোরে ঐ দেশের রাণীর গলার হার চুরি করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। সওদাগর সুন্দর হার দেখিয়া জামাতাকে কিনিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতে চোর ধরিবার জন্য কোতল ছুটিল। সওদাগরের জামাতার গলে হার দেখিয়া কোতল তাহাদিগকে ধরিরা রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা হার গ্রহণ করিয়া সওদাগর ও জামাতাকে মশাল ঘরে রাখিল। সওদাগর এক মনে মুস্কিল আসানকে ডাকিতে লাগিলেন।

মুস্কিল আসান ঠাকুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে স্বপ্নে বলিলেন,

১৬

সওদাগর হার ক্রয় করিয়া তোমার দেশে চোর হইল কেন? তুমি ইহাদিগকে শীঘ্র মুক্ত করিয়া দাও। ধন দৌলত সঙ্গে দিয়া দাও। নচেৎ তোমার বংশ ছারখার করিব।

রাজা পরদিন প্রাতে উঠিয়া উহাদিগকে ধনদৌলত দিয়া দেশে পাঠাইয়া দিলেন। সওদাগর আসিতেছেন, পথে মুস্কিল আসান ঠাকুর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নৌকায় কি ভরিয়াছ? এরূপ পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে সওদাগর চোর মনে করিয়া বলিল যে, আমি নৌকায় মাটি ভরিয়াছি। তোমার তাহাতে প্রয়োজন কি?

মুস্কিল আসান ঠাকুরের কৃপায় নৌকার সকলই মাটি হইল। সওদাগর নৌকায় মাটি দেখিয়া ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িল। ব্রাহ্মণ বলিল যে, তুমি কতবার মুস্কিল আসানের পূজা মানস করিলে, কিন্তু এ পর্যন্ত পূজা করিলে না কেন? সওদাগরের সকল কথা মনে পড়িল এবং পুনরায় তাহার পূজা মানস করিল। তারপর নৌকা পুনরায় ধন-দৌলত-পূর্ণ হইল।

এদিকে ধনপতি সওদাগরের বাড়ী পুড়িয়া যাওয়ায় সকলে অন্ন কষ্টে দিনযাপন করিতেছে। একদিন সওদাগরের স্ত্রী মুস্কিল আসানের পূজা স্বপ্নে দেখিয়া পরদিন কিছু আতপ যোগাড় করিয়া মুস্কিল আসানের সিন্নি দিতেছে, এমন সময় সওদাগর দেশে আসিয়া পৌঁছিল। কন্যা প্রসাদ হাতে লইয়াছিল, সেই সময় পিতা দেশে আসিয়াছে শুনিয়া আহ্লাদে প্রসাদ ফেলিয়া দিল। তাহাতে জামাতার সহিত সওদাগর জলে ডুবিল।

সওদাগরের কন্যার ক্রন্দন শুনিয়া মুস্কিল আসান ঠাকুর স্বর্গ হইতে দৈববাণী করিলেন যে, প্রসাদ ফেলিয়াছে বলিয়া এ দুর্দশা, শীঘ্র যাইয়া আমার প্রসাদ গ্রহণ কর, তবেই সওদাগর, জামাতা ও নৌকা সহিত ভাসিয়া উঠিবে। সকলে জয় জয়কার দিতে লাগিল। সওদাগর একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বিবিধ বিধানে মুস্কিল আসানের

পূজা দিল। পরে ধন দৌলত বাড়ীতে আনিল। মুস্কিল আসানের কৃপায় সওদাগর সুখে স্বছন্দে বাস করিতে লাগিল।

এই লোক-কথাটিতে যে সব অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হ'ল দেবসেবার পুরস্কার [Reward for service of Gods Q 21] এবং অসাধুতার শাস্তিবিধান [Impiety Punished—Q 220]

'উত্তরবঙ্গের ব্রতকথা' গ্রন্থখানি বিমলা দেবী সঙ্কলিত। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩৪৩। গ্রন্থের নামকরণেই প্রকাশিত যে লেখিকা উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ব্রত এবং ব্রতগুলির সঙ্গে ব্রতকথাও সঙ্কলন করেছেন আলোচ্য গ্রন্থটিতে। ভূমিকায় লেখিকা বলেছেন ঃ

"উত্তরবঙ্গে যে সকল ব্রতাদির প্রচলন আছে তাহার নিয়ম পালন সম্বন্ধে কোন উপযুক্ত পুস্তক নাই। যাঁহারা ব্রতাদি পালন করেন, তাঁহারা নিয়ম পদ্ধতি প্রায়ই ঠিকমত জানিতে পারেন না। বিশেষতঃ এই সকল ব্রতাদির অবশ্য আনুষঙ্গিক যে সকল কথা প্রচলিত আছে ঐ সকল কথা অধিকাংশ মুখে মুখে থাকায় উহা সংগ্রহ করা অনেক স্থলে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। শাশুড়ী কিংবা জানেন এইরূপ বৃদ্ধাদের নিকট কষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিতে হয়। ঐ সকল ব্রতাদি সম্বন্ধে আমি এ পর্যন্ত যতদূর জানিতে শিখিতে পারিয়াছি, তাহা এই পুস্তিকাতে লিপিবদ্ধ করিলাম।"

গ্রন্থটি চারিটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে মঙ্গলচণ্ডী পূজার নিয়মাবলী ও ব্রতকথা স্থান পেয়েছে। এই ভাগে কুলাই মঙ্গল চণ্ডীর কথা, ঢালা সুবচনীর কথা, খাড়া সুবচনীর কথা, বথাই পথাই-মঙ্গলচণ্ডীর কথা স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয়ভাগে সংক্রান্তি পুরুষের ও নাগপঞ্চমীর নিয়মাবলী ও ও ব্রতকথা প্রকাশিত হয়েছে। এই বিভাগে যে ব্রতকথাগুলি স্থান পেয়েছে, সেগুলি হল যথাক্রমে—সামাই ব্রতকথা, সংক্রান্তি পুরুষের কথা, নাগ পঞ্চমীর কথা।

তৃতীয় ভাগে ষষ্ঠীপূজার নিয়মাবলী ও ব্রতকথা স্থান পেয়েছে এই পর্যায়ে স্থান পেয়েছে ষষ্ঠীর ব্রতকথা, পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত লোটন ষষ্ঠীর ব্রতকথা, চৈত্রমাসে অনুষ্ঠেতব্য আলোক ষষ্ঠীর ব্রতকথা, জ্যৈষ্ঠ মাসের ব্রতকথা, ভাদ্রমাসের চাপড়ষষ্ঠীর ব্রতকথা।

চতুর্থভাগে লক্ষ্মীপূজা পদ্ধতি ও লক্ষ্মীর ব্রতকথা স্থান পেয়েছে। এই পর্যায়ে লক্ষ্মীর জন্মকথা এবং লক্ষ্মীর কথা স্থান পেয়েছে।

'বসুমতী' পত্রিকায় [ভাদ্র, ১৩৬০] 'ইচ্ছামতী' শীর্ষক নিম্নোদ্ধৃত গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটি হ'ল—

একদিন লক্ষ্মী-নারায়ণ পাশা খেলিতে বসিয়াছেন। এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সাহায্যকারী হইল, কথা রহিল যদি লক্ষ্মীকে হারায়, তবে সে ভস্মীভূত হইবে, আর যদি নারায়ণকে হারায়,তবে 'কুটে আতুর' হইবে। নারায়ণ হারিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ 'কুটে আতুর' হইয়া পথে শুইয়া রহিল ; রাজার মেয়ে ইচ্ছামতী শিবপূজার ফুল তুলিতে যায়, আতুর ব্রাহ্মণ কিছুতেই পথ ছাড়েনা। ওদিকে শিব পূজার বেলা হইয়া যায়, রাজার মেয়ে অগত্যা তাহাকে প্রতিশ্রুতি দেয়, সে যদি পথ ছাড়ে, স্বয়ম্বর সভায় তাহাকেই সে মালা দিবে। ব্রাহ্মণ পথ ছাড়িয়া দিল এবং কালক্রমে ইচ্ছামতী সেই কুটে আতুরকেই বিবাহ করিল। দূর বনের ধারে কুটীরে তাহারা থাকে, আতুরের সেবায় রাজার মেয়ের দিন কাটে। লক্ষ্মীর বড় দয়া হইল। একদিন তিনি রালদুর্গা ব্রতের নিয়ম প্রণালী ইচ্ছামতীকে শিখাইয়া দিলেন। অঘ্রাণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসের অমাবস্যা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত দ্বিপ্রহরে এই ব্রত করিতে হয়। একটি কলার মাজপাতে ১৭টি আতপ চাউল ও ১৭টি দূর্বা এবং তামার একটি টাটে সিন্দূর, চন্দন, ওড়ফুল, জবার মালা, জোড়া কলা উপকরণ সাজাইয়া দিয়া ইচ্ছামতী চার মাস যথা-রীতি ব্রত করিল, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সূর্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিলেন, 'কুটে আতুর' স্বামীর কন্দর্পের মত শরীর হইল।

রালদুর্গার পূজায় তাহাদের ঐশ্বর্যের সীমা রহিল না। একটি সুন্দর পুত্র সন্তানও তাহারা লাভ করিল। সংবাদ পাইয়া রাজকন্যা জামাতাকে দেখিতে গেলেন। কন্যার মুখে রালদুর্গা ব্রত মাহাত্ম্য শুনিলেন! নিজও বাড়ী আসিয়া সেই ব্রত করিলেন, অপুত্রক ছিলেন তিনি পুত্রলাভ করিলেন।

বসুমতী পত্রিকায় ১৩৬০ সনে [ভাদ্র] 'জয়াবতী' শীর্ষক একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটি সংগ্রহ করেছেন কামিনীকুমার রায়।

'এক দেশে এক সদাগর ছিল, তাহার সাত মেয়ে, কিন্তু কোনও ছেলে নাই। পার্বতী এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে হাতে নড়ি, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, মাথায় জটা সেই সদাগরের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সদাগরের স্ত্রী তাঁহাকে আদর আপ্যায়ন করিয়া ভিক্ষা দিলেন, কিন্তু তিনি পুত্র আঁটকুড়ের ভিক্ষা গ্রহণ করেন না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সদাগরের স্ত্রীর মনে ভারি দুঃখ হইল, সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সদাগর এবং অন্য লোকজন ছুটিয়া আসিল ব্যাপার কি জানিয়া সকলে সেই বৃদ্ধাকে খুঁজিতে বাহির হইল; দেখিল অদূরে এক বটগাছের তলায় তিনি বসিয়া আছেন। সদাগর তাঁহার পায়ে পড়িয়া অনেক কান্নাকাটি করিল এবং যাহাতে তাঁহার স্ত্রীর একটি ছেলে হয়, সেইরূপ কোনও ঔষধ দিতে অনুরোধ করিল।

বৃদ্ধা তাহাকে একটি ফুল দিয়া বলিলেন, "ঋতু স্নানের পর তোমার স্ত্রী যেন এই ফুলটা ধুইয়া জল খায়, তাহা হইলেই ছেলে হইবে।"

সদাগরের স্ত্রী নির্দেশ মত কাজ করিল এবং সন্তান সম্ভবা হইল। দশ মাস দশ দিন যায়, ব্যথায় অস্থির, কিন্তু সন্তান

হইতেছেনা। এদিকে কৈলাসে পার্বতীর আসন টলে। তিনি পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ব্যাপার কি!

পার্বতী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অমনি এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে সেই সদাগরের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সূতিকা গৃহ হইতে সকলকে সরাইয়া দিয়া তাহার পদ্মহস্ত সদাগরের স্ত্রীর পেটে বুলাইয়া দিলেন। অমনি চাঁদের মত একটি ছেলে ভূমিষ্ঠ হইল পার্বতী উহার নাম জয়দেব রাখিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই দেশেই ধনপতি নামে আর এক সদাগর ছিল; তাহার সাত ছেলে, কিন্তু কোনও মেয়ে নাই। পার্বতী অতঃপর তাহার বাড়ীতেও একদিন পূর্বোক্তরূপে ভিক্ষা করিতে গেলেন এবং কন্যা আঁটকুড়ের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না বলিয়া চলিয়া আসিলেন। শেষে ধনপতির স্ত্রীও দেবীর কৃপায় ঐরূপে একটি কন্যাসন্তান লাভ করিল এবং তাহার নাম রাখিল জয়াবতী।

জয়াবতীর যখন ছয় সাত বৎসর বয়স, সে সঙ্গিনীদের লইয়া বনের ফুলপাতা কুড়াইয়া বালির নৈবেদ্য দিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করে, এমন সময় একদিন জয়দেবের উড়ন্ত পায়রা আসিয়া তাহার কোলে পড়িল। জয়দেব পায়রা লইতে আসিল; কিন্তু জয়াবতী প্রথমে পায়রা দিতে স্বীকৃত না হইলেও শেষে দিতে বাধ্য হইল। জয়দেব জিজ্ঞাসা করিল তাহারা ফুলপাতাগুলি দিয়া ও সব কি করিতেছে। জয়াবতী উত্তরে জানাইল তাহারা জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতেছে; এই ব্রত করিলে হারানো ধন ফিরে পায়, মরিলে বাঁচিয়া উঠে, খাঁড়ায় কাটে না, আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না, সতীন মারিয়া ঘর হয়, রাজা মারিয়া রাজ্য পায়।

জয়দেব আর কিছু বলিল না, পায়রা লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া রহিল, জয়াবতীর সঙ্গে তাহার বিবাহ না দিলে সে উঠিবেও না, খাইবেও না।

শেষে উভয় পক্ষের সম্মতিতে জয়দেব ও জয়াবতীর বিবাহ হইয়া

গেল। বিবাহের দিন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের এক মঙ্গলবার,—সেদিন জয়াবতী মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিয়াছে। রাত্রে আঁচল খুলিয়া 'গদ' খাইতেছে, এমন সময় জয়দেব জিজ্ঞাসা করিল, কি করিতেছ, তুক্‌-তাক কিছুই করে নাই। মঙ্গলচণ্ডীর গদ খাইয়াছে, বিবাহের হৈ হল্লায় সারা দিন খাইতে পারে নাই। "এই ব্রত করিলে কি হয় ?" "হারালে পায়, ম'লে জিওয়, খাঁড়ায় কাটেনা, আগুনে পোড়ে না, সতীন মেরে ঘর হয়, রাজা মেরে রাজ্য পায়।"

জয়দেব মনে মনে বলিল, আচ্ছা, পরীক্ষা করা যাইবে। পরদিন তাহারা নৌকায় চলিয়াছে, জয়দেব জয়াবতীর সব কয়টি অলঙ্কার পোঁটলা বাঁধিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল। কৈলাস হইতে পার্বতী তাহা জানিতে পারিলেন। তাঁহার আদেশে অমনি এক রাঘব বোয়াল পোঁটলাটি তাহার পেটের মধ্যে পুরিল।

বউভাত; জেলেরা মা পার্ব্বতীর চক্রান্তে অন্য কোনও মাছ না পাইয়া নদী হইতে সেই রাঘব বোয়ালটিই ধরিয়া আনিল। জয়াবতী সেই মাছটি কাটিতে যাইয়া সমস্ত অলঙ্কার ফিরিয়া পাইল। এইরূপে জয়াবতী আরও বহু পরীক্ষায়,—১৭ শত বেনের রন্ধনে, ১৭ শত বেনের একত্র পরিবেশনে উত্তীর্ণ হইল। মা দুর্গা কখনও শ্বেত মাছি, কখনও শ্বেত কাক প্রভৃতির রূপ ধরিয়া আসিয়া জয়াবতীকে সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

জয়াবতীর ছেলে হইল; জয়দেব এক সুযোগে তাহাকে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিল। পার্বতী তাহাকে বাঁচাইয়া জয়াবতীর কোলে তুলিয়া দিলেন। আর একদিন জয়দেব কুমোরের পোণে গিয়া ছেলেকে রাখিয়া আসিল; কুমোরেরা পোণে আগুন দেয়, আগুন আর জ্বলে না, মা পার্বতী কৈলাস হইতে সব জানিতে পারিলেন। তিনি এক বৃদ্ধার বেশে আসিয়া কুমোরের বাড়ী উঠিলেন, জয়াবতীর

ছেলেকে পোণ হইতে অলক্ষ্যে কোলে তুলিয়া লইয় আসিলেন অমনি পোণ জ্বলিয়া উঠিল।

শেষে এই রাজ্যের রাজা মারা গেল। রাজার শ্বেত হস্তী অন্য রাজার খোঁজে বাহির হইয়া জয়দেবকে নিয়া সিংহাসনে বসাইল। এইরূপে জয়দেব দেখিল, জয়াবতী ব্রতের ফল যাহা বলিয়াছিল, সকলই ফলিল। দেশে দেশে জয়মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল।'

প্রখ্যাত লোক সংস্কৃতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোক-সাহিত্যে'র ৪র্থ খণ্ড [কথা] প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে [১৩৭৩]। বাংলা লোক-কথা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গ্রন্থটি সর্বমোট দ্বাদশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ও বক্তব্য সঙ্কলিত গল্পগুলিকে একত্রে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। অধ্যায়গুলি হ'ল যথাক্রমে 'অলৌকিক জন্মকথা,' 'ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া,' 'ভূতপ্রেতের কথা', 'দৈবকথা', 'নিষ্ঠুরতার কথা', 'নির্বুদ্ধিতার কথা', 'চতুরতার কথা', 'লোভীর কথা', 'ছোট বউয়ের কথা.' 'ভাই-ভগিনীর কথা,' বন্ধুত্বের কথা' এবং 'বিবিধ কথা'। সমগ্র গ্রন্থটিতে সর্বমোট ২১০টি গল্প সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'নির্বুদ্ধিতার কথা' পর্যায়েই সর্বাধিক গল্প সংকলিত হয়েছে। সংকলিত গল্পের সংখ্যা ৩২। এরপরই ৪র্থ অধ্যায়ে 'দৈবকথা' পর্যায়ে সংগৃহীত গল্পের সংখ্যাধিক্যের উল্লেখ করতে হয়। এই অধ্যায়ে মোট ৩০টি গল্প সংকলিত হয়েছে। আর সর্বাপেক্ষা কম গল্প সংগৃহীত হয়েছে একাদশ অধ্যায়ে—'বন্ধুত্বের কথা' পর্যায়ে। এই পর্যায়ে মাত্র ৫টি গল্প সংগৃহীত হয়েছে।

লেখক গ্রন্থের নিবেদন অংশে বলেছেন, 'বাংলার লোককথার এ পর্যন্ত ইহাই বৃহত্তম সংকলন এবং বিস্তৃততম আলোচনা' কিন্তু গ্রন্থটি কেবলমাত্র এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক লোককথার সংগ্রহ বলেই যে উল্লেখযোগ্য তা নয়, অনেক

গুলি বিরল বৈশিষ্ট্যের জন্যও এটি বাংলা লোক কথা চর্চার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

প্রথমেই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় গ্রন্থটি রচনার ব্যাপারে লেখকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। ডঃ ভট্টাচার্যের পূর্বে কয়েকটি লোক কথার সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল বহুকাল পূর্বেই কিন্তু সেগুলির প্রতিটিই নিছক শিশুদের উপযোগী করেই প্রকাশিত হয়েছিল। তাই লোককথাগুলি বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে একদিকে যেমন সংগৃহীত হয়নি, তেমনি লোক-কথা সমূহের সমাজ বিজ্ঞান সম্মত পরিচয়টুকুও সেইসব সংকলনে অনুপস্থিত। সেইদিক দিয়ে ডঃ ভট্টাচার্যের গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান সংগ্রহ বলে বিবেচিত হবে। এইবার আমরা গ্রন্থটির অপরাপর বৈশিষ্টগুলি সম্পর্কে আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি।

লোককথা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, কথাগুলি যে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সেই ভাষার অবিকৃতরূপ রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ লোককথা সংগ্রাহকই এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি স্মরণে রাখেন না। অন্ততঃ আমাদের দেশে যাঁরা লোককথা সংগ্রহে পথিকৃৎ রূপে চিহ্নিত, তাঁদের ক্ষেত্রে এই মূল্যবান বৈশিষ্ট্যটি অনুসৃত হতে দেখা যায়নি। যেমন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার যদিও টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ থেকে তাঁর গ্রন্থের লোক কথাগুলি সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু প্রকাশিত কথাগুলি এতদঞ্চলের কথ্যভাষায় প্রকাশিত হয়নি। কিংবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পূর্ব মৈমনসিংহ থেকে তাঁর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট লোক-কথাগুলি সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু তবু সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা অঞ্চলের সাধু ভাষায়। ডঃ ভট্টাচার্যের সংগৃহীত লোককথাগুলি মোটামুটি-ভাবে যে অঞ্চল থেকে সংগৃহীত, সেই অঞ্চলের ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি কয়েকটি কাহিনী যে অঞ্চল থেকে সংগৃহীত, সেই অঞ্চলের কথ্য ভাষাতেই প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন চতুর্থ

অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট ১৪ সংখ্যক গল্পটি [বিপদের দিনে] ঢাকা বিক্রম-পুর পরগণার কথ্যভাষায় প্রকাশিত। এই একই অধ্যায়ের ১৬ সংখ্যক গল্পটি [শোকহীনার শোক] ত্রিপুরা জেলার কথ্য ভাষায় প্রকাশিত। পঞ্চম অধ্যায়ের ১ম গল্পটি [রমুনা-যমুনা] ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার কথ্যভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

লোক-সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পাঠান্তর। লোক কথার ক্ষেত্রেও এই পাঠান্তর মোটেই দুর্লভ নয়। একই লোককথা বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিরূপ অবস্থায় প্রচলিত আছে তা পাঠান্তর ব্যতিরেকে জানা সম্ভব নয়। সেদিক দিয়ে আলোচ্য সঙ্কলনে কয়েকটি লোক-কথার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত পাঠান্তর নির্দেশের অভিপ্রায়ে বিভিন্ন পাঠের সংকলন খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। সম্ভবমত কথাগুলি কোন স্থান থেকে সংগৃহীত এবং সংগ্রহকালের নির্দেশও করা হয়েছে।

লেখক যথার্থই বলেছেন ঃ

'জাতির লোক-কথার সংগ্রহ যত আধুনিক হউক না কেন, ইহা সর্বদাই একটি অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া থাকে; সেইজন্য ইহাদের মধ্যে সমাজ জীবনের বহু বিস্মৃত আচার আচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। ইহাদের ভিতর দিয়া জাতীয় সমাজ জীবনের অগ্রগতির ধারাটি অনুসরণ করিবার সুযোগ হয়।' —লেখক কর্তৃক সংগৃহীত লোক-কথাগুলির ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি আপাত তুচ্ছ সকল তথ্য সংগ্রহেই বিশেষ লক্ষ্য রাখার প্রয়াস দেখা যায়। শুধু খুঁটিনাটি তথ্যাদি সংগ্রহেই যে লেখকের সচেতন দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাই নয়, সেইসঙ্গে প্রয়োজনমত জাতিতত্ত্ব বিষয়ক উপাদানগুলির তাৎপর্য ও গুরুত্ব কথার সঙ্গে যুক্ত মন্তব্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। জাতিতত্ত্বের সঙ্গে নৃতত্ত্বের সম্পর্ক যেহেতু গভীর এবং জাতিতত্ত্বের ন্যায় লোককথা যেহেতু নৃতাত্ত্বিক উপাদানেরও আকর, তাই কোন কোন ক্ষেত্রে লেখককে নৃতাত্ত্বিক

তাৎপর্য ব্যাখ্যাতেও প্রয়াসী হতে দেখা গেছে। বস্তুতঃ প্রতিটি কথার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট মন্তব্য একদিকে যেমন কথার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবনে বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়েছে, তেমনি লেখকের সুগভীর পাণ্ডিত্য ও অধ্যয়নশীলতার পরিচয়বাহী হয়ে উঠেছে। প্রতিটি অধ্যায়ের পূর্বে সেই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট গল্পগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও অভিপ্রায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

এইবার আমরা গ্রন্থের বিস্তৃত ভূমিকাংশ বিষয়ে উল্লেখ করব। ভূমিকাংশে লোক-কথার বিশেষত্ব, লোক-কথার বিস্তার, জাতীয় চরিত্র ও লোক-কথা, লোককথার সঙ্গে আখ্যায়িকা কাব্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, লোককথা ও উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা, মঙ্গল কাব্য ও লোককথার আলোচনা, লোককথা ও রবীন্দ্রনাথ, বাংলা লোককথা সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও সর্বশেষে লোক-কথার শ্রেণী বিভাগ স্থান পেয়েছে।

'লোক-কথা ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক আলোচনায় লেখক লোককথার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক আকর্ষণ এবং তাঁর কাব্যে লোককথার প্রভাব বিষয়ে তথ্যনির্ভর ও কৌতূহলোদ্দীপক বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। 'মানসী'. 'সোনারতরী', 'কণিকা', 'কল্পনা', 'শিশু', 'উৎসর্গ', 'পরিশেষ', প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বহু কবিতায় রূপকথার চিত্রকল্পের প্রতিফলন বিষয়ে লেখকের আলোচনা, রবীন্দ্র-কাব্যে রূপকথার প্রভাব বিষয়ে অবহিত হতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শুধুমাত্র রূপকথাই নয়, বাংলার ব্রতকথাগুলি সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। রবীন্দ্র সাহিত্যে রূপকথার মত ব্রতকথার প্রত্যক্ষ প্রভাবের পরিচয় অনুপস্থিত হলেও লোককথারই অন্তর্গত ব্রতকথা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের পরিচয় নানা স্থানেই বিধৃত রয়েছে। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত, মেয়েলি ব্রত' [১৩০৩] পুস্তিকাটির ভূমিকা রবীন্দ্রনাথই লিখে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও যে ব্রতকথা

সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার পরিচয়ও তাঁর নিজের লেখাতেই মেলে :

'সাধনা পত্রিকা সম্পাদনকালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।' এছাড়া 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মেয়েলি ব্রতকথা' শীর্ষক প্রবন্ধটিও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৭ই চৈত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ক্লাসিক থিয়েটারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আহূত সহস্রাধিক ছাত্রের সমাবেশে রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' নামে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং ঐ বৎসরেই পরে যেটি 'বঙ্গদর্শনে'র বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, সেখানেও রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতির বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় অনুসন্ধান করার পরামর্শ দান প্রসঙ্গে বলেছেন :

'সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত পার্বনগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে।' —অর্থাৎ লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ব্রত পার্বন ও সেগুলির পাঠান্তর সংগ্রহের উপরেও রবীন্দ্রনাথ যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলেছেন।'

'বাংলা লোক-কথা সংগ্রহ' শীর্ষক আলোচনায় লেখক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে থেকে শুরু করে পরবর্তীকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সংগ্রাহক কর্তৃক বাংলা লোককথা সংগ্রহের মোটামুটি একটা ইতিহাস বিবৃত করেছেন। কিন্তু এই আলোচনায় একটি গুরুতর তথ্যগত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। লেখক বলেছেন : 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতেই খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় বাংলা লোক-সাহিত্যের একটি প্রধান উপকরণ প্রবাদ সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হইলেও বাংলার লোককথা সংগ্রহের দিকে তাহাদের দৃষ্টি কোন দিনই আকৃষ্ট হয়

নাই। অথচ বাংলার প্রতিবেশী অঞ্চল বিশেষতঃ সাঁওতালী ভাষী অঞ্চল হইতেই একজন ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকের চেষ্টায় বৃহত্তম লোককথা সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল' [১৭], লেখক এর পর উল্লেখ করেছেন :

'১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার লোক-কথার প্রথম সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ইহার সংগ্রাহক প্রসিদ্ধ রেভাঃ লালবিহারী দে'।

এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন প্রথম রচয়িতার সম্মান প্যারীচাঁদ মিত্রের পরিবর্তেহ্যানা ক্যাথারিন মূলেন্সকে দেওয়া হয়ে থাকে তাঁর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' রচনার জন্যে, তেমনি প্রথম বাংলা লোককথা সংগ্রহের গৌরব লালবিহারী দে'র মত বাঙ্গালীর না হয়ে, সেই গৌরব লাভের অধিকারী হয়েছেন একজন বিদেশীয় এবং তিনি হলেন জি., এইচ. ড্যামাণ্ট। কলকাতা থেকে যে 'The Indian Antiquary' প্রকাশিত হয়, ড্যামাণ্টের সংগৃহীত মোট ২২টি উপকথা এবং রূপকথা সেই পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ড্যামাণ্টের সূত্রেই বাংলা লোককথা সংগ্রহের শুভ সূচনা ঘটেছিল স্বীকার করতে হয়। অতএব রেভারেণ্ড লালবিহারীর প্রায় এক দশক পূর্ব থেকেই বাংলা লোক-কথার সংগ্রহ কার্য শুরু হয়েছিল দেখা যায়। তবে একথা ঠিক যে ভারতবর্ষের অপরাপর অঞ্চলের লেককথা সংগ্রহে বিদেশী-য়েরা যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, বাংলাদেশের লোক করা সংগ্রহে সেই পরিমাণ গুরুত্ব আরোপিত হয়নি। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র পরবর্তী লোক-কথা সংগ্রাহক হিসাবে লেখক কেবলমাত্র উইলিয়াম ম্যাককুলোচ সঙ্কলিত 'Bengali House hold Tales' [১৯১২] এর উল্লেখ করেছেন কিন্তু ম্যাককুলোচের পূর্বসূরী আর একজন বিদেশীয়ের উল্লেখ এখানে না করলে বাংলা লোক-কথা সংগ্রহের ইতিহাস আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেই বিদেশীয় হলেন এইচ, এইচ, রিসলে। এঁর রচিত The Tribes

and castes of Bengal' গ্রন্থটি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে লেখক বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করা ব্যতিরেকে বহু স্থানীয় লোক-কাহিনীও প্রকাশ করেছিলেন।

অধ্যাপক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তীর 'বাংলা সাহিত্যে মা' গ্রন্থে [১৯৭৩] সন্নিবিষ্ট মোট ৮টি প্রবন্ধের তৃতীয় প্রবন্ধটি হল 'রূপকথায় মা'। রূপকথা সম্পর্কে সামগ্রিক ভাবে আলোচনার সূত্রপাত অনেকের দ্বারা ইতিপূর্বে ঘটলেও রূপকথার বিশেষ চরিত্র অবলম্বনে আলোচনা বোধ করি এই প্রথম। তদুপরি লেখক এমন এক চরিত্র নির্বাচন করে নিয়েছেন যা নাকি রূপকথার বিশাল জগতে সীমিত পরিসরেই সীমাবদ্ধ। রূপকথা মূলতঃ নায়ক নায়িকার রোমাঞ্চকর অভিযান, প্রেম, তাদের ত্যাগ—এককথায় বলা যায় 'যৌবনের অফুরান প্রাণশক্তির উদ্দীপনায় চঞ্চল।' সেক্ষেত্রে মা'র ভূমিকা তেমন উজ্জল কিংবা গুরুত্বপূর্ণ নয়। রূপকথার মা অনেকটা কাব্যে উপেক্ষিতার মত। তবু সেই মায়েরও একটা মাধুর্য আছে। লেখক সেই মাধুর্যমণ্ডিত মায়ের ভূমিকাটি বিষয়েই আলোকপাত করেছেন। লেখক স্বভাবতঃই তাঁর আলোচনায় প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি রূপকথার ওপর নির্ভর করেছেন। যেমন—পুষ্পমালা, মধুমালা, শঙ্খমালা, বুদ্ধভুতুম, শীত বসন্তের কাহিনী ইত্যাদি।

পৃথিবীর সব দেশের জননী চরিত্রই মূলতঃ এক। আর তা হল অন্তহীন অপত্য স্নেহের আকর। তবু দেশভেদে জননী চরিত্রে কিছু পার্থক্য থাকেই। বাংলাদেশের রূপকথায় চিত্রিত মা আসলে যে বাঙ্গালী মা একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলেই বেশ সহজেই তা অনুধাবন করা যায়। তবে লেখক যথার্থই বলেছেন যে ছড়ায় বর্ণিত মায়ের ভূমিকার তুলনায় রূপকথায় চিত্রিত মাতৃমূর্তি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। 'ছড়ায় মায়ের উল্লাস হাস্যোজ্জ্বল চিত্র এখানে বেশি দেখা যায় না। বরং ব্রতের মায়েদের দৈব নির্ভরতা ও দুঃখ সহন ক্ষমতার সঙ্গে

রূপকথার মায়েদের সাদৃশ্য অধিক। কারণ ছড়ার মায়েদের কোন শ্রেণী বিভাগ নেই—সেখানে মায়েদের একটিই মাত্র পরিচয়—আর তা হ'ল সন্তান গরবে গরবিনী, সৌভাগ্যবতী। এছাড়া ছড়ার মায়েদের দায়িত্ব নবজাতক, বড়জোর শিশুকে ঘুম পাড়ান, স্নান করান ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু রূপকথার মায়েদের দায়িত্ব যেমন অনেক বেশি, তেমনি তাঁদের নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও পড়তে হয়। তাদের মধ্যে দেখা যায় নানা শ্রেণীবিভাগ—কেউ রাজ-রাণী, কেউ সওদাগরের জননী, কেউ বা দীন দরিদ্রা দুঃখিনী। ছড়ার মা চরিত্রের কোন বিবর্তন নেই, কিন্তু রূপকথার মা চরিত্রে আছে বিবর্তন।' তাই ছড়ার তুলনায় রূপকথার মা অনেক বেশি রক্ত মাংসের জীবন্ত যা সহজেই সহানুভূতি আকর্ষণে সক্ষম। ছড়ার মা চরিত্রের স্থলাভিষিক্ত হবার অবকাশ আছে, কিন্তু রূপকথায় সে অবকাশ নেই।

রূপকথার মাকে অনেক সময়ই অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় বলে তাঁরা সংস্কারের বশ, দৈবে বিশ্বাসী। দুঃখের দিনে একটা কিছুকে অবলম্বন করে সান্ত্বনার সন্ধান করে ফেরার প্রয়াস আর কি।

এইবার দেখা যাক রূপকথার মায়েদের দুঃখভোগের কারণগুলি কি, প্রতিকূলতার স্বরূপটি কেমনতর? কখনও সূতিকা গৃহে বিধাতা পুরুষ নবজাতকের আয়ুঃসীমা নির্দ্ধারণ করে দিয়ে যান অল্প কয়েকদিনের জন্য, কখনও আবার মাকে এই রকম হতভাগ্য স্বল্পায়ু শিশুর হাতেই জেনেশুনে মেয়েকে সমর্পন করতে হয়, আবার কখনও নিজের কপাল বৈগুণ্যেই মায়েদের দুঃখভাগিনী হতে দেখা যায়—যেমন বুদ্ধু আর ভুতুমের দুই মা। দু'জনেই রাজরাণী হয়েও প্রসব করলেন পেঁচা আর বানর। অতএব রাজপ্রাসাদ থেকে তারা বিতাড়িত হলেন। সপত্নীর ষড়যন্ত্রেও মায়েদের অবর্ণনীয় দুঃখভোগ করতে দেখা গেছে বহু রূপকথায়। সতীনের ষড়যন্ত্রে শীত বসন্তের

মাকে টিয়াপাখী হতে হয়েছিল। সাত ভাই চম্পা ও পারুলের মা'র তো নিজের কোনই দোষ ছিলনা। কেবল সপত্নীদের বিদ্বেষে ফুটফুটে সাতটি ছেলে আর একটি মেয়েকে হারিয়ে অবশেষে তাকেও ঘুঁটে কুড়ানী দাসীর অদৃষ্টকে মেনে নিতে হয়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সব রূপকথাতেই Poetic Justice রক্ষিত হয়েছে। মায়েদের দুঃখ মোচন হয়েছে, তারা আবার উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, মিলিত হয়েছেন হারানো সন্তানদের সঙ্গে। সব ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে।

শিশু শ্রোতাদের হৃদয় রূপকথার মায়েদের অবর্ণনীয় দুঃখের বর্ণনায় যে ব্যথাতুর হয়ে পড়ে, এইভাবে তাদের সেই দুঃখভোগেরও অবসান ঘটে। তারা অনাবিল এক পরিতৃপ্তি লাভ করে। কারণ রূপকথা শোনার সময় রূপকথার দুঃখিনী মা যে কখন তার নিজের মা এ পরিণত হয়ে যান, তা তাদের খেয়াল থাকেনা।

বাংলার মায়েদের বিরুদ্ধে স্নেহান্ধতা বিষয়ে যে অভিযোগ সচরাচর শুনতে পাওয়া যায়, রূপকথার মায়েরা কিন্তু সেই অপবাদ বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন লক্ষ্য করা যায়। লেখক এই বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঃ

'বাঙলার মা দুঃখিনী, কিন্তু তাঁর আশা অতি উচ্চ। ভূমির মায়ের অন্তরে ভূমার স্বপ্ন সাধ। সন্তানের কাছে তাঁর অনেক প্রত্যাশা। সন্তানকে অলকে-লালসে দিন কাটাতে দেখলে তাঁর অন্তর বিদীর্ণ হয়। কঠিন কর্তব্যের পথে চালিত করতে বাংলার মা সন্তানকে বিপদের মুখে পাঠাতেও দ্বিধা করে না। ·· তিনি স্নেহ বিহ্বল ও কোমল—কিন্তু সময় বিশেষে বহ্নিতেজ তেজস্বিনী। তাঁর অগাধ স্নেহ সন্তানকে ঘরেও টানে, আবার বিঘ্ন বিপদের মুখে দূরেও সরিয়ে দেয়। সন্তানকে বীর্যে সম্পদে প্রতিষ্ঠিত দেখলেই তাঁর আনন্দ।' আদর্শ উপস্থাপনা, চমকপ্রদ বিশ্লেষণ ভঙ্গী ও সর্বোপরি অনবদ্য ভাষা প্রবন্ধটিকে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে।

জাহ্নবী কুমার চক্রবর্ত্তী রচিত 'বাংলা সাহিত্যে মা' গ্রন্থটির অন্তর্গত একটি রচনা হ'ল 'ব্রতের মা'। লেখক সঙ্গত কারণেই বাংলা ব্রতগুলিকে 'কুমারী ব্রত' ও 'বধূব্রত'-এই দু'টি বিভাগে বিভক্ত করেছেন। তবে তুলনামূলক বিচারে বধূব্রতের সংখ্যাই অধিক। ব্রতগুলি আসলে পার্থিব কামনা-বাসনার সার্থক অভিব্যক্তি। এই কামনা বাসনা যে একান্তভাবে আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক তা কিন্তু নয়। সন্তানের জননী হওয়া, স্বামীর প্রিয় হওয়া প্রভৃতির ন্যায় আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাপ-ভায়ের সংসারের মঙ্গল কামনার ন্যায় আন্তরিক ইচ্ছার প্রকাশও এই সব ব্রতে লক্ষ্য করা যায়। লেখক তাঁর আলোচনায় বিশেষ ভাবে ব্রতকথাগুলির মধ্য দিয়ে ব্রতচারিণী মায়ের মূর্তিটির উপরই আলোকপাত করেছেন।

বঙ্গজননীর অপত্যস্নেহ প্রবাদ বাক্যে রূপান্তরিত। সন্তানের কল্যাণে বঙ্গজননীর পক্ষে কোন কিছু করাই অসম্ভব নয়। বিভিন্ন দেব দেবীর কাছে স্বতঃই তাঁর আন্তরিক প্রার্থনা—সন্তান যেন তার সুখে থাকে, কল্যাণে থাকে। সেই জন্যে নিজের কঠিন সংযম ও ক্লেশ স্বীকার করতেও বঙ্গ জননীর কোন বাধা নেই। লেখক যথার্থই বলেছেন :

"ব্রতের মা যেন মাটির বুকে প্রস্ফুটিত সূর্যমুখী। স্বর্গের আশীর্বাদ এনে তিনি সন্তানের মাথায় রাখেন। দুঃখের ব্রত জননীর, ব্রতের ফলভোগী সন্তান ও সংসার। ব্রতের জননী তাই ক্লিষ্টা অথচ কল্যাণী, দুঃখে খিন্না অথচ শুচিস্মিতা—যেন দগ্ধ প্রদীপের স্বর্ণলেখা।"

ব্রতের মাধ্যমে বঙ্গ জননীর বিশেষ ভাবে যে পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়—তা হ'ল তাঁর শিল্পচেতনা এবং গল্প কথনের বিরল নৈপুণ্য। ব্রতের অপরিহার্য অঙ্গ হল আলপনা। বঙ্গ জননীর নিপুণ হাতের টানে মূর্ত হয়ে ওঠে কত কি শুভ প্রতীক—গাছ, পাতা, ঘট, সূর্য, তারা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে উপকরণ বলতে চাল গুঁড়ো দিয়ে

প্রস্তুত পিটালী আর এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া। কিন্তু এই সামান্য উপকরণের মাধ্যমেই অসামান্য শিল্পচেতনার স্বাক্ষর তাঁরা রাখেন। লেখকের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে, "ব্রতের মায়ের এই শিল্প চেতনা বাংলার মাকে অন্য এক মর্যাদা দান করেছে। সন্তান তাঁর সাধ্য, ব্রত তাঁর সাধন। আর সেই সাধনার সঙ্গে যুক্ত আনন্দ ও সুন্দরের স্বপ্ন, যুক্ত শিল্পরুচি ও পবিত্র কল্যাণবোধ।"

ব্রতের শেষ অঙ্গ হল ব্রতকথা শ্রবণ। বঙ্গ জননীই ব্রতকথার কথক। অপূর্ব ছন্দে এই ব্রতকথাগুলি কথিত হয়। ছোট ছোট সহজ সরল বাক্যে নিটোল একটি কাহিনী কত স্বাভাবিক গতিতেই না অগ্রসর হতে থাকে।

আপাতদৃষ্টিতে ব্রতগুলি মনে হতে পারে বিশেষ বিশেষ দেব দেবীর মহিমা ব্যঞ্জক। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখলে দেখা যাবে বঙ্গ জননীর অন্তহীন বিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয়, সন্তান বাৎসল্য ও সাংসারিক কল্যাণবোধই মূর্ত এই সব ব্রতকথায়।

'অরণ্যষষ্ঠীর ব্রতকথা'য় আপাতভাবে ষষ্ঠীর মহিমা প্রচারিত হলেও, সন্তান স্নেহ কিভাবে সন্তানকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে আনল তাই গল্পটির চরম ফলশ্রুতি। 'চাপড় ষষ্ঠীর ব্রতকথা'তেও ভক্তিমতী অথচ কর্মনিষ্ঠ জননী কিভাবে তাঁর সন্তানকে নতুন পুকুরের জল থেকে ফিরে পেলেন সেই কাহিনীই প্রকাশিত। 'নিরাকুল নারায়ণ ব্রত কথা'তেও রাণী কিভাবে সন্তান লাভে সমর্থ হয়েছেন এবং স্বামীর দোষে ও দেবতার রোষে রাজ্য, স্বামী, সন্তান সব একে একে হারিয়েও শেষ পর্যন্ত দেবতার করুণায় সব ফিরে পেয়েছেন তাই বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে লেখকের বক্তব্যের অনুসরণে বলা যেতে পারে:

"বাংলা সাহিত্যে হিন্দু জননীর ব্রতের মূর্তিই উজ্জ্বলতর, বাঙালী মায়ের দুঃখ, দুঃখের তপস্যা ও বিপদে বিজয়িনীর মহিমায় সে চিত্রগুলি মনোরম। ব্রতের জননী বঙ্গের সুমঙ্গলী গৃহলক্ষ্মীর পবিত্র প্রতিমা।"

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় তাঁর রচিত 'বাংলা পড়ানোর নূতন পদ্ধতি' গ্রন্থে [পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ, ১৯৭৬] 'রূপকথায় কি আছে' শীর্ষক নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে রূপকথা সম্পর্কিত কোন তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবেশের পরিবর্তে সম্পূর্ণ এক অভিনব পদ্ধতিতে রূপকথা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। লেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার রচিত 'ঠাকুরমার ঝুলি' থেকে মোট ১৪টি গল্প নির্বাচন করেছেন। এর মধ্যে 'দুধের সাগর' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত রূপকথার সংখ্যা ৬। রূপকথাগুলি হল যথাক্রমে—কলাবতী রাজকন্যা, ঘুমন্তপুরী, কাঁকনমালা—কাঞ্চনমালা, সাত ভাই চম্পা, শীত বসন্ত ও কিরণমালা। রূপতরাসী পর্বের অন্তর্ভুক্ত হল—নীল কমল লালকমল, ডালিম কুমার, পাতাল কন্যা, মণিমালা ও সোনার কাঠি-রূপার কাঠি—এই ৫টি গল্প। চ্যাঙ—ব্যাঙ পর্বভুক্ত হল—শিয়াল পণ্ডিত, সুখু আর দুখু, ব্রাহ্মণী, দেড় আঙ্গুলে—মোট এই ৪টি গল্প।

মোট ১৮টি শীর্ষে লেখক এই নির্বাচিত রূপকথাগুলির লক্ষণ বিশ্লেষণ করেছেন। অবশ্য রূপকথাগুলির অতিসিদ্ধ অলঙ্কারযুক্ত অনুষ্ঠান ও বর্ণনা এবং ভাষাও লেখককৃত বিভাগগুলিতে স্থান পায়নি। এইবার লেখক যে সকল লক্ষণের বিভাগ করেছেন সেগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ'গুলি হল—প্রধান চরিত্রের সংখ্যা, প্রধান চরিত্রের সামাজিক মর্যাদা, খল চরিত্র, প্রধান আঞ্চলিক পরিবেশ, অন্য উল্লেখযোগ্য পরিবেশ, সামাজিক স্তর, মন্ত্রপূজা ও ধর্ম, নায়কের চরিত্র বৈশিষ্ট্য, খলের চরিত্র বৈশিষ্ট্য, নায়কের পতনের কারণ, সমস্যা থেকে মুক্তির উপায়, যানবাহন, জীবজন্তু, গাছপালা, উৎসব অনুষ্ঠান, প্রাকৃতিক বস্তু বিশ্ব, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, গান ও ছড়ার সংখ্যা এবং মন্তব্য। লেখক কৃত লক্ষণ বিভাগে অভিপ্রায় [Motif] সংযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। যাইহোক, তবু লেখক প্রদত্ত 'টেবিল' থেকে নির্বাচিত রূপকথাগুলি সম্পর্কে এক নজরে একটা সামগ্রিক

ধারণা করা যায়। সেই সঙ্গে সাধারণভাবে বাংলা রূপকথা সম্পর্কেও একটা ধারণা করা সম্ভবপর হয়। কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। বাংলা রূপকথায় প্রধান চরিত্রের মর্যাদা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজপুত্র, রাজকন্যার ন্যায় অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্তরাই পেয়েছে। সে তুলনায় রাখাল, গ্রাম্যমেয়ে, গ্রাম্য শিশু প্রভৃতির স্থান অনেক সীমিত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। রূপকথাগুলিতে সন্নিবিষ্ট প্রধান চরিত্রের সংখ্যা সাধারণভাবে দুই অথবা তিন হতে দেখা যায়। অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম হয় না এমন নয়। অধিক সংখ্যক প্রধান চরিত্র সম্বলিত রূপকথাও দুর্লভ নয়। অধিকাংশ রূপ-কথাতেই খল চরিত্র প্রায় অনিবার্য ভাবে এসেছে। রূপকথাগুলির পরিবেশরূপে তুলনামূলক ভাবে গ্রাম অপেক্ষা শহরই বেশি এসেছে। বাংলা রূপকথার অপর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল গান ও ছড়ার আধিক্য। প্রায় প্রতিটি রূপকথাতেই কিছু না কিছু গান ও ছড়ার সংযোজন লক্ষণীয়।

আলোচ্য লেখকের অনুসরণে আরও একটু বিস্তারিত ভাবে বাংলা রূপকথা, লোককথা, ব্রতকথাগুলিকে এইভাবে টেবিলের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে দেখালে একটা বিরাট প্রয়োজন সাধিত হবে বলা চলে।

যাইহোক, বাংলা রূপকথা সম্পর্কিত আলোচনায় লেখককৃত বিশ্লেষণ যে সম্পূর্ণ অভিনব, তা স্বীকার করতে হয়।

বাংলা লোককথার এক উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে আছে ব্রতকথাগুলি। অসংখ্য ব্রতকথা আমাদের দেশে আজও প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই সব ব্রতকথা আজও সম্পূর্ণরূপে সঙ্কলিত হয়নি। বিশেষত একই ব্রতকথা স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রচলিত রয়েছে। ব্রতকথাগুলির সাহিত্যিক মূল্য বাদ দিলেও সমাজ জীবনের সার্থক পরিচয় প্রদানে এগুলির অসামান্য গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ ব্রতকথাগুলির কিছু

কিছু সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন ঠিকই, কিন্তু অপ্রকাশিত ব্রতকথার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। ব্রতকথা সচরাচর মুখে মুখেই চলে এসেছে। সাধারণত পরিবারের বয়স্ক মহিলারা এই সব ব্রতকথা স্মরণে রাখেন এবং প্রয়োজন মত কথাগুলি বাড়ীর আর পাঁচজন স্ত্রীলোকের সামনে বলেন। স্মৃতিতেই ব্রতকথাগুলির অধিকাংশ রক্ষিত, মুদ্রিত ব্রতকথার সংখ্যা কম সে তুলনায়। পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী বর্তমানে অশীতিপর বৃদ্ধা। তিনি বহুকাল ধরে বেশ কিছু ব্রতকথা সংগ্রহ করে এসেছেন, কিন্তু তাঁর সংগৃহীত ব্রতকথাগুলি অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। তাঁর সংগৃহীত ব্রতকথাগুলি হল কার্তিক মাসের যম পুকুরের কথা, অগ্রহায়ণ মাসের কুলী মঙ্গলবারের কথা, অগ্রহায়ণ মাসের দামুই পোড়া বামুনের কথা, অগ্রহায়ণ মাসের আলপনা পূজোর কথা, পৌষ মাসের সুখী-দুঃখীর কথা, তুঁষ তুঁষুলী ব্রত, মাঘ মাসের সুন্দর পূজোর ব্রতকথা, মাঘ মাসে অনুষ্ঠিত শীতলার কথা, চৈত্র মাসের অশোক ষষ্ঠীর কথা, বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত অশ্বত্থ পাতার ব্রতকথা, জ্যৈষ্ঠ মাসে অনুষ্ঠেতব্য দশহারার কথা, চৈত্রমাসে অনুষ্ঠেতব্য লক্ষ্মীপূজার কথা, শ্রাবণ মাসে অনুষ্ঠেতব্য লোটন ষষ্ঠীর কথা, ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠেতব্য লক্ষ্মীর কথা, আশ্বিন মাসের দুর্গাষষ্ঠীর কথা, পৌষ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেতব্য সোদো ষষ্ঠীর কথা ইত্যাদি।

ব্রতানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ঐহিক সুখ-শান্তি লাভ। তাই সব ব্রতকথাতেই নানাবিধ বাসনা কামনার কথা প্রকাশিত হয়েছে। সুহাসিনী দেবী সংগৃহীত একটি কথা প্রকাশ করে লোক কথাচর্চা সংক্রান্ত আলোচনার পরিসমাপ্তি টানা গেল। এটি কার্তিক মাসে অনুষ্ঠেতব্য 'যমপুকুরের কথা'।

"উদ্ধবেরা মা-টি, পো-টি, ঝি-টি, ঘরকন্না করেন, থাকেন; একদিন গিন্নী যাবেন গঙ্গার স্নানে, জয়াকে বল্লেন—এই দ্যাখ

জয়া—আমার এই ঢেঁকিটা কুলোটা ডালাটা নাউডগাটা পুঁই ডগাটা কারুকে কিছু দিস্‌নি—এই বলে তিনি গঙ্গার স্নানে গেলেন। এদিকে জয়া যে যা চেয়েছে তাকে তাই দিয়ে বসে আছে। গিন্নী গঙ্গা থেকে এসে বল্লেন, আমি যা বারণ করে গেছি তাই করে বসে আছিস্? কাল সকালে যার মুখ দেখ্‌বো তার সঙ্গে তোর বিয়ে দোব। এদিকে কতক রাত পুইয়েছে কতক রাত পোয়ায় নি; ধর্মরাজ নিরঞ্জন থানে থেকে কানে শুন্‌লেন, ছেঁড়া পুঁথি নিয়ে এসে কপাট ঢেলে পড়ে রইলেন। উদ্ধবের মা ছড়া ঝাঁট দিতে এসে দেখে না দোর গোড়ায় কে শুয়ে। কে গো? সর না নড় না, ছড়া ঝাঁট দি বেলা হয়ে গেল। আমি সর্‌বনা নড়্‌বনা, আগে যা সত্যি করেছো তা প্রতিপালন কর। কি সত্যি করেছি, কি প্রতিপালন করবো? জয়াবতী কে বলেছিলে কাল সকালে যার মুখ দেখ্‌বো তার সঙ্গে তোর বে দেবো—আমার মুখ দেখছ আমার সঙ্গে তার বিয়ে দাও। বাপ্‌রে বাপ্, রাগে দুঃখে ঝি বউকে কি না বলে, তা বলে কি তাই সত্যি হয়? তিনি বল্লেন—হাঁ তাই কর্ত্তে হবে। কি কর্ব্বেন—ঘাটের জল মাঠের দুর্বো দিয়ে জয়াবতীকে উচ্ছুগ্‌গু করে দিলেন বিয়ে। ব্যাটার বে দিয়ে বৌ নিয়ে এলেন। নিয়ে এসে ঘর সংসার কর্তে লাগলেন। একদিন বৌ গেছে গেরস্থের বাড়ী আগুন আন্তে, কার্ত্তিক মাস—দেখেনা—মেয়েরা সব কি পূজো কচ্ছে। ও মেয়েরা এ কিরে? এ যম পুকুর। এ কল্লে কি হয়? মা বাপের পুণ্যি হয়। অন্তকালে স্বর্গে যায়। তবে আমিও কর্বো ভাই। না ভাই তোমার শাশুড়ী যে বজ্জাত দেখলে বকাবকি কর্বে। না রোজ আগুন নিতে এসে পূজো করে যাব তিনি টের পাবেন না। কর্বে। কেউ দিলে ধান গাছটি, কেউ দিলে মান গাছটি, কেউ দিলে হলুদ গাছটি, কেউ দিলে হিঞ্চে, কলমী। একটি যমপুকুর খুঁড়ে সেই গুলি পুঁত্‌লে পুঁতে রোজ পূজো করে। কথা শুনে সন্ধ্যে দেয়। এই রকম

করে কিছুদিন যায়। গিন্নী ভাবেন-বৌ আমার আগুন আন্তে দেরী করে কেন ? আজ আমি যাবো। বলে তিনি গেলেন। গিয়ে দেখেন যে মেয়েরা কি পূজো কচ্ছে। ও মেয়েরা এ কিরে ? এ যম পুকুর। এ কল্লে কি হয় ? ধর্ম হয়, পুণ্যি হয় অন্তকালে স্বর্গে যায়। এটি কার ? এটি বৌয়ের। এটি কার—ঝি এর। এটি কার ? এটি নাতনির ! এটি কার ? বলব না। কেন বল্‌বিনি ? বলতেই হবে। বল্— এটি তোমার বৌ এর। আমলোরে আই খাকি, ভাই খাকি নেদ্ খাকি—আমার একটি বই পুত্ নয় অমঙ্গল কর্তে বসেছে, বলে— ইঁট পাটকেল্ গোহাড় দিয়ে বুজিয়ে দিলেন। তারপর দিন বউ আগুন আন্তে গিয়ে দেখে যম পুকুর বুজানো। মেয়েদের জিজ্ঞেস কল্লে, ও মেয়েরা, আমার যম পুকুর কি হলো ? তোমার শাশুড়ি এসে বুজিয়ে দিয়ে গেছেন। কি কর্ব্বে। কাঁদলে, কাট্‌লে তার পর পুকুরে জল দিলে, পুকুরের কথা শুনলে, পুকুরে সন্ধ্যে দিলে। সে বছর গেল কেঁদে কেটে। ফিরে বছর এলো। ভাবলে শাশুড়ী আমার কলা বাগানে যায় না, আমি কলা বাগানে যম পুকুর খুঁড়বো। বলে—কলা তলায় যম পুকুর খুঁড়লে, ধান, মান, কলা, কচু, হিংচে, কলমী পুঁতলে, পুঁতে রোজ কথা শুনে পূজো করে, সন্ধ্যা দেয়। একদিন শাশুড়ী বলে— কলা গুলো কাগে খাচ্ছে, বগে খাচ্ছে, ছাগলে খাচ্ছে কেউ দেখে না, কেউ আনে না। আজ আমি আনবো, বলে—কলা বাগানে গেলেন। এ কাঁদিতে হাত দেন, ও কাঁদিতে হাত দেন, হুস্ করে যম পুকুরে পা পড়লো। আমলোরে আই খাকি, ভাই খাকি, নেদ্ খাকী আমার একটি বই পুত্‌না, তার অমঙ্গল করতে বসেছে, বলে—ইঁট পাট্‌কেল গোহাড় দিয়ে বুজিয়ে দিলেন। বউ সন্ধ্যে দিতে গিয়ে দেখে না যম পুকুর বুজনো। কি করবে—সে বছর গেল। কেঁদে কেটে রইল। তার পরের বছর ভাবলে—শাশুড়ী আমার তুলসী তলায় যায় না আমি তুলসী তলায় যম পুকুর খুঁড়বো।

তুলসী তলায় যম পুকুর খুঁড়ে পূজো করে, কথা শোনে সন্ধ্যে দেয়। একদিন উদ্ধবের বাপের শ্রাদ্ধ। উদ্ধবের মা গেছে তুলসী তুলতে। হুস্ করে যম পুকুরে পা পড়ে গেল। আমলোরে আই খাকি, ভাই খাকি, নেদ্ খাকি, আমার একটা বই পুত্ নয় তার অমঙ্গল করতে বসেছে। বলে –ইঁট পাটকেল গোহাড় দিয়ে বুজিয়ে রেখে এলেন। এদিকে বউ সন্ধ্যে দিতে গিয়ে দেখলে—যম পুকুর বুজনো। কি করে—সে বছর গেল কেঁদে কেটে। তার পরের বছর বউ ভাবলে শাশুড়ী আমার হেন্ সেলে যায় না। আমি হেন্সেলে যম পুকুর খুঁড়বো। এই বলে হেন্সেলে যম পুকুর খুঁড়ে, পূজো করে কথা শোনে সন্ধ্যে দেয়। একদিন শাশুড়া বলে – বউ আমার কি হিড় হিড় করে কি বিড় বিড় করে, ভাত ব্যান্নে স্বাদ্ লাগেনা। আজ আমি পান্তা বেড়ে খাব। বলে না হাপুড় হুপুড় তেল মাখলে, বালির গাদায় ডুব খুঁড়লে, খট করে একটা আঙ্গট পাতা কেটে নিয়ে এলো। যেই না হাঁড়িতে হাত দিয়েছে অমনি হুস করে যম পুকুরে পা পড়ে গেল। আমলোরে আই খাকি, ভাই খাকি, নেদ্ খাকি। আমার একটি বই পুত না তার অমঙ্গল করতে বসেছে—বলে ইঁট পাটকেল গোহাড় দিয়ে বুজিয়ে রেখে এলেন। এদিকে বউ রাঁধতে এসে দেখে না যম পুকুর বোজানো। দেখে ভয়নোক রাগ হলো। বল্লে-বার বার এই রকম করে নষ্ট করে দিলেন—দূর হোগগে আর করবো না। এই বলে রইল। কিছু দিন যায়, একদিন শাশুড়ী উদ্ধবের মা জল খেয়ে রোদে পিট দিয়ে বসে আছেন, এমন সময় ধর্মরাজ নিরঞ্জন ছলনা করতে এলেন। মা ঠাকরুন গো, কাল শুদ্ধু উপোস করে আছি, একাদশীর পারন করাও। কি খেতে দোব আখ খেয়েছি, আখের খোশা খাও; কলা খেয়েছি, কলার খোশা খাও; ডাব খেয়েছি, ডাবের খোশা খাও। মা ঠাকরুন গো খুব খেয়েছি। একটু জল দাও। গোলা হাঁড়ির বার কলসীর জল দিলেন। মা

ঠাকরুন গো খুব খেয়েছি পথ দেখিয়ে দাও। কাঁটা বন দেখিয়ে দিলেন। ধর্মরাজ সাঁপ গাল দিতে দিতে যাচ্ছেন। বউটি হাত ছানি দিয়ে ডাকলে—বামুন ঠাকুর শুনে যাও। ধর্মরাজ ফিরে এলেন। বউটি ভালো কার্পেটের আসন পেতে দিল, ভালো আখ ছাড়িয়ে দিলে, ভালো কলা ছাড়িয়ে দিলে, ভালো ডাবের মুখ ফুটিয়ে দিলে, ভালো কর্পূর দেওয়া জল দিলে। মা ঠাকরুন গো খুব খেয়েছি পথ দেখিয়ে দাও। ভাল রাজপথ দেখিয়ে দিলে । বে হচ্ছে, পৈতে হচ্ছে, ভাত হচ্ছে ধর্মরাজ আশীর্বাদ করতে করতে গেলেন। বরের স্বর্গ হলো শাশুড়ীর নরক হলো। এদিকে উদ্ধবের মা একদিন ভাত গলায় বেঁধে মারা গেলেন। উদ্ধব শ্রাদ্ধ শান্তি করলো। ভাট্ ফকিরদের দিলে তারপর সংসার ধর্ম করতে লাগল। এদিকে উদ্ধবের মা মরে গেছেন যম দূতেরা টেনে নিয়ে গিয়ে লোহার ডাঙ্ মাথায় মারছে, নরক কুণ্ডে মুখ ছোপড়াচ্ছে। উদ্ধবের পো জয়ারে ঝি উদ্ধার কর-বলে চেঁচাচ্ছে। ধর্মরাজ এসে বললেন—জয়া তুমি সব দিক চেয়ো দক্ষিণ দিকে চেয়ো না। কেন চাইবো না, কেন বারণ কল্লে দেখি দিকিনি—বলে দক্ষিণ দিকে চেয়ে দেখে—মায়ের প্রহার হচ্ছে, লোহার ডাঙ্গ্ মাথায় মারছে, নরক কুণ্ডে মুখ ছোবড়াচ্ছে। উদ্ধব রে পো জয়ারে ঝি উদ্ধার কর—বলে চেঁচাচ্ছে। দেখে জয়া এসে গোঁসা ঘরে শুয়ে রইল। ধর্মরাজ এসে বললেন—জয়া কোথায় ? জয়া গোঁসা ঘরে খিল ফেলেছে। কে বড়বচন বলেছে ? কেউ হেলেনি কেউ ফেলেনি কেউ বড়বচন বলেনি। আমি হেন মেয়ে থাকতে তুমি হেন জামাই থাকতে, আমার মার এই দুর্গতি ! তোমার মায়ের হবে না তো কার হবে ? তোমাদের বউ যেখানে যম পুকুর খুঁড়েছে সেখানে হাস্তা হয়েছে। তা বল্লে হবেনা। আমার মায়ের কি করলে ভালো হবে বলো ? তোমাদের বউ যদি তোমার মার নামে একটি যম পুকুর উচ্ছুগ্গু করে দেয়,

তবেই তোমার মার দুঃখ ঘুচবে। যাই দিকিনি ভায়ের বাড়ী, দেবে নাকি বউ। ভায়ের বাড়ি গেল। এসো এসো বোন এসো। খেতে আসিনি পর্‌তে আসিনি, মাখ্‌তে আসিনি, ভাই—মার যাতনা সইতে পারিনি। কেন মার যাতনা হবে? শ্রাদ্ধ শ্রান্তি করলুম্, ভাট্ ফকিরকে দিলুম। আচ্ছা রাত হোক্ দেখাব। রাত হল, বল্লে দক্ষিণ দিকে চেয়ে দেখ। চেয়ে দেখেনা মায়ের প্রহার হচ্ছে, নোয়ার ডাঙ্গ মাথায় মাচ্চে, নরক কুণ্ডে মুখ ছোবড়াচ্ছে। উদ্ধবরে পো, জয়ারে ঝি উদ্ধার কর বলে চেঁচাচ্ছে। কি কল্লে মুক্তি হয় বল? বউ যদি একটি যম পুকুর উচ্ছুগগু করে দেয় তবেই মার দুঃখু ঘুচবে। বৌকে বল্লে—দাও—আমার মার নামে যম পুকুর উচ্ছুগ্‌গু করে। বৌ বল্লে, মহাপাতকী নিরিসী, বিরিলী, ডাইনী—আমি যেখানে যম পুকুর খুঁড়েছি, সেখানে বুজিয়েছেন। সেখানে হান্তা হয়েছে। আমি কখনো দোবনা। তা বল্লে হবে না। দিবিতো দে, তা না হলে আমি তোর সংসার ফেলে চল্লুম। কি আর করে, পাড়ার সকলে বল্লে—দে একটা ঘট উচ্ছুগ্‌গু করে, কোথায় বিদেশে চলে যাবে। বৌ বল্লে, আচ্ছা কার্ত্তিক মাস আসুক্। কার্ত্তিক মাস এল, যম পুকুর খুঁড়লে, ধান, মান, কলা, কচু পুঁতলে। এক ঘাট বাপ-মার, এক ঘাট শ্বশুর-শাশুড়ীর, এক ঘাট যম রাজার এক ঘাট আপনার বলে—চার ঘটে যেই ফুল ফল দিয়েছে অম্‌নি চন্দনের ছড়া ঝাঁট পড়্‌ল পুষ্প রথ এল, উদ্ধবের মা স্বর্গে গেল। যে বলে তার হয় যে শোনে তার হয় অন্তকালে স্বর্গে যায়।"

---

১. লোক কাহিনীর দিক্-দিগন্ত; আবদুল হাফিজ [ঢাকা] পৃঃ ৪১-৪২।

২. The Preface of "Folktales of Bengal" by L. B. Dey.

৩. The Preface of "Folktales of Bengal" by L. B. Dey.

৪. লোক কাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস [ঢাকা]; ডক্টর মযহারুল ইসলাম ; পৃঃ ৮০ ।

৫. The Preface of "Folktales of Bengal" by L. B. Dey.

৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; ডঃ সুকুমার সেন [২য় খণ্ড ; ১৩৬২] পৃঃ ২৪৪

৭. অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানতে কৌতূহলী পাঠক 'রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত [কার্তিক-পৌষ ১৩৭৮] জীবেন্দ্রসিংহরায়ের 'সাহিত্যসাধক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখতে পারেন।

৮. Folklorists of Bengal ; [1965] by Sankar Sengupta ; page 115

৯. বাংলার লোক-সাহিত্য ; ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ; [১ম খণ্ড ; ৩য় সংস্করণ] উপকথা ; পৃঃ ৪৯৩

১০. বাংলার লোক-সাহিত্য ; ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য [৪র্থ খণ্ড ; ১ম সংস্করণ] ১৩৭৩

১১. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত বাংলার লোক-সাহিত্য ; ৫ম খণ্ড ; ১ম সংস্করণ ১৩৭৩ ; পৃঃ ৫০ ।

১২. S. D. F. L ; page 1099.

১৩. বাংলার ব্রত ; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পৃঃ ৯

১৪. S. D. F. L. [P. P 1121]

১৫. Ibid ; page 61

১৬. মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সংগীত ও সাহিত্য ; শ্রীপুলকেন্দু সিংহ ; পৃঃ ৮ ।

১৭. R. M. Dawkins ; 'The Meaning of Folk-tales' ; Folk-Lore LxII [1951] P 418 ।

১৮. বাংলার লোক-সাহিত্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য [চতুর্থ খণ্ড ; কথা] পৃঃ ৪৪ ।

বাংলা লোক সঙ্গীত-চর্চার ইতিহাস

বাংলা প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা এবং লোককথা চর্চার ইতিহাস আলোচনার পর এবার বাংলা লোক সঙ্গীত-চর্চার ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে। এই আলোচনার প্রারম্ভেই একজন প্রখ্যাত লোক সংস্কৃতিবিদের একটি উক্তি উদ্ধার করা হ'ল যেখানে তিনি বলেছেন—'বাংলাদেশকে জানিতে হইলে গানের মধ্য দিয়া ইহাকে জানা যত সহজ, অন্য কোন বিষয়ের মধ্য দিয়াই তাহা তত সহজ নহে। প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম কাল পর্যন্ত বাঙ্গালীর সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদই তাহার সঙ্গীত। বাঙ্গালীর ধ্যান ধারণা, সামাজিক আচার আচরণ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনের সুখ দুঃখের অনুভূতি সবই সঙ্গীত সাধনায় যে বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিতে না পারিলে বাঙ্গালীর চরিত্র এবং তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা করা যাইবে না।' [১]

বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রাণ হ'ল সঙ্গীত ; কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যেতে পারে যে সঙ্গীতের ভিত্তিভূমির ওপরই বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রাসাদটি অবস্থিত। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতি। বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ রবীন্দ্রনাথের মুখ্য পরিচয় তিনি একজন গীতিকবি। বাংলার গীতি সাহিত্য পরিপুষ্ট হয়েছে যাঁদের প্রতিভায়, তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, রামপ্রসাদ, অতুল প্রসাদ, রজনী কান্ত প্রমুখ গীতিকবিরা। বাঙ্গালীর প্রায় সব উৎসবানুষ্ঠানেরই আরম্ভ ও সমাপ্তি সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে।

অতএব সঙ্গীত যে বাঙ্গালীর মজ্জাগত, বাঙ্গালীর চেতনা রাজ্যে

সঙ্গীতের রাজকীয় আধিপত্য তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সঙ্গীতেই বাঙ্গালী মানসের সার্থক প্রতিফলন। সামাজিক, ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রের পরিচয়ই বিধৃত রয়েছে বাঙ্গালীর সঙ্গীতে। তাই সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে বাঙ্গালীর সার্থক পরিচয় লাভ সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব, অবাস্তব ব্যাপার। কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা ব্যক্তি প্রয়াসে সৃষ্ট সঙ্গীতের কথাই বলেছি, আমাদের আলোচ্য বাংলার লোক সঙ্গীত। লোক সাহিত্যের অপরাপর বিভাগগুলির মত লোক-সঙ্গীতও সংহত সমাজের সৃষ্টি এবং ব্যষ্টির পরিবর্তে তা সমষ্টির সৃষ্টি রূপেই পরিচিত—

'It is true that a great many of the songs are the possession of the people as a whole ; no body knows when they are composed.' [২]

এই যে লোক সঙ্গীত রচনার সময়কাল কিংবা স্রষ্টা সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় না, তার কারণ ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা বিশেষ কোন সঙ্গীত রচিত হলেও তিনি সেই সঙ্গীত রচনা করেন সংহত সমাজের মুখপাত্র রূপে। আর রচিত সঙ্গীতে ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ানুভূতিটুকুই বিধৃত হয় না, সমগ্র সমাজের অভিজ্ঞতাটুকুও প্রতিফলিত হয়। নতুবা তা সমগ্র সমাজের যৌথ সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেনা। অনেক সময় একাধিক ব্যক্তিও লোক সংগীত রচনায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত পাশ্চাত্য সমালোচকের বক্তব্য উদ্ধার করে বলা যেতে পারে—

'The folk song is of individual authorship in the sense that it was first that composed by one individual, sometimes a known literary figure, some times a man of the people whose name has remained obscure. Its composition may be but is not necessarily due to improvisation. The folk song is communal in the sense that its text is never quite fixed, and alterations, modifications and additions can be

practised freely. It is communal also in the sense that a given folk song may in fact have a dozen or more authors, each being responsible for a stanza or two.' [৩]

বাংলা লোক সাহিত্যের সমৃদ্ধতম বিভাগ হ'ল লোক সঙ্গীত। বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে সাধারণ ভাবে বাংলা সঙ্গীত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, এখানকার লোক সঙ্গীত সম্পর্কেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কিংবা আর একটু এগিয়ে বলা চলে ব্যষ্টি রচিত সঙ্গীত অপেক্ষা নিরক্ষর কবিদের রচিত লোকসংগীতেই যথার্থ বাঙ্গালী মানসের সার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কারণ বাংলাদেশের শতকরা সত্তর জনের ওপর মানুষ এখনও গ্রামেরই বাসিন্দা, আর লোক সঙ্গীতে এই সব মানুষের চিন্তা ভাবনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, উপলব্ধি-অনুভূতির রূপায়ণ ঘটেছে।

এখন প্রশ্ন হ'ল লোক সাহিত্যের অপরাপর বিভাগের তুলনায় লোক সঙ্গীতের সমৃদ্ধির কারণ কি? করেণ অনেকগুলিই। ধাঁধা, ছড়া, প্রবাদ কিংবা লোককথার তুলনায় লোকসংগীতের প্রধান আকর্ষণ তার সুরে। স্বভাবতই তাই মানুষ লোক সংগীতে সহজে আকৃষ্ট না হয়ে পারেনা। এখন আনন্দ লাভের বহুবিধ উপকরণ আবিষ্কৃত হলেও কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত গ্রাম বাংলার মানুষের অবসর সময় অপনোদন এবং আনন্দ লাভের তেমন পর্যাপ্ত উপকরণ ছিল না। তাই এই অভাব পূরণ করেছিল লোক সংগীত। এ ছাড়াও ছড়া, ধাঁধা. প্রবাদ এমন কি লোককথার ক্ষেত্রেও বক্তা একজন, শ্রোতার সংখ্যা অনেক। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ এসব ক্ষেত্রে সীমিত। কিন্তু লোকসংগীতের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে অনেকের অংশ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। ধাঁধা ছড়া বা লোক কথার তুলনায় লোক সংগীতের ব্যবহারিক মূল্যও অনেক বেশি। জীবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লোক সংগীতের ব্যবহার

আজও অব্যাহত। গর্ভবাস থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অবলম্বনে লোক সংগীত রচিত হয়েছে। এছাড়াও আছে কর্ম সংগীত—বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন কালে যেগুলি গীত হয়ে থাকে। লোক সংগীতের বহুল প্রচারের আর একটি কারণ হ'ল এর ভাষা অপেক্ষা সুরের প্রাধান্যই বেশি। আর এই সুরে এমন এক মাদকতা আছে, যা সহজেই শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে। একবার সুর মনে গেঁথে গেলে পরে সেই সুরটুকুকে মূলধন করেই সম্ভব ও সাধ্যমত ভাষার যোগান দিয়ে গান গাওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকে না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে বাংলা লোক সংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল সুরেরঅবিকৃত রূপ। অর্থাৎ টুসু, ভাদু, জারি, ভাওয়াইয়া, আলকাপ, গম্ভীরা ইত্যাদি প্রতিটি গানের জন্য বিশেষ বিশেষ সুর নির্দিষ্ট আছে। গায়ক কখনই সুর বিকৃতি ঘটাতে পারেন না, সে অধিকার তার নেই।

ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথা, ছড়া ইত্যাদি যেমন বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চল থেকেই কম বেশি পরিমাণে সংগৃহীত হয়েছে বা আজও সংগ্রহ করা সম্ভব, বাংলা লোক সংগীত সংগ্রহ করাও তেমনি সম্ভব। কিন্তু তবু এক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে—বাংলা দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ সঙ্গীত প্রচলিত আছে। যেমন মালদহ অঞ্চলে গম্ভীরা, মুর্শিদাবাদে আলকাপ, পুরুলিয়ায় টুসু, উত্তরবঙ্গে ভাওয়াইয়া ইত্যাদি আঞ্চলিক সঙ্গীত গুলি। এইসব আঞ্চলিক সঙ্গীতগুলির ভাব ও সুর অন্যান্য সঙ্গীত থেকে এগুলির স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যকে সূচিত করে। কিন্তু ছড়া, ধাঁধা, বা প্রবাদের ক্ষেত্রে আমরা তেমন স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করিনা। তবে এই স্বাতন্ত্র্য বাংলার একান্তভাবে নিজস্ব কিনা তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। কারণ—'where neighbouring peoples are in intimate contact, and especially where they intermingle, much more exchange of melodies

takes place than otherwise so that it becomes at times exceedingly difficult to trace the original source of the melodies.' [৪]

বাংলা লোক সংগীতের বিপুল বৈচিত্র্য বাস্তবিকই আমাদের আশ্চর্যান্বিত না করে পারেনা! জীবনের এমন কোন পর্যায় নেই, যা নাকি এই সব সংগীতে ধরা পড়েনি। বাংলা লোক সাহিত্যের অপরাপর বিভাগের তুলনায় সংগীত যেমন সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয়তম, তেমনি অপরাপর বিভাগের তুলনায় বাংলা লোক সংগীত সংগ্রহ ও লোকসংগীত সম্পর্কিত আলোচনাও অনেক বেশি হয়েছে। তবে এ সব আলোচনাই হয়েছে বাঙ্গালীর দ্বারা; প্রবাদ কিংবা লোক কথার ক্ষেত্রে যেমন বহু বিদেশীয়কে আমরা আলোচনা কিংবা সংগ্রহে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখেছি, লোক সংগীতের ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যায়নি। বাংলার লিখিত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও উপন্যাস, নাটক, গদ্য ইত্যাদির সূচনা পর্বে ইউরোপীয় মিশনারীদের সক্রিয় প্রয়াস নিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু কাব্য চর্চায় তাদের অগ্রসর হতে দেখা যায়নি।

কেউ কেউ বাংলার লোক সংগীতের সুরে অলঙ্করণ সমৃদ্ধির অভাব বিষয়ে উল্লেখ করে থাকেন। একথা ঠিকই যে মার্গ সংগীতের বৈদগ্ধ্য লোক সংগীতের সুরে অনুপস্থিত, কিন্তু লোক সংগীতের অনুরাগী যারা তারা এর সুরের সরল মাধুর্যের জন্যই এর প্রতি আকৃষ্ট। তান-লয়-মান কিংবা সুরের নিখুঁত চাতুর্যের সন্ধান লোক সংগীতে করতে গেলে ব্যর্থ হতে হবে। সে সন্ধান করতে হবে নাগরিক সংগীতে। এই প্রসঙ্গে নাগরিক সংগীতের সংগে লোক সংগীতের যে পার্থক্য, সে বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। নাগরিক সংগীত দীর্ঘদিনের অনুশীলনে আয়ত্ত হয়, কিন্তু লোক সংগীতের ক্ষেত্রে সেই অনুশীলনের তেমন প্রয়োজন হয় না। প্রাণের গভীর

আবেগের তাড়নায় এর সুর আপনা থেকেই কণ্ঠে এসে যায়। যে অলঙ্করণ বহুলতা নাগরিক সংগীতের ঐশ্বর্য, তাই লোক সংগীতের বন্ধন। বলা চলে লোক সংগীতের সুরের আকর্ষণ তথা আবেদন এর অলঙ্কার রিক্ততার মধ্যেই নিহিত।

পরিশীলিত সাহিত্যের সংগে লোক সাহিত্যের যে সম্পর্ক, মার্গ সংগীতের সংগে লোক সংগীতেরও সেই সম্পর্ক অর্থাৎ উভয়ই উভয়ের পরিপূরক, একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত। বৈদিক যুগেও মার্গ সংগীতের সংগে লোক সংগীতের অনুশীলন যে অব্যাহত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাংলা লোক সংগীতে কবিত্বের অপূর্ব প্রকাশ ঘটলেও এবং লোক কবিরা অনেক ক্ষেত্রে বিরল উপমা প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখালেও গভীরতর ভাব ব্যঞ্জনা কিংবা জটিল জীবন জিজ্ঞাসা এই সব সংগীতে অনুপস্থিত। তার কারণ, যে সমাজে এই সব সংগীতের উদ্ভব ও ব্যবহার, সেই সমাজে কোন জটিলতা ছিল না। জীবনযাত্রা ছিল যেমন নিতান্তই সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, তাদের রচিত সংগীত-ও তেমনি সহজ, সরল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাড়ম্বর।

ডক্টর ভেরিয়র এল্‌উইন অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন: 'Symbolic method is found everywhere in Indian folk poetry' [৫] কিন্তু বাংলা লোক সংগীতের মধ্যে একমাত্র অধ্যাত্ম বিষয়ক বিশেষত দেহতত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীত ব্যতিরেকে বলা যেতে পারে যে অনুভূতির প্রত্যক্ষ প্রকাশই হ'ল বাংলা লোক সংগীতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

বাংলা লোক সংগীতের বহুল ব্যাপ্তিই আবার এর কাব্যিক মানকে অনেক সময়ে অবনমিত করেছে। নিছক সুরকে অবলম্বন করে বহু অক্ষম মানুষের সঙ্গীত রচনায় প্রয়াসী হওয়াই এর অন্যতম কারণ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণীয়:

'সকল সাহিত্যে যেমন লোক সাহিত্যেও তেমনি তার ভাল

মন্দের ভেদ আছে। কবির প্রতিভা থেকে যে রসধারা বয় মন্দাকিনীর মতো অলক্ষ্য লোক থেকে সে নেমে আসে; তারপর একদল লোক আসে যারা খাল কেটে সেই জল চাষের ক্ষেতে আনতে লেগে যায়। তারা মজুরি করে, তাদের হাতে এই ধারার গভীরতা, বিশুদ্ধিতা চ'লে যায়, কৃত্রিমতায় নানা প্রকারে বিকৃত হ'তে থাকে।' [৬]

বাস্তবিক আজ বাংলা লোক সংগীতের অকৃত্রিম রূপ বিপন্ন। এই বিপন্ন হওয়ায় কারণ একদিকে যেমন আধুনিক সভ্যতার বিকাশ লাভ—'The construction of railways, the linking up of villages with other districts, and contact with large towns and cities had an immediate and permanent effect upon the minstrelsy of the country side. Many of the village labourers migrated to the towns, or to the colonies, and most of them no longer cared for the old ballads, or were too busily occupied to remember them.' [৭]

—তেমনি রবীন্দ্রনাথ কথিত মজুরের দলও এর জন্য দায়ী। আজকাল অনেকেই লোক সংগীতের চর্চায় নিযুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে লোক সংগীতের দু'একটি টান আর 'মাঝিরে', 'নাইয়ারে' কিংবা 'বন্ধু' জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে বাজারে লোক সংগীত চালাবার অপচেষ্টা চলেছে। যথার্থ লোক সংগীতের অনুরাগী ও গবেষককে এই ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে এবং এর প্রতিরোধের জন্য সচেষ্ট হতে হবে, নতুবা কালক্রমে দেখা যাবে কৃত্রিম লোক সংগীত আসল লোক সংগীতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে।

জয়নারায়ণ ঘোষাল বিরচিত 'করুণানিধান বিলাস' [১৮১৩-১৮১৪] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে রচিত এই কাব্য

খানিতে ইংরেজী শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলা দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি জীবনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে যে পরিবর্তন সূচিত হ'ল, তার পরিচয়টি সার্থকভাকে বিধৃত রয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে বাঙালীর সমাজ জীবনের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যাবে এই কাব্যখানিতে। বিশেষত কৃষ্ণলীলার বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি সমসাময়িক বাঙ্গালী সমাজের—উৎসবানুষ্ঠানের যথাসম্ভব খুঁটিনাটি বিবরণ দান করেছেন এই কাব্যে। কিন্তু আমাদের আলোচনায় বর্ত্তমান কাব্যটির উল্লেখ অন্য কারণে। তা হ'ল—এই কাব্যে কবি বোলান তরজা, জারিগান, শাড়ি গান [সারি গান] ইত্যাদির বহুল উদাহরণ দিয়েছেন। প্রাচীনতম কবি গানের নিদর্শনও বর্তমান গ্রন্থটিতে বিদ্যমান। বলা যেতে পারে বাংলা লোক সংগীতের অন্যতম প্রাচীন সংগ্রহ এই কাব্যটি। 'শাড়ি গান' [সারি গান] প্রসঙ্গে কবি বর্ণনা করেছেন ঃ

বাঙ্গাল বুলিতে শাড়ি ঝুলেতে গাইবে।
দুই পাশে দাঁড়ি মিলি সঙ্গে স্বর দিবে॥

এইবার 'করুণানিধান বিলাসে' সঙ্কলিত কয়েকটি সারিগান উদ্ধৃত করা হ'ল—

ক। তরুণী তরণ্যাকার কৃষ্ণ কর্ণধার।
এইরূপে জলকেলি সুখ পারাবার॥ ৪২ ॥
জল্‌জন্তু ধর্য্যা কভু করে নৌকা মত।
কৃষ্ণ তাহে মাঝি হন দাঁড়ি গোপী যূথ॥ ৪৩ ॥
কর বৈঠা কঙ্কণেতে বাজিছে পঞ্জনি।
সপ্তস্বরে শাড়ি গায় গোপিনী রঙ্গিণী॥ [পৃঃ ২৬৯]

খ। [নৌকার শাড়ি গান]
আজি আনন্দের সীমা নাই কাঁজি দরশনে।
বিরজায় তরণি বায় মোহিনী মোহনে॥ ধুয়া॥
রাধিকার গুণগান করিছে সঘনে।

মুরলী বাজায় কৃষ্ণ সুচাঁদ বদনে॥ ১ ॥
প্রেমধারা বহিতেছে ভকত লোচনে।
তাল মানে ভক্ত নাচে মুগ্ধ গুণ গানে॥ ২ ॥
সারদা সকল সখী বীণার বাজনে।
গাইছে যুগল গুণ সুধা আলাপনে॥ ৩ ॥
জয় জয় রাধা জয়কৃষ্ণ বৃন্দাবনে।
সখা সখী ভাবে মত্ত নাম মধু পানে। [পৃঃ ২১১]

কাব্যে সঙ্কলিত সারি গানে রাগ ও তালাদির উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়—

গ। শাড়ী গীত॥
রাগিনী বাঙ্গাল॥
তাল একতালা॥
রমণী তরনি বায়;
প্রেম ভরা সেই নায়ঃ
বিকিকিনি আনন্দ বাজারে।
হাতে বঠ্যা বায় তায়ঃ
কঙ্কণে সুতাল ভায়ঃ
রসঘাটে লাগিল সত্বরে॥
দূর্ব্বা দল কুঞ্জবেলা তিন প্রহর॥ [পৃঃ ১১৫৯]

ঘ। দাড়ি মাজি ব্রজশিশু হইব সকল।
নটবর বেশভূষা হবে অবিকল॥
কনক বঠ্যায় হালি পঞ্জনি সহিত।
নানারঙ্গ পতাকায় হইবে শোভিত॥ ৮॥
ঋতুমত শাড়ি গান মল্লারে মীলিব।
বরষা রাগিনী যত তাহার সহিত॥ ৯॥
কালজলে আল করি তরণি রচিব।
তার মধ্যে হিণ্ডোলাতে আমরা ঝুলিব॥ [পৃঃ ১৭৭]

৬। দিবসেতে তরিমধ্যে জলেতে ভ্রমণ।
দাঁড়ি মাঝি সখীয়ে শোভা অগণন॥ ৫॥
বসন ভিজিয়া অঙ্গে হইল দর্পণ।
যুগল কিশোর রূপ তাহাতে দর্শন॥ ৬॥
নদনদী দুই কূলে অতি রম্যবন।
তার ছায়া গোপী অঙ্গে হয়্যাছে পতন॥ ৭॥
নানারাগে শাড়ি গান জুড়ায় শ্রবণ।
কেহু কাচে কেহু নাচে তোষয়ে মোহন॥ [পৃঃ ৩১৮-৩১৯]

অবশ্য 'করুণানিধানবিলাসে' সঙ্কলিত সারিগান গুলি যে অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা হয়ত নয়, কবি নিজেও কিছু কিছু অংশ পরিবর্তিত করে থাকতে পারেন, তবু দেড়শতাধিক বৎসর পূর্বে—বিশেষত যে কবি ইংরিজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, তাঁর কাব্যে সারি গানের উল্লেখ ও বর্ণনা যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্যামচাঁদ গুপ্ত বিরচিত 'সারি গান' ১৩০৮ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে গোষ্ঠ পর্যায়ের ২৮টি গান এবং দ্বিতীয় খণ্ড মাথুর পর্যায়ে ৮টি পদ সঙ্কলিত হয়েছে।

লেখক লোক সঙ্গীতের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন গ্রন্থটিতে। প্রাচীন গানকে তিনি সারি, জারি, নৌলা, পর্ব ও বারমাস্যা—এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

সারি গানের সংজ্ঞায় লেখক বলেছেন যে নৌকায় সারি সারি বসে বা দাঁড়িয়ে গান করার জন্যে এই গানের নাম 'সারি গান'। প্রাচীন সারি গানগুলি গঙ্গা বন্দনা, দান ও বিরহ অবলম্বনে রচিত। তবে তুলনামূলক বিচারে সারি গানে দান লীলার বর্ণনাই অধিক। লেখক দান লীলার আধিক্যের মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে বর্ষায় নৌকারোহণ করা কালে, সহজেই বৃন্দাবনের

রমণীদের মথুরায়-দধি, দুধ প্রভৃতি বিক্রয় করতে যাওয়ার চিত্র স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। তাই সারি গানে দান লীলার আধিক্য।

বর্ষার সঙ্গে বিরহের যোগও অত্যন্ত গভীর। তাই দান লীলা ব্যতীত বিরহ বর্ণনার আধিক্যও এই গানে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের সারি গানে অবশ্য গঙ্গাবন্দনা, দান লীলা ও বিরহ ব্যতীত, মান, মাথুর, গোষ্ঠ প্রভৃতি পালাও লক্ষ্য করা যায়।

'জারি গান' মুসলমানী গান, 'নৌলা' একপ্রকার ভজন আর 'পর্ব' ধর্মের গান। এই শ্রেণীর সংগীত বৌদ্ধ যুগ থেকেই প্রচলিত বলে লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন।

সাহিত্য পরিষদের ১০ম অধিবেশনে [৬ই মার্চ ১৩১০] প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু 'গাজী সাহেবের গান' নামে একটি প্রবন্ধের সারমর্ম প্রকাশ করেন। ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবার এবং বারুইপুর অঞ্চলে এই গান প্রচলিত। বারুইপুরের রায়চৌধুরী বংশ রাজপুরে যখন প্রতিষ্ঠিত, তৎকালে তাঁদের পূর্ব পুরুষ মদন রায় পীর গাজী সাহেবের কৃপায় নবাবের কোপদৃষ্টি থেকে কেমন করে রক্ষা পেয়েছিলেন, তারই বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে 'গাজী সাহেবের গানে।' তখন বাংলায় শায়েস্তা খাঁর আমল। সে সময়ে ২৪ পরগণার দক্ষিণ দিকে হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের মধ্যেকার সম্পর্ক কেমন ছিল, তাও এই গানের মধ্য দিয়ে বেশ বোঝা যায়।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় [১৩১১ ও ১৩১২] ডাক্তার মোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্যের 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ আলোচনা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে বাংলার সারিগান, গুরু সত্য সংগীত, বারগীত, অষ্টক গীত, কেবল কামিনীর গীত, কানাই বলাইয়ের গান, বাদার গীত বা নলে গীত, গাজীর গীত, জারিগান প্রভৃতি বিস্তৃত উদাহরণ সহ

আলোচিত হয়েছে। লেখক অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, 'যত প্রকার গ্রাম্য কবিতা আছে তাহার মধ্যে সারি গীতই শ্রেষ্ঠ।' [পৃঃ ৪০, ১ম সংখ্যা]

লেখক সংগৃহীত ১টি সারি গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। গানটির বিষয় গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ—

কেমনে বাঁচিবে তোর মা—
আরে ও নিমাই সন্ন্যাসেতে যেওনা।
যখন জন্মিলে নিমাই নিম তরুতলে
আমি বাছিয়া রাখিলাম নাম নিমাই চাঁদ তোমারে।
সন্ন্যাসী না হইও, বৈরাগী না হইও
ওরে ঘরে বসে কৃষ্ণনাম আমারে শুনাইও।
সোনার নদীয়া ছেড়ে যাবে গোরা রায়,
ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়ার বল কি হবে উপায়।
কাঁচা সোনার বরণ অঙ্গে ছাই যে মাখিবে,
শচী মায়ের বুকে তাহা কেমনে সহিবে।

—লেখক বলেছেন, 'যখন দেশের লোক ইতিহাস বলিয়া কোন গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর করে নাই, তখন নিরক্ষর কবিগণের গ্রথিত গানই দেশের ঐতিহাসিক জ্ঞানদাতা ছিল।' [পৃঃ ৪০, ১ম সংখ্যা] কবিত্ব শক্তির বিচারে 'গুরু সত্য সঙ্গীত' দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী বলে লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত লেখক কর্তৃক প্রকাশিত 'গুরু সত্য সংগীতে'র উদ্ভব বিষয় কিংবদন্তীটির উল্লেখ করা যেতে পারে—

'খুলনা জেলার বিখ্যাত নদী রূপশার নিকটবর্তী আউটপোষ্ট বঠিয়া ঘাটার অপর পারস্থিত জনমা নামক স্থানের একটি পোদ জাতীয় ফকির নাকি সর্ব প্রথমে এই গুরু সংগীত রচনা করিয়া বাদায় গমনশীল যাত্রিগণের নিকট প্রকাশ করে।' [পৃঃ ৪৫, ১ম সংখ্যা।]

লেখকের সংগৃহীত 'গুরু সংগীতে'র একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে—

আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে এবার দয়াল
ফুটেছে আখীর।
আমি প্রভাতে জাগিয়া দেখি দয়াল আমার
সম্মুখে জাহির, রে সম্মুখে জাহির॥
ফুল ঝরে পাখি উড়ে পাতায় শিশির
গলেরে রোদের তাপে আলোক নিশির,
তাই ভেবে কান্দে ঈশান যাতনা গভীর
বড় যাতনা গভীর॥

লেখক জারি গান সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন প্রবন্ধটিতে। লেখকের মতে, 'সংগীত কবিত্বের মধ্যে নিরক্ষর কবি হস্ত চালিত অথবা কল্পনা প্রসূত গীতি কাব্যে জারী গীত একটি অতি উচ্চ অংগের কবিত্বময়, নির্দোষ আমোদ। ······জারী অর্থে প্রচার। ইহা আরবিক শব্দ এবং অধিকাংশ আরবিক ধর্মের ছায়ায় প্রতিপালিত নিরক্ষর মুসলমান কবিগণকৃত আরবিক কাহিনী ঘটিত সংগীত। তবে হিন্দুর দেশে থাকিয়া যে সকল মুসলমান কবি বাহিরে 'কোরাণ' ভিতরে পুরাণ লইয়া হিন্দুর সংগে অধিকাংশ সময় চলাফেরা করে, তাহারা দুই একটি হিন্দু ধরণের জারী গীত প্রকাশ করিয়াছে। এই গীতের মধ্যে "ধুয়া" নামে একটি অংশ আছে ; সাধারণ সংগীতের যেমন আভোগ, অন্তরা, চিতেন প্রভৃতি অংশ, আর মুখড়া, অবস্থায়ী, কোলখোজ, মিল ওপর চিতেন প্রভৃতি রীতি আছে। এই জারী গীতেও সেইরূপ ধুয়া, আবেজ, ফেররা, মুখড়া বাহির চিতান প্রভৃতি অংশ আছে। প্রত্যেক গীতের শেষ ভাগে বা অগ্রে একটি অথবা আবশ্যক বোধে দুইটি ধুয়া থাকে।' [পৃঃ ৮০ ; ২য় সংখ্যা]।

লেখক 'হাবু গীতে'র আলোচনা প্রসংগে বলেছেন, 'নিরক্ষর

কবিগণ আপন আপন বালকগণকে পরস্পরের সহিত বিবাদ ছলে একরূপ কবিত্বময় কলহ শিক্ষা দিয়া থাকে। এই সঙ্গীত-কলহ দুই বা ততোধিক বালকসমূহে গীত হয়। ইহাকে সাধারণতঃ 'হাবুগীত' কহে। ইহার ভাষা বড় অশ্লীল।

এই 'হাবুগীত' গাহিবার সময় কৃষক শিশুগণ দুই চরণ বিস্তৃত করিয়া বামহস্ত বক্ষের সঙ্গে সংবদ্ধ করত দক্ষিণ হস্ত নাড়িয়া নাড়িয়া সুরের সঙ্গে গাহিতে থাকে, আর সময় সময় মুখে এক প্রকার হাস্যোদ্দীপক শব্দের সঙ্গে বগল বাজাইয়া সংগীতের উপসংহার করে। এই সমস্ত গীতগুলি অশ্লীল হইলেও ইহাতে রচয়িতার যথেষ্ট নিপুণতা আছে।'

সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকার ১৩১২ সনের ১ম সংখ্যায় শিবচরণ সরকার সঙ্কলিত 'বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাথা' পর্যায়ে ঘেঁটু পূজার গীত ৪টি, অন্নপ্রাশনের মাংগল্য গীত ২টি এবং দুর্গার শাঁখা পরা' বিষয়ে একটি দীর্ঘ গাথা প্রকাশিত হয়েছে।

পরিষৎ পত্রিকার চতুর্দশ ভাগের [১৩১৪] ২য় সংখ্যায় 'বরিশালের গ্রাম্য গীতি' নামে রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার রচিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই ক্ষুদ্র রচনাটিতে একটি দক্ষযজ্ঞ বিষয়ক, একটি কৃষ্ণ প্রেম বিষয়ক এবং মেয়ে মহলে গীত একটি কালী বিষয়ক সংগীত প্রকাশিত হয়েছে। এই একই বৎসরের পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় রাজকুমার কাব্যভূষণ 'গ্রাম্য শব্দ কোষ ও পাবনার গ্রাম্য শব্দাদি সংগ্রহ' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে পাবনা জেলা থেকে সংগৃহীত ৪টি সারি গান প্রকাশ করেছেন।

১৩১৯ সালের সাহিত্য পরিষদের [৪র্থ সংখ্যা] কার্য বিবরণী থেকে জানা যায় শশিভূষণ পাল 'সারি গান' ও 'বারমাসী গান' প্রবন্ধদ্বয় রচনা করে প্রতিটি প্রবন্ধের জন্য ১০ টাকা করে পুরস্কার লাভ করেন।

শশিভূষণ দে কর্মকার প্রণীত 'ভাদু সংগীত' মাত্র ২৩টি গানের

সঙ্কলন। এই ক্ষুদ্র সঙ্কলনটি ১৩২৬ সালে বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত।

'অমিয় ভাদুসংগীত' রাজেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক সঙ্কলিত ও বাঁকুড়া থেকে ১৩২৮ সালে প্রকাশিত। মোট ২৪টি গানের সঙ্কলন এটি। বেশ কয়েকটি গান শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, জগন্নাথ দেব, কালী প্রমুখ দেবদেবীর বন্দনা মূলক। গ্রন্থটিতে সঙ্কলিত ভাদু অবলম্বনে রচিত কয়েকটি গানের সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। একটি গানে ভাদুকে 'বিশ্বকর্মা সংগিনী' বলে অভিহিত করা হয়েছে—

প্রিয়ে ভাদু রাণী।
পূজা লও গো বিশ্বকর্মা সঙ্গিনী॥
কিরূপ নিয়ে এসেছিলি রে
গুণগান যার ফুরায় নি।
[ওসে] চিরস্থায়ী যশো ভাতি
ইতিহাস-রূপিনী॥
অমল ধবল যশ গো
এয়োতি স্বরূপিনী।
পুণ্যময়ী যশোমতী
স্বরূপা নয়নমণি॥

ভাদুগানে সমসাময়িক নানা বিষয়ের অবতারণা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। একটি গানে গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের [Non-Co-operation Movement] বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে—

নান্‌-কো-অপারেশন
দেশে আইছে গান্ধীজীর হুজুগ নূতন॥
অপরূপ টাটকা গন্ধরে
বালক যুবা সুরঞ্জন।
[রূপ] মনোহর অগোচর
অঘটন সুখনটন॥

যুদ্ধের কারণে রেলের মাশুল বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাদু গানে তারও প্রতিফলন পড়েছে—

সাবাস হুজুগ এল।
লড়াই হয়ে রেল মাশুল বেড়ে গেল।
কাশী যেত পাঁচ টাকাতে গো
এখন সাত টাকা পড়তা হল।
পূর্বে আট টাকায় বৃন্দাবন যেত
[এবে] বার টাকা দর হল।

ঘৃতের অভাবও একটি গানের বিষয়বস্তু হয়েছে—

অবাক করলে শেষে,
ভৈষা ঘৃত তাও মেলেনি আর দেশে ;
গাওয়া ঘৃতের নাম শুনি যারে
কালে কল্পে পাই গো সে ;
করবে শিশিতে ভর যেমন আতর
গন্ধ শুঁকবে মজলিসে।

'যাদুভুলাভাদুসংগীত' সুরেন্দ্রনাথ বীট রচিত এবং ১৩২৮ সালে বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত। মোট ২৩টি গানের সঙ্কলন এটি। একটি ভাদু গানে যেন মা মেনকার নবমীর রাত্রিতে প্রকাশিত আর্তির প্রতিফলন ঘটেছে—

পোহাইওনা গো বিভাবরী ধরি গো
তব চরণ।
পোহাইলে যাবে চলে প্রাণের প্রাণ মোর
ভাদু ধন॥
দেখে আমায় অনাথিনী, রাখ যদি এই বাণী,
তবে সদা ভাদু ধনির, হেরব আমি চাঁদ বদন॥
বহু ভাগ্যে কত সাধে পেয়েছি আমি ভাদু চাঁদে,
ছেড়ে গেলে কেঁদে কেঁদে যাবে আমার এ জীবন॥

অপর একটি গানে ভাতুর বাসর ঘর সজ্জিত করার কথা বলা হয়েছে—

বলি ওলো মকর
চল মোরা সাজাইগে ভাতুর বাসর।
ফুলের আলিশ, ফুলের বালিশ গো,
ফুলেতে বনাব ঘর।
আবার, বোটা ফেলে সুবাস ফুলে,
শয্যাপাতি মনোহর ॥
আজকে ভাতুর বিয়ে হবে লো, চতুর্দ্দোলে
আসবে বর।
ওলো বাসর সুসাজ দেখে ভুলে যেন,
সেই লম্পট নাগর ॥

একটি গানে আবার প্রেম বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অভিব্যক্ত হয়েছে—

ভেবে মনে মনে
ভালোবাসা করবি লো মানুষ চিনে ॥
হঠাৎ করে যারে তারে লো, দিসনা প্রাণ অসাবধানে।
নইলে আফশোষেতে মরবি শেষে ভাসবি গো তুফান বানে ॥
শুধু জুলে যাসনা ভুলে লো, কখন কদাচনে।
যাদের মুখটি মিঠা অন্তর খিটা, কসনা কথা তার সনে ॥
হবে যেজন রসিক সুজন লো, যে পীরিতের রীতি জানে।
ওলো তার সনেতে করবি প্রণয় সুখে ভুঞ্জিবি প্রাণে ॥

পীতাম্বর দাস কর্তৃক সংগৃহীত 'ঝুমুর সংগীত' ৯৬টি গানের সঙ্কলন। এই সঙ্কলনটি ১৩২৯ সালে প্রকাশিত।

মহম্মদ সফিউদ্দিন রহমান কর্তৃক 'গম্ভীরা সংগীত' ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। এটি মাত্র ১৩টি গানের একটি সঙ্কলন।

'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ১৩৩১ সালের মাঘ মাসের সংখ্যায় [৩য় বর্ষ ;

দ্বিতীয়ার্ধ ; ৬ষ্ঠ সংখ্যা] মুহম্মদ মনসুরউদ্দিনের 'জাগ্ গান' নামে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 'জাগগান' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন—'পাবনা জিলার নানা পল্লীতে জাগ্ গান প্রচলিত আছে। রাখাল বালকগণ পৌষ মাসের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রাত্রিকালে বাড়ী বাড়ী পল্লীর নিরক্ষর অজ্ঞাত কবি রচিত গান গায় এবং ভিক্ষা লয়। এই ভাবে সমস্ত পৌষ মাস গান গাহিয়া যে সমুদয় পয়সা, চাউল, ডাইল প্রভৃতি পায় তাহাই দিয়া পৌষ সংক্রান্তির দিনে নিজেরা মাঠে পাক করিয়া খায়।' [পৃঃ ৭৩৬]

জাগ্ গানের রচনাকাল ও ভাষা সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য, 'এইসব গানের রচনাকাল বাঙলায় মুসলমানগণের প্রতিপত্তির সময়কার বা তার পরবর্ত্তী সময়কার এবং ইংরেজ আমলের পূর্বেকার তাহার কারণ ইহার ভাষা আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু শব্দবহুল।' [পৃঃ ৭৩৬]

পাবনা জেলায় জাগ্ গানের প্রচলন থাকলেও এই গানের পীঠস্থান হল রংপুর। রংপুর থেকেই জাগ্ গান পাবনা জেলায় প্রসার লাভ করে। জাগ্ গান গুলিতে সাধারণতঃ লৌকিক চরিত্রের মহিমা জ্ঞাপন অথবা পীর-সাধুদের মাহাত্ম্য প্রচলিত হতে দেখা যায়। বৈষ্ণবপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সম্পর্কিত আখ্যানও জাগ্ গানের বিষয় হয়ে উঠেছে পরবর্তীকালে। মনসুর-উদ্দিন ধূয়াসহ যে 'কৃষ্ণজাগ্' প্রকাশ করেছেন, সেটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা গেল—

কৃষ্ণ জাগ্

ধূয়া

এমা দয়া নাইরে তোর,
মা হয়ে কেন বেটায় সদা বলো ননী চোর ॥
কেষ্ট যায়, মা, বিষ্ণুপুরে, যশোদা যায় ঘাটে,

খালি গৃহ পেয়ে গোপাল সকল ননী লোটে।
"ননী খা'লো কে রে গোপাল ননী খা'লো কে ?"
"আমি ত মা খাই নাই ননী বলাই খা'য়েছে।"
"বলাই যদি খাইত ননী থুতো 'আদা' 'আদা'
তুমি গোপাল খাইছো ননী ভাণ্ড করেছো সাদা।"
ছড়ি হাতে নন্দরাণী যায় গোপালের পিছে
একলম্ফে উঠলেন গোপাল কদম্বেরই গাছে।
পাতায় পাতায় ফেরেন গোপাল ডালে না দেয় পাও,
গাছের নীচে নন্দরাণী থরে কাঁপে গাও।
"নামো নামো ওরে গোপাল পাড়্যা দেই তোর ফুল,
কদম্বেরই ডাল ভাঙ্গিয়ে মজাবি গোকুল।"
"নামি নামি ওরে মারে একটী সত্য করো,
নন্দ ঘোষ যে তোমার পিতা যদি আমায় মারো।"
"তাকি আর হয় রে গোপাল তাকি আর হয়,
নন্দঘোষ যে তোমার পিতা সর্ব্বলোকে কয়।'
নালা ভোলা দিয়া গোপাল গাছ হতে নামাল
গাভী ছাঁদা রসি দিয়ে দুই হস্ত বাঁধিল।

ইত্যাদি।

উদ্ধৃত জাগ্‌গানটি প্রশ্ন-উত্তর মূলক হওয়ায় বেশ নাটকীয়তা সঞ্চারিত হয়েছে। সংগ্রাহক মনস্থুরউদ্দিন জাগ্‌গানের সঙ্গে **folk ballad** এর সাদৃশ্যের বিষয় উল্লেখ করেছেন। [পৃঃ ৭৩৬] কিন্তু **ballad** এর ন্যায় জাগ্‌গানগুলির কাহিনীগত ঐক্য তেমন না থাকায় সর্বোপরি মানবিক আবেদনের অপ্রতুলতা এগুলিকে আখ্যায়িকা গীতিতে রূপান্তরিত করেছে। মনস্থুরউদ্দিনের সংগৃহীত 'পাড়া গেঁয়ে গান' পর্যায়ে ৩টি [৩য় বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩১ ; দ্বিতীয়ার্ধ, ১ম সংখ্যা ; পৃঃ ৮৩-৮৪] ; [৩য় বর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৩১, দ্বিতীয়ার্ধ] ৩য় সংখ্যায় ২টি এবং 'ধুয়াগান' নামে ২টি গান [৩য়

বর্ষ ; পৌষ ; ১৩৩১ ; দ্বিতীয়ার্ধ, ৫ম সংখ্যা] 'বঙ্গবাণী'তে সঙ্কলিত হয়েছে।

১৩৩১ সনের ৩য় সংখ্যায় পরিষৎ-পত্রিকায় 'গ্রাম্য গীতি' শীর্ষক নিবন্ধে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ঢাকা ও ময়মনসিংহের কয়েকটি প্রাদেশিক গ্রাম্য গীতি ও সেগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৩৪ সনের ৪র্থ সংখ্যায় [২৭শ ভাগ ; ১ম খণ্ড] 'গ্রাম্য গীতি কবিতায় বারাষে' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটির লেখক হিরণ্ময় মুন্সী।

লেখক প্রবন্ধটিতে যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমায় প্রচলিত বারাষে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং নিদর্শন স্বরূপ একটি বারাষে বা গ্রাম্য কবিতা উপস্থাপিত করে তার কাব্যমূল্য সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। 'বারাষে' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, 'বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের বৈকালে যখন খররৌদ্রের তাপ অস্তগামী সূর্যের সহিত ক্ষীণ ও মলিন হইয়া আসে, তখন মাঠে মাঠে 'সবুজের' ছড়াছড়ির মাঝখান হইতে এই গানের সুরের রেশ 'গাজুড়ান' বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া কেমন যেন পাগল করিয়া তোলে।

মাঠে নিড়ানী বা টাঙ্গি দিতে দিতে সারিবন্দী ভাবে দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়া বসিয়া মাথাল মাথায় সমবেত চাষী 'পরিয়াত' গণ মিলিতকণ্ঠে এই গান গাহিতে থাকে। তবে বাঁশের আড়বাঁশীতেই এই গান শোনায় ভাল।

বারাষে প্রায় ৩০।৪০ রকমের আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি কাব্যাংশে অতি উচ্চস্তরের। এই গানেরও বিভিন্ন পদ বা পালা আছে। পদবিশেষের সুরবিন্যাসও বিভিন্ন। সাধারণতঃ ইহা ভাটিয়াল সুরেই গাওয়া হয়।' [পৃঃ ৫০৫]

লেখক রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বনে রচিত একটি 'বারাষে' উদ্ধৃত করেছেন —

বসন্ত বৈশাখে রাধা ভাবিত সদায়
কৃষ্ণের বিরহ প্রাণে সহন না যায়।
বলিয়া গেলেরে কৃষ্ণ 'আসিব ত্বরিত'
বিলম্ব দেখিয়া নিরীক্ষণ করি পথ।
জ্যৈষ্ঠের যন্ত্রনা যত সহন না যায়,
খিয়ের অনল ওঠে জ্বলিয়া সদায়।
আষাঢ়ে নবীন মেঘ ডাকে গরজিয়ে,
এত দুঃখ দিলি বিধি মোর মাথা খেয়ে।
শ্রাবণে অশেষ দুঃখ হেন নাহি মোর মনে,
এ ছার জীবন আমি রাখি কি কারণে।
ভাদ্দরে ভরিল জলে যমুনার কূল,
তাহাতে উঠিল ফুটি কমলের ফুল।
ভ্রমর ভ্রমরী যেমন মধু করে পান,
এই মত ছাড়িয়া গেছেন শ্রীকৃষ্ণ আমার।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা প্রতি ঘরে ঘর,
আনন্দের অবধি নাই গোকুল নগর।
কার্তিকে করিলেন প্রভু বৃন্দাবনে রাস,
কৌতুকে বসেছেন কৃষ্ণ গোপী চারিপাশ।
অগ্রহায়ণে অশেষ দুঃখ হেন নাই মোর মনে,
অনুক্ষণ পড়ে মনে নন্দসুত ধনে।
পৌষ মাসের পীড়া ওঠে বিপরীত,
প্রভুর বিরহ শীতে তনু হয় কম্পিত।
মাঘ মাসে মোর মরণ হত সেও ছিল মোর ভাল,
শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া যবে মথুরাতে গেল।
ফাল্গুনে ফুটিল যত নানাবিধ ফুল,

ভ্রমর ভ্রমরী ডাকে একে সমতুল।
চৈত্রেতে চিন্তিত রাধা চিত্ত নাহি রে স্থির,
অস্থুস্থুর রামধন······পিরীত।
অক্রূর হরিয়া নিল রথে নারায়ণ,
ফিরিয়া না দিলে কৃষ্ণ আমার দরশন।
শ্রীকৃষ্ণ পেয়েছিলাম অতি বড় সাধে,
ছাড়িয়া গেলরে কৃষ্ণ কোন অপরাধে। [পৃঃ ৫০৫]

উদ্ধৃত 'বারাষে'টি যে তেমন প্রাচীন নয়, জ্যৈষ্ঠ মাস দিয়ে বৎসরের উল্লেখেই তার প্রমাণ মেলে। দ্বিতীয়ত, 'বারাষে' যে বারমাস্যারই নামান্তর মাত্র, উদ্ধৃত বারাষেটিই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

১৩৩৪ সনে প্রকাশিত কার্ত্তিক সংখ্যায় 'সৌরভ' পত্রিকায় [১৫শ বর্ষ; ১০ম সংখ্যা] সুধাংশু ভূষণ রায়ের ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত একটি বারমাস্যা প্রকাশিত হয়েছে। বারমাস্যা সচরাচর বিরহ সঙ্গীত রূপেই পরিচিত। সমালোচক বারমাস্যা সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছেন, 'পরিবর্তমান প্রাকৃতিক পটভূমিকায় বিরহিনী নারীর সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে।' অর্থাৎ বারমাস্যা গানের দু'টি উপাদান—প্রকৃতি বর্ণনা ও মনোবিশ্লেষণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ বারমাস্যায় এই দুইয়ের সার্থক সামঞ্জস্য বিধান হতে দেখা যায় না। পল্লী কবিরা যে কোনও একটি উপাদানের উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে অপর উপাদানটিকে অবহেলা করেন। কিন্তু সুধাংশু ভূষণের সংগৃহীত বারমাস্যাটিতে প্রকৃতি বর্ণনা ও মনোবিশ্লেষণের সার্থক সমন্বয় বিশেষ সার্থকতা দান করেছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট ফল, আষাঢ় মাসের নূতন জল,
শ্রাবণ মাস কাটাইল নারী নাইয়রে নাইয়রে
আরে নাইয়রে।
তিন মাস গত অইল, রূপুন সাধু না আসিল,

আস্‌লা বন্ধু রইলা কার মন্দিরে ।
কত পাষাণ বান্‌ছরে সাধু বৈদেশে ।
ভাদ্র মাসে আওলা কেশ আশ্বিন মাসে বর্ষশেষ
কার্ত্তিক মাস কাটাইল নারী কাতরে কাতরে
আরে কাতরে ।
ছয় মাস গত অইল রুপ্তন সাধু না আসিল
আস্‌লা বন্ধু রইলা কার মন্দিরে
কত পাষাণ বান্‌ছরে সাধু বৈদেশে ।
আগুন মাসে দাওয়া মারী, পৌষ মাস শীত ভারী ;
মাঘ মাস্যা শীত নারীর, অন্তরে অন্তরে আরে অন্তরে ।
নয় মাস গত অইল রুপ্তন সাধু না আসিল,
আস্‌লা বন্ধু রইলা কার মন্দিরে ।
কত পাষাণ বান্‌ছরে সাধু বৈদেশে ।
ফাল্গুন মাসে দ্বিগুন জ্বালা চৈত্র মাসে শরীর কালা,
বৈশাখ মাসে অইল নারীর যৌবন উতলা ;
বার মাস গত অইল রুপ্তন সাধু না আসিল,
আস্‌লা বন্ধু রইল কার মন্দিরে ।
কত পাষাণ বান্‌ছরে সাধু বৈদেশে ।

'সৌরভ' পত্রিকার ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় [১৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা] 'নালিতার বারমাস্যা' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নিবন্ধটির লেখকের নাম অবশ্য প্রকাশিত হয়নি। নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে, 'ময়মনসিংহ জিলার কৃষকদের বর্তমানে পাটই একমাত্র সম্বল। নালিতার সহিত তাহাদের সুখ দুঃখ এমনিভাবে জড়িত যে একমাত্র এই ফসলের ভাল মন্দেই তাহাদের হৃদয় আনন্দ বা বিষাদে ভরিয়া যায় ; ঘরে ঘরে স্বামী স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের বাৎসরিক যাবতীয় সাধ মিটান উহারই উপর নির্ভর ক'রে।' [পৃঃ ২৮০]

নিবন্ধটিতে একটি বারমাস্যা উপস্থাপিত করা হয়েছে। বার মাস্যাটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, '…নালিতা উৎপাদনে যাবতীয় কাজ ও এতৎসংলগ্ন নানা সুখস্বপ্নই এই বারমাস্যার প্রতিপাদ্য বিষয়।' [পৃঃ ২৮০]

এইবার বারমাস্যাটি উদ্ধার করা যেতে পারে—

পৌষনা মাসেতে ভাইরে পুষ্প অন্ধকারী।
নাল্যার লাগ্যা গিরস্থেরা না লয় ঘর বাড়ী॥
[দিশা] ও নিলকে, শরীল করলাম কালারে ভাই
নাল্যা নিড়াইতে।

মাঘনা মাসেতে ভাইরে ক্ষেতে নিলাম আল,
লাঙ্গল ভাঙ্গলাম জোয়াল ভাঙ্গলাম আরও
ভাঙ্গলাম ফাল॥

ফাল্গুনা মাসেতে ভাইরে ক্ষেতে নিলাম মই।
তুর্ব্বায় ভেদাল্লায় কয় আমরা যাইবাম কই॥
চৈত্রিনা মাসেতে ভাইরে রবির বড় জ্বালা।
নাল্যা ক্ষেতে গোবর ফালতে শরীর করলাম কালা।
বৈশাখ মাসেতে ভাইরে নাল্যার ফাললাম আলি
নাল্যা বেচ্য কিন্যা আনলাম ভাউজের লাগিল বালি।
নাল্যা যে নিড়াও গো তুমি ধানত নিড়াও না।
গোসা কর্য়া বইয়া থাকবাম ভাত রান্‌তাম না।
জ্যৈষ্ঠিনা মাসেতে ভাইরে নাল্যার আইল্যা পড়ে আগা।
নাল্যা বেচ্যা কিন্যা আনবাম ভাউজের লাগ্যা তাগা।
আষাঢ় মাসেতে ভাইরে নাল্যার লইল ফুল।
নাল্যা বেচ্যা কিন্যা আনবাম ভাউজের লাগ্যা নাকুল॥
ভাদ্রনা মাসেতে ভাইরে নাল্যার লইল আলি।
নাল্যা বেচ্যা কিন্যা আনবাম ভাউজের লাগ্যা বালি।
নাক্কুল দিলা যেমন তেমন বালি দিলা ভাঙ্গা।

তোমার ঘাড় ঠেঙ্গ থইয়া আমি বইবাম হাঙ্গা ॥
আশ্বিন মাসেতে ভাইরে বাড়ীর করলাম ঠাট।
ছয় দেউড়ী ছাড়াইয়া ভাউজে লার ত যায় পাট ॥
অগ্রাণ মাসেতে ভাইরে সবে নয়া খায়।
নাল্যা বেচার যত টাকা খাজনা ফাজনায় যায় ॥
ও নিলকে শরীল করলাম কালারে ভাই
নাল্যা নিড়াইতে।

এই বারমাস্যাটি যে প্রাচীন, পৌষ মাস থেকে গণনার রীতিতেই তা প্রমাণিত। দ্বিতীয়তঃ বারমাস্যায় সচরাচর প্রকাশিত বিষয়কে বর্ণনা করার পরিবর্তে ভিন্নতর বিষয়কে বর্ণনা করায় অভিনবত্ব সঞ্চারিত হয়েছে। বাস্তবতার উষ্ণ স্পর্শজাত উদ্ধৃত বারমাস্যাটি সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট না করে পারে না।

পরিষৎ পত্রিকার পঞ্চত্রিংশ ভাগের [১৩৩৫] ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্র ঘোষের 'ময়মনসিংহ জেলার কিশোর গঞ্জ মহকুমার গ্রাম্যসঙ্গীত' শীর্ষক প্রবন্ধটি। লেখক ইংরেজী ১৮৯৮ সালে জয়কার জনৈক জমিদারের সহায়তায় কিশোরগঞ্জ থেকে সংগৃহীত ৫টি গানও প্রকাশ করেছেন। এই পাঁচটি গানের প্রথমটি কার্ত্তিক পূজা উপলক্ষে গৃহস্থ অন্তঃপুর বাসিনীদের দ্বারা গীত সঙ্গীত। অপর ৪টি বিবাহ সঙ্গীত।

'বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে যে সমস্ত মহারথী নানা ভাষায় স্ব স্ব জাতির মানুষের প্রাণের মধ্যে নিহিত রসবস্তু উদ্ধার করিয়া স্বজাতীয়গণের এবং বিশ্ব মানবের সেবায় উপস্থাপিত করিয়া অতি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক গৌরবের অধিকারী হইয়া বাঙ্‌ময় জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, বাঙ্গালার মুহম্মদ মনসুর-উদ্দীন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।'

সদ্য প্রয়াত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুহম্মদ

মনসুরউদ্দীন সম্পর্কিত এই অভিমত যে নিছক ভাবাবেগ প্রসূত উচ্ছ্বাস মাত্র নয়, তা লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই সাধক-অধ্যাপকের সঙ্কলিত 'হারামণি'ই প্রমাণ। 'হারামণি' সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে মনসুরউদ্দীন সাহেবের লোক সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণটি জেনে নেওয়া যেতে পারে। মনসুরউদ্দীন নিজেই এই ব্যাপারে আলোকপাত করে বলেছেন: 'আমার পল্লীগান সংগ্রহ সুরু হয় ১৯২০ কি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। আমি তখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী। এই সময়ই আমার এক আত্মীয় আমাকে একখণ্ড পুরাতন "প্রবাসী" [১৩২২] পড়িতে দেন। এই সংখ্যা প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত লালন ফকিরের গান সংগ্রহ ছাপা হইয়াছিল। এই গান সংগ্রহ দেখিয়া আমার পরম বিস্ময় লাগিয়াছিল; কেননা লালন ফকিরের গান ও অন্যান্য ধরণের পল্লীগান আমাদের অঞ্চলে সুপ্রচুর ও সুপ্রচলিত ছিল।' —এই মন্তব্য থেকে আমরা দুটি তথ্য লাভ করি। তথ্য দুটি হ'ল – প্রথমত বিগত প্রায় ছ'দশক ধরে মনসুরউদ্দীন সাহেব লোক সংগীত সংগ্রহে লিপ্ত রয়েছেন, যে দাবী সম্ভবত অপর কোন লোক সংস্কৃতিবিদ্ করতে পারেন না; আর দ্বিতীয়ত লোক সংগীত সংগ্রহে তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই অনুপ্রাণিত, যদিও পরোক্ষে। অবশ্য মনসুরউদ্দীন নিছক লোক সংগীত সংগ্রহেই তাঁর প্রয়াসকে সীমিত রাখেন নি, রাখেন নি যে তার প্রমাণ আমরা লোককথা চর্চার ইতিহাস আলোচনা কালেই দেখেছি। বস্তুতঃ লোকসংগীত ব্যতিরেকে লোক সাহিত্যের অপর যে বিভাগটির প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা কিংবা আকর্ষণ, তা হ'ল লোককথা। তিনি নিজেও এই সত্য স্বীকার করেছেন:

'রাজশাহী হইতে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে [১৯২৬-২৮] পড়াশুনা করিতে যাই। এই স্থানে লোক বিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর পড়াশুনা করার ফলে লোক সঙ্গীত ও লোক গল্প সংগ্রহ আমার

একটা নেশার মত হইয়া দাঁড়ায়।' তবু মনসুরউদ্দীন সাহেবের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'হারামণি'। বাংলা লোক সংগীত সম্পর্কিত আলোচনায় 'হারামণি' এক অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান। এ পর্যন্ত 'হারামণি'র ৮টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে [১৯৩০] কলকাতা থেকে, আর এ পর্যন্ত প্রকাশিত শেষ খণ্ডটি [৮ম] প্রকাশিত হয় ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে [জুন/১৯৭৬]। অপরাপর খণ্ডগুলির মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডটির প্রকাশকাল ১৯৪২ [কলকাতা] তৃতীয়টির প্রকাশকাল ১৯৪৮ [ঢাকা], চতুর্থ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে [ঢাকা]। ৫ম খণ্ড-১৯৬১, ৬ষ্ঠ খণ্ড—১৯৬৭, ৭ম খণ্ড—১৯৬৪। আটটি খণ্ডে কয়েক সহস্র লোক সংগীত সংকলিত হয়েছে। শুধু সংগ্রহ প্রকাশ করেই লেখক তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি, সেই সঙ্গে ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনীয় আলোচনাও করেছেন। সংকলনে বিভিন্ন ধরণের লোক সংগীত স্থান লাভ করেছে। এদের মধ্যে আছে—সারি, বিবাহ গান, বাউল, বার মাসী, ধুয়া, জারী, মারেফতী, উদাসী ইত্যাদি। গানগুলি বর্তমান বাংলাদেশের নানা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। মনসুরউদ্দীন পাবনা জেলার মানুষ। তাই স্বভাবতঃই তাঁর লোক সংগীত সংগ্রহ শুরু হয় পাবনা জেলা থেকেই। পদ্মা নদীর উত্তর পারে অবস্থিত সুজানগর থানার অধীন মুরারিপুর গ্রামটিতে বৈরাগীদের ছিল একটি আখড়া। এখনকারই এক নবীন বৈরাগী, নাম প্রেমদাস-এর কাছ থেকেই লেখকের গ্রাম্য গান সংগ্রহে হাতে খড়ি। প্রথম সংগৃহীত গান তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন এবং যথা সময়ে তা প্রকাশিতও হয়। স্বভাবতঃই লেখক এতে আরও বেশি উদ্বুদ্ধ হন লোক সংগীত সংগ্রহে। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় বাউল গান এবং অপরাপর লোক সংগীত প্রকাশের জন্য 'হারামণি' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের সূত্রপাত করেন।

রামানন্দবাবু এই বিভাগটি সম্পর্কে বলেছিলেন : 'এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত, অশিক্ষিত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর, স্বল্পাক্ষর কাব্য, কবির উৎকৃষ্ট গান ও কবিতা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। প্রবাসীর পাঠক পাঠিকা এই কার্যে সহায় হইবেন আশা করি। অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাঁহারা লেখাপড়া না জানা সত্ত্বেও স্বভাবত উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্ব রস মধুর কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। কবিয়াল, তর্জাওয়ালা, জারিওয়ালা, বাউল, দরবেশ, ফকীর প্রভৃতির অনেকে এই দলের। প্রবাসীর পাঠক পাঠিকারা ইহাদের যথার্থ কবিত্বপূর্ণ রচনা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিব।'—বাংলা লোকসংগীত সংগ্রহ ও প্রকাশের ব্যাপারে 'প্রবাসী' পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল এক কথায় অসামান্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত গান এই বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে লোক সঙ্গীতের বিষয়বস্তু অবলম্বনে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র এবং দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত লোক সঙ্গীতের স্বরলিপি। 'হারামণি' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর যাঁদের সংগ্রহ প্রকাশিত হয়, তাঁরা হলেন ক্ষিতিমোহন সেন, সৈয়দ আজিজুর রহমান, করুণাময় গোস্বামী, প্রফুল্লকুমার চৌধুরী, অনাথনাথ বসু, প্রমোদ কুমার সেনগুপ্ত, জসীমউদ্দীন, হরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে মনসুরউদ্দীন সাহেবের প্রথম সংগ্রহ এই 'হারামণি' বিভাগেই প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি লোকসঙ্গীতের সংগ্রহগুলি 'হারামণি' নামেই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। মনসুরউদ্দীন সাহেবের 'হারামণি'র ১ম খণ্ডটিতে নানা শ্রেণীর লোক সঙ্গীত স্থান পেয়েছে। এই খণ্ডে বিধৃত গানগুলি লেখক সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর এক প্রতিবেশী দীনুমণ্ডলের পুত্র ছায়েমউদ্দীন, ছোবানী মণ্ডলের পুত্র কৃষিজীবী নায়েব আলী মণ্ডল, ন্যাংড়া মোল্লা, আবদুল

জব্বার নামক এক রাখাল, খাসচরের জাবেদ আলী, কানু সরদার, সাগরকান্দি গ্রামের নলিনীকান্ত সূত্রধর, পাবনার আকিলউদ্দীন বিশ্বাস, রাজশাহীর জগদানন্দ বৈরাগী প্রমুখাদির কাছ থেকে।

'হারামণি'র দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে সারিগান, বিবাহ গান, বাউল, বারমাসী, ধুয়া ইত্যাদি। গানগুলির অধিকাংশ রাজশাহীর নওগাঁ মহকুমা থেকে সংগৃহীত। সংগৃহীত হয়েছে নওগাঁ মহকুমার অন্তর্গত কালী গ্রামের অধিবাসী দেবনাথ মণ্ডল, আতাই কুলা গ্রামের দেলবর রহমান, মহাদীঘির মানু ফকীর ও কাদের ফকীর, অলঙ বেওয়া, বদির উদ্দীন ফকীর প্রমুখের কাছ থেকে। 'হারামণি'র প্রথম খণ্ডটি লেখক স্বয়ং প্রকাশ করলেও দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই খণ্ডটি প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেন রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র। 'হারামণি'র তৃতীয় খণ্ডটি স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে শতাধিক লালন সঙ্গীত স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে লালন সঙ্গীত তখনও তেমন প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়নি। লালন সঙ্গীত ব্যতীত এই খণ্ডে অপরাপর যে সংগীত স্থান লাভ করেছে—তা হ'ল বিবাহ সংগীত। এই বিবাহ সংগীতগুলি সংগৃহীত হয়েছে বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। 'হারামণি'র চতুর্থ খণ্ডটির গুরুত্ব বিশেষ ভাবে বিবাহের গানের জন্য। এই খণ্ডে সংকলিত বিবাহ সংগীতগুলি রাজশাহী, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। বিবাহের গানগুলি ব্যতিরেকে এই খণ্ডে জারী, উদাসী, বারমাসী, মারেফতী ইত্যাদি অন্যান্য শ্রেণীর লোক সংগীতও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডটির অপর বৈশিষ্ট্য স্বল্প পরিচিত পাগলা কানাইয়ের সংগ্রহের প্রকাশ।

পঞ্চম খণ্ডটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দ্বারা প্রকাশিত। এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে লালন শাহ এবং পাগলা

কানাই রচিত গান। গানগুলি ফরিদপুর জেলার মংগল বয়াতী সাহেবের কাছ থেকে সংগৃহীত।

ঢাকা থেকে সংগৃহীত লালন ফকিরের দু'শ গান সঙ্কলিত হয়েছে ষষ্ঠ খণ্ডে। গানগুলি শাহকলীমুদ্দীনের কাছ থেকে সংগৃহীত। 'হারামণি'র সপ্তম খণ্ডটি প্রকাশ করেছেন ঢাকার 'বাংলা একাডেমী'। এই খণ্ডে প্রায় সাত শতের মত গান সঙ্কলিত হয়েছে। এই খণ্ডে আছে শ্রীহট্টের অনেকগুলি লোক সংগীত; এছাড়াও আছে পাঞ্জু শাহের শতাধিক গান, লালন শাহের গান ইত্যাদি। অষ্টম খণ্ডটিও প্রকাশিত হয়েছে ঢাকার 'বাংলা একাডেমী' থেকে। এই খণ্ডেও সাত শতাধিক গান সঙ্কলিত হয়েছে; যদিও লেখক দাবী করেছেন আট ন'শ বলে। এই সংকলনে ধৃত গানগুলি সংগৃহীত হয়েছে ফরিদপুর, পাবনা, ঢাকা, কুষ্টিয়া ইত্যাদি অঞ্চল থেকে। এই সংকলনটি নানা কারণেই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শেখ ভানুর ২০টি গান ছাড়াও লালন শাহ, পাগলা কানাই, গোঁসাই গোপাল, মেছের শাহ ইত্যাদি রচিত ৬৪৬টি গান সংকলিত হয়েছে। এছাড়াও 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'হারামণি' বিভাগে ১৩২২ থেকে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রকাশিত ১৫টি গান ও সেগুলির সংকলকের নামও প্রদত্ত হয়েছে। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রস্তুত ২টি বাউল গানের স্বরলিপিও এই খণ্ডটির গুরুত্বকে বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও আছে লালন সঙ্গীতের সূচীপত্র, লোক অধ্যাত্ম সাধনা, লোক বিজ্ঞান, ইসলাম ও ইতিহাস, বাউলের ধর্ম, বাংলাদেশের লোকসংগীত, রাজশাহী জেলা ও রংপুর জেলার বিবাহের গান, লালন শাহ সম্পর্কিত তথ্যবহুল আলোচনা, লোক সংগীত সংগ্রহ আন্দোলন, লোক সংগীতের প্রভাব—ইত্যাদি বিষয়ে লেখকের সুচিন্তিত আলোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ অভিমত। বস্তুত বাংলা লোক সাহিত্য চর্চায়—রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পুষ্ট মনসুর-উদ্দীন সাহেব একটি স্মরণীয় নাম। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে

তিনি আজও পরিণত বয়সেও লোক সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ ও তার আলোচনায় সমান ভাবে সক্রিয় আছেন। পরিশেষে আচার্য স্থনীতি কুমারের মন্তব্যটি উদ্ধার করে বলা যেতে পারে : 'হারামণির একটি বৈশিষ্ট্য, ইহা শুধু লোক সাহিত্যের নহে, বাঙ্গালা দেশের হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে বঙ্গভাষী জনগণের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধির একটি রত্নভাণ্ডার। হিন্দু [ব্রাহ্মণ্য, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, জৈন, লৌকিক বর্ণ আচার অনুষ্ঠান] ও মুসলমান [কুরানের উপর আধারিত পৌঢ় পরিপূর্ণ একেশ্বরবাদ পীর, মুরিদী বা গুরু শিষ্য পরম্পরা, যোগ কলন্দর, গ্রাম—দেবতাদের মুসলমান রূপ] ভাবধারাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর বৈষ্ণব, বাউল, মারফতী সমাজের নানা অনুষ্ঠানমূলক প্রেমমূলক প্রভৃতি সর্বন্ধর জীবনের কবিতাময় প্রকাশের একটি "সংহিতা পুস্তক" বলিয়া মনস্থরউদ্দীন সাহেবের আট খণ্ডে প্রকাশিত এই "হারামণি" সংকলনকে এক খানি মহাগ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ..."হারামণি" বাঙ্গালা সাহিত্যের ও ভারতীয় সাহিত্যের এক অমূল্য নিধি এবং লোক গান বা Folklore আলোচনার ক্ষেত্রে বিশ্ব সাহিত্যেও এ বিষয়ে 'হারামণি'র একটি বিশেষ স্থান আছে।' [৮]

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে 'পল্লীশিল্প' নামক নিবন্ধে জসীমউদ্দীন পল্লীর শিল্পকলা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধটিতেই লেখক বিক্রমপুর জেলাস্থিত মুসলমানদের গাজীর পট দেখিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘোরার কথা বলতে গিয়ে যে গানটি গেয়ে এই পট বাড়ি বাড়ি দেখান হ'ত তা উদ্ধৃত করেছেন :—

পেরথমেতে দেখেন কর্ত্তা ঠাকুর জগন্নাথ
রাম লক্ষ্মণ নয়া হনু লঙ্কা চইলা যায়।
রাবণ আইস্যা যোগীর বেশে সীতা হরণ করে
শূর্পনখার নাক যেমন লক্ষ্মণ ঠাকুর কাটে।
কামরতি বামন দেখেন ছিন্নমস্তা কালী

তার পরেতে দেখেন কর্তা ময়ূরপঙ্খী নাও।
গাজীর ভাই কালু আইল নিশান ধরিয়া
গাজীর আছে একটা বাঘ নাম যে খান্দিয়া
ঘর দুয়ার ডুলিয়া বাঘে মানুষ লইয়া যায়।
চুল নাই বুইড়া বিটি খোপার লাইগা কান্দে
কচুপাতা টিপলা দিয়া খোপা ডাঙর করে।
সুন্দর বুইনা বাঘ ছিল আড়ে আড়ে চায়।
তারা বুইনা বাঘ যেমন সেলাম জানায়।
পালের প্রধান বড় আবালটা বাঘে লইয়া যায়।
সাত সের চাইলের পিঠা খাইল বুড়ি কাঁথা মুড়ি দিয়া।
দাঁতটিং দাঁতটিং বইলা বুড়ি জামাই বাড়ি যায়।
গোটা দুই তিন কিল দিল বুড়ির আসরে পাসরে
গোটা চার পাঁচ কিল নিল বুড়ির গুষ্টার উপরে
নন্দ ঘোষের বাপ আইল হুক্কা হাতে লইয়া
দুই বাঘের এক মাথা ধরিছে যুগান।

বাংলা লোক সংগীত ও লোক শিল্প সংগ্রহে একটি স্মরণীয় নাম গুরুসদয় দত্ত, আই. সি. এস। বাংলার ব্রতচারী আন্দোলনের পুরোধা গুরুসদয় দত্ত ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ—এই তিন বছর বীরভূমের কালেক্টর পদে আসীন ছিলেন। এই সময়েই তিনি বীরভূম জেলার পটুয়াদের কাছ থেকে বেশ কিছু পট গীতি সংগ্রহ করেন এবং পরবর্তীকালে সেগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। গুরুসদয় দত্ত সংগৃহীত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'পটুয়া সঙ্গীত' [১৯৩৯] সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বর্তমান সংকলকের লোক সাহিত্য ও শিল্প প্রেম সম্বন্ধে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যেতে পারে।

বীরভূমে কালেক্টরের পদে যোগদানের পূর্বে গুরুসদয় মৈমনসিংহ জেলার কালেক্টর পদে আসীন ছিলেন। সময় ১৯২৯ সাল।

এই সময় এখানকার প্রচলিত বাউল সঙ্গীত বাউল নৃত্য এবং জারি সঙ্গীত ও জারি নৃত্যের সংরক্ষণ ও প্রচলনের উদ্দেশ্যে তিনি 'গণ-গীতি ও গণ-নৃত্য সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করেন। বীরভূমে অবস্থানকালে লেখক যে কেবল পটুয়া সঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে সংগ্রহ করেছিলেন কাঠিনাচের গান, ঝুমুর গান। বীরভূমের রায়বেঁশে নৃত্য, কাঠিনৃত্য ও গীত ইত্যাদি তৎসহ প্রাচীর চিত্র, কাষ্ঠ-ভাস্কর্য প্রভৃতি পল্লী সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করার অভিপ্রায়ে—১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি স্থাপন করেন 'বঙ্গীয়-পল্লী-সম্পদ্-রক্ষা-সমিতি'। ১৯৩২ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট সমিতির ভবনে বাংলার আলপনা শিল্প, কাঁথাশিল্প, মৃৎশিল্প, কাষ্ঠ-ভাস্কর্য শিল্প, পটুয়াদের অঙ্কিত অনেকগুলি রঙ্গীন বহুচিত্র দীর্ঘপট ইত্যাদি লোক শিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বলা চলে এই প্রদর্শনী ছিল ভারতের শিল্প ইতিহাসে প্রথম গণশিল্প প্রদর্শনীর বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান। এই প্রদর্শনীতে তিনি বহু চিত্র দীর্ঘপটের প্রদর্শন ব্যতিরেকে পটুয়া সঙ্গীত পরিবেষণেরও ব্যবস্থা করেছিলেন এবং এইভাবে বিশেষ করে পটুয়া চিত্র ও পটুয়া সঙ্গীতের অপূর্ব্বত্ব সম্পর্কে গুণীজন ও সহরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় মনীষিরা এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত থেকে পটুয়া শিল্প ও পটুয়া সঙ্গীতের সৌন্দর্য মাধুর্যের সঙ্গে পরিচিত হন। এইবার 'পটুয়া সঙ্গীত' সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে। কিন্তু তৎপূর্বে পট ও পটুয়া সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া আবশ্যক। পৃথিবীতে বহু প্রাচীন কাল থেকেই শিল্পচর্চা হয়ে আসছে। আমাদের ভারতবর্ষও শিল্পচর্চায় কখনও পিছিয়ে থাকেনি। ভারতের সঙ্গীত, সাহিত্যের মতই শিল্পকলাও মূলতঃ অধ্যাত্ম প্রেরণা সঞ্জাত। এই শিল্পকলা পর্বত গাত্রে, গিরিগুহা কিংবা মন্দির গাত্রে যেমন

আত্মপ্রকাশ করেছে, তেমনি পটও শিল্প প্রকাশের মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 'পট' শব্দটির মূল অর্থ বস্ত্র। কিন্তু পরবর্তীকালে বস্ত্রের উপর লিখিত চিত্র 'পট' নামে পরিচিতি লাভ করে আর—যারা এই চিত্রকলায় নিযুক্ত তারা অভিহিত হয় পটুয়া নামে। ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকেই যে পটচিত্রের প্রচলন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়—প্রাচীন গ্রন্থাদিতে। বানভট্টের 'হর্ষচরিতে' বিশাখাদত্তের 'মুদ্রারাক্ষসে', কালিদাসের 'শকুন্তলা'য় ভবভূতির 'উত্তর রামচরিতে', রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধবে'র মত গ্রন্থাদিতে। বাংলাদেশে দুই শ্রেণীর পট প্রচলিত—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির চৌকা পট এবং দীঘল পট বা জড়ানো পট। চৌকা পট একটি চিত্র সম্বলিত, কিন্তু দীঘল পট বহু সংখ্যক চিত্র সম্বলিত। 'পটুয়া সঙ্গীত' হ'ল শেষোক্ত পটে অঙ্কিত চিত্রগুলি অবলম্বনে রচিত গান। মোটামুটি ভাবে একটি কাহিনীর বিবৃতি সূচক অনেকগুলি চিত্র দীঘল পটে থাকে। এই পটের চিত্র এবং সঙ্গীতের বিষয় বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৌরাণিক। এই সব বিষয় বস্তুর মধ্যে আছে কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, গৌরাঙ্গ লীলা, শিব পার্বতী লীলা ইত্যাদি। আমাদের দেশে লোক শিক্ষার যতগুলি মাধ্যম ছিল—যেমন কথকতা, যাত্রা ইত্যাদি; পটুয়া সঙ্গীতও এদেরই মত লোক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। আমাদের এই বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ রাম অবতার, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি পটের সঙ্গে যুক্ত যম পট ও যমপটের গানের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব গানের মূল প্রতিপাদ্য মানুষকে অন্যায় ও পাপ কার্য থেকে বিরত করা। 'কৃষ্ণলীলা' থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধার করা গেল—

> অবির পুত্র যমরাজা যম নাম ধরে
> বিনা অপরাধে যম কাউরি দণ্ড নাই করে।
> একজন বলতে তারা দুইজনে যায়—
> কেও ধরে চুলের মুষ্টি কেও ধরে গায়।

পাপী লোক হলে লোহার ডাঙ্গে বেড়ে গো
তার মস্তক ফাটায়।
ভাল জল থাকতে যে জন মন্দ জল দেয়
মৃত্যুকালে নরককুণ্ডে মুখে তার জল দেয়
ঢেঁকি পেতে যে জন লোককে ধান ভানতে না দেয়—
মৃত্যুকালে যমের দূতে ঢেঁকিতে তার মাথাতে পাহাড় দেয়
মস্তকে তার হাড়ের চিঁড়ে কুটে খায়।
আপনার পতি ছেড়ে যেজন পরপতি ভজে
খেজুর গাছে চাপি নারীর যম ডণ্ড করে।

গুরুসদয় দত্ত এই পট ও পটুয়া সঙ্গীতের বিলুপ্তির কারণ হিসাবে দায়ী করেছেন আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসারকে। তাঁর ভাষায়, "সম্প্রতি আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ও শহুরে শিক্ষার প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাহিদা এবং গুণগ্রাহিতা বাংলার গ্রাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে'—কিন্তু পটুয়া সঙ্গীত কিংবা পট শিল্পের বিলুপ্তির আর একটি কারণ হ'ল—পরবর্তীকালে অর্থোপার্জনের অঙ্গ-স্বরূপ এগুলিকে স্থূল ইন্দ্রিয়ভোগের সুলভ পণ্যে পরিণত করা। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, 'রুচিহীনতা পট চিত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।" [৯] যাইহোক, বাংলার জীবন ও সাহিত্যে পটুয়া সঙ্গীতের যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে তা অনস্বীকার্য; কারণ—"ইহা কোন অভিজাত সমাজের ভাববিলাসব্যঞ্জক সাহিত্য নয়—জাতির সাধারণ জনগণের প্রাণ যে অনাবিল ও বিলাস—কলুষ হীন ভাবধারার ও কল্পনাধারার জীবন্ত প্রবাহে ভরপুর ছিল তাহার এবং বাঙ্গালী—হিন্দুর গভীর অন্তশ্চরিত্রের ও ধর্ম বিশ্বাসের রসপূর্ণ অথচ সহজ স্বাভাবিক ও সরলতা মাখা রূপায়ন।

বৌদ্ধ পরবর্তী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলার আত্ম-সংস্কৃতির ও সভ্যতার মূল উৎসের সন্ধান এই পটগীতি বা পটুয়া সঙ্গীতগুলিতে যেরূপ সহজ, সরল, সুস্পষ্ট ও

অনাড়ম্বর ভাবে পাওয়া যায়, সেরূপ আর কোথাও—পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।' [১০]

গুরুসদয়ের 'পটুয়া সঙ্গীতে' সর্বমোট ২৯টি সঙ্গীত স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে ১২টিই শ্রীকৃষ্ণের লীলা সংক্রান্ত। এর পরই বিষয় বস্তুর প্রাধান্যের পরিপ্রেক্ষিতে রামচন্দ্র বা রামায়ণে বর্ণিত কাহিনীর স্থান। ৬টি সঙ্গীত রামায়ণ কেন্দ্রিক। এছাড়াও আছে শিবের মাছ ধরা, ভগবতীর শঙ্খ পরান পালা, ভগবতী মঙ্গল, গোপালন, গৌরাঙ্গ অবতার, জগন্নাথ ও গৌরাঙ্গের গান ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক আখ্যানে স্থান পেয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, পুতনা বধ, নন্দোৎসব বস্ত্রহরণ, ননীচুরি, দানখণ্ড, কালীয় দমন ইত্যাদি। রামায়ণ কেন্দ্রিক আখ্যানে স্থান পেয়েছে সিন্ধুবধ, শ্রীরামের বিবাহ, তাড়কা বধ, অহল্যা উদ্ধার, শ্রীরামের বনবাস ইত্যাদি।

মূলতঃ পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে রচিত হলেও পটুয়া সঙ্গীতে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর নিজস্ব জীবনযাত্রা প্রণালীই প্রতিফলিত হয়েছে। লেখকের ভাষায়, 'পটুয়া শিল্পীর বৃন্দাবন বাংলাদেশে, অযোধ্যা বাংলাদেশে, শিবের কৈলাস বাংলাদেশে, তাহার কৃষ্ণ, রাধা, গোপ - গোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙ্গালী। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বাঙ্গালী, শিব ও পার্বতীও পুরা বাঙ্গালী। বড়াই বুড়ীর ছবি বাঙ্গালী ঠাকুরমা ও দিদিমার নিখুঁত রসময় প্রতিমূর্তি।' চাষ পালা, শিবের মাছ ধরা ইত্যাদি আখ্যানগুলি এই বক্তব্যের উৎকৃষ্ট প্রমাণ।—

চারিদিকে বাঁধ বেঁধে মধ্যে রাখেন বায়
এলো জাল ফেললে ঠিকনে দিলেন খুটো
হস্তে টিপনে জল ছেঁচেন মুঠো-মুঠো।
হস্তে জল ছেঁচেন দুর্গা মুখে গীত গায়—
জলের ঝপঝপানিতে লক্ষ যোজন ধেয়।

যেখানে না পায় মৎস্য তুলে মারে বাড়ি
ভাঙ্গে না শিবের ধান্ ছিঁটে করেন গুঁড়ি।

[শিবের মাছ ধরা ; পৃঃ ১০৯]

আজ থেকে চার দশকেরও আগে পটুয়া সংগীতগুলি সঙ্কলিত হয়েছিল শুধু এজন্যই নয়, সেই সংগে পটুয়া সংগীত ও পট শিল্প সম্পর্কে গুরুসদয়ই প্রথম সুধী শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—তাই লোক সংগীত চর্চার ইতিহাসে তিনি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। পরবর্তীকালে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ওয়াকিল আহমদ ও আরও অনেকেই পটুয়া সংগীত প্রসংগে আলোচনা করেছেন। কিন্তু সকলেরই আলোচনা মূলতঃ গুরুসদয়ের সংগৃহীত তথ্যাবলী নির্ভর। 'পটুয়া সংগীতে'র প্রথমাংশে সংযোজিত বিস্তৃত 'পরিচায়িকা' অংশটি পাঠককে এই প্রাচীন সংগীত ও শিল্পকলার নানাদিক সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা গঠনে সহায়তা করে স্বীকার করতে হয়।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত 'পটুয়া সংগীত' নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায় [১৩৪৬, অগ্রহায়ণ]। আলোচনাটি গুরুসদয় দত্ত কর্তৃক সঙ্কলিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'পটুয়া সংগীত' শীর্ষক সঙ্কলন গ্রন্থটিকে লক্ষ্য করে রচিত। পটুয়া সংগীত বিশেষ ভাবে বীরভূমের নিজস্ব সম্পদ। বীরভূমের পটুয়ারা এই সংগীত গান করে জীবিকা অর্জন করত। পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত এই সংগীত লোক সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য উপাদান। বিশেষত সংগীত ও চিত্রের অসামান্য সমন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পটুয়া সংগীত এক বিরল গুরুত্বের অধিকারী। লেখক যথার্থই বলেছেন, 'সংগীত ও চিত্রকলার এরূপ অপূর্ব সমাবেশ আমরা অন্যত্র পাইনা' [পৃঃ ২৩১]।

নৃতত্ত্বের দিক দিয়েও পটুয়া সংগীতের এক বিশেষ ভূমিকা

অনস্বীকার্য—তা হ'ল এর অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। লেখকের ভাষায়, 'এই চিত্রকরেরা সংস্কৃতি হিসাবে হিন্দু এবং ধর্মে মুসলমান। ইহাদের নাম, আচার, ব্যবহার অনেকটা হিন্দুদের মত। তাহা হইলেও ইহারা মুসলমান সমাজে স্থান লাভ করিয়াছে।' প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে পটুয়া সংগীতগুলি কিন্তু সবই হিন্দু দেব দেবী বিষয়ক এবং চিত্রগুলিও তাই।

রচনাটির প্রারম্ভেই লেখক লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: 'আমাদের ইতিহাস নানা কারণে অপরিজ্ঞাত বা অল্প পরিজ্ঞাত। এই জন্য আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সমস্ত নিদর্শন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান নাগরিক জীবন হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। বহু প্রাচীনকাল হইতে বাংলার পল্লীর মধ্যেই বাঙালীর প্রাণের স্পন্দন অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। সেই জন্য আমাদের পল্লী সংগীতে, ছড়া ও রূপকথায়, ব্রত ও নৃত্যে, যাত্রা ও কবির গানে বাঙালীর সংস্কৃতির একটি অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ পাওয়া যায়' [পৃঃ ২৩১]।

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা আচার্য সুকুমার সেন 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় [১৯৫৩] 'লোক সাহিত্যে গাথা' শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রবন্ধটি 'বিচিত্র সাহিত্য' ২য় খণ্ডে স্থান লাভ করে [১৩৬৩]। লেখক লোক সাহিত্যের দুটি লক্ষণের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একটি লক্ষণকে 'জৈব' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যে অতীতের সঙ্গে বর্তমান তথা সমসাময়িকতার সংযোগ রক্ষার প্রবণতাই বিশেষ ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। লেখকের মতে এই ক্ষেত্রে "লোক সাহিত্যের ঝোঁক পড়েছে "লোক" এর উপর, "সাহিত্য"-এর উপর নয়।' উদাহরণ হিসাবে লেখক এখন

থেকে ৭৫ বৎসর পূর্বে [লেখকের ভাষায়—প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে সংগৃহীত] বাঁকুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত একটি ভাদু গানের উল্লেখ করেছেন—

ও ভাদু আমি করি লিবেদন, বিপত্তি কালেতে
ভাদু ও মধুসূদন গো।
অশোকবনে পাতের কোড়া রাম কি পাশা খেলেছে
ওগো যোগীর ভেসে রাবণ আস্যে সীতা হরে গিয়েছে।
ও ভাদু।
সীতা হরে লিলি রাবণ খুলে গায়ের আবরণ
ওগো মায়ের সত্য পালতে হবে চোদ্দ বছর যাওরে বন।
ও ভাদু।
রাম লক্ষ্মী যাবি রে বনে মায়ে ফেলে বল না
আমার মা দুখিনী ওভাগিনী এল কুঞ্জে রবে না।
ও ভাদু।
রাম ছেড়েছে যজ্ঞের ঘোড়া অশোকবনের কাঁদড়ে
আবার লব কুশ ধরেছে ঘোড়া সীতা বলে দাও ছায়ড়ে।
ও ভাদু।
ভায়ে বলে আন্‌ব বুন'কে ভাজে বলে কি দিব
আমি রানিগঞ্জের ঢাকাই শাড়ী বুনকে বিদায় করিব।
ও ভাদু।
রানিগঞ্জের ঢাকাই শাড়ি পরেছি আর পরব না।
তুমি গেছিলে শ্যাম ভবের বাজার বিষয় পাঁয়ে ভুল না।
ও ভাদু।
মাছ রাঁদিলাম চাকা চাকা শ্যামকে কল্লেম নিমন্তন
আমি বিরলে পাঁয়েছি শ্যামকে ছায়ড়ে দিবার নাইক মন।
ও ভাদু।

লক্ষ্য করা যায় যে উদ্ধৃত ভাদু গানটিতে রামায়ণের কাহিনী

যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি সেই সঙ্গে স্থান পেয়েছে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, এমন কি সর্বশেষে বাঙ্গালীর অতি প্রিয় মাছ রান্না করে শ্যামকে নিমন্ত্রণ করার কথাও বলা হয়েছে।

নারায়ণ চৌধুরী বিরচিত 'সঙ্গীত পরিক্রমা' গ্রন্থে [১৩৬২] 'বাংলার লোক সঙ্গীত' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সংযোজিত হয়েছে। লেখক তাঁর আলোচনায় মুখ্যতঃ লোক সংগীতের সুর সম্পর্কেই আলোকপাত করেছেন। বাংলার লোক সংগীত সম্পর্কিত প্রায় সব আলোচনাই মুখ্যতঃ গানের বাণীরূপকে আশ্রয় করেই হয়েছে। সেদিক থেকে আলোচ্য আলোচনাটি লোক সংগীতের সুর সম্পর্কিত বলে, স্বভাবতঃই একটা বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী হয়েছে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ভেদে এক এক এলাকায় এক এক ধারায় লোক সংগীতের উদ্ভব ও প্রচার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক ভাটিয়ালী, সারি ইত্যাদি গানগুলির উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উপর বাংলার লোক সংগীতের প্রভাব, লোক সংগীতের সঙ্গে নাগরিক সঙ্গীতের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়েও লেখক আলোচনা করেছেন।

নীহারকণা মুখোপাধ্যায় রচিত 'সঙ্গীত ও সাহিত্য' গ্রন্থটিতে [১৩৬৯] মূলতঃ 'ভারতীয় সংগীতের বিকাশ ও তার বিস্তৃতি, "সংগীতের বিকাশে অধ্যাত্ম প্রেরণা', বাংলার গীতিরূপের ক্রম পরিচিতি পর্যায়ে নাথ গীতিকা, চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, ঢপকীর্তন, ব্রতকথা ও পাঁচালী, আধুনিক যুগের রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সংগীত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সংগীতের বিভিন্ন ধারা পর্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সারি, জারি ও ভাটিয়ালী সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। ভাটিয়ালী তথা লোক গীতির সুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখকের মনোজ্ঞ আলোচনা সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। কারণ নিছক বিষয় সম্পর্কে

আলোচনাকে সীমিত না রেখে সুরের সম্পর্কেই লেখিকা তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। যেমন অভিজাত সংগীতে যে ক্ষেত্রে স্থায়ীর প্রথমাংশ থেকেই নির্দিষ্ট রাগটির সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ সম্ভব, সেক্ষেত্রে পল্লী সংগীতে পূর্বাঙ্গের গায়কী ভঙ্গী থেকে রাগ পরিচয় লাভ সম্ভব। লেখিকা তাই ভিন্ন ভিন্ন গানের সুর পার্থক্যকে মোটামুটি চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন—এবং তা অবশ্যই পূর্ববঙ্গের স্বর বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে—

ক। যে সব সুর 'স র ম প' এমনি ক'রে আরোহণ করে.

খ। যেগুলি 'স গ ম প' ক'রে,

গ। যেগুলি 'স র গ প' ক'রে এবং

ঘ। যে সব সুর 'স র গ ম প' এমনি করে পঞ্চম পর্যন্ত সোজাসুজি সরল ভাবে আরোহণ ক'রে যায়। লেখিকা বাংলা লোক সংগীতকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কঁসৌলী ঝিঁঝিট রাগকে আশ্রয় করতে দেখেছেন। অর্থাৎ যে ঝিঁঝিট উদারার ধৈবত পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে থাকে।

লোক সংগীতকে কেউ কেউ ব্রাত্য বা অন্ত্যজ বলে বিবেচনা করে থাকেন। কিন্তু লোক সংগীত যে মার্গ সঙ্গীতের ন্যায়ই উপযুক্ত মর্যাদার অধিকারী এবং সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী তা কোন মতেই অস্বীকার করার নয়। বর্তমান আলোচনায় লেখিকা একটু অগ্রসর হয়ে বলেছেন :

'বিশেষ কোনো একটি স্বর থেকে আরম্ভ করে, অন্যান্য বিশেষ স্বর সমূহে বিচরণ করে, একটি বিশিষ্ট নির্দিষ্ট স্বরে এসে স্থিতি হ'লে রাগের পূর্ণরূপ প্রকাশ পায়। এই রাগ প্রকাশের ধারা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে পল্লী সংগীতে। তাই সন্দেহ হয়, হয়তো বা অভিজাত সংগীত এই নিয়মটি ধার করে পেয়েছে পল্লী সংগীতের কাছেই। ...শিক্ষিত রাগ সংগীতকারগণও সর্বদা রাগ সংগীতের

নিয়মানুবর্তিতা সঠিক রক্ষা করতে পারেন না, কিন্তু পল্লী সংগীত-কারগণ আজও সে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করে আসছেন।'

'সপ্তর্ষি' পত্রিকার অষ্টম বর্ষের [মাঘ-চৈত্র, ১৩৭১] সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ অধিকারী 'উত্তর বঙ্গের লোক সাহিত্য' শীর্ষক দীর্ঘ নিবন্ধে উত্তরবঙ্গের প্রচলিত লোক সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় দান প্রসংগে এখনকার প্রবাদ, ধাঁধা প্রভৃতির সংগে লোক সংগীত বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। বর্তমান নিবন্ধে লোক সাহিত্যের অপরাপর বিভাগের তুলনায় সংগীত বিষয়ক আলোচনাই বিস্তৃততর স্থান অধিকার করেছে।

লেখকের আলোচিত গানগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে ভাওয়াইয়া গান, চটকা গান, মাহুত বন্ধুর গান, মইষাল বন্ধুর গান, দেহ তত্ত্বের গান, মনোশিক্ষার গান, কুষাণ গান, মনসাদেবীর পালার গান, সোনারায় ঠাকুরের গান, হুদুমদেও পূজা ও তার গান, বিবাহ উপলক্ষে রচিত গান।

লেখক 'ভাওয়াইয়া' শব্দের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করে বলেছেন, 'ভাব শব্দটি থেকে ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ভাব+ইয়া প্রত্যয় যোগে ভাবিয়া, তার থেকে হয়েছে ভাওয়াইয়া। অর্থাৎ যে গানের সুর এবং বিষয়বস্তু অন্তরকে দোলা দেয়, ভাবিয়ে তোলে।'

কিন্তু 'ভাওয়াইয়া' শব্দটির উৎপত্তি বেশ বিতর্কমূলক। কারো কারো মতে কোচবিহার, দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের বাউদিয়া সম্প্রদায়ের নামানুযায়ীই শব্দটির উৎপত্তি। বাউদিয়া হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় শ্রেণীর মানুষ নিয়ে গঠিত এক যাযাবর সম্প্রদায় আর এই সম্প্রদায়েরই গান হল ভাওয়াইয়া। যাই হোক উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে এই গানই জনপ্রিয়তার বিচারে অন্য সকল গানের শীর্ষে। গল্পের মধ্যে যেমন ট্রাজিক রসই শ্রেষ্ঠ, তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও বিষাদান্ত সঙ্গীতের আকর্ষণ পাঠক চিত্তে প্রবল বলেই প্রতিভাত

হয়—'Our sweetest Songs are those that tell of saddest thought'। বাংলার সীমিত সংখ্যক বিষাদান্ত লোক সংগীতের মধ্যে ভাওয়াইয়া অন্যতম। ভাওয়াইয়া গানের মূল ভাব নৈরাশ্য, বিচ্ছেদ জনিত বেদনা ও অতৃপ্তিজনিত দীর্ঘশ্বাস। সমালোচকের ভাষায়, 'ইহার মধ্য দিয়া প্রধানতঃ প্রেমস্পর্শ কাতর নারীমনের প্রচ্ছন্ন বেদনার ভাবই অভিব্যক্তি লাভ করিয়া থাকে। ইহার প্রধান সুর বিরহ কিংবা অতৃপ্তির যে মর্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই ইহাকে এক অনবদ্য বেদনা-মধুর রস রূপ দিয়াছে।'

ভাওয়াইয়াকে আমরা আঞ্চলিক সংগীত রূপে অভিহিত করতে পারি, কিন্তু মূলতঃ তা যে প্রেম সংগীত তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। লেখক কর্তৃক সংগৃহীত ভাওয়াইয়া গান এখানে উদ্ধার করে দেওয়া হ'ল—

আই মুঞ্‌ঞ দুস্‌কের কথা কার বা আগে কঙ্‌
শুইয়া থাকোং একলারে ঘরে
ফুলের মশারী টানাইয়ারে,
আই মোর স্বামী নাই বগলে।
তোর রসিয়ার দোতরার ডাঙে
ঘড়ে না রয় দেহটারে
বালিস ভিজিয়া যায় দুই নয়নের জলেরে
আই মুঞ্‌ঞ দুস্‌কের কথা কার বা আগে কঙ্‌।

উল্লেখযোগ্য, ভাওয়াইয়া প্রেম সংগীত হওয়া সত্ত্বেও রাধা কৃষ্ণের প্রসংগ এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেনি। কথায় বলে 'কানু ছাড়া গীত নেই', সেই কানুর প্রসংগ উত্থাপিত হবার সুবর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ভাওয়াইয়া গানে রাধা-কৃষ্ণের বিষয়কে সযত্নে পরিহার করে যাওয়া হয়েছে। আর তার ফলে এই গানের অকৃত্রিম মানবিক আবেদন বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে।

কুচবিহার এবং গোয়ালপাড়া অঞ্চলে হাতি এবং হাতির মাহুতকে কেন্দ্র করে ভাওয়াইয়া সুরে গীত হয় এক প্রকার গান, যা 'মাহুত বন্ধুর গান' বলে পরিচিত, লেখক সেই গানের বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। আলোকপাত করেছেন জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত 'মইষাল বন্ধুর গান' বিষয়েও। উভয় প্রকার সংগীতের বিষয়বস্তু মূলতঃ এক, প্রকাশভংগির মধ্যেও রয়েছে যথেষ্ট সাদৃশ্য। নাটকীয় কথোপকথনের ফলে এই শ্রেণীর গান গুলির এক বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। লেখক সংগৃহীত একটি মইষাল বন্ধুর গান উদ্ধৃত করা গেল—

কইন্যা ঃ

ও কি মইষাল বন্ধুরে
বক্না মইষের দুধ ধরি
যান মইষাল আমার বাড়ী
খায়া আইসেন নবীন বাটার পান
খায়া ছ্যাখেন মইষাল ক্যামোন মজা পান।
মইষ চড়ান ওরে মইষাল কোন বা ঝাড়ের মাঝে ?

মইষাল ঃ

মইষ চড়াই ওহে কইন্যা ঘাটের উজানে
ঘাঁটির ডাঙ কি নাই শোনেন কানে ?
মইষ চড়াই ওহে কইন্যা শান বান্দা ঘাটে।

কইন্যা ঃ

তোর মইষালের এমনি মায়া
বুজাইতে না মানে দেহা
তোমার সনে মইষাল কেমনে হবে দেখা।
মাকালের ফলরে যেমন
মোর নারীর যৈবন তেমন
বটবৃক্ষের ছায়া যেমন

মোর নারীর যৈবন তেমন
ওকি মইষাল বন্ধুরে।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তভূমি যে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভৌগোলিক দিক দিয়েই স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী তা নয়, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এতদঞ্চল নিজস্ব এক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অধ্যক্ষ ডঃ সুধীর কুমার করণ তাঁর 'সীমান্তবাংলার লোকযান' [১৩৭১] গ্রন্থটিতে পুরুলিয়া জেলাকে কেন্দ্রভূমি রূপে গ্রহণ করে এখানকার আঞ্চলিক পরিমণ্ডলের লোকসংস্কৃতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। লেখকের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আছে নানা ধরণের পর্ব-পার্বণ, সাহিত্য-সংগীত, আচার-আচরণ ইত্যাদি।

সমগ্র গ্রন্থটি আদি-মধ্য ও অন্ত্য-এই তিনটি পর্বে বিভক্ত। আদি পর্বে লেখক বিস্তৃত পরিসরে সীমান্তবাঙলার পরিচয় দান করেছেন। মধ্যপর্বে ঝাঁপান, করম, ঈদ, ভাদু, বাঁধনাপরব, টুসু ইত্যাদি পর্ব-পার্বণ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। অন্ত্যপর্বে মূলতঃ ঝুমুর গানের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য এছাড়াও লেখক সাঁওতালী সংগীত, সীমান্তবাঙলার নৃত্যগীত, সীমান্তবাঙলার আদিম বিশ্বাস, গ্রামদেবতা, লোককথা ইত্যাদি বিষয়েও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সবশেষে বেশ কিছু ঝুমুর ভাদু, বাঁধনা পরবের গান, টুসুগান, বিবাহসংগীত ও সাঁওতালী সংগীত সংকলন করেছেন।

কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে রাঢ় অঞ্চলের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গরু বা ভগবতী পূজার যে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তাই পরিচিত 'বাঁধনা পরব' নামে। এই পরবে আনুষ্ঠানিক ভাবে গো-মাতার পূজার্চনা করা হয়, আর হয় নৃত্য-গীতাদির অনুষ্ঠান। উত্তর মানভূম এবং হাজারীবাগ সীমান্তের খোট্টা বাংলায় রচিত এবং লেখক সংগৃহীত একটি জা'গান গান যা বাঁধনা পরবে গীত হয় উদ্ধৃত করা হ'ল—

জাগো মা লছুমনি জাগো মা ভগবতী
আজি ত অমাবস্যা রাতি
জাগেকা প্রতিফল দিবে গো মহাদেবে
পাঁচপুতায় দশ ধেনু গাইরে। [১ সংখ্যক/পৃঃ ৩৩৮]

এই গানটিরই অনুরূপ আর একটি গান উদ্ধার করা গেল যেটি পুরুলিয়া জেলার কুইলাপাল থেকে বর্তমান লেখকের সংগৃহীত।

জাগো মা লক্ষ্মী জাগো মা ভগবতী
জাগে তো অমাবস্যার রাত
জাগেকা প্রতিফল দেবী গো ময়লান
পাঁচপুতা দশ ধেনু গায়রে।

'সীমান্তবাঙ্‌লার লোকযানে' মোট ৩০টি ভাদুগান সংকলিত হয়েছে। কথায় বলে 'কানু ছাড়া গীত নাই'—অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণের সুদূরপ্রসারী প্রভাব আমাদের গানেও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও যে নেই তা নয়। রামায়ণের প্রভাবও বাংলার লোকসংগীতের এক বিরাট অংশে লক্ষ্য করা যাবে। দু'টি ভাদুগান উদ্ধার করা হ'ল যে দুটি গানে 'রামায়ণের' প্রভাব পড়েছে—

ক। মাথায় জটা ত্রিশূলকাঁটা পর রাম গাছের বাকল।
রাম সাজেছেন বনে যাতে বাকল করে ঝলমল॥
[১৭ সংখ্যক/পৃঃ ৩৩৫]

খ। রামের মা কৌশল্যা রাণী লক্ষ্মণের মা সুমিত্রা।
দুই বহিনে বনে যায়েঁ ঘুরাই আনবে রামসীতা॥
[১৮ সংখ্যক/ "]

লেখক তাঁর গ্রন্থে ৫০টি টুসুগান সংকলন করেছেন। সচরাচর ভনিতাযুক্ত টুসুগান পাওয়া যায় না। কিন্তু লেখক এইরকম একটি ভনিতাযুক্ত টুসুগান সংকলন করেছেন—

কাক ডাকে কোকিল ডাকে আর ডাকে ঘুঘু সে।
দিশা হারা জোড়া পায়রা ঘুরিছে পাশে পাশে।
কোয়ের গুঁড়ুর তিতির ময়ূর ভীড় করে এসে এসে
বার বাজায় জোড়া মানিক ঝরণায় জল খাতে বসে।
প্রেম শিকারী আটা বসে বারুদগুলি তার ধাসে
শরবিঁধা হরিণীর মত জর জর হয় শেষে।
জুলুম দিয়া ময়না টিয়া রাধাকৃষ্ণের নাম ঘোষে।
টুসুর গানে বিষ্ণু ভণে লেগেছে প্রণয় ফাঁসে
[সাধে মধুর মিলনের আসে—
সে তো শুকসারী ডালে বসে। ঘোষা]

[৫১ সংখ্যক গান/পৃঃ ৩৪৬]

দুর্গাপূজোর সময় ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত গীত সহযোগে এক প্রকার নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হতে দেখা যায়; এই নৃত্যানুষ্ঠান 'কাঠিনাচ' নামে পরিচিত। এতে কেবল পুরুষেরাই অংশগ্রহণ করে থাকে। অবশ্য পাতা নাচের মত এই নৃত্যে পুরুষেরা মেয়ের মত সেজে অংশ নিয়ে থাকে। কাঠিনাচ রাস উৎসবের স্মৃতি বিজড়িত। 'দক্ষিণ ভারতের কোলাট্টম রাসনৃত্যের এবং রাজস্থানের দণ্ডিয়া রাসনৃত্যের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে এই কাঠিনাচের রূপ-সাদৃশ্য আছে।' রাসনৃত্য বলেই কাঠিনাচের গানের মুখ্য বিষয় রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যান। কিন্তু মজার কথা হ'ল অনেক সময়ে এই রাসনৃত্যের গানে রাম-সীতার প্রসঙ্গও এসে গেছে। লেখক এমনই একটি গান আমাদের উপহার দিয়েছেন—এই গানটিতে সীতা সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রের বনগমন বর্ণিত হয়েছে। রাজ-কুলবধূ ও রাজকুলনন্দিনী সীতার করুণ অবস্থাই বিশেষ ভাবে গানটির বর্ণনীয় বিষয়—

রাম ভাঙেন সরু ডাল
লক্ষ্মণ ধরে শিরে গো,

তাহার ছায়াতে সীতা চলেন ধীরে ধীরে গো।
হায়—হায়······
আগে যান রামচন্দ্র পশ্চাতে যে লক্ষ্মী গো
তাহার পশ্চাতে যান লক্ষ্মণ মহামতি গো,
হায়—হায়······
উপরে সূর্যের তাপ গো তলে তাতা বালি
চলিতে না পারেন সীতা করেন বিকলি গো —
হায়, হায় · ··

'সপ্তর্ষি' পত্রিকার ১৩৭২ সনের 'লোক সাহিত্য সংখ্যায়' 'ভাদু গান' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটির রচয়িতা মানস মজুমদার। বাংলা লোক সংগীতের ক্ষেত্রে 'ভাদু গানে'র এক বিশেষ স্থান আছে। কেউ কেউ বলেন যে ভাদু গানের মূলে এক ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। ভাদু গান নাকি পঞ্চকোটের রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরীর করুণ ও বিয়োগান্তিক পরিণতি অবলম্বনেই মুখ্যতঃ সৃষ্ট। তাই বলে ভাদুগানের রস করুণ রস নয়। এবং বলা যায় যে ভাদুকে অবলম্বন করে গ্রাম বাংলার নারী সমাজের হৃদয়োচ্ছ্বাসের বিচিত্র ও অপকট প্রকাশ ঘটেছে। লেখকের এই প্রসংগে মন্তব্যটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য, 'গ্রাম-বাংলার কুমারী হৃদয়ই যেন এগুলির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। একান্ত সহজ, সরল কুণ্ঠাহীন এই আকাঙ্ক্ষার সংগে যুক্ত হয়েছে কুমারী ভদ্রেশ্বরের অতৃপ্ত জীবন ভোগের স্মৃতি।'

'ভাদু গান' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক ভাদুগানের ঐতিহাসিক পটভূমি, ভাদু গানের বিভিন্ন বিভাগ, ভাদুগানে বর্ণিত সমসাময়িক জীবন যাত্রা ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। মাঝে মাঝে লেখকের স্নিগ্ধ রসিকতা রচনাটিকে বিশেষ ভাবে উপভোগ্য করে তুলেছে। অনেকগুলি ভাদুগান উদ্ধৃত হওয়ায় পাঠকের পক্ষে ভাদুগানের বিচিত্র বিষয় সম্বন্ধে অবহিত

হওয়া যেমন সম্ভবপর হয়, তেমনি ভাছুগান রচয়িতা তথা পল্লী রমনীদের বিচিত্র মানসিকতার সংগেও পরিচয় ঘটে। ভাছুগানের মুখ্য ছুটি বিভাগ—বন্দনা ও বিদায় মূলক গীতি। বন্দনা মূলক গানগুলি একান্তভাবেই বরণ সংগীত। এই পর্যায়ের গানগুলিতে তেমন উল্লেখযোগ্য বিষয় বা ভাব-বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। নিছক প্রথানুসরণের ব্যাপার মাত্র। ভাছু গানের প্রসংগে স্বাভাবিক ভাবেই শাক্ত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত আগমনী ও বিজয়া সংগীতের কথা এসে পড়ে। কিন্তু শাক্ত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত আগমনী গান যেমন মাতৃ হৃদয়ের অন্তহীন বেদনার স্পর্শে করুণ রস মণ্ডিত ও সহজেই তা পাঠক চিত্তকে দ্রবীভূত করতে সমর্থ, তেমনটি কিন্তু ভাছুগানের আগমনী বা বন্দনামূলক গানে লক্ষ্য করা যায় না। সেখানে কল্পনা ও ভাবৈশ্বর্যের অভাব সহজেই লক্ষিত হয়। কিন্তু ভাছু বিদায় উপলক্ষে রচিত বিদায় গীতগুলি সংগত কারণেই শাক্ত পদাবলীর বিজয়া সংগীতের সংগে উপমিত হতে পারে। এগুলির প্রত্যেকটি যেন গ্রাম্য রমনীদের বেদনা মণ্ডিত হৃদয়ের সার্থক অভিব্যক্তি। টুসু, ঝুমুর প্রভৃতি অপরাপর লোক সংগীতের ক্ষেত্রে যেমন বহু বিচিত্র বিষয় ও সমসাময়িক সমাজ জীবনের প্রভাব সার্থক ভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়, আমাদের আলোচ্য ভাছু গানগুলির ক্ষেত্রেও তা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। লেখক সংকলিত গানগুলিতে সিনেমা, ক্যানেল, নয়া পয়সা, কয়লার খাদের জলতলা, মাষ্টার মশাই, কলকাতা প্রভৃতি কত বিচিত্র বিষয়ই না স্থান পেয়েছে। এই সব থেকেই বোঝা যায় যে লোক সংগীত বিশেষ করে গ্রাম্য জীবনের কেবল অবসর সময় অপনোদনের উপকরণ মাত্রই ছিল না, সেই সংগে কূপমণ্ডুক ভাগ্যাহত নিস্তরঙ্গ জীবনের অধিকারী গ্রাম্য মানুষগুলির আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের সার্থকতম মাধ্যম রূপেও এগুলি কাজ করেছে। তাই এই সব সংগীতের এক সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক ভূমিকাও রয়েছে।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয়—ভাদু গানগুলি একান্তভাবে গ্রাম্য নারী সমাজের সম্পত্তি। কারণ যাকে অবলম্বন করে এই গানগুলি রচিত তিনি যেমন একজন কুমারী, তেমনি যারা এই গানগুলির রচয়িতা তাঁরাও কুমারী বা নারী। আর তাই ভাদু গানগুলির সুরে যেমন, তেমনি বিষয় বস্তুতেও নারী কণ্ঠ ও নারী অনুভূতির রাজকীয় আধিপত্য। লেখকের প্রবন্ধে ভাদু গানের আনুপূর্বিক পরিচয় প্রদত্ত হলেও এই বিষয়টি অনালোচিত থেকে গেছে অথচ এই প্রসংগে আলোকপাত করা হলে প্রবন্ধটি স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করত।

'সপ্তর্ষি' নামক ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার ১৩৭২ সনে প্রকাশিত 'লোকসাহিত্য' সংখ্যায় শ্রীগোবিন্দ হালদার রচিত 'বাংলার লোক সংগীতে ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া' প্রবন্ধটিতে বাংলা-দেশের দুটি প্রধান লোক সঙ্গীতের সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। তবে ভাটিয়ালি পূর্ববঙ্গে প্রচলিত, অপর পক্ষে ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের প্রচলিত লোক সংগীত। অবশ্য একদিক থেকে উভয় সংগীতের সাদৃশ্য রয়েছে, সেটা হ'ল বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রে। ভাটিয়ালি এবং ভাওয়াইয়া দুইই মূলতঃ প্রেম সংগীত। তবে ভাব গভীরতা এবং সুর সৌন্দর্যে ভাটিয়ালি ভাওয়াইয়ার তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয়। সত্য কথা বলতে কি বাংলা লোক সংগীতের সাম্রাজ্যে ভাটিয়ালির হ'ল সম্রাজ্ঞীর ভূমিকা।

ভাটিয়ালি গীত হয় মাঝিদের দ্বারা। জোয়ারের টানে নৌকা যখন আপনা আপনি চলতে থাকে, মাঝিদের নৌকা চালনার জন্য আর দৈহিক কসরত করতে হয় না, তখন হালটি ধরে উদাত্ত কণ্ঠে তারা শুরু করে ভাটিয়ালি গান। তাই ভাটিয়ালি কোন ক্রমেই কর্ম সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, যদিও বিশেষ এক কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই এই সংগীত গীত হয়। আর অবসর তথা অলস সময়ের গান বলেই ভাটিয়ালি গানে তালের কোন অস্তিত্ব নেই! অথচ মজার

ব্যাপার হ'ল অধিকাংশ ভাটিয়ালি গানে নারী হৃদয়ের আকুতি অভিব্যক্ত হয়েছে। লেখক তাঁর প্রবন্ধে ভাটিয়ালি গানের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই বিশদ আলোচনা করেছেন, আলোকপাত করেছেন এই গানের বিষয়-বৈচিত্র্য, গানের উৎস ভূমি, 'ভাটিয়ালি'র ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়ে।

'ভাওয়াইয়া' সম্পর্কেও লেখকের আলোচনা যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ, তা সহজেই প্রতীয়মান হন। এক্ষেত্রেও লেখক ভাওয়াইয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি, এই গানের সুর বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণ রীতি ও ভাষা, গানের বিষয়, এই প্রকার সংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তবে লেখক যদি তাঁর আলোচনায় তাত্ত্বিক দিকের সঙ্গে কিছু কিছু নিদর্শনের উল্লেখ করতেন, তাহলে আলোচনাটি আরও সার্থক ও উপভোগ্য হ'ত বলা চলে। ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়ার তুলনামূলক আলোচনাও আর একটু বিস্তৃত পরিসরে স্থান পাওয়া উচিত ছিল। ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়ার তুলনামূলক আলোচনা প্রসংগে লেখক মন্তব্য করেছেন ঃ 'গায়কীর দিক দিয়ে ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে অনেকটা মিল আছে। তবে ভাটিয়ালির সুর সম্পূর্ণ এক টানা, কিন্তু ভাওয়াইয়া গানের সুর ভাটিয়ালির ন্যায় টানা হলেও গাইবার পদ্ধতি কিছুটা স্বতন্ত্র। ভাওয়াইয়া গানে মাঝে মাঝে গলাটাকে ভেঙে থমকিয়ে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ ভাওয়াইয়া গানের সুরের দিক দিয়ে এতে ভাটিয়ালি ও পাহাড়ী অধিবাসীদের গাইবার রীতির সম্মিলিত প্রভাবই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।'

বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমৃদ্ধতম হ'ল বাংলার লোক সংগীত। বিষয় ও সুর বৈচিত্র্যে আমাদের লোক সঙ্গীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোক সঙ্গীতের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বের অধিকারী হতে সমর্থ হয়েছে। সঙ্গীত-প্রাণ বাঙ্গালীর

এটা গর্বের কারণ। শুধু যে বিষয় ও সুর বৈচিত্র্যে আমাদের লোক সংগীত সমৃদ্ধ তাই নয়। অন্যান্য বিভাগের উপকরণের তুলনায় লোক সংগীত সংগ্রহ ও সেই সম্পর্কিত আলোচনার পরিমাণও অনেক বেশি।

বাংলা লোক সাহিত্যের আলোচনা ও গবেষণায় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের এক বিশেষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্যান্য বিভাগের মত বাংলা লোক সংগীত সংগ্রহ ও আলোচনাতেও তাঁর অবদান বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটিতে [১৩৭২] 'গীত ও নৃত্য' সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলা লোক সংগীতের সর্ব প্রথম বৃহৎ সংগ্রহ। ইতিপূর্বে যে বাংলা লোক সংগীত সংগৃহীত অথবা সেই সম্পর্কে আলোচনা হয়নি এমন নয়, তবে সে সব আলোচনা ছিল বিশেষ ভাবে আঞ্চলিক লোক সংগীতের। ডঃ ভট্টাচার্যই প্রথম বাংলা লোক সংগীতের বিভিন্ন প্রকার নিদর্শন একত্রে সঙ্কলিত করেছেন। আর এই জন্যে আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলা লোক সংগীতের বহুল বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে পাঠকের একটা সামগ্রিক ধারণা সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়ক।

গ্রন্থটি সর্বমোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বাংলা দেশের আঞ্চলিক সংগীতগুলি—যেমন পটুয়ার গান. ভাদু গান, টুসু গান, জাওয়া গান, পাতানাচ, ভাদুরিয়া, করম নাচ, সাখী গান, বাঁধনা পরবের গান, গম্ভীরা গান, ভাওয়াইয়া, জাগ গান, আলকাপ, ভাটিয়ালি ইত্যাদি স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে ব্যবহারিক সংগীত বা Functional Song। মূলতঃ এই পর্যায়ে-বিবাহের গান ও সেই সম্পর্কিত আলোচনাই স্থান পেয়েছে। জলভরা, বর সাজানো. হলুদ কোটা, কামানো, নান্দীমুখ, বর বরণ, বধূ বরণ, বাসর, হোম, দধিমঙ্গল, বাসি বিবাহ, কন্যা বিদায়, যাত্রা মঙ্গল, দ্বিরা

গমন ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে রচিত সংগীত এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে আনুষ্ঠানিক সংগীত ও সেই সম্পর্কিত আলোচনা। Calendric Song বা আনুষ্ঠানিক সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পার্বণ সঙ্গীত, মনসা পূজার গান, জন্মাষ্টমী, দুর্গা পূজা, কালীপূজা, রামলীলা ঘেঁটু পূজা, শীতলা পূজা, গাজন, নীলপূজা, হোলী, ভাইফোঁটা ইত্যাদির গান।

চতুর্থ অধ্যায়টি প্রেম সংগীতের আলোচনা ও সঙ্কলনে ব্যয়িত হয়েছে। কর্ম সংগীত স্থান পেয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। নৌকা বাইচ, চাষ, ছাত পেটান, ধান ভাঙ্গা ইত্যাদি উপলক্ষে যে সব গান গীত হয়ে থাকে সেগুলিই এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়টিতে ঘটনামূলক সংগীতের সঙ্কলন ও আলোচনা স্থান পেয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে পুরাণের গান, ধামালী, ব্যবসায়ীর গান, কুষাণ গান, বান্দুটি গান, রঙ পাঁচালী, ঝাঁপান গান, পুতুল নাচের গান ইত্যাদি 'বিবিধ সংগীত' বিষয়ক আলোচনা স্থান লাভ করেছে।

আর সব শেষে অষ্টম অধ্যায়ে লেখক লোক-নৃত্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—ব্রত নৃত্য, যুদ্ধ নৃত্য, গাজন নৃত্য, মুখোস নৃত্য, পুতুল নাচ, বউ নাচ, ধামালী নৃত্য, মাদার নৃত্য, সঙ-এর নৃত্য, ঐন্দ্রজালিক নৃত্য, বাঘ নাচ, ঘোড়া নাচ ইত্যাদি।

'বাংলার পল্লীগীতি' গ্রন্থখানি সুপরিচিত লোক-সাহিত্য সংগ্রাহক ও আলোচক চিত্তরঞ্জন দেব লিখিত। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থখানির নামকরণ থেকেই সহজে প্রতিভাত হয় যে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রকার লোক সংগীত। তবে এই বাংলা দেশ বলতে রাজনৈতিক দিক থেকে বিভক্ত যে বাংলা দেশ, সেই বাংলা দেশ নয়। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে যে বাংলা দেশের ঐক্য আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং অনুভব

করি সেই বাংলাদেশের। অবশ্য লেখক যেহেতু বছর বারো আগে 'পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ' গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন, যে গ্রন্থে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত শিবাষ্টক, জারি, ভাটিয়ালী, কবি, ঢপ, বাউল, পাঁচালী, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণী গান ইত্যাদি সঙ্কলিত হয়েছে, সেই কারণে স্বভাবতঃই মনে হতে পারে যে আলোচ্য গ্রন্থে পূর্ববঙ্গকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তা কিন্তু নয়। এই প্রসঙ্গে লেখকের উক্তিটি উদ্ধার করা যেতে পারে—'সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্ব বা পশ্চিম বলে কিছু থাকতে পারেনা। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সবটা মিলেই বাংলা সংস্কৃতির পূর্ণরূপ। কাজেই এই সংগ্রহের মধ্যে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের মতো পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিত্ব মূলক গানও স্থান পেয়েছে—বৃক্ষের বৃহত্তম অংশকে বাদ দিয়ে ক্ষুদ্রতম অংশকে ধরলে গাছের পূর্ণাঙ্গ রূপ কল্পনা করা যায় না।'

আলোচ্য গ্রন্থটি সর্বমোট পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে গম্ভীরা, গমীরা, গাজন, নীল, মেছনীর গান, হুদুমা, মেঘারাণীর ব্রত ও গান, ঝুমুর, জারি, ঝাপান ও ভাসান, ভাদু গান ও পরব, টুসুগান, গারাম ঠাকুরের গান, বিয়ের গান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক স্বয়ং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পর্যটন করে ক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন সংগীত ও সেই সম্পর্কিত উৎসব কলার বিবরণ সংগ্রহ করেছেন বলে সংগৃহীত গান ও সেই সব গানের উপলক্ষ্য বিভিন্ন পূজা ও উৎসব সম্পর্কে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়েছে। সচরাচর লোকসংগীত সংকলনগুলিতে আলোচনার তুলনায় সংগৃহীত গানের প্রাচুর্যই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থটিতে দুইই সমান সমান স্থান অধিকার করেছে। এই সমতা রক্ষিত হবার ফলে সংকলিত গানগুলি প্রসঙ্গেই শুধু নয়, সেই সঙ্গে ঐ শ্রেণীর সংগীত সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা করার অনুকূল সুযোগ ঘটে। লেখক আলোচনা করেছেন বিশেষ বিশেষ সংগীতের

উপলক্ষ্য, উৎসবানুষ্ঠানের সময়, উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ, সর্বোপরি সংকলিত গানগুলির ভাববস্তু বিশ্লেষণতো আছেই।

প্রথম খণ্ডে যেমন লৌকিক ধর্ম উৎসব ও অনুষ্ঠান এবং সেইসব সম্পর্কিত গান স্থান পেয়েছে, দ্বিতীয় খণ্ডে তেমনি আবার প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু সম্বলিত গানগুলি স্থান পেয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে ভাওয়াইয়া, চট্‌কা, সারি ও ভাটিয়ালী, বারমাস্যা ও বিচ্ছেদী গান, ধানকাটার গান ইত্যাদি। তৃতীয় খণ্ডটিতে স্থান পেয়েছে বাউল, কীর্ত্তন এবং বৈষ্ণবের গান। চতুর্থ খণ্ডটিতে দেশাত্ম-বোধক ও স্বদেশী গান, গাজীর গান, বরাতীর গান, হোলির গান, রাখালিয়া গান, জাগের গান ইত্যাদি সাময়িক গীতিগুলি স্থান পেয়েছে। আর সর্বশেষে পঞ্চম খণ্ডে ছড়া, প্রবাদ এবং ধাঁধা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পরিশিষ্টে বাংলার লোক-বাদ্য, বাংলার লোক-নৃত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং সংকলিত বিভিন্ন গানের কঠিন আঞ্চলিক শব্দগুলির পরিভাষাও প্রদত্ত হয়েছে। গানের দেশ বাংলাদেশ। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সঙ্গীত যেমন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় তেমনি রচিতও হয়েছে অসংখ্য লোকসংগীত। বিষয়বস্তু ও সুরে তাদের বৈচিত্র্য বাস্তবিকই বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারেনা। তাই প্রচলিত সমস্ত লোকসংগীত সম্পর্কে আলোচনা করা যেমন কঠিন, তেমনি এই গ্রন্থে তার অবকাশও ছিল কম, তবু মোটামুটিভাবে পরিচিত লোকসংগীতগুলি সম্পর্কে লেখকের বিস্তৃত আলোচনা বাংলার লোকসংগীত সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে যে বিশেষভাবে সহায়ক, ততে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। আমরা পূর্বেই বাংলা লোকসংগীতের বৈচিত্র্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। তবু পূর্ববঙ্গে ভাটিয়ালী সুরের প্রাধান্য যেমন অন্য সব সুরকে প্রভাবিত করেছে, পশ্চিমবঙ্গে তেমনি আধিপত্য ঝুমুর ও বাউল গানের। অবশ্য উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া সব প্রভাব থেকে মুক্ত এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে

সমুজ্জল। তেমনি উত্তর বঙ্গের অন্যান্য গানেও ভাওয়াইয়া গানের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। লেখক তাঁর আলোচনায় এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

লোক সংগীত পল্লী বাংলার মানুষের নিছক অবসর সময় অপনোদনের উপকরণ মাত্রই নয়। এই সংগীত তাদের ধর্মীয় তথা প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। লেখক তাঁর আলোচনায় এই বিশেষ দিকটির প্রতি আদ্যন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে-ছিলেন। তাই তাঁকে মন্তব্য করতে দেখা গেছে, 'বাংলার লোক-কবির দল একদিকে যেমনি দেব-দেবীর বন্দনা গেয়েছে, তেমনি আবার এইসব দেব দেবীর কাহিনীর অন্তরালেই তাদের মনের কথা, অভাব অভিযোগের কথাও ব্যক্ত করেছে কখনও সুকৌশলে, কখনও বা স্পষ্ট ভাবে। তারা এই গানের মাধ্যমেই প্রতিকার চেয়েছে দেশের অভাব—অভিযোগের। এই লোক কবির দল কোথাও স্বর্গের দেবতাকে তাঁদের আসনচ্যুত করে মর্ত্যের বাসিন্দা রূপে দেখায়নি বা মর্ত্যের মানুষকেও স্বর্গের দেবতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেনি। তারা তাদের কাব্য গাথায় যে দেব-দেবীর কথা গেয়েছে তারা হল এদেরই ঘরের লোক—তাদের কথাই বর্ণনা করেছে। ফলতঃ এইসব দেব-দেবীই হউক বা যে কোনো গানেই হউক প্রত্যেকটির ভিতরই প্রচ্ছন্নভাবে উঁকি মারছে এই কৃষাণ ঘরের ছবি।'

বাংলা লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং প্রসারে যাঁদের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, গুরুসদয় দত্ত তাঁদেরই অন্যতম। বাংলার ব্রতচারী আন্দোলনের পুরোধা গুরুসদয় দত্ত দীর্ঘদিন পূর্বেই নীরবে যে বিরাট অবদান রেখে গেছেন বাংলার লোক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে, বিশেষত লোকসাহিত্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণে, তা এতকাল পরেও আজকের লোকসংস্কৃতিবিদ্ কিংবা লোকসংস্কৃতির গবেষককে অনুপ্রাণিত না করে পারেনা। আমরা বিশেষ করে

এই প্রসঙ্গে শ্রীহট্ট থেকে তাঁর সংগৃহীত গানগুলির উল্লেখ করতে চাই। ১৯৩৯ সনে তিনি শ্রীহট্ট থেকে ৪২৩টি গান সংগ্রহ করে প্রকাশের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে দিয়েছিলেন। প্রথমাবস্থায় এই লোকসঙ্গীতের সংকলনটির নাম ছিল 'শ্রীহট্টের গণগীত'। পরবর্তীকালে প্রস্তাবিত এই নামটির পরিবর্তে 'শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত' নামকরণ করা হয় এবং ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিকের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় দীর্ঘকাল পরে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে।

গুরুসদয় দত্ত লোকসঙ্গীত সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক রীতিটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন সম্যকভাবে। তাই এই গানগুলির সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন।

'..I have now had them recorded in exactly the same dialect in which they are sung, which I need hardly say, is the most important Consideration in the genuineness of folk songs.'

যাইহোক, গানগুলি সংগ্রহ করা ছাড়া এগুলির শ্রেণীবিন্যাস বা এতদ্সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কোন আলোচনা তিনি করেন নি। অবশ্য তিনি প্রস্তাবিত গ্রন্থটির ভূমিকা লিখবেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন, তাতেই গানগুলি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আলোচনা স্থান পাবে, এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—

'...I shall undertake to...contribute a suitable introduction explaining the nature and scope of the collection.' কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ভূমিকা তাঁর পক্ষে লিখে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর সেই অসম্পূর্ণ কৃত্য ন্যস্ত হয়েছে ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিকের ওপর। এবং প্রথমেই স্বীকার করতে হয় যে ডঃ ভৌমিক সেই কৃত্য অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উপযুক্ত যোগ্যতার সঙ্গেই সম্পন্ন করেছেন। সম্পাদক যদিও 'নিবেদন' অংশে বলেছেন,

'বইখানিতে শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীতের সকল দিক আলোচিত বা উদাহৃত হয় নাই।' —তথাপি গ্রন্থটিকে একটি আদর্শ লোক-সংগীতের সংকলনের মর্যাদা দিতে হয়।

এইবার গ্রন্থটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে। বর্ত্তমান সংকলনে সর্বমোট ৩৮০টি সংগীত স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ গুরুসদয় দত্তের পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত ৪৩টি গান পরিত্যক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে যে অনাবশ্যক বিবেচনায় এই ৪৩টি গান পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কি কারণে এই 'অনাবশ্যক' বিবেচিত হয়েছে, তার কোন সূত্র উল্লিখিত হয়নি। লোকসাহিত্যের সমস্ত উপাদানই যে যথার্থ রসমণ্ডিত কিংবা সাহিত্যিক গুণ সম্পন্নতা হয়ত নয়। কিন্তু বিলীয়মান এই মহান সম্পদের সমস্ত উপাদানেরই এক বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, তাই সংগৃহীত সমস্ত সংগীত সংকলনটিতে স্থান পেলে উপযুক্ত, হ'ত। কারণ পরিত্যক্ত গানগুলি ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। অতএব সেগুলি বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হবার আশঙ্কা সমধিক।

গ্রন্থটি তিনটি অংশে বিভক্ত—ভূমিকা, সংগ্রহ এবং পরিশিষ্ট। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডস্থিত সমগ্র প্রথম অধ্যায়টি ভূমিকাতে ব্যয়িত হয়েছে। বাস্তবিক সুদীর্ঘ ২২৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী গ্রন্থটির ভূমিকাংশ গ্রন্থটির এক অসামান্য সম্পদ। এই অংশে সম্পাদকের বিরল শ্রমশীলতা ও বাংলা লোকসাহিত্য ও সংগীত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় পরিস্ফুট। সম্পাদক ভূমিকার প্রথমেই শ্রীহট্ট ও তার পরিবেশ সম্পর্কে আনুপূর্বিক আলোচনা লিপিবদ্ধ করে শ্রীহট্টের ভৌগোলিক অবস্থান, এখানকার বিভিন্ন অধিবাসীদের পরিচয়, উৎপন্ন দ্রব্য, এখানকার মানুষের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বা শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ হেতু বৈষ্ণবীয় ভাবধারা প্রভাবের ব্যাপকতা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার ভক্তিসাহিত্য ও লোকসাহিত্যের উদ্ভব,

এখানকার 'সিলেট নাগরী' নামক হরফের উদ্ভব এবং এই হরফের বৈশিষ্ট্য ; মুসলমানগণ কর্তৃক শ্রীহট্ট বিজয়, বাংলা সংস্কৃতি বিশেষত লোক-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের অবদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত লেখক শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শ্রীহট্টের গীতিসাহিত্য ও লোকসঙ্গীতের সমৃদ্ধির মূলে এখানকার বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়েছে। এখানকার পাহাড়, পর্বত, অরণ্য, প্রান্তর, নদী ইত্যাদি একদিকে যেমন শ্রীহট্টের প্রাকৃতিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে, তেমনিই এই সব উপাদান এখানকার লোক সংগীতে বহুল পরিমাণে উল্লিখিত হতে দেখা গেছে। উল্লিখিত হতে দেখা গেছে নৌকা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত আমদানী-রপ্তানীর প্রসঙ্গ। কারণ একদা শ্রীহট্ট যেমন নৌ-শিল্পে যথেষ্ট উন্নত ছিল, তেমনি আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যে শ্রীহট্টের ছিল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। বিপরীত ক্রমে চা এবং কমলালেবু শ্রীহট্টের দুই বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্য হওয়া সত্ত্বেও এই দুটি বস্তুর কথা এখানকার লোক সংগীতে উল্লেখযোগ্য ভাবে অনুপস্থিত থেকে গেছে। এমন কি এতদঞ্চলের পশু পাখী ইতর শ্রেণীর প্রাণীর কথাও এখানে প্রাপ্ত লোক সংগীতে অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সব কবির গান গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে এমন ৯৬ জনের নাম এবং তাঁদের রচিত যে সব গান সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে সেই সব গানের সংখ্যা স্থান পেয়েছে। স্থান পেয়েছে কিছু সংখ্যক কবির ব্যক্তি পরিচয়ও। সঙ্কলনে ৫৯টি ভাটিয়াল গান, ১৪টি রাগ গান, ৩৮টি ধামাইল, ৯টি সারি গান, ১৯টি বিবাহ গীতি স্থান পেয়েছে এবং এ ছাড়াও বাউল ইত্যাদি গানও বেশ কিছু সঙ্কলিত হয়েছে। ভূমিকাংশে সম্পাদক, এই সব গানের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়দ্বয় ব্যয়িত হয়েছে যথাক্রমে সঙ্কলিত গানগুলির 'রচনা ভঙ্গী' এবং 'ভাষা পরিচয় প্রসঙ্গে।' 'রচনা ভঙ্গী'তে লোক সংগীতের আটটি বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে বর্ণিত হয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল—ধুয়া, পুনরাবৃত্তি [সমার্থক, বিপরীতার্থক ইত্যাদি] শৃঙ্খলামূলক বর্ণনা, বর্ণনা ভঙ্গির বিশেষণ, অর্থহীন পদ দ্বারা পংক্তির পাদপূরণ, একই গানের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গী, কতকগুলি ব্যাকরণগত বিশেষত্ব যেমন—স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির কাব্যিক বিকৃতি, কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের কাব্যিক রূপ, শব্দদ্বৈত ও অনুকার ধ্বনির বিচিত্র ও ব্যাপক ব্যবহার, পদাশ্রিত নির্দেশকরূপে-গুলি,-খিনি,-গেছি ইত্যাদির ব্যবহার, দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ প্রকাশে ৬টি এবং বিপরীতক্রমে ৬টি বিভক্তির অর্থ প্রকাশে ২য়া বিভক্তির ব্যবহার, কয়েকটি অনুসর্গের কাব্যিক প্রয়োগ, বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণের ব্যাপক ও বিচিত্র প্রয়োগ, বিশিষ্ট কাব্যিক বাগ্-ধারার প্রয়োগ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহ আলোচিত হয়েছে। বলাবাহুল্য এই বৈশিষ্ট্যগুলি সঙ্কলিত গানগুলি অবলম্বনে বর্ণিত হলেও, এগুলি সাধারণভাবে সকল শ্রেণীর লোক সংগীতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিশেষতঃ বাংলা লোক সংগীতের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান এই আলোচনাতেই বিধৃত রয়েছে। 'ভাষা পরিচয়' অংশে শ্রীহট্টের উপভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পাদক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অবশ্য এই আলোচনা প্রকৃতিতে বর্ণনামূলক। এখানকার উপভাষার তুলনামূলক আলোচনা কিংবা শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে কোন আলোচনা স্থান পায়নি।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় [বর্তমানে যা দুর্লভ] বিভিন্ন সময়ে যে সব লোক সঙ্গীত প্রকাশিত হয়েছিল এবং তা অবশ্যই শ্রীহট্টের, সঙ্কলিত হয়েছে। ইদানীং কেউ কেউ লোক সংগীতের কিছু কিছু স্বরলিপি প্রকাশে সক্রিয় ভূমিকা

নিলেও প্রখ্যাত লোক সংগীত বিশেষজ্ঞ হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'শ্রীহট্টের লোক সঙ্গীতের সুর বিচার' নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটির সংযোজন একদিকে গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধির যেমন অন্যতম কারণ, তেমনি স্বরলিপি সহ লোক সংগীতের সুরের পরিচয় দানের প্রয়াসও এই প্রথম।

'জনসেবক সাপ্তাহিকী'তে 'লোক বাংলা ও ভাদু গান' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—১লা আশ্বিন, ১৩৭৩ সালে। প্রবন্ধটির রচয়িতা মানস মজুমদার। বাংলা দেশের বৈচিত্র্যময় লোক সঙ্গীতের রাজ্যে ভাদু যে কেবল পরিচিত গান তাই নয়, অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং লোক কবিদের [মহিলা কবি] রচিত ভাদুগানের সংখ্যাও সীমাহীন। ভাদুগান, পল্লী বাংলার মানুষের কাছে ভাদু পূজার অপরিহার্য উপকরণ। প্রাণের ঠাকুরকে ভক্ত যেমন কুসুমাঞ্জলি উপহার দেয়, তেমনি ভাদুরাণী অর্চিত হন কুসুম রূপ ভাদুগানে। ভাদুগানের উপলক্ষ্য যদিও ভাদু, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব উপলক্ষ্যকে অতিক্রম করে গেছে পল্লী বাংলার মহিলা কবিদের ব্যক্তিগত ধ্যান, ধারণা, আশা আশাক্ষার কথা। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক ভাদু গানের সঙ্গে যুক্ত প্রচলিত কিংবদন্তী সহ মোট ৭টি পর্যায়ে ভাদু গানের বিষয় বৈচিত্র্য উপস্থিত করেছেন।

ভাদুর প্রসাধন বিষয়ক গানগুলিতে অনূঢ়া ভাদুর প্রসাধন বাসনার বিচিত্র অভিব্যক্তির মাধ্যমে গ্রাম বাংলার কুমারী হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা কিভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে লেখক কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে সেই বিষয়টিকে প্রকাশ করেছেন। যেমন একটি গানে ভাদুর বিচিত্র অলঙ্কার পরিধানের বাসনা প্রকাশিত হয়েছে—

ভাদু তোর লেগে রোদন করে
রাজা যমুনার তীরে।
কি কি গয়না লিবি ভাদু

বলনা আমারে ॥
আমি পায়ে লোবো পায়ের
তোড়া সাজবো বাহারে।
কি কি শাড়ী লিবি ভাদু
বলনা আমারে ॥
আমি সবুজ পেড়ো শাড়ি
লোবো সাজবো বাহারে।
আরও কি গয়না লিবিরে ভাদু
বলনা আমারে ॥
নাকে লোবো নথের টানা
সাজবো বাহারে ॥
ভাদু তোর লেগে……

অসংখ্য ভাদু গানে কলকাতা এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। পল্লী বাংলার মানুষের কলকাতা সম্পর্কে বিচিত্র কৌতূহল এই সব গানে ধরা পড়েছে। অবশ্য কেবল কৌতূহলই নয়, কোন কোন গানে আবার কলকাতা সম্পর্কে বিরূপ মানসিকতার প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়। লেখক এই রকম একটি গান আমাদের উপহার দিয়েছেন। গানটিতে কলকাতার লবণাক্ত জল সম্পর্কে কটাক্ষ করা হয়েছে—

ও ভাদু আমার ছোট ছেলা গো
বাছায় কে পাঠালে কলকাতা।
কলকাতার ঐ লোনা জলে
ভাদু হল শ্যামলতা ॥

দীর্ঘ প্রবন্ধটির একেবারে শেষ পর্যায়ে ভাদুর বিদায় গীতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ভাদুকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিদায় দিলেও মানসপটে গোপনে তার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের আর্তি প্রকাশিত হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে—

লুকিয়ে তোমায় রাখবো ভাদু
আমার বুকের মাঝে।
মনে মনে করবো পূজো
সকাল আর সাঁঝে॥
হাতে তোমার সোনার বালা
গলায় তোমার মুক্তামালা।
ফুলে তোমায় সাজিয়ে দোবো
বনফুলের সাজে॥
নাইবা যদি তোমার মাথায়
দেবদাসীরা চামর ঢুলায়॥
ক্ষতি কি তাই শঙ্খ ঘণ্টা
নাই বা যদি বাজে
লুকিয়ে তোমায়......

পুলকেন্দু সিংহ 'মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সংগীত ও সাহিত্য' গ্রন্থটিতে [১ম খণ্ড/১৩৭৩] মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত কীর্তন গান বাউল গান, রামায়ণ গান ইত্যাদি বিভিন্ন অধ্যাত্ম সংগীত সম্পর্কে যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনি সেই সঙ্গে এতদঞ্চলে প্রচলিত গান, বোলান গান, গাজন গান, জারি গান, ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন এখানকার আঞ্চলিক সংগীতে প্রকাশিত লোক জীবন ও সমাজ চিত্রের প্রতিফলন বিষয়ে। 'মুর্শিদাবাদের ভাঁদুই গান' শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক মুর্শিদাবাদ জেলার মুন্নুটি, দোহালিয়া, উদয় চাঁদপুর, কামারমনি, সাবলদহ, রাইহাট, ছোট কাপসা, কালিকাপুর উপলাই, পারুলিয়া, তেল পুন্দি, পাঁচথুপী ইত্যাদি অঞ্চলে প্রচলিত ভাদুগান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন। লেখক ভাদু উৎসবকে 'কৃষি উৎসব' বলে অভিহিত করেছেন। লেখকের ভাষায়, 'বৃষ্টির রসে পরিপুষ্ট হয়ে বীজে অঙ্কুরোদ্গমের সূচনা হয়

—তারই ফলে আগামী দিনে নতুন সোনালী ফসলের প্রত্যাশার গান ভাঁতুই গান। আবার কুমারী কন্যার হৃদয়ে যৌবনের রস সঞ্চারে যে বিচিত্র স্বপ্নের অঙ্কুরোদ্গম হয়—তারই আগামী ফলশ্রুতি ঘর বাঁধবার আদিম আকুতি প্রকৃতির সঙ্গে মানবী জীবনের আত্মিক সংগতি ভাতু গানের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে।" একথা ঠিক যে ভাদ্র মাস আউশ ধান তোলার সময়। এছাড়া এই সময় ধান রোয়া ও পোঁতার কাজও হয়ে যায়। সর্বত্র দেখা যায় সবুজ ধানের চারা। তবু ভাতু উৎসবকে ঠিক লেখক যে অর্থে 'কৃষি উৎসব' বলেছেন, সেই অর্থে 'কৃষি উৎসব' বলে অভিহিত করা যায় কিনা সেটা বিতর্কের বিষয়। সকলেই অবশ্য আদিবাসীদের 'করম' উৎসবের সঙ্গে ভাতু উৎসবের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। এমন কি ভাতু গানের ওপর করম উৎসবের প্রচুর প্রভাবের কথাও কেউ কেউ বলেছেন।

তবে ভাতু উৎসবের মূলে যে একটা ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তা প্রায় এখন সকলেই স্বীকার করে থাকেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি হল—মানভূম জেলার পঞ্চকোটের রাজধানী কালীপুরে রাজা নীলমণি সিংহদেবের একটি কন্যা হয়েছিল—কন্যার নাম ভদ্রেশ্বরী। ভদ্রেশ্বরী ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী। এই ভদ্রেশ্বরীর অনূঢ়া অবস্থায় মৃত্যু হয়। স্বভাবতই এই দুর্ঘটনায় রাজা নীলমণি সিংহ অত্যন্ত আঘাত পান। তিনি তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় কন্যার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে নির্দেশ দিলেন সমগ্র রাজ্যে উৎসবের আয়োজন করতে। এই ভাবেই ভাতু উৎসবের সূচনা, আর রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরীই ভাতু দেবীতে রূপান্তরিত। ক্রমে ভাতু উৎসব পঞ্চকোট থেকে বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম ইত্যাদি নানা অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়। ভাদ্র মাসের প্রথম দিন ভাতুর মৃন্ময়ী মূর্তি গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে শুরু হয় গানের মাধ্যমে তার অর্চনা। তারপর ভাদ্র সংক্রান্তিতে ভাতু মূর্তির বিসর্জন। টুসুগানের

অনুসরণেই ভাদু গান সাধারণত গীত হয়ে থাকে। আর এই উৎসবে অংশ গ্রহণকারীরা সকলেই কুমারী মেয়ে। কারণ ভদ্রেশ্বরী ছিলেন যে অনূঢ়া কন্যা। ভাদুগান বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত। বিশেষ ভাবে এই গানের মধ্য দিয়ে কুমারী হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষাই মূর্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়। গানের বিষয় বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য যেমন আগমনী, বিজয়া, ভাদুমূর্তির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আক্রমণাত্মক সঙ্গীতও রচিত ও গীত হয়ে থাকে।

লেখক মুর্শিদাবাদে প্রচলিত বেশ কয়েকটি ভাদুগান প্রকাশ করেছেন। এগুলির মধ্যে আছে নিজেদের ভাদু মূর্তির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এবং অপরের মূর্তির নিন্দাসূচক গান—

ভাঁদুই লো সুন্দরী মাটির লো সরা
কাল ভাঁদুইকে নিয়ে যাব নদীর গাবা
ও পাড়ার ভাঁদুই গুলো গরুতে খেয়ে লেয়—
আমাদের ভাঁদুই সোনার বরণ পায়।

এছাড়া ভাদুর বিয়ে, ভাদুর পথ পরিক্রমা, ভাদুকে আমন্ত্রণ জানান, ধূপদান উপলক্ষে রচিত কয়েকটি গানও প্রকাশিত হয়েছে।

‘মুর্শিদাবাদের বোলান গান’ শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক বীরভূম, বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদের দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত বাংলাদেশের এক উল্লেখযোগ্য লোক সংগীত ‘বোলান’ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বোলান গান গীত হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে শিব পূজা উপলক্ষে। লেখক মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বোলান গান গীত হবার উপলক্ষ্য বর্ণনা করে বলেছেন, ‘রাঢ় মুর্শিদাবাদের কান্দী অঞ্চলে রুদ্রদেব বুদ্ধমূর্তি শিব, গ্রাম-দেবতা ইত্যাদি দেবতাকে কেন্দ্র করে সারা চৈত্র মাস ধরে ভক্তবৃন্দ ধর্ম্মীয় নিয়ম-কানুন পালন করেন, তাকে ‘বত্’ করা বলে। সাধারণতঃ দিনের বেলায় ভক্তেরা ফলাহার করেন। গাজনের পূজোয় তারা ব্রত সাঙ্গ করেন। ধনী-নির্দ্ধন, অন্ত্যজ-উচ্চবর্ণ

নির্ব্বিশেষে সকলেই এই ব্রত করতে পারেন। তাই গ্রামে গাম্য দেবতাকে কেন্দ্র করে এই সময় বিরাট উৎসাহ দেখা যায়। গ্রামের প্রতি পাড়াতে সন্ধ্যের পর থেকেই বোলান গানের মহড়া চলে অধিক রাত্রি পর্যন্ত।' বোলান গানের বিষয় বস্তু পৌরাণিক ; রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি থেকেই সংগৃহীত হয়। বোলান গান আসলে স্বল্পায়তন বিশিষ্ট পালাগান। এর প্রতিটি পালাই কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ। পালাগুলি হ'ল যেমন—সীতার বনবাস, দুর্বাশার অভিশাপ, বিশ্বামিত্র মুনির ধ্যান ভঙ্গ, দাতাকর্ণ পালা, দক্ষযজ্ঞ পালা ইত্যাদি। অনেক সময় পালাগুলি সংলাপ যুক্তও হতে দেখা যায়। গীত হয় লৌকিক সুরে। সঙ্গে ব্যবহৃত হয় মাদল, মন্দিরা, বাঁশি ইত্যাদি। বোলান গানের অংশ গ্রহণকারীরা সকলেই পুরুষ। এদেরই মধ্যে এক বা একাধিক নারী বেশ ধারণ করে। বোলান গান নৃত্য সম্বলিত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বোলান গানের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—'ইহা দীর্ঘ গীতি কাহিনী বলিয়া ইহাতে প্রারম্ভেই একটি বন্দনা গীত হয়, তাহা গণেশ কিংবা সরস্বতী উভয়েরই হইতে পারে।' কিন্তু শুধু গণেশ বা সরস্বতীই নয়, বন্দনা গীতে শিবও স্থান পান। আর এই স্থান পাওয়াটা স্বাভাবিক, যেহেতু বোলান গান চৈত্র সংক্রান্তিতে শিব পূজা উপলক্ষ্যে রচিত ও গীত হয়। আবার কালীও স্থান পান বন্দনা গীতে। লেখক এরকম একাধিক বন্দনা গান সঙ্কলন করেছেন—

ক। আমরা সবে ভক্তি ভাবে, প্রণাম করি শিবে।
ভবভোলা তোমার খেলা কি বুঝিবে জীবে,
নিজ গুণে ভক্তিহীনে মুক্তি দিতে হবে
পতিত পাবন নামটি তোমার তবে জানা যাবে।

কিংবা,

খ। শঙ্করে সঙ্গে লয়ে এস মা সংকড়ি [শঙ্করী]
অধম কুমারে কৃপা কর ক্ষেমঙ্করি [ক্ষেমঙ্করী]

লেখক 'রুক্মিনীর বিবাহ পালা' উদ্ধৃত করেছেন।

বোলান গান পুরাণ কাহিনী ভিত্তিক হলেও এতে সমসাময়িক জীবনের উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন ঘটে। অনেক সময় পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্র স্থানীয় লৌকিক কাহিনী ও চরিত্রের দ্বারাও প্রভাবিত হয়। লেখক সঙ্কলিত পালাটি থেকে সমসাময়িক জীবন বোধের কিছু চিত্র উদ্ধার করা গেল—

ক। নাপিত ডেকে চুলকে ছাঁট, টেরী কাটো।
হে নরপতি, সম্রাট ধুতি, শীঘ্রগতি কটিতে আঁটো॥

খ। কপাল ভাল হবে তোমার বিয়োগে,
৭০ [সত্তর] টাকার জামা পরো গায়েগে॥
সিল্কের চাদর ভারি—
তার কদর স্টকিং জুতো পায়ে গো॥

গ। ভাল করে চুল বেঁধেছে, ফুল দিয়ে,
তখন সে আরো বড় মেয়ে।
কাল চুলে চিরুণী পড়েছে রুক্মিণী,
শ্যামিজ শোভিছে রাঙ্গা গায়ে।

'মুর্শিদাবাদ জেলার জারিগান' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক কারবালা যুদ্ধের করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত বাংলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য লোক সংগীত 'জারিগান' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আলোকপাত করেছেন এই গানের বিষয়বস্তু, গায়নপদ্ধতি, লোক সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হবার যৌক্তিকতা, এই গানে সমসাময়িক সমাজ জীবনের প্রতিফলন, এই শ্রেণীর গানে বিদেশী শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে। পরিশেষে লেখক সঙ্কলিত মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় অঞ্চলের জারি গানের অংশ বিশেষ উদ্ধার করা গেল—

শ্রীহকনাম
ফুল ছুরাতের জারির জের—
বয় কত জননী এই খবর পাইয়া—

আল্লার দরবারে তখন খাড়া হবেন জাইয়া
মহর নামা তখন বিবি ডাড়িয়া কান্দিবেন
দোজখে পড়েছে জত উন্মত গুণাগার
উম্মতে খালাষ দেহ পরয়ার দেগার
জখন ফতেমা বিবি কান্দিবেন কাটিবেন
তখন মহর নামা আল্লাজি পড়িবেন
জিদ্দা দিয়া রছুলুল্লা জখন থাকিবেন
খালাষ না হলে উম্মত না তুলিবেন
দোজখের কামে জত ফেরেস্তারা রবে
সকলকে ডাকিয়া আল্লা এই কথা কবে
ফতেমার মহরের কারণ এই হুকুম হল
ফতেমার খাতিরে উম্মত খালাষ হইল
রছুলের আবেদারি জে কেহ করিবে
পিরিতি আর ভয় করে জে চলিবে
বাপ বেটি দুইজনে কান্দিবেন কাটিবেন
তবে তো উম্মতের গুণা মাফ হয়ে জাবেন
যে জন নবীর শাতে পিরিতি রাখিবে
নবিকে দেখিয়া সে জন কান্দিয়া উঠিবে
নবিজির কদম ভুলে জগতে যে রবে
কোথুনি দোজখ হোতে খালাষ না পাবে
মমিন বান্দার কাছে কওছর লইয়া
কওছরের পানিতে ভাইরে গা ধুবেন জাইয়া
কওছরের পানিতে জখন গোছল করিবে
সেই তো উম্মতের বরন চান্দ সুরজ হবে
আল্লাহ বল ভাই জত মমিনগণ
ফুলুছরাত্তের জারি খানি হইল খতুম
আমি অধুম গুণাগার জারির কিবা জানি

দশের সভাতে গাই গোলাম মওলার বানি
কিয়ামতের জারি ভাই কহিলাম আমি
গুণা খাতা মাফ করিবেন পরওয়ার দিগার তুমি
ফুলুছরাতের জারি সমাধা

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সঙ্কলিত 'বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর' বাংলা লোক-সঙ্গীতের কোষ গ্রন্থ [Encyclopaedia of Bengali Folk Songs] গ্রন্থটি মোট ৪টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে। এই খণ্ডে অ থেকে ছ পর্যন্ত আদ্য-অক্ষর বিশিষ্ট সঙ্গীতগুলি স্থান পেয়েছে। যেমন অষ্টক, অষ্টমাসী, আখড়াই, আগমনী, আলকাপ, উমাসঙ্গীত, ওঝার গান, করম সঙ্গীত, গাজনের গান, গাজীর গান, গোষ্ঠের গান, ঘরের গান, চটকা গান, ছো নাচের গান ইত্যাদি। সঙ্কলিত মোট গানের সংখ্যা—১০৫৩।

বঙ্গীয় লোক সঙ্গীত রত্নাকরের দ্বিতীয় খণ্ডে [১৩৭৩] স্থান পেয়েছে জ থেকে ন-আদ্য অক্ষর বিশিষ্ট গানগুলি। এই গানগুলির মধ্যে আছে জাগগান, জাওয়া গান, ঝাঁপান গান, ঠাট গান, ঠাউর গান, ঢপ কীর্তন, ঢুয়া গান, ত্রিনাথের গান, ডরাই বিষহ্রির গান, থোয়াব্রতের গান, দধিমঙ্গলের গীত, দুর্গাপূজার গান, ধর্ম পূজার গান, ধুয়া গান, নাটগীত, নামকীর্তন, নীলপূজার গান ইত্যাদি। তবে সর্বাধিক সংখ্যক গান যা এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে তা হ'ল ঝুমুর! সংখ্যার বিচারে তারপর স্থান পেয়েছে টুসু গান। ঝুমুর গানের মধ্যে যে কত বৈচিত্র্য আছে, তা আলোচ্য সঙ্কলনটি থেকে সহজেই বোঝা যায়। সম্পাদক অন্ততঃ পক্ষে ৩২ ধরণের ঝুমুর গান সংকলন করেছেন। এদের মধ্যে আছে কৃষ্ণলীলা, গৌরচন্দ্রিকা, বাল্যলীলা, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, বংশী খণ্ড, শ্রীরাধার পূর্ব-রাগ, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ, কাঠিনাচের ঝুমুর, টাঁড় ঝুমুর, সাঁওতালি ঝুমুর, ঝুমুর ভাদরিয়া, পাতা নাচের ঝুমুর, নাচনী নাচের

ঝুমুর, লৌকিক ঝুমুর ইত্যাদি। শুধু সঙ্কলিত ঝুমুর গানের সংখ্যাই হ'ল ৫৬২টি। এই খণ্ডে সঙ্কলিত মোট গানের সংখ্যা হ'ল—১২৫০।

'বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকরে'র ৩য় খণ্ডটিতে [১৩৭৪] প থেকে ব পর্যন্ত আদ্য অক্ষর যুক্ত গানগুলি স্থান পেয়েছে। এই খণ্ডে সঙ্কলিত গানগুলির মধ্যে আছে পটুয়ার গান, পার্বণ সঙ্গীত, পাতা নাচের গান, পুতুল খেলার গান, পাটকাটার গান, পাঁচালী, পুরাণের গান, প্রেম সঙ্গীত, ফকিরি গান, ফেলুয়া ভুলুয়ার গান, ফুলপট, ফল ভাসানোর গীত, বন্দনা গান, বন দুর্গার গীত, বনবিবির গান, বন্দের গান, বয়াতীর গান, বৌ-ঘরার গান, বৌ-নাচের গান, ব্যবহারিক গান ইত্যাদি। এই খণ্ডে সঙ্কলিত গানের সংখ্যা—৯৭৫।

'লোক-সঙ্গীত রত্নাকরে'র ৪র্থ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ৩য় খণ্ডটি ৪র্থ খণ্ডের পরে প্রকাশিত হয়। ৪র্থ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে 'ভ' থেকে 'হ' আদ্য অক্ষর যুক্ত বাংলার লোক সঙ্গীতগুলি। এগুলির মধ্যে আছে ভক্তিগীতি, ভক্ত্যানাচের গান, ভজন গান, ভাঁজৈর গান, ভাঁজোর গান, ভাটিয়ালি, ভাদুগান, ভাব গান, ভাসান গান, মঙ্গল গান, মাগনের গান, মাঝির গান, মাদল নাচের গান, মারফতী গান, মালসী গান, মাহুত বন্ধুর গান, মহীপালের গান, মেলার গান, মেয়েলী গীত, মৈষাল বন্ধুর গান, যাওয়া গান, যাত্রা গান, রাখালী সঙ্গীত, রামায়ণ গান, লেটো গান, শীতলা পূজার গান, সংকীর্তন, সাপুড়ের গান, সারিগান, স্বদেশী গান, হাল্দা ফাটা গান, হাপু গান, হাবুগান, চৌতিশা, ভাবের গান, বৈরাগ্যের গান ইত্যাদি। এ ছাড়াও ৭টি লোক সঙ্গীতের স্বরলিপি এবং আচার নৃত্য, ইঁদপরবের নাচ, ওঝার নাচ, করম নাচ, কাচ নৃত্য, কাঠি নৃত্য, খেমটা নাচ, গম্ভীরা নাচ, গাজন নৃত্য, ছৌ নাচ, ঘোড়া নাচ, জাওয়া নাচ,

ভাদু নাচ, ভাঁজো নৃত্য, মেয়েলী নৃত্য, রাবণ-কাটা নৃত্য, লেটো নৃত্য ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার লোক নৃত্যাদি সম্পর্কেও আলোচনা স্থান পেয়েছে। এর ফলে কৌতূহলী পাঠক লোক সঙ্গীতের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার লোক নৃত্য সম্পর্কেও জানার সুযোগ পাবেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলার লোক সঙ্গীত অনেক ক্ষেত্রেই নৃত্য সম্বলিত। তাই নৃত্য ব্যতিরেকে শুধুই সঙ্গীতের অনুষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট থেকে যায়। তাই লোক সঙ্গীতের সঙ্গে লোক নৃত্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করায় আলোচ্য বিষয় বস্তু সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। এই খণ্ডে সঙ্কলিত গানের সংখ্যা হ'ল—৬৩৫। অতএব মোট ৪টি খণ্ডে সঙ্কলিত গানের সংখ্যা হ'ল ৩৯১৩ অর্থাৎ চার সহস্রের মত। বাংলা লোক সঙ্গীতের এত বৃহৎ সঙ্কলন যেমন এর আগে প্রকাশিত হয়নি, তেমনি লোক সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে এই ৪টি খণ্ডের অপরিহার্যতাও অনস্বীকার্য।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর। কিন্তু কবি প্রতিভা যে অক্ষর জ্ঞান অথবা তথাকথিত শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল নয়, সঙ্কলিত ও বহু বিচিত্র সঙ্গীতগুলিই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তবে আগে আমাদের দেশের মানুষ যে সাধারণ শিক্ষা অর্থাৎ non formal education থেকে বঞ্চিত ছিলনা, আমাদের দেশের বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থ ও কাহিনীর সঙ্গে যে তাদের যথাযথ পরিচয় ছিল, সঙ্কলিত গানগুলি তাও প্রমাণ করে। আর একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়, তা হ'ল প্রচলিত একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে পূর্ববঙ্গই লোক সঙ্গীতের রত্ন ভাণ্ডার, সে তুলনায় পশ্চিম বঙ্গ তেমন উর্বর নয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গের মত পশ্চিমবঙ্গও লোক সঙ্গীতের যে গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার আমাদের আলোচ্য সঙ্কলন গ্রন্থগুলিই তার প্রমাণ। ডঃ ভট্টাচার্য বাস্তবিকই বাংলা লোক সঙ্গীতের কোষ গ্রন্থ রচনা করে এক মহান জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন।

বিশেষত বাংলা লোক সংগীতের গবেষক অথবা লোক সংগীত প্রেমিক মাত্র তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে একত্রে নানা শ্রেণীর বহু সংখ্যক গান সঙ্কলিত করার জন্য। অবশ্য সঙ্কলক নিজেই স্বীকার করেছেন যে সঙ্কলিত সব গান তাঁর নিজস্ব সংগৃহীত নয়। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে সব লোক সঙ্গীত প্রকাশিত হয়ে এসেছে, কোষ গ্রন্থে সে সবও স্থান পেয়েছে। তবে তাতে লেখকের গুরুত্ব হ্রাস পায় না কোন মতেই স্বীকার করতে হয়।

প্রদ্যোৎ ঘোষ রচিত 'গম্ভীরাঃ লোক সঙ্গীত ও তৎসহ একাল ও সেকাল' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে। 'গম্ভীরা' বাংলা লোক সঙ্গীতের জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। অসংখ্য গম্ভীরা গান রচিত হয়েছে পল্লী কবিদের মাধ্যমে, কিন্তু গম্ভীরা সম্পর্কে তেমন প্রয়োজনীয় আলোচনা সে তুলনায় হয়নি স্বীকার করতে হয়। অবশ্য ১৩১৯ বঙ্গাব্দে হরিদাস পালিতের 'আদ্যের গম্ভীরা' প্রকাশিত হয়েছিল। হরিদাসবাবুর গ্রন্থে প্রধানতঃ গম্ভীরা উৎসবের কথাই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু গম্ভীরা গান সম্পর্কে কোন আলোচনা সেখানে স্থান পায়নি। সেদিক দিয়ে প্রদ্যোৎ ঘোষ রচিত গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই গ্রন্থে গম্ভীরা সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি বেশ কিছু গম্ভীরা গানও সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থটিকে তাই আমরা মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথম পর্যায়ে লেখক 'গম্ভীরা' শব্দটির অর্থ, গম্ভীরা-মণ্ডপ, গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠান, গম্ভীরা-গান : সমাজ সচেতনতা, গম্ভীরা ও লোক সঙ্গীত, গম্ভীরা ও বাংলার জনশিক্ষা, গম্ভীরার ক্রমবিকাশ ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে বিস্তারিত ও যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়টি শিব বন্দনা, চার-ইয়ারী, পালা গান, খবর ইত্যাদির ক্ষুদ্র সঙ্কলনে পর্যবসিত হয়েছে। এমন কি দু'টি গানের স্বরলিপিও সন্নিবিষ্ট হয়েছে গ্রন্থের একেবারে শেষে।

শুধু দ্বিতীয় পর্যায়ের সঙ্কলনেই নয়, প্রথম পর্যায়ের অন্তর্গত গম্ভীরার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাতেও লেখক নিজের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্য বেশ কিছু গম্ভীরা গান উদ্ধৃত করেছেন।

অবিভক্ত বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চৈত্র সংক্রান্তি তিথিতে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত, মালদহে তাই রূপান্তরিত হয়েছে 'গম্ভীরা' নামে। আর সেই জন্যে গম্ভীরার গানগুলি সবই শিব কেন্দ্রিক। পূর্বে গম্ভীরার মুখ্য বিষয় ছিল উৎসব, কিন্তু বর্তমানে গান তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। গম্ভীরা উৎসবটি চারদিনের। প্রথম দিনে হয় ঘটভরা, দ্বিতীয় দিনে হয় ছোট তামাসা, তৃতীয় দিনে হয় বড় তামাসা এবং চতুর্থ দিনে হয় আহারা। বলাবাহুল্য এই চারদিনের উৎসব চৈত্র সংক্রান্তির আগেই অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন হয় চড়ক পূজা। লেখক তাঁর গ্রন্থে গম্ভীরা উৎসবের চারদিনের বিস্তারিত বিবরণ দান করেছেন।

এইবার আসা যাক গম্ভীরা গানের আলোচনায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় এই গানের নাটকীয়তার। অন্যান্য লোক সংগীতের মত গম্ভীরা নিছক সংগীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বলা চলে এই গান অভিনয় যুক্ত সংগীতানুষ্ঠান। অনেকগুলি চরিত্র এই গানে অংশ গ্রহণ করে থাকে। মূলতঃ ভক্তের চরিত্রে অবতীর্ণ ব্যক্তিই এই সংগীতানুষ্ঠানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তাকে সহায়তা করে গায়ক ও বাদকের দল। ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতেও পারে। আর থাকে মহাদেব রূপী একজন। কখনও আবার মহাদেবের সঙ্গে পার্বতী বেশেও একজন থাকে। প্রদ্যোৎবাবু গম্ভীরার মধ্যে রূপক প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ 'মহাদেব এ যুগের সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁকে দেশের নানা দুর্দশা সম্পর্কে অবহিত করা ও তার প্রতিকার করার জন্যে উক্তি প্রত্যুক্তি চলে। অন্য চরিত্রগুলির কপালে চুনের টিপ, মাথায় ও দু হাতের

কব্জিতে ছেঁড়া ন্যাকড়া বা দড়ি বাঁধা থাকে। এর অর্থ দারিদ্র্য পীড়িত জনগণ। রূপকের অর্থ—সরকারের দরবারে মানুষের ফরিয়াদ।' [পৃঃ ২৩]

গম্ভীরা গানের একটা অনুষ্ঠান কয়েকটি অংশে বিভক্ত। এই অংশগুলি হ'ল বন্দনা, ঠুংরি, চার-ইয়ারী, রিপোর্ট ইত্যাদি। গম্ভীরা গানে অংশ গ্রহণকারীরা উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত হয়ে অংশ গ্রহণ করে। গম্ভীরা গানের সঙ্গে বাজে ঢাক। বাস্তবিক নৃত্য, গীত, বাদ্য, সংলাপ ও সর্বোপরি অভিনয়ে সমৃদ্ধ গম্ভীরা বাংলা লোক সংগীতের আসরে এক বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকারী।

গম্ভীরা গান যদিও শিবকে উদ্দেশ করে রচিত ও গীত হয় কিন্তু তাই বলে অধ্যাত্ম ভাবনা গানগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেনি। বৈষ্ণব পদাবলীর মতই তাই সৃষ্টির গুণে ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপভোগ্য সামগ্রীতে পরিণত হতে পেরেছে। গম্ভীরা গান বিশেষ ভাবে সমসাময়িক ঘটনা বা বিষয় কেন্দ্রিক। তাই সমসাময়িক কালের ইতিহাস রচনায় এগুলি প্রামাণ্য উপাদানের মর্যাদা লাভের অধিকারী। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত একটি গম্ভীরা গীতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা গেল—

বুঝি ফিরিঙ্গী দল এবার ভাইরে ধোর‍্যা লিলে খাঁটা।
সিপাহী সব মিল্যা অদের কর্লে বলির পাঁঠা॥
গরু আর শুয়ারের চর্বি দিয়া কর্লে টোটা।
হিন্দু আর মোসলেমের বুকে মার‍্যা দিল খঁটা॥
জাতি ধর্ম নাই এক ফোঁটা।
পরে দুই ভায়েতে শল্লা কোর‍্যা, অদের নাড়্যাৎ মারছে সাঁটা॥
ইত্যাদি

উদ্ধৃত সঙ্গীতে 'দুই ভায়েতে' বলতে হিন্দু ও মুসলমানকে বোঝান হয়েছে। আর একটি গান উদ্ধার করা গেল, যেখানে হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রীতির কথা ঘোষিত হয়েছে ঃ

হায়রে আল্লা কি হোল, হিন্দু—মোসলেম দুই মোলো।
দেখছি জাতিয়ারী জাতিয়ারী কোর‍্যা দাঙ্গা—হাঙ্গামায় পোল॥
মোসলেম কোহছে হাম বাড়া, হিন্দু দেয় নাকো সাড়া।
ভোলা তোমার দেশে একুন ভেসে দোটানা ভাব দাড়ালো॥
ভোলা তুমি মুসলমানের আদব, হিন্দুর শিব শিব বোম্ বোম্।
হামরা দুয়োভায়ে করতুক পূজা
মানঠোং কি মজা ছিলো॥

এইবার গম্ভীরা গানে সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতনতা কিভাবে প্রতিফলিত হয় তারই উদাহরণ স্বরূপ একটি গান প্রদ্যোৎবাবুর সংগ্রহ থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। পরাধীনতার বেদনা ও স্বরাজের জন্য দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে। বিষয়বস্তু থেকেই প্রমাণিত হয় যে গানটি দেশ স্বাধীন হবার পূর্ববর্তী কালে রচিত—

স্বরাজ যদি পাই ভোলা,
খেতে দিব মানিক কলা [মর্তমান কলা],
নইলে অ্যাঁধ্যার কলা।
বানিয়া হল দেশপতি
কি বলব ভাই দেশের গতি
কাঁচ দিয়ে কাঞ্চনাদি নেয়
হাতে দিয়্যা খোলা।
কি বলব হে ভোলা নানা
বুক ফুটেও মুখ ফুটেনা
এ মুখ ফুটাও ভাতের মতো
উঠাও বণিকের ঝোলা।

পরিশেষে বলতে হয় যে গ্রন্থটিতে লেখক গম্ভীরা গানের সকল দিক এমন কি ভাষা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলেও এই গানের কবিত্ব শক্তি সম্পর্কে কিন্তু কোন আলোকপাত

করেন নি। তবে কি বুঝে নিতে হবে যে তিনি এই গানের কবিত্ব শক্তিতে বিশ্বাসী নন?

অধ্যাপক মনোরঞ্জন মাইতি রচিত 'বাংলা ও রুশ লোক সাহিত্য' [১৯৬৮] গ্রন্থটিতে মূলতঃ রাশিয়ার লোক সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে আলোচনা সন্নিবিষ্ট হলেও গ্রন্থের প্রথম দু'টি অধ্যায়ে লেখক বাংলা লোক সাহিত্যের দুই উল্লেখযোগ্য বিভাগ লোকগীতি ও গাথা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়টি ব্যয়িত হয়েছে 'বাংলা লোকগীতি' সম্পর্কিত আলোচনায়। বিস্তৃত পরিসরে লেখক বাংলা লোক সংগীতের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন। সমগ্রভাবে বাংলা লোক সংগীতকে আঞ্চলিক ও ব্যবহারিক—এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। আঞ্চলিক সংগীতের অন্তর্গত পটুয়া, ভাদু, টুসু, গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, জারি ইত্যাদি এবং ব্যবহারিক সংগীতের মধ্যে বিবাহ সংগীত, শোক-সংগীত ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন লেখক। এ ছাড়াও আনুষ্ঠানিক এবং কর্ম সংগীতেরও সামান্য কিছু পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে। অবশ্য লেখক তাঁর আলোচনায় উল্লেখযোগ্য নতুন কোন তথ্যের সংযোজন করেন নি। এমন কি তাঁর পূর্বসূরীদের সংগ্রহ থেকেই বিভিন্ন গানের উদাহরণ দিয়েছেন। বাংলা লোক সংগীত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরীর ব্যাপারে লেখকের আলোচনাটির কিছু মূল্য আছে স্বীকার করতে হয়।

লোক-সাহিত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হবার পর থেকেই লোক সাহিত্য প্রেমিক মানুষ লোক সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহের সঙ্গে লোক সঙ্গীত সঙ্কলন শুরু করে। এবং এ পর্যন্ত লোক সঙ্গীতের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সঙ্কলনও প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি সভ্যতাভিমানী শহরবাসী যারা, তারাও লোক সঙ্গীতের মাধুর্যমণ্ডিত সুর ও অকৃত্রিম কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। এইভাবে লোক সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি

পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে কিছু সুযোগ সন্ধানী শহরের নিয়ন আলো শোভিত কক্ষে বসে যেমন পল্লীসংগীত রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তেমনি অপরপক্ষে এক শ্রেণীর স্বার্থ সন্ধানী গায়ক-শিল্পী লোক সংগীতের মানকে বিকৃত করে আধুনিক জনরুচির উপযোগী করে আসর মাত্ করতে শুরু করেছেন। এই দুই শ্রেণীর মানুষই লোক সংগীতের চরম ক্ষতিকারক। প্রখ্যাত লোক সংগীত শিল্পী দিনেন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত 'পূর্ববাংলার লোক সংগীত' গ্রন্থটি [১৩৭৫] সেদিক থেকে এক উল্লেখযোগ্য প্রয়াসরূপে পরিগণিত হবে। প্রভাতী, গোষ্ঠ, বিচ্ছেদ, নিমাই সন্ন্যাস, ভাটিয়ালী, সারি, হোলী, জলভরার গান, ধামাইল, বাইত্যার গান প্রভৃতি পূর্ববাংলার বিভিন্ন পর্যায়ের গানগুলিকে মোট ষোলোটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে সাতচল্লিশটি [লেখক প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী] গান ও সেই গান গুলির প্রচলিত সুর অনুযায়ী স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি শ্রেণীর বিষয়বস্তু, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে সম্পাদক প্রথমে কিছুটা আলোকপাত করে নিয়েছেন। বাংলা লোক সংগীতের সুরসম্পদ সংরক্ষণে সম্পাদকের এই প্রয়াস বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। যদিও পূর্ববাংলার অসংখ্য লোক সংগীতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি শ্রেণীই আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তবু মোটামুটি প্রতিনিধি স্থানীয় বিভাগগুলি নির্বাচিত হওয়ায় বর্তমান সঙ্কলনটি সাধারণভাবে পূর্ব বাংলার লোক সংগীতের একটা সামগ্রিক পরিচয় দানের পক্ষে সহায়ক হয়েছে বলা চলে। প্রখ্যাত লোক সাহিত্য গবেষক ভাস্কর বসু লিখিত ভূমিকাটি গ্রন্থের মর্যাদাকে বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি করেছে। সম্পাদক তাঁর নিবেদনে পরবর্তী দুটি খণ্ডে পশ্চিম বাংলা ও উত্তর বাংলার কয়েকটি প্রচলিত গীতধারার পরিচিতি স্বরলিপি সহ প্রকাশের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। সম্পাদকের এই ভাবী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে আগে ভাগেই সাধুবাদ জানাই।

দিলীপ মুখোপাধ্যায় রচিত 'উত্তর রাঢ়ের লোক সঙ্গীত' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলার প্রাচীন জনপদের অন্যতম রাঢ় অঞ্চলের উত্তরাংশে প্রচলিত বিভিন্ন লোক সংগীত সম্পর্কেই মূলতঃ আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থটিতে। 'উত্তর রাঢ়' বলতে যে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমা এক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে, তা হ'ল —মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কান্দি মহকুমা, সাঁওতাল ভূমি সহ সমগ্র বীরভূম জেলা আর বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ। অর্থাৎ পূর্ব দিকের সীমা হ'ল ভাগীরথী নদী অপর পক্ষে দক্ষিণ দিকের সীমা রচিত হয়েছে অজয় নদীকে দিয়ে।

লেখক উত্তর রাঢ়ের লোক সংগীত সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভেই স্বীকার করে নিয়েছেন : 'উত্তর—রাঢ়ের লোক সঙ্গীতের যে বহুবিধ ধারা—সারা বছর জুড়ে বৃহত্তর গণজীবনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও সামাজিক উৎসবে বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিস্তার লাভ করেছে—তা অন্যত্র দুর্লভ না হলেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দাবীদার।'

উত্তর রাঢ়ের লোক সঙ্গীতে আদিবাসীদের প্রভাব অনেকখানি —লেখক বিশেষ ভাবে এই বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর মুখ্য কারণ নিহিত রয়েছে উত্তর রাঢ়ের ভৌগোলিক অবস্থানে। সাঁওতাল ভূমির একাংশ উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত হওয়ায় আদিবাসীদের সমাজ জীবলের সারল্য আর আত্মপ্রত্যয় একদিকে যেমন এতদঞ্চলের লোক সংগীতের ভাববস্তুতে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি অপর পক্ষে এখানকার লোক সংগীতের ভাষাতেও উপজাতিদের বিস্ময়কর অবদান রয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বীরভূম জেলার পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমাংশে নানা শ্রেণীর উপজাতির বসবাস। এরা অধিকাংশই দ্রাবিড় অথবা কোলমুণ্ডা ভাষী। উত্তর রাঢ়ের লোক সংগীতের ভাষায় তাই দ্রাবিড় এবং কোলমুণ্ডার শব্দের বিশেষ প্রাচুর্য।

গ্রন্থটি কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের স্বল্প পরিসরে লেখক আঞ্চলিক চেতনা, রূপরেখা, উৎস, কামনার কথা, পরিধি, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি শিরোনামায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথম পর্বের শেষে লেখক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের অনুসরণে বাংলা লোক সংগীতের শ্রেণী বিভাগ রচনা করেছেন।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব্বে উত্তর রাঢ়ের বিভিন্ন প্রকার লোক সংগীত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যে সব সংগীত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে আছে পটুয়া, ভাঁজো, বোলান, পোড়ো, করম পূজার গান, ভাদুগান, বিয়ের গান, আলকাপ, ঝুমুর, লেটো, হাপু ইত্যাদি। তৃতীয় পর্বে বাউল, কবিগান কীর্তন ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থের লেখকের আনন্দবাজার পত্রিকায় [রবিবাসরীয় আলোচনী] 'বাংলার লোক সংগীত বিচিত্রা' শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে রচনাটি 'সাহিত্য সমীক্ষা' নামক গ্রন্থের [১৩৭৮] অন্তর্ভুক্ত হয়। রচনাটি বিশেষ ভাবে সংবাদ পত্রে প্রকাশের উদ্দেশ্যে রচিত। তাই স্বল্প পরিসরে পশ্চিম বাংলার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ লোক সংগীতের পরিচয় স্থান পেয়েছে এই রচনাটিতে। যে সকল লোক সংগীত বিষয়ে আলোক পাত করা হয়েছে, সেগুলি হল জাগান গান, ঝাঙ্গোড়া গান, ছৌনাচের গান, পাতা নাচের গান, টুসু গান ও কাঠিনাচের গান। বিভিন্ন গানের যে সব দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা হয়েছে, সেগুলি লেখকের নিজস্ব সংগ্রহ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে অনুষ্ঠান উপলক্ষে গানগুলি গীত হয় সেই অনুষ্ঠানেরও বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। অন্যান্য লোক সংগীতগুলি পরিচিত হলেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন সমবেত ভাবে গীত হয় যে ঝাঙ্গোড়া গান তা তেমনি সকলের পরিচিত নয়, অন্যান্য লোক সংগীতের তুলনায় বেশ স্বল্প পরিচিতই বলা

চলে। তাই সচরাচর বাংলা লোক সংগীতের সঙ্কলনে এই গানের পরিচয় দেখতে পাওয়া যায় না।

'উত্তর বাংলার পল্লীগীতি' [চট্‌কা খণ্ড] ৮৩টি চট্‌কা গানের একটি সঙ্কলন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৩৮২ বঙ্গাব্দে। সম্পাদনা করেছেন হরিশ্চন্দ্র পাল। সম্পাদক গ্রামোফোন রেকর্ডে ধৃত বিভিন্ন চট্‌কা গানগুলিই স্বরলিপি সহ প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটির গুরুত্ব দ্বিবিধ কারণে—স্বরলিপি সংযোজিত হওয়ায় প্রকাশিত গানগুলি যদি কেউ শিখতে চান, তবে তা তার পক্ষে সহজসাধ্য হবে এবং বর্তমানে লোক সংগীতকে ইচ্ছাকৃত অথবা অজ্ঞতাবশতঃ বিকৃত করার যে প্রয়াস প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, স্বরলিপি থাকায় সেই বিকৃতির হাত থেকে অন্ততঃ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত গানগুলি রেহাই পাবে। দ্বিতীয়ত—একত্রে এতগুলি চট্‌কা গান সঙ্কলিত হওয়ায় চট্‌কা গানের বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কেও পাঠকের পক্ষে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করাও সম্ভব হবে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে জেনে এসেছি যে চট্‌কা গান লঘু সুর ও ভাবের গান। এ গান ভাওয়াইয়া গানেরই অংশ বিশেষ। এবং এই গানের সাহিত্যিক মূল্য তেমন কিছু নেই। পরকীয়া প্রেম ও কেচ্ছাকাহিনীই এই গানের বিষয়। তবে ক্ষিপ্র তাল ও আকর্ষণীয় বিষয়ের জন্য এই গান অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে সঙ্কলিত গানগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে বেশ কিছু চট্‌কা গান সমাজ চিত্রমূলক। ৫৬ সংখ্যক গানে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের ফলে প্রথমা পত্নীর কি করুণ অবস্থা হয় তাই বর্ণিত হয়েছে—

সতীন নিকা করি আইন্‌লে তোক্
ঝগড়া করি মাইল্লে মোক্
মোক্ সজালু ধারার তলে এঁছুর
ওরে ভাত না কাপড় ধুড়িয়া চাপড়

দয়ার দাদাক্ দিচোঙ খবর
পানিয়ামরা ছাড়িয়া না দে নাইওর।

কোনো কোনো চট্কার বিষয়বস্তু আবার কাহিনীমূলক। ৬৭ সংখ্যক গানটিতে বর্ণিত হয়েছে চুরি করার ফলে পুলিশের হাতে শাস্তি ভোগের কাহিনী—

মাইর্তে মাইর্তে করিলেক কালা ত্যোও কয় ওরে শালা
দুইজনে ধরিয়া দিলেক্ বাশ ডলাডলি।
আরে মুখ দিয়া বিড়াইল্ রক্তের সলা বাপ্ বুলি ড্যাকানু স্যালা
ডাকেয়া যে কঙ্ "বাবু মুই কচ্চোঙ্ চুরি"
মহারাজার হুকুম জারি কত চোরাক্ আইন্চে ধরি
চালান দিচে ফৌজদারি কাছারি
আরে হাকিম বাবু বিচার কৈল্লো ছয়মাস আমার ফাটক্ হইল
জেলখানাতে করিনু বসতি

কিছু কিছু গানের বিষয়বস্তু যে বিরহের ন্যায় করুণ, তারও পরিচয় পাওয়া যায় সঙ্কলনটি থেকে।

ইদানীং বাংলা লোক সঙ্গীত বিশেষত সঙ্গীত রসিকদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছে। আর তারই সুযোগ নিয়ে একদল মানুষ যথেচ্ছ ভাবে লোক সংগীতকে বিকৃত করে পরিবেষণ করে সস্তায় কিস্তিমাৎ করে চলেছেন। এমনিতেই আমাদের লোক সাহিত্য চর্চা বেশ দেরীতেই শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে লোক সংস্কৃতির এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি অবহেলিত ছিল। দেশাত্মবোধের সূত্রেই আমরা আমাদের সংস্কৃতির এই মূল্যবান উপাদানের প্রতি আকৃষ্ট হই। ইতিমধ্যেই বহু উপকরণ তাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সভ্যতার উন্নতি এবং আমোদ প্রমোদের নানাবিধ উপকরণ প্রাচুর্যে অবশিষ্ট উপাদানও ধ্বংসের মুখে চলেছে। তাই একদিকে যথা সম্ভব সত্বর অবশিষ্ট উপকরণগুলি যেমন সংগ্রহ করতে হবে, তেমনি সংগৃহীত উপাদানগুলির বিশুদ্ধতা রক্ষায় সচেষ্ট হতে

হবে। এই বিরাট দায়িত্ব দেশের সরকারের দ্বারাই সার্থক ভাবে পালিত হতে পারে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের সরকার সেই দায়িত্ব পালনে তেমন সক্রিয় নন, তাই স্বভাবতঃই লোক সংস্কৃতি প্রেমিক মানুষকেই তার সীমিত সামর্থ্যে এই দায়িত্ব পালনে অগ্রণী হতে হবে। বুদ্ধদেব রায় একজন সুপরিচিত লোক সংগীত শিল্পী। তিনি তাঁর 'লোকগীতি মঞ্জরী'তে [১৩৮৩] মুর্শিদা, গম্ভীরা, গাজন গান, ভাওয়াইয়া, জারী গান, বিয়ের গান, মেয়েলী ব্রত গান, টুসুগান, ভাদু ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের সর্বমোট ২২টি লোকগীতি সঙ্কলন করেছেন। শুধু তাই নয়, প্রতিটি গানের সঙ্গে স্বরলিপিও প্রকাশ করেছেন। গানগুলি ঢাকা, মালদহ, বর্ধমান, কুচবিহার, বিক্রমপুর, বীরভূম, পুরুলিয়া, রাজশাহী ইত্যাদি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। স্বরলিপি সহ গানগুলি সংকলিত হওয়ায় এই সব গানের যথার্থ সুর রক্ষিত হ'ল। লেখক প্রথমেই 'সঙ্গীত পরিচিতি' অংশে সঙ্কলিত গানগুলির উপলক্ষ্য, ভাববস্তু এবং কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই সব গান প্রচলিত সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধদেব বাবুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যত অধিক সংখ্যক লোক-সংগীতে অভিজ্ঞ শিল্পী বাংলার অসংখ্য লোক সংগীতের স্বরলিপি প্রস্তুতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, ততই মঙ্গল। বাংলার লোক সংগীতের যথার্থ সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যটি তাহলে রক্ষিত হবে। লোক সংগীতের সাহিত্য মূল্য অপেক্ষা সাঙ্গীতিক মূল্যই যে প্রধান!

বর্তমানে যাঁরা বাংলা লোক সাহিত্য নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক মহাশয়। ডঃ ভৌমিকের উল্লেখযোগ্য গবেষণা হ'ল 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোক সঙ্গীত' [১৩৮৪]। গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। বাংলা লোক সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংগ্রহ এবং আলোচনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা আছে। 'প্রান্ত উত্তর বঙ্গের লোক সঙ্গীত' শীর্ষক বিশালায়তন গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা লোক সাহিত্য চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের আর একবার প্রমাণ দিলেন। গ্রন্থটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত—১ম খণ্ডে আলোচনা এবং ২য় খণ্ডে সংগ্রহ স্থান পেয়েছে।

জলপাইগুড়ি—রঙপুর জেলার আহেল বাসিন্দারা 'রাজবংশী' নামে খ্যাত। এই রাজবংশীদের জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে তাদেরই উপভাষায় রচিত সঙ্গীত গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়। বাংলা লোক সংগীত সম্পর্কিত এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় সব ক'টি গ্রন্থই মূলতঃ সঙ্কলন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্কলিত গানগুলির সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কেই আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু লোক সাহিত্য আলোচনা নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া একান্তভাবে আবশ্যক। নতুবা সে আলোচনা অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট থাকতে বাধ্য। বলাবাহুল্য আলোচনার এই রীতিটি সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক ও বস্তুভিত্তিক। ডঃ ভৌমিক এই বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসরণ করে প্রান্ত উত্তরবঙ্গে প্রচলিত লোক সাহিত্যের উপাদানে রাজবংশী সমাজের রীতি নীতি, সংস্কার ইত্যাদি কিভাবে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে, বিশেষ ভাবে সেই বিষয়েই আলোকপাত করেছেন। আর তার ফলেই একটি অজ্ঞাত দেশ ও সমাজের রহস্য উদঘাটিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। গ্রন্থের সুদীর্ঘ ভূমিকায় ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন :

'যাঁহারা কাব্য সরোবরের রাজহংস নন, নিতান্তই অনুসন্ধিৎসু এবং বৈজ্ঞানিক-নৃতত্ত্বে আসক্ত গদ্যময় মানুষ, তাঁহারাও এই সংগ্রহ হইতে অঞ্চল বিশেষের নৃতত্ত্ব, সমাজ, পরিবার ও গোষ্ঠীর অন্তর্জীবন সম্পর্কে বহু বিস্ময়কর উপাদান হাতের কাছেই পাইবেন ......।'

রাজবংশী সমাজে শিশুর মুখে প্রথম অন্ন তুলে দেবার অধিকারী

মামা। অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যে গান গাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে, 'ভাতছোঁয়ানি' গান ও সেগুলির আলোচনায় সে সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংযোজিত হয়েছে। এখানে বালিকাদের প্রথম রজোদর্শন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বালিকার প্রথম ঋতুমতী হওয়াকে এখানে বলে 'ফুল-ফুটানি'। লেখক এই 'ফুল-ফুটানি'র বর্ণনা ও গানের পরিচয় প্রদান করেছেন।

একটি 'ফুল ফুটানি' গান উদ্ধৃত করা হ'ল—

হায় রে বিধি,
কান্দিয়া পোহাছুঁ আতি ;
আছে তো ডালিমের ফল
খাবারে নাই মান্‌ষি ॥
চান্দের কোলে তারা য্যামন
শোভা ধরে য্যামন আতি ;
ওই রকম নারীর যৈবন
দেও প্রাণো পতি হে পতি ॥
আর কয়তকাল আখিম যৈবন
বুকের শাড়ী বান্ধিয়া ;
মাসিক চান্দের তিথি
যা'ছে গে বিতিয়া।
ফুলের মতু যা'ছে গে শুকিয়া
ডালোতে নাইরো ভমরা ॥

সমাজ ও পরিবারে বন্ধ্যা রমণীকে কি হীন অবস্থায় কালাতিপাত করতে হয় সে সম্পর্কে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অপুত্রক ও উত্তরাধিকারী হীন বিধবারা বট গাছের সঙ্গে পাকুড় গাছের বিবাহ দিয়ে থাকেন। এই রকম বট-পাকুড়ের বিবাহের গান লেখক সঙ্কলন করেছেন। দলবদ্ধভাবে রাজবংশী মেয়েরা মাঠে যায় জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে। এই সময় তারা গানও

গায়। লেখক এই রকম গানেরও নিদর্শন দিয়েছেন। প্রেম ও বিবাহের গান বিস্তৃততর অংশ অধিকার করে আছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে। এই সব গান অবলম্বনে লেখক রাজবংশী যুবক-যুবতীর প্রেমের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, কন্যাপণ প্রথা, বিবাহের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ,বিবাহের সময় যে সব আচার অনুষ্ঠান অনুসৃত হয়, গার্হস্থ্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা, ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পর্কেই আলোকপাত করেছেন।

'মড়া—খোয়া' গানের আলোচনায় রাজবংশী সমাজে মৃতদেহ সৎকারের রীতি, অশৌচের কালসীমা ও শ্রাদ্ধাদি সম্পর্কে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। অসুখ বিসুখে রাজবংশীরা এখনও শরণাপন্ন হয় ওঝার। আধুনিক বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর না করে তারা বিশ্বাস করে ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদিতে. আর এই সবের জন্য ওঝারাত আছেই। ওঝারা এছাড়াও কারো অনিষ্ট বা ইষ্ট সাধনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ওঝাদের নিয়ে রচিত ওঝালি গান এখানকার সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ লোক সংগীত। লেখক ওঝালি গান সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

বটো না পাখুড়ি গাড়িনু রে,
স্যাও পাখুড়ি মেলে পাঞ্চো ডালো রে ;
তোক, পাখুড়ি বিহায় ছ্যাছুঁ
বড়য় আশা করি'রে।
ওহো মোর পাখুড়ি রে॥
না জানোঁ মুই সাঁতার
না জানোঁ মুই পহর রে ;
না জানোঁ মুই ভুরা খিয়াইবারে রে।
ওহো মোর পাখুড়ি রে॥
ঘাটিয়ারক দিনু আনা আনা,
খেউনিয়ারক দিনু কানর সনা।

ওহো মোর পাখুড়ি রে ॥
আজি চল্ যাই, চল্ যাই,
গে বাই,
চল্ যাই পাঙ্গার নদী।
আজি পাঙ্গার নদীর দীঘল গে জঙ্গল
বাই, মুনিয়া কাটেন খড়ি ॥
খড়ি কাটিনো বেছা গে বেছি
বাই, ছাড়িমো বট—পাখিড়ি ॥

এছাড়াও স্বল্প পরিসরে লেখক প্রান্ত উত্তরবঙ্গের ছড়া—ধাঁধা ও প্রবাদের পরিচয় প্রদান করেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কয়েক শতাধিক গান সঙ্কলিত হয়েছে। বাস্তবিকই বাংলা লোক সাহিত্য বিশেষতঃ লোক সঙ্গীত চর্চার ইতিহাসে গ্রন্থটি একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী হয়ে থাকবে।

"টুসুর গানে মানভূম" [গীতিসঙ্কলন] সঙ্কলনটি পুরুলিয়া [মানভূম] থেকে প্রকাশিত। মোট ১৬টি গানের সঙ্কলন। এই সঙ্কলনটিতে সঙ্কলিত গানে বিশেষ ভাবে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত হয়েছে। মানভূম পূর্বে ছিল বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী মানুষ মানভূমকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়াসী হলে হিন্দী ভাষাভাষী মানুষ ও বিহার সরকারের সঙ্গে মানভূমে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ উপস্থিত হয়, সঙ্কলনটিতে সঙ্কলিত টুসুর গানে সেই প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'লোকসেবক সঙ্ঘে'র প্রয়াসও কোন কোন গানের বিষয় হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করা যায়—

পাটনা বিহার আইন সভায়
হিন্দী ভাষীর দল ভারী
[তাই] ভোটের জোরে ভাঙ্গছে তারা
লোক সেবকের কলগাড়ী ॥

আইন সভায় হিন্দী ভাষার
হুকুমদারী চালাতে
বাংলা ভাষা করছে দমন
মানভূমের জ্বালাতে ॥
মাতৃভাষায় প্রদেশ গঠন
গোটা দেশের নীতিরে
[পাছে] এই নীতিতে জেলা হারায়
বিহারের এই ভীতিরে ॥
মানভূমেরই মাতৃভাষা
বাংলা ভাষা চারধারে।
সেই কারণে বাংলা দমন
চালায় বিহার সরকারে ॥
হোকনা যতই পীড়ন দমন
হিন্দী রাজের অত্যাচার
লোকসেবকের অটল গাড়ী
টলবে নাকো কোনো ধার ॥
ভাষার নীতি করতে বিচার
কমিশনে ভার দিল
হিন্দী রাজের মাথায় এবার
বিষম বিপদ পড়িল ॥
বাংলা বিহার মামলা দায়ের
ভাষা ভিত্তি সেসনে
জনমতের বাজবে বিগুল
বিচারের কমিশনে ॥
চলল এবার ইঞ্জিন ঐ
পুরু আছে কয়লাজল।

[এবার] মিথ্যাচারীর টলবে আসন
মিথ্যা হবেরে বিকল ॥
ভাষা নীতির টিকিট আছে
যাবিরে আজ কোন খানে।
হওরে এবার জংশন পার
লোকসেবকের ইঙ্গিনে ॥

বাঁকুড়া [শালবনী] থেকে প্রকাশিত কালীপদ কুণ্ডু রচিত 'ভাদুসঙ্গীত' ১৯টি গানের সঙ্কলন। লোকসঙ্গীতের মধ্যে ভাদু ও টুসু গানেই সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাগুলি যেমন প্রতিফলিত হয়, তেমনটি অন্যত্র লক্ষিত হয় না। এই সঙ্কলনের অন্তর্গত একটি গানে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে—

ক। ও ঠাকুরপো সকল মাটী
ভাদু পূজায় আট পার্টি আর ছ পার্টি ॥
চৌদ্দ জনে ভাদু পূজায় হে গড়েছিলাম যুক্তফ্রণ্ট পার্টি
আজকে ফ্রণ্ট যে, ভেঙ্গে গেল, হোল ভীষণ ঝগড়া ঝাটি।
এক পার্টিতে আট জন হোল হে, ছ জন জোটে এক পার্টি।
এই আট পার্টি আর, ছ পার্টিতে, ভীষণ কথা কাটাকাটি ॥
কেমন করে হবে পূজা হে, পাছে হয় কাটাকাটি।
লম্ফ, ঝম্ফ, ভূমিকম্প—লাগে কাপড় সাটাসাটি ॥
কেহ হাতে নিয়ে ছোরা হে, কেহ হাতে নিয়ে লাঠি।
ও ঠাকুরপো দেখে শুনে লেগে গেল দাঁত কপাটি ॥

একটি ভাদুগানে আবার নকশাল উপদ্রব বর্ণিত হয়েছে—

খ। আমার ভাদুর একটি ছেলে
এমন করে কলকাতা কে পাঠালে ॥
কলকাতাতে চারিদিকে গো হচ্ছে যে বিশৃঙ্খলে,
দলে দলে হাঙ্গামা, বেঁধে ছুড়ছে ইট পাটকেলে ॥

রাস্তা ঘাটে ফুটছে বোমা কি আছে কি কপালে ॥
কি উপদ্রব করছে বলি গো, ঢুকে গিয়ে স্কুলে।
আসবাবপত্র তছনচ করে দিয়ে যে যাচ্ছে চলে ॥
পুলিস ছুটাছুটি করে গো গিয়ে ঘটনাস্থলে।
ছাড়ে কাঁদুনে গ্যাস—চালায় লাঠি, গ্রেপ্তার করে সকলে ॥

শালবনীতে ইলেকট্রিক যাওয়া উপলক্ষে একটি গানে আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে—

গ। শালবনির বাড়ল খ্যাতি।
ঘরে ঘরে জ্বলবে ইলেকট্রিক বাতি ॥
কেরোসিন কেও পোড়াবেনা যে গো নম্ফ ডিবায় প্রভৃতি।
হ্যারিকেন আর, কেও জ্বালবেনা, জ্বলবেনা হ্যাসেক বাতি ॥
শালবনীতে ইলেকট্রিক গো, হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি।
সুইচ টিপলেই, দপ করিয়ে জ্বলবে লাল নিল সবুজ বাতি ॥
কিড়িং কিড়িং বেজে উঠবে গো, ধরবে ফোন যে কানপাতি।
আপনি কে বটে, কি বলছেন আপনি,
আমি কাজে ব্যস্ত অতি ॥
তালপাতার বাতাসকেও নিবে না গো,
ফোন [ফ্যান] ঘুরবে বনবন দিবারাতি।
আরাম করে, বাতাস খাবে, যত সব নাতি পুতি ॥
রাস্তা ঘাটো চারিদিকে গো, দেখে সব আলোর জ্যোতি।
গুমুরে গুমুরে লোকের ভেঙ্গে যাবে বুকের ছাতি ॥

১. বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর [প্রথম খণ্ড] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ; পৃঃ II.
২. Verrier Elwin ; Folk Songs of Chattishgarh. P. I.
৩. Alexander. H. Krappe ; The Science of Folk-Lore ; New York, 1964 ; P 170.
৪. George Herzog ; S D F ML op. cit. P. 1037
৫. Folk Songs of Chattishgarh op., Cit. p.li.
৬. মনস্থরউদ্দীনের 'হারামণি' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রবীন্দ্রনাথের আশীর্বানী।
৭. A. Williams ; Folk-Songs of the upper Thames [London, 1913], 13 f.
৮. 'হারামণি'র ৩য় থেকে ৮ম খণ্ড স্বাধীনতা লাভের পরে প্রকাশিত। আমাদের গ্রন্থটির পরিকল্পনা অনুযায়ী এগুলির আলোচনা 'পরিশিষ্টে' সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আলোচনার সংহতির জন্য একত্রেই প্রকাশ করা হ'ল।
৯. বাংলার লোক-সংস্কৃতি ; ওয়াকিল আহমদ ; পৃঃ ৭৬
১০. পরিচায়িকা ; পটুয়া সঙ্গীত ; গুরুসদয় দত্ত ; পৃঃ II.

বাংলা গীতিকা-চর্চার ইতিহাস

বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এইবার শেষ পর্যায়ে উপনীত। এই পর্যায়ে আলোচনা করা হবে বাংলা গীতিকা-চর্চা প্রসঙ্গে। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে আলোচনা শুরুর পূর্বেই 'গীতিকা' বলতে কি বোঝায় সেই বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে। এই ধারণা করতে গিয়ে স্বভাবতঃই আমাদের পাশ্চাত্য সমালোচকদের বিভিন্ন মন্তব্যের কথা মনে পড়ে। এই সব মন্তব্যে **'ballad'**-এর বিষয় বস্তু, বর্ণনারীতি এবং অন্যান্য উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে ইংরেজী 'ballad'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে প্রথমেই 'গীতিকা' শব্দটি ব্যবহৃত হলেও দুইয়ের শ্রেণী চরিত্র কিন্তু অভিন্ন নয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত 'ballad'-এর সঙ্গে আমাদের দেশের গীতিকার উল্লেখ-যোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। যাইহোক, তবু পাশ্চাত্য দেশের 'ballad' সম্পর্কিত ধারণাগুলির পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে, কারণ এই ধারণার আলোকেই আমাদের দেশের 'গীতিকা' সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা প্রস্তুত করা সম্ভবপর হবে। Alexander Haggerty Krappe বলেছেন :

'The popular ballad is a simple narrative poem relating epic events as seen through the medium of a lyrical temperament, popular in origin or by transmission, and fitted for oral circulation' [১]

সমালোচক Gorden Hall Gerould ও প্রায় একই কথা বলেছেন 'ballad' প্রসঙ্গে—

'Defined in simplest terms, the ballad is a folk-song that tells a story, whatever may be added to this statement is by way of amplification, to explain and clarify merely, since the whole truth of the matter is in it. What we have come to call a ballad is always a narrative, is always sung to a rounded melody, and is always learned from the lips of others rather than by reading.' [২]

অতএব 'ballad' দেখা গেল আসলে লোক-সংগীত, তবে তা কাহিনীমূলক। এই কাহিনীমূলক সঙ্গীতগুলি লোক-সাহিত্যের অপরাপর উপাদানের মত লোক-মুখেই অবস্থান করে। পরিশীলিত সাহিত্যের মত 'ballad'-এর লিখিত রূপ অনুপস্থিত।

Gerould অন্যত্র 'ballad'-এর গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন—

'We may say that a compressed and centralized episode is the ordinary narrative unit, that dramatic presentation is the ordinary narrative method, and that impersonality of approach to the theme is the ordinary narrative attitude. A ballad is a folk-song that tells a story with stress on the crucial situation, tells it by letting the action unfold itself in event and speech, and tells it objectively with little comment or intrusion of personal bias'. [৩]

এই মন্তব্য থেকে দেখা যায় যে, গীতিকায় একটি কেন্দ্রীয় ঘটনা থাকবে এবং এই কাহিনীটি হবে সঙ্কটপূর্ণ। কাহিনীটি অগ্রসর হবে ঘটনা এবং সংলাপের মধ্য দিয়ে। নাট্যকারের মত এক্ষেত্রে রচনাকার

আত্মনির্লিপ্ত হয়ে কাহিনী বর্ণনায় প্রবৃত্ত, স্বভাবতই তাই কাহিনীটি হবে এক্ষেত্রে একান্তভাবে বস্তুধর্মী।

লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে 'ballad'-এর এক উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রচয়িতার মানসিকতায় বিরাজমান। লোক-সঙ্গীতে যে ক্ষেত্রে কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধি—অনুভূতি প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করে, 'ballad'-এ সেক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক মানসিকতা লক্ষণীয়। একাধিক সমালোচক এই বিশেষ দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

'The attitude of the narrator is impersonal, in the sense that he never memorizes and rarely his subjective attitude towards the action to intrude.' [৪]

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে গীতিকায় একটি কেন্দ্রীয় ঘটনা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে সেই ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দান আদর্শ 'ballad'-এর ক্ষেত্রে মোটেই কাম্য নয়। আদর্শ 'ballad'-এ সর্বপ্রকারের অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যকে পরিহার করে চলা হয়। আর তারই পরিণামে এগুলি হয়ে ওঠে অত্যন্ত নাটকীয় এবং সেই সঙ্গে গতিশীল।

'The ballad tells a story. But of the elements that go to make up a story—action, characters, setting and then the ballad is mainly concerned with action. characterization is conventional and general; setting is likewise general and static, theme is implied. But the action is always vivid and dramatic and often romantic as well. [৫]

এইবার আসা যেতে পারে বাংলা গীতিকা সম্পর্কিত আলোচনায়। প্রথমেই বাংলা গীতিকার আঙ্গিক-প্রকরণ সম্পর্কে

উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের দেশের গীতিকাগুলি পাশ্চাত্য দেশীয় 'ballad'-এর ন্যায় ঘটনা প্রধান হওয়ার পরিবর্তে বর্ণনা প্রধান হয়ে উঠেছে। গীতিকাগুলিতে বর্ণিত কাহিনী প্রায়শই শিথিল বিন্যস্ত। তাই ইউরোপীয় 'ballad'-এর কাহিনীর সংহতি ও দৃঢ়পিনদ্ধ ভাব আমাদের গীতিকায় অনুপস্থিত।

অনেক ক্ষেত্রেই পারিপার্শ্বিক বর্ণনা এইসব গীতিকায় প্রাধান্য-লাভ করেছে। কাহিনী হয়ে উঠেছে শাখানির্ভর এবং দীর্ঘ। এমন কি রচয়িতার ব্যক্তিগত অনুভূতি-উপলব্ধির অভিব্যক্তি এই গীতিকায় অনুচ্চারিত থাকেনি। ফলতঃ ইউরোপীয় 'ballad'-এর নাটকীয়তা আমাদের গীতিকায় অনেক সময়ই অনুপস্থিত। বাংলা গীতিকায় যে ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে বৈচিত্র্য প্রকাশের অবকাশ নেই। একই রূপ ছড়ার ছন্দে বিরতিহীন অবিভক্ত বর্ণনার সাহায্যে কাহিনীকে গঠন করা হয়েছে। এইবার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে প্রয়াসী হওয়া যেতে পারে। আমাদের গীতিকাগুলির প্রধান উপজীব্য বিষয় হ'ল প্রেম—ব্যর্থ ও অভিশপ্ত প্রেমের কাহিনীই রূপায়িত হয়েছে গীতিকাগুলিতে।

ইংরেজী 'ballad'-এর বিষয়বস্তু গীতিকার তুলনায় অনেকাংশে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং রোমহর্ষক। সেখানে দেখা যায়—গর্ভবতী প্রেমিকা প্রেমিক কর্তৃক নিহত হয়েছে, একজন নারীকে কেন্দ্র করে দুই ভাই দ্বন্দ্বে লিপ্ত এবং পরিণামে একজনের জীবনাবসান, সন্দিগ্ধ স্বামী কর্তৃক অবিশ্বাসী স্ত্রীর হত্যাসাধন, অনূঢ়া রমণী কর্তৃক তার নব-জাতকের হত্যাসাধন ইত্যাদি। স্বভাবতঃই আমরা বাংলা গীতিকায় এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হই না। বাংলা গীতিকায় আমরা যে সব বিষয়বস্তুর রূপায়ণ লক্ষ্য করে থাকি তা হ'ল—চৌর্যবৃত্তি, বিশ্বাস-ঘাতকতা, অবৈধ প্রণয়, হত্যা, প্রেমিক-প্রেমিকার গোপন পলায়ন ইত্যাদি। মোটের ওপর তাই বলা চলে যে গীতোপযোগী প্রেম বিরহ-মিলন কেন্দ্রিক কাহিনী লেখকের আত্মোপলব্ধির জারক

রসে জারিত হয়ে একই রূপ-ছন্দে বিরতিহীন ভাবে দীর্ঘ পরিসরে বর্ণিত হয়ে গীতিকা আখ্যা লাভ করেছে।

বাংলাদেশে এ যাবৎ প্রাপ্ত গীতিকা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—নাথ-গীতিকা, ময়মনসিংহ-গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকা। বাংলা দেশের প্রাচীনতম গীতিকা হ'ল নাথ-গীতিকা। এই গীতিকা বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে অপর দুই শ্রেণীর গীতিকা থেকে স্বতন্ত্র। বলা চলে নাথ-গীতিকা বিষয়বস্তুর বিচারে ইতিহাস গোত্রীয়, যদিও কেউ কেউ এর কাহিনীকে ঐতিহাসিক বলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। [৬] তবে বিষয়বস্তুতে ইতিহাস জাতীয় হলেও আন্তর-বৈশিষ্ট্যে এগুলি নিঃসন্দেহে গীতিকা শ্রেণীভুক্ত। আমরা প্রথমে নাথ-গীতিকা সংগ্রহ, তার শ্রেণীবিভাগ ও প্রকাশ সম্পর্কে আলোচনা করব।

নাথ-গীতিকার বিষয়বস্তু গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ ও সেই সঙ্গে নাথ ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার। নাথ-গীতিকাকে আমরা দু'টি ভাগে বিভক্ত করতে পারি—একটি বিভাগের অন্তর্গত গোর্খনাথ-মীননাথের কাহিনী। এই গোর্খনাথ-মীননাথের কাহিনী আবার বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন—গোর্খ বিজয়, গোরক্ষ-বিজয়, মীনচেতন ইত্যাদি। অপরপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত হ'ল গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী। এই শেষোক্ত কাহিনীটিও বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন মানিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস ইত্যাদি। নাথ-গীতিকাগুলিতে যদিও নাথ গুরুদের অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত ও সাধনার কথা বর্ণিত হয়েছে, তবু সর্বোপরি মানবীয় আবেদন এগুলিকে লোকসাহিত্যের বৃহত্তর আঙ্গিনায় স্থাপন করেছে। অবশ্য নাথ-গীতিকার যে দু'টি বিভাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে শেষোক্ত বিভাগটিতেই মানবিক আবেদন অনেক বেশি পরিমাণে পরিস্ফুট। আমরা এ পর্যন্ত প্রকাশিত নাথ-গীতিকাগুলির রচয়িতা হিসাবে বেশ কয়েকজন

কবির নাম পেয়েছি। এঁদের মধ্যে আছেন ভবানী দাস, সুকুর মামুদ, শেখ ফয়জুল্লা [কবীন্দ্র দাস], দুর্লভ মল্লিক প্রমুখ। কিন্তু মনে হয় এঁরা কেউই স্বাধীনভাবে কিছু রচনা করেননি, দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত কাহিনীকেই এঁরা রূপদান করেছিলেন মাত্র। অর্থাৎ এঁদের নামে প্রচলিত রচনাগুলি এঁদের স্বকপোলকল্পিত নয়।

গোপীচন্দ্রের গান বহুকাল পূর্ব থেকেই অধুনা বাংলাদেশস্থ রংপুর জেলায় প্রচলিত ছিল। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন রাজকার্যোপলক্ষে যখন রংপুরে ছিলেন, তখন তিনি এই গান সংগ্রহ করেন এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। গ্রীয়ারসন রংপুরের কৃষকদের কাছ থেকে এই গান সংগ্রহ করেছিলেন। অবশ্য সংগৃহীত এই গান ছিল গোপীচন্দ্রের গানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে এই গান দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল, ফলে স্বভাবতই সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই গানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব ছিল না। অতঃপর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন গ্রীয়ারসন সংগৃহীত গানের কিছু অংশ উদ্ধৃত করেন ও সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এর ফলেই গোপীচন্দ্রের গানের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের পরিচয় স্থাপিত হয়। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গ থেকে গোপীচন্দ্রের গানের প্রচলিত অন্যান্য পাঠগুলি সংগ্রহেও উৎসাহ দেখা দেয়।

১৩০৮ বঙ্গাব্দে শিবচন্দ্র শীলের সম্পাদনায় দুর্লভ মল্লিক বিরচিত 'গোবিন্দ চন্দ্র গীত' প্রকাশিত হয়। এই পুঁথিখানি বর্ধমান জেলার এক গ্রামে লিখিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য এ'টিই পশ্চিম-বঙ্গে প্রাপ্ত একমাত্র নাথ-গীতিকা। তবে 'গোবিন্দচন্দ্রের গীতে' একদিকে যেমন তত্ত্বকথার প্রাধান্য, অপরদিকে তেমনি সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। দুর্লভ মল্লিকের

রচনায় 'শিশুপা' নামে হাড়িপার এক পুত্রের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য অভিমত প্রকাশ করেছেন :

'দুর্লভ মল্লিকের গান পুরাতন উপকরণের সাহায্যে নূতন ভাষায় রচিত, ইহাতে উপাখ্যান ভাগও কতকটা রূপান্তরিত হইয়াছে।' গ্রীয়ারসন সাহেব সংগৃহীত গানের মত দুর্লভ মল্লিক রচিত 'গোবিন্দ চন্দ্র গীত' ও গোপীচন্দ্রের গানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র।

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় রংপুর নীলফামারির সাবডিভিসনাল অফিসারের পদে আসীন থাকা কালে 'ময়নামতীর গানে'র একটি পাঠ সংগ্রহ করেন এবং সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় [১৫শ ভাগ। ২য় সংখ্যা] ১৩১৫ বঙ্গাব্দে সংগৃহীত পাঠের পরিচয় প্রকাশ করেন।

'যোগীর পুঁথি'র রচয়িতা আব্দুল সুকুর মহম্মদ। সুকুর মহম্মদ ছিলেন রাজশাহী জেলার রামপুর বেয়ালিয়ার ছ' মাইল উত্তর পূর্বস্থিত সিন্দূরকুসুমী গ্রাম নিবাসী। এই কাব্যটি ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

ভবানী দাস নামক এক কবি ময়নামতীর গান অবলম্বনে 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' রচনা করেছিলেন আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে এই কাব্যটি ১৩২১ সনে ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা থেকে ১৩৩২ সনে আব্দুল সুকুর মহম্মদ বিরচিত কাব্যটিকে 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' নামে প্রকাশ করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সেন এবং বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'গোপীচন্দ্রের গানে'র ১ম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে ছিল কেবল মৌখিক সংগ্রহ 'গোপীচন্দ্রের গান' অংশটি। দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই খণ্ডে ছিল 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' ও 'গোপীচন্দ্রের

সন্ন্যাস' অংশদ্বয়। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনায় যে 'গোপীচন্দ্রের গান' প্রকাশিত হয়, তাতে গোপীচন্দ্রের গানের তিনটি পাঠই স্থান পেয়েছে। এই তিনটি পাঠের মধ্যে আছে মৌখিক সংগ্রহ যা 'গোপীচন্দ্রের গান' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় পাঠটি ভবানীদাস বিরচিত 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' এবং তৃতীয় পাঠটি স্নুকুর মামুদ বিরচিত 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে প্রচলিত কাহিনীকেই নাথ-গীতিকাকারেরা রূপায়িত করেছিলেন। তাই বিভিন্ন কবির নামে প্রচলিত গীতিকাগুলিতে যেমন ঐক্য লক্ষ্য করা যায়, অনেক ক্ষেত্রে তেমনি অনৈক্যও বর্তমান। হাড়িসিদ্ধাকে গোপীচন্দ্রের মাটির তলে পুঁতে ফেলার বিবরণ দুর্লভ মল্লিক ও স্নুকুর মামুদের কাব্যে থাকলেও রংপুরের গাথা এবং ভবানী দাসের গ্রন্থে তা অনুপস্থিত। রাজার পারিষদবর্গের নামের ক্ষেত্রে, হাড়িপার বিচিত্র কর্মকাণ্ডের বিবরণেও ঐক্য এবং অনৈক্য দুই-ই লক্ষিত হয়। রংপুরের গাথায় গোপীচন্দ্রের রাণী বলে উল্লিখিত হয়েছেন হরিশ্চন্দ্র রাজার দুই কন্যা—অদুনা ও পদুনা। কিন্তু ভবানী দাসের কাব্যে এই দুজনের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছেন রতনমালা এবং কাঞ্চনমালা। আবার স্নুকুর মামুদের কাব্যে রাণী বলে উল্লিখিত হয়েছেন পূর্বদেশের মহেশচন্দ্র রাজার কন্যা চন্দনা, উত্তরদেশের নেহালচন্দ্র রাজার কন্যা ফন্দনা এবং পশ্চিমদেশের হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যাদ্বয় অদুনা ও পদুনা। রংপুরের গানে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় তাঁর রাজত্বের উল্লেখ আছে। কিন্তু স্নুকুর মামুদের গ্রন্থে সেই উল্লেখ অনুপস্থিত। অবশ্য ভবানী দাসের কাব্যে এর আভাষটুকু আছে মাত্র।

এইবার 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'র প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। ময়মনসিংহ-গীতিকা সংগ্রহ ও প্রকাশের সঙ্গে যে তিনটি নাম

বিশেষ ভাবে যুক্ত, তাঁদের একজন হলেন সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে এবং অপর দু'জনের একজন 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক কেদার নাথ মজুমদার ও অপরজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

আমরা প্রথমে কেদারনাথের কথায় আসতে পারি। কারণ, "Mymensingh Gitika" owes its origin to Kedarnath" ময়মনসিংহ-গীতিকার সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে নিজেও 'সৌরভে'র 'কেদার স্মৃতি সংখ্যা'য় বলেছেন, 'যে ময়মনসিংহের চাষার গানগুলি আজ সাত সমুদ্র পার হইয়া সুদূর ইয়োরোপ আমেরিকায় আপন সম্মানিত আসনটি অধিকার করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার মূলে কেদারনাথের প্রাচীন সাহিত্যানুরাগ। তিনি 'সৌরভে' তাহার সন্ধান না দিলে আদৌ তাহা লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরা দিত না।'

কেদারনাথ মজুমদার ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার গাছিহাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না। তদুপরি কৈশোরেই তিনি পিতৃহীন হন। তাই দারিদ্র্যের জন্য আর তাঁর পক্ষে লেখাপড়া করা সম্ভবপর হয়নি। মাত্র ১৭ বৎসর বয়সেই তাঁকে উপার্জনের জন্য সংঘাতময় কর্মজীবনের শুরু করতে হয়। 'কুমার' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সহ সম্পাদক রূপে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সৌরভ'। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটির এক বিশেষ অবদান ছিল। কেদারনাথের কলেজীয় শিক্ষালাভ না ঘটলেও পরবর্তীকালে তিনি সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতি, শ্রুতি ইত্যাদিতে তাঁর যথেষ্ট অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংরেজী ও ইতিহাসেও তাঁর অধিকার ছিল অনেকখানি। কেদারনাথ যখন ঢাকায় 'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকায় কর্মোপলক্ষে ছিলেন, তখনই তিনি বিভিন্ন

শ্রেণীর লোকসঙ্গীত ও লোক কথা সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং বিভিন্ন জনকে এই ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেন। এই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে চন্দ্রকুমার দে'র যোগাযোগ ঘটে। কেদারনাথের অবদানকে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে দেখতে পারি—'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদনা, চন্দ্রকুমার দেকে আবিষ্কার এবং ইতিহাস ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থরচনা। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে 'ঢাকা বিবরণ' [১৯১০], বাংলা সাময়িক সাহিত্য [১৯১৭], Ramayaner Samaj [১৯২৭], ময়মনসিংহের ইতিহাস ইত্যাদি। কেদারনাথের অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তাঁর জীবনীকার যথার্থই বলেছেন :

'There cannot be any difference of opinion on the point that "Mymensingh Gitika" could not come into being unless the findings of Kedarnath were brought into play in it. Threfore if any credit is due to anybody for this collection besides the collector, it should primarily go to Kedarnath and then to D. C. Sen.' [৭]

কেদারনাথ ১৩৩৩ [১৯২৬] বঙ্গাব্দে পরলোকগমন করেন।

কেদারনাথের পর তাঁরই আবিষ্কার চন্দ্রকুমার দে সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

১২৮৮ [১৮৮১] সনে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত 'আইথর' গ্রামে চন্দ্রকুমারের জন্ম হয়। রামকুমার দে ছিলেন তাঁর পিতা। রামকুমারের আর্থিক সঙ্গতি তেমন স্বচ্ছল ছিল না। তাই অর্থাভাবে চন্দ্রকুমারের প্রথা সিদ্ধ শিক্ষা লাভ ঘটেনি। পিতার মৃত্যুর পর চন্দ্রকুমার মাসিক দু'টাকা বেতনে কালীপুর জমিদারীতে গোমস্তার চাকরীতে নিযুক্ত হন। তাঁর কাজ ছিল গ্রামে গ্রামে পর্যটন করে খাজনা আদায়। কর্মসূত্রে তাই তাঁকে গ্রাম-গ্রামান্তরে

ঘুরতে হ'ত। আর এর ফলে একদিকে যেমন গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে, তেমনি তাঁর পক্ষে পল্লীসংগীত ও গাথা সংগ্রহ সহজতর হয়।

'সৌরভ' পত্রিকার সূত্রেই আচার্য দীনেশ চন্দ্রের দৃষ্টি চন্দ্রকুমারের ওপর পড়ে। তিনি চন্দ্রকুমারকে মাসিক ৭০ টাকা বেতনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে লোকসঙ্গীত সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। আর তার ফলেই শুরু হয় একের পর এক গীতিকাগুলির সংগ্রহ।

চন্দ্রকুমার নিজেও ছিলেন কবি-সাহিত্যিক। কিন্তু তবু লোক গীতিকার সংগ্রাহক রূপেই তিনি বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এইসব গীতিকা সংগ্রহে তাঁকে যে কি অপরিসীম পরিশ্রম ও কষ্টের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল সে সম্পর্কে আচার্য দীনেশচন্দ্র লিখেছেন: 'কি কষ্টে যে এই সকল পল্লীগাথা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি ও তাঁহার ভগবানই জানেন এবং কতক আমি জানিয়াছি। এই সকল গান অধিকাংশ চাষাদের রচনা। এইগুলির অনেক পালা কখনই লিপিবদ্ধ হয় নাই। পূর্ব্বে যেমন প্রতি বঙ্গপল্লীতে কুন্দ ও গন্ধরাজ ফুটিত, তেমনই লোকের ঘরে ঘরে নিরবধি শোনা যাইত, ও তাহাদের তানে সরল কৃষকপ্রাণ তন্ময় হইয়া যাইত। ফুলের বাগানে ভ্রমরের মত গানগুলিরও শ্রোতার অভাব হইত না। কিন্তু লোকের রুচি এই দিকে এখন আর নাই। এইগুলি গাহিবার লোকেরও অভাব হইয়াছে, যেহেতু এই শ্রেণীর গানের ওপর শ্রোতার সেই কৌতুক পূর্ণ অনুরাগ ফুরাইয়া আসিয়াছে। যাহা লিখিত হয় নাই, আবৃত্তিই যাহা রক্ষার একমাত্র উপায়, অভ্যাস না থাকিলে সেই কাব্যকথার স্মৃতি মলিন হইয়া পড়িবেই। এখন একটি পালাগান সংগ্রহ করিতে হইলে বহু লোকের দরবার করিতে হয়। কাহারও একটি গান মনে আছে কাহারও বা দুইটি—নানা গ্রামে পর্যটন

করিয়া নানা লোকের শরণাপন্ন হইয়া একটি সম্পূর্ণ পালা উদ্ধার করিতে পারা যায়। এইজন্য চন্দ্রকুমার প্রতি পালাটি সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক কষ্ট সহিয়াছেন।' [৮]

চন্দ্রকুমার সংগৃহীত বিভিন্ন গীতিকাগুলির সংগ্রহকাল, সংগ্রহ সূত্র সহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে—

১। দ্বিজ কানাই প্রণীত 'মহুয়া' [ময়মনসিংহ গীতিকা পৃঃ ৩০-৪২] পূর্ব মৈমনসিংহ থেকে সংগৃহীত এবং দীনেশচন্দ্র সেনকে ৯ই মার্চ, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রেরিত।

২। মলুয়া [ময়মনসিংহ গীতিকা ; পৃঃ ৪৫-১০০] ময়মনসিংহের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত এবং ১৯২১ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে দীনেশচন্দ্রকে প্রেরিত।

৩। চন্দ্রাবতী ; নয়নচাঁদ ঘোষ প্রণীত ; [ময়মনসিংহ গীতিকা ; পৃঃ ১০৩-১১৮]

৪। কমলা ; দ্বিজ ঈশান প্রণীত ; [ময়মনসিংহ গীতিকা ; পৃঃ ১২১-১৭০]

৫। দেওয়ান ভাবনা ; চন্দ্রাবতী প্রণীত; [ময়মনসিংহ গীতিকা পৃঃ ১৭৩-১৯১] নেত্রকোণা থেকে সংগৃহীত এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেরিত।

৬। দস্যু কেনারামের পালা; চন্দ্রাবতী প্রণীত ; [ময়মনসিংহ গীতিকা ; পৃঃ ১৯২-২৩৬]

৭। রূপবতী [ময়মনসিংহ গীতিকা ; পৃঃ ২৩৯-৬০] ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ তারিখে প্রেরিত।

৮। কঙ্ক ও লীলা ; রঘুসুত, দামোদর, শ্রীনাথ বানিয়া ও নয়ান চাঁদ ঘোষ এই চারজনের ভণিতা যুক্ত ; [ময়মনসিংহ গীতিকা ; পৃঃ ২৬৩-৩১২]

৯। দেওয়ানা মদিনা ; মনসুর বয়াতি প্রণীত ; [ময়মনসিংহ গীতিকা ; পৃঃ ৩৫১-৩৮৭]

১০। ধোপার পাট [পূর্ববঙ্গ গীতিকা; ২য় খণ্ড; ২য় সংখ্যা পৃঃ ৩-২৮]

এই পালাটির উল্লেখযোগ্য অংশ মৈমনসিংহের অন্তর্গত সাকুয়াই বাট্টা গ্রামনিবাসী রজনীকান্ত ভদ্র এবং অপর কিছু অংশ চরশম্ভু গঞ্জবাসী দীনগোপ এবং কীর্তন খোলার 'মধুর বাপ' নামে পরিচিত জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত। দীনেশচন্দ্রকে চন্দ্রকুমার এই পালাটি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখে প্রেরণ করেন।

১১। মইষাল বন্ধু [পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ২য় খণ্ড; ২য় সংখ্যা; পৃঃ ৩১-৭৮] মইষাল বন্ধুর দু'টি পালাই অসম্পূর্ণ সংগ্রহ। প্রথম পালাটি সংগৃহীত হয়েছে যথাক্রমে সূত্রকোণা গ্রামের চন্দ্রকুমার সরকার, ফুল্লার আব্বাস নামক রায়ের রাজাদের জনৈক গাড়োয়ান এবং সোহাগী গ্রামের নিধু ব্যাপারী নামক একজন পাট ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। দ্বিতীয় পালাটি সংগৃহীত হয়েছে ভাওয়াল পরগণার উছি নামক গ্রামের অধিবাসী গাছুনী শেখ নামক এক মুসলমানের কাছ থেকে। প্রথম পালাটি দীনেশ চন্দ্রের কাছে প্রেরিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর এবং দ্বিতীয় পালাটি প্রেরিত হয় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী।

১২। ভেলুয়া [পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ২য় খণ্ড; ২য় সংখ্যা ঃ পৃঃ ১৪১-২০৭] চন্দ্রকুমার এই পালাটি সংগ্রহ করেন ময়মনসিংহের বানিয়াচক থেকে। উল্লেখযোগ্য যে হামিদুল্লা নামে জনৈক মুসলমান 'ভেলুয়া সুন্দরী' নামে একটি কাব্য বহুকাল পূর্বে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশ করেন। চন্দ্রকুমার সংগৃহীত পালাটি পাঁচটি খণ্ডে সমাপ্ত।

১৩। কমলা রাণীর গান [পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ২য় খণ্ড; ২য় সংখ্যা; পৃঃ ২১১-৩০] চন্দ্রকুমার সংগৃহীত এই পালাটি অসম্পূর্ণ। পালাটির ভণিতায় অধরচাঁদের নামোল্লেখ রয়েছে।

১৪। দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদ আলি [পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ২য়

খণ্ড ; ২য় সংখ্যা ; পৃঃ ৩৪৯-৩৯০] ঐতিহাসিক গাথার এ'টি বিরল নিদর্শন। প্রেম আখ্যান এই পালায় গৌণ স্থান অধিকার করে আছে।

১৫। ফিরোজ খাঁ দেওয়ান [পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ২য় খণ্ড ; ২য় সংখ্যা ; পৃঃ ৪৩৫-৪৭৮] এই পালাটি সংগৃহীত হয় রাজীবপুরের সাহরালী গায়েন, চন্দ্রতলার সদীর গায়েন এবং কাটিখালির রহমান গায়েনের কাছ থেকে। কিয়দংশ আবার ন' পাড়া নিবাসী এক অন্ধ ফকিরের কাছ থেকেও সংগৃহীত।

১৬। আয়না বিবি [পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ৩য় খণ্ড ; ২য় সংখ্যা ; পৃঃ ১৯১-২১৬]। পালাটি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে সংগৃহীত। এ'টি চরিত্রে 'মলুয়া'র সমগোত্রীয়। হিন্দু অভিপ্রায় যুক্ত মুসলমান গীতিকার এ'টি একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

১৭। শ্যাম রায়ের পালা [পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ৩য় খণ্ড ; ২য় সংখ্যা পৃঃ ২৭৩-৯৪] চন্দ্রকুমার কর্তৃক এ'টি ১৯২২ থেকে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংগৃহীত হয়। পালাটির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জনের কাছ থেকে সংগৃহীত যেমন—মৈমনসিংহের কিশোর গঞ্জ মহকুমার অধীন মাচুনা গ্রামবাসী কৈলাসচন্দ্র দে, কাঠগড় নিবাসী শচিনী সোম এবং মমিনপুরবাসী অদেলা দাস প্রমুখ।

১৮। শিলাদেবী [পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ৪র্থ খণ্ড ; ২য় সংখ্যা ; পৃঃ ৪৭-৭০] চন্দ্রকুমার এই পালাটি মৈমনসিংহের আদমগুজি নিবাসী কালু শেখ এবং কদমশ্রী গ্রামের নন্দলাল দাসের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। পালাটি দীনেশচন্দ্রের কাছে প্রেরিত হয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে।

১৯। আঁধা বন্ধু [পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ৪র্থ খণ্ড ; ২য় সংখ্যা ; পৃঃ ১৮৫-২০৭] পালাটি চন্দ্রকুমার কর্তৃক ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সংগৃহীত। সংগৃহীত হয়েছে বুদ্ধু নামক হাজাং শ্রেণীর এক ব্যক্তি ও মঙ্গল নাথ নামক থালিয়া জুড়ির এক ভিক্ষুকের কাছ থেকে।

২০। বগুলার বারমাসী [পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ৪র্থ খণ্ড ; ২য় সংখ্যা ; পৃঃ ২১:-২৩২]। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পালাটি সংগৃহীত। সংগৃহীত হয়েছে মৈমনসিংহ জেলার থালিয়াজুড়ি পরগণার মধ্যবাটী নামক গ্রামের অধিবাসী বৈরাগী ও কৃষ্ণরাম মাল নামক ব্যক্তিদ্বয়ের কাছ থেকে।

২১। রতন ঠাকুরের পালা [পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ৪র্থ খণ্ড; ২য় সংখ্যা ; পৃং ৩২৩-৩৩৭]

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ পালাটি মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাঠঘর নিবাসী গাছিম শেখ ও ভিন্ন এক গ্রামের অধিবাসী রামচরণ বৈরাগীর কাছ থেকে সংগৃহীত।

২২। পীর বাতাসী [পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ৪র্থ খণ্ড ; ২য় সংখ্যা ; পৃঃ ৩৪১-৩৬৪] চন্দ্রকুমার কর্তৃক ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ আজমীরি বাজার নিবাসী বৃন্দাবন বৈরাগী এবং লক্ষ্মীগঞ্জ নিবাসী শ্রীদাম পাটুলী ও জগবন্ধু গায়েনের কাছ থেকে সংগৃহীত।

২৩। জিরালানি [পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ৪র্থ খণ্ড; ২য় সংখ্যা ; পৃঃ ৪২৭-৪৫১] পালাটি অসম্পূর্ণ। মৈমনসিংহের অন্তর্গত পীর সোহাগপুর গ্রাম নিবাসী রজনী কর্মকার ও ভাদাই ফকির নামক বাউল গায়কের কাছ থেকে সংগৃহীত।

২৪। সোনারায়ের জন্ম [পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ৪র্থ খণ্ড; ২য় সংখ্যা ; পৃঃ ৪৬৭-৪৭৯]

২৫। ভারাইয়া রাজার কাহিনী [পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ৪র্থ খণ্ড; ২য় সংখ্যা ; পৃঃ ১৫৭-১৮১] চন্দ্রকুমার মৈমনসিংহের মুক্তাগাছার বিজয় নারায়ণ আচার্যের সাহায্যে এই পালাটি সংগ্রহ করেন।

অতএব বাংলা গীতিকা চর্চার ইতিহাসে চন্দ্রকুমার কেবল একটি স্মরণীয় নামই নয়, লুপ্ত প্রায় একটি বিভাগের তিনি আবিষ্কর্তা—

'..........however great the merits of the editor

D. C. Sen, it is necessary to mention with deep respect and admiration, the name of Chandra Kumar De, who is the real discoverer of this forgotten and neglected branch of Bengali literature ....It was he who rescued these songs, literally at the last minute, from the threat of oblivion.' [৯]

চন্দ্রকুমার দে'র প্রসঙ্গে আলোচনার পর স্বভাবতই যাঁর প্রসঙ্গ এসে পড়ে, তিনি দীনেশচন্দ্র সেন। লোককথা চর্চার ইতিহাস আলোচনা কালে স্বল্প পরিসরে আমরা তাঁর বিষয়ে উল্লেখ করেছি। এইবার গীতিকা চর্চার ইতিহাস আলোচনায় তাঁর সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনা যুক্ত হ'ল।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর ঢাকা জেলার অন্তর্গত বাগজুড়ী গ্রামে দীনেশচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকার জগন্নাথ স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা কলেজ থেকে তিনি এফ, এ এবং ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথম জীবনে তিনি একাধিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। কুমিল্লা ইনষ্টিটিউশন এবং কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদেও ইনি কাজ করেছিলেন। কুমিল্লায় আসার পর থেকেই তিনি বাংলার প্রাচীন সাহিত্য ও পুঁথি বিষয়ক নানাবিধ রচনা প্রকাশ করতে থাকেন। 'ঢাকা প্রকাশ', 'অনুসন্ধান', 'জন্মভূমি', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকাদিতে তাঁর রচনাদিও প্রকাশিত হতে শুরু করে। বঙ্গ ভাষার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করে দীনেশচন্দ্র কলকাতার 'পিস্ এসোসিয়েশন' থেকে 'বিদ্যাসাগরপদক' লাভ করেন।

দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় সুবিখ্যাত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। এই গ্রন্থ প্রকাশের সূত্রেই তিনি বাংলার বিদ্যোৎসাহী

সমাজে পরিচিতি অর্জন করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্রকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্পেশাল ইউনিভার্সিটি প্রফেসর' রূপে নিযুক্ত করা হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদে বৃত হন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র যে রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ বক্তৃতা দান করেন, পরবর্তীকালে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সেইটিই 'The folk Literature of Bengal' নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বাংলার রূপকথা ও উপকথার একটি সঙ্কলনও সংযোজিত হয়।

বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে দীনেশচন্দ্রের স্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে :

'..............বাংলার লোক-সাহিত্য ও দীনেশ চন্দ্র সমার্থক। ....রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁর উদ্যম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের বহু লুপ্ত অধ্যায় বিশেষ করে লোক সাহিত্যের এক বিপুল স্বর্ণভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়।' [১০] বাংলা লোকসাহিত্য চর্চায় দীনেশচন্দ্রের অবদানকে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখতে পারি। প্রথমতঃ লোক সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহে প্রেরণা দান, দ্বিতীয়ত—লোক সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ ও তা প্রকাশের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য তৎকালীন সরকারকে সম্মত করা, তৃতীয়ত—বাংলা লোকসাহিত্যকে বিদেশীদের গোচরীভূত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন।

চন্দ্রকুমার দে, আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখাদির ন্যায় উপযুক্ত সংগ্রাহক নিযুক্ত করে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলেন দীনেশচন্দ্রই। গীতিকা সংগ্রহের সূত্রে যে চন্দ্রকুমার দে বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন, দীনেশচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশিত হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত ভাষায়—'আমি শক্তিহীনের মত যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন গ্রীক ভাস্করাচার্য ফিডিয়াসের

মত, তাঁহার স্মৃতি মনোমন্দিরে পূজা করিব।' এই—শ্রদ্ধার্ঘের মাধ্যমে একদিকে যেমন চন্দ্রকুমারের কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি সেই সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের লোক সাহিত্য চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিও এ'টি। দীনেশচন্দ্র সংগ্রাহকদের নানা প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিয়েছেন, জোর দিয়েছিলেন যাতে সংগ্রাহকেরা প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে অবিকৃত ভাবে লোক সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেন।

আদর্শ সংগ্রাহক নিযুক্তির ব্যাপারে দীনেশচন্দ্রের ধারণা কতখানি স্বচ্ছ ছিল এবং এই ব্যাপারে তিনি কিরূপ বৈজ্ঞানিক মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁরই উক্তি থেকে—'পাশ করা যুবকেরা চাষাদের সঙ্গে মিশিতে ঘৃণা বোধ করিবে; তাহারা পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতে স্বীকৃত হয় কিনা সন্দেহ। তারপর, নিরক্ষর চাষারা যেভাবে গানগুলি বলিবে, ঠিক সেইভাবে টুকিতে হইবে। আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা ভাষার জটিলতা ও অপপ্রয়োগ দেখিয়া, গানগুলি সংশোধন করিতে চেষ্টা পাইবেন, হাজার বার বলিয়া দিলেও তাহারা যেমনটি, ঠিক তেমনটি পাঠাইবেন না। অনেক স্থানে চাষা মুসলমানদের কুঁড়ে ঘরে থাকিয়া তাহাদের গান সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে। আমার মতে যে সকল নিরক্ষর চাষা পুরুষানুক্রমে এই সকল গান রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সমশ্রেণীর লোক, অথবা পাড়া গাঁয়ের অর্দ্ধ শিক্ষিত ভদ্রলোক, যাহারা এই সকল গানের সমঝদার তাহারাই এই সংগ্রহ কার্যের উপযুক্ত।' [১১]

এইবার অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে দীনেশচন্দ্রের ভূমিকা কি ছিল দেখা যাক্। দীনেশচন্দ্র নিজেই এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

'সরকার বাহাদুরের নিকট এই পল্লীগীতি সংগ্রহ ও ছাপাইবার ব্যয় ভার আংশিক রূপে পাইবার জন্য আবেদন করিলাম। আমি লিখিয়াছিলাম, শুধু ময়মনসিংহ নহে, বঙ্গের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ

গাথা অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেগুলি সংগ্রহের জন্য কয়েকটি লোক নিযুক্ত করা দরকার। বহু চেষ্টার পর সরকার বাহাদুর তিন বৎসরের জন্য অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করিতে সম্মত হইলেন ; প্রতি বৎসর তাহারা এতদর্থে তিন হাজার টাকার কিছু বেশী দিয়াছিলেন।'

বাংলা গীতিকাকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে দীনেশচন্দ্র স্যার আশুতোষের অর্থ সাহায্যে এগুলি অনুবাদ করান এবং তাঁরই সম্পাদনায় 'Eastern Bengal Ballads' নামে এ'গুলি প্রকাশিত হয়। অবশ্য তার পূর্বেই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশিত হয়েছে আচার্য দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনায়। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ব্যতীত ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মুখ্যতঃ আশুতোষ চৌধুরী সংগৃহীত গীতিকাগুলি ডঃ দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় ঐ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই স্যার আশুতোষের সাহায্য পুষ্ট হয়ে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' রূপে প্রকাশিত হয়।

পূর্ববঙ্গ-গীতিকা প্রসঙ্গে যাঁর উল্লেখ একান্তভাবে প্রয়োজন, তিনি হলেন আশুতোষ চৌধুরী। দীনেশচন্দ্রের ভাষায়, '......অটুট স্বাস্থ্য, অপূর্ব উদ্যম, পল্লী সাহিত্যের প্রতি অপরাজেয় অনুরাগের সহিত সুলেখক আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় চট্টগ্রামের বহু বড় নদীর তীরে, সমুদ্রের সিকতায় প্রাণ সঙ্কল্প করিয়া যে চেষ্টা করিতেছেন —তাহার তুলনা কোথায়?' [১২]

পূর্ববঙ্গ-গীতিকা সংগ্রহে অন্যান্য যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা হলেন কবি জসীমুদ্দীন, নগেন্দ্র চন্দ্র দে, বিহারীলাল রায়, মনসুরউদ্দীন, মনোরঞ্জন চৌধুরী এবং শিবরতন মিত্র। এঁদের সংগৃহীত কয়েকটি গীতিকার সংক্ষিপ্ত কিছু পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে—

ক। মানিক তারা [পূর্ববঙ্গ-গীতিকা। ২য় খণ্ড ; ২য় সংখ্যা ;

পৃঃ ২৩৩-২৭৪] । বিহারীলাল রায় কর্তৃক মৈমনসিংহ থেকে সংগৃহীত এবং ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্রকে প্রেরিত।

খ। মাঞ্জুর মা [পূর্ববঙ্গ-গীতিকা। ৩য় খণ্ড ; ২য় সংখ্যা ; পৃঃ ১১-৩৪] মৈমনসিংহ থেকে নগেন্দ্রচন্দ্র দে কর্তৃক সংগৃহীত।

গ। বারতীর্থের গান [পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ৩য় খণ্ড ; ২য় সংখ্যা ; পৃঃ ৫১৫-৫২৬] বিহারীলাল রায় কর্তৃক সংগৃহীত।

ঘ। রাজা রঘুর পালা [পূর্ববঙ্গ-গীতিকা। ৪র্থ খণ্ড ; ২য় সংখ্যা ; পৃঃ ৭৩-৮৯] মৈমনসিংহ থেকে নগেন্দ্রচন্দ্র দে কর্তৃক সংগৃহীত।

ঙ। বীর নারায়ণের পালা [পূর্ববঙ্গ-গীতিকা। ৪র্থ খণ্ড ; ২য় সংখ্যা পৃঃ ২৯৩-৩১৬ নগেন্দ্রচন্দ্র দে কর্তৃক ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মৈমনসিংহের অন্তর্গত মুক্তাগাছার নিকটস্থ সলিদা গ্রামের কালাচাঁদ মাল ও সকুরিয়া গ্রামের শেখ পানাউল্লার নিকট থেকে সংগৃহীত।

চ। শান্তি ও নীলা পালাটি জসীমুদ্দীন কর্তৃক ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার পিয়ারপুর গ্রামের এছেন খাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত।

ছ। মনসুরউদ্দীন সংগৃহীত পালাটি হ'ল 'মহীপাল'।

জ। নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম থেকে মনোরঞ্জন চৌধুরী কর্তৃক 'চৌধুরীর লড়াই' পালাটি সংগৃহীত।

আশুতোষ চৌধুরী সংগৃহীত পালাগুলি হ'ল—নিজম ডাকাতের পালা, কাফেন চোরা, ভেলুয়া, হাতী খেদা, কমল সদাগর, সুজা তনয়ার বিলাপ, নসর মালুম ইত্যাদি।

বাংলা গীতিকা চর্চার ইতিহাসে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক একটি স্মরণীয় নাম। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশিত হলে ক্ষিতীশবাবুর দৃষ্টি

এ'দিকে আকৃষ্ট হয়। অবশ্য 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশিত হবার পূর্ব্বেই তিনি পূর্ববঙ্গের গায়েন এবং বয়াতীদের মুখ থেকে বেশ কিছু গীতিকা শুনেছিলেন। তাই প্রকাশিত পালাগুলির কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি তাঁকে এই সব পালাগুলি সংগ্রহে অনুপ্রাণিত করে। মৌলিকের নিজের ভাষায়, 'প্রকাশিত পালাগুলিতে দেখিলাম কোনো স্থলে ঘটনার কিছু অংশ বাদ গিয়াছে। বহু জায়গায় বর্ণনা পারম্পর্যহীন, একজনের উক্তি আর একজনের মুখে চলিয়া গিয়াছে। বহু গানের শব্দ সজ্জা ও বানান বিভ্রাটের ফলে ভাটিয়ালী গানের কোনো ধাঁচও নজরেই পড়েনা। পরে দেখিয়াছি 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'মুড়াই' 'ভাওইয়া', 'সাইগরী' ও 'হাল্‌দাফাটা' সুরের গানগুলিরও ঐ একই অবস্থা।'

ক্ষিতীশবাবু ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পালা সংগ্রহে ব্রতী হন। এবং দীর্ঘকাল ধরে মৈমনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর জেলা পর্যটন করেন। প্রায় তিন দশককাল পর্যটন করে দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রকাশিত পালাগুলি ঐ সব গীতিকার গায়ক 'বয়াতী' এবং 'গায়েন'দের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। শুধু গাথাগুলির সংগ্রহই নয়, সেই সঙ্গে এইসব গাথার সুর, তাল, ছন্দ সম্পর্কেও তিনি প্রয়োজনীয় বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। শ্রীমৌলিকের সম্পাদনায় 'প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা' কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি পালাগুলির ছন্দ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবিষ্ট করেছেন। পালাগুলির কাহিনী বর্ণনায় যেখানে অস্পষ্টতা আছে, সেখানে তিনি সহজবোধ্য কথ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। প্রতিটি পালার পাঠান্তর, দুর্বোধ্য শব্দগুলির অর্থ ও সর্বোপরি প্রতিটি পালার পরিচয় ভূমিকার দ্বারা সমৃদ্ধ।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ১ম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে। এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে ছ'টি পালা—বাইদ্যা কন্যা

মহুয়া, সুন্দরী মলুয়া, চন্দ্রাবতী, দস্যু কেনারাম, আয়না বিবি ও শ্যাম রায়ের পালা। ক্ষিতীশবাবু প্রথম পালাটিকে ৯৮৬টি ছত্রে সংকলন করেছেন। অর্থাৎ ক্ষিতীশবাবুর সংকলিত পালায় অতিরিক্ত ২৩১টি ছত্র স্থান পেয়েছে। এছাড়া 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় প্রকাশিত ৭৭টি ছত্রের পাঠান্তর ঘটেছে বর্তমান খণ্ডে। পাঠান্তরগুলি সম্পাদক পাদটীকায় দিয়েছেন। 'মহুয়া' পালার প্রথমেই তিনি দুটি বন্দনাকে স্থান দিয়েছেন। প্রথম বন্দনাটি সম্পাদক, হিন্দু গায়েনদের খাতায় দেখেছেন এবং গানের আসরে নিজে শুনেওছেন। সংকলিত দ্বিতীয় বন্দনাটিই শুধু দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

ক্ষিতীশবাবুর সম্পাদিত সংকলনে 'মলুয়া' পালাটির ছত্রসংখ্যা ১৭৯৯। দীনেশচন্দ্রের সম্পাদিত পালার ১২টি ছত্র ব্যতিরেকে অবশিষ্ট ১১৩৫টি ছত্রই মৌলিকের সম্পাদিত গ্রন্থে বর্ত্তমান। আলোচ্য সংকলনে নূতন ছত্রসংখ্যা ৫৫৪। আলোচ্য সংকলনে গৃহীত 'চন্দ্রাবতী' পালার ছত্রসংখ্যা ৫৪৬ অর্থাৎ অতিরিক্ত ছত্র ১৯২টি। দীনেশচন্দ্রের সংগ্রহের ১৯টি ছত্রের সঙ্গে আলোচ্য সংগ্রহের তাৎপর্যে পার্থক্য থাকায় দীনেশচন্দ্রের পাঠ সম্পাদক পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। বর্ত্তমান সম্পাদক ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সুসংদুর্গাপুরে কালীচরণ গায়েনের খাতা থেকে দস্যু কেনারামের পালাটি সংগ্রহ করেছিলেন। বর্ত্তমান সংগ্রহে এ'টি ৬০২টি ছত্রে সমাপ্ত। তন্মধ্যে ৪৫৬টি ছত্র 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় স্থান লাভ করেছে। ৪৫৬টি ছত্রের মধ্যে ৪০টি ছত্রের সঙ্গে বর্তমান সংগ্রহে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

'আয়না বিবি' পালাটি 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩য় খণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছে। কিন্তু ক্ষিতীশচন্দ্র সঙ্কলিত এই পালাটিতে ২৩৩টি অতিরিক্ত ছত্র স্থান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ক্ষিতীশচন্দ্রের সম্পাদিত গ্রন্থে সংযোজিত 'আয়না বিবি'র পালার ১০ম ও ১১শ অধ্যায় দু'টি দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে অনুপস্থিত।

এই দু'টি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু দীনেশচন্দ্র নিজের ভাষায় সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন মাত্র।

দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩য় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে 'শ্যামরায়ের পালা'। ক্ষিতীশচন্দ্রের 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ১ম খণ্ডে এটি ৪১২ ছত্রে প্রকাশিত। অর্থাৎ দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থের তুলনায় ১৬টি ছত্র অধিক। অবশ্য আলোচ্য সংগ্রহের ৪১২ ছত্রের মধ্যে পালাটির 'ধুয়া' কিংবা 'দোয়ারকি' ছত্র স্থান পায়নি।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩য় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে। এই খণ্ডে যে ক'টি গীতিকা স্থান পেয়েছে সেগুলি হ'ল যথাক্রমে কাঞ্চনকন্যা, কমলা রাণীর পালা, রাজকন্যা রূপবতী, পীর বাতাসী কন্যার পালা, সদাগরকন্যাবগুলা, দেওয়ানামদিনা, আমিনা বিবি ও নছর মালুম পালা এবং মণির ওঝা-মাঞ্জুর মাও।

দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ২য় খণ্ডে প্রকাশিত 'ধোপার পাট' পালাটিই বর্তমান গ্রন্থে 'কাঞ্চনকন্যা' নামে প্রকাশিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে প্রকাশিত পালাটির ৪৬৬টি ছত্র স্থান পেয়েছে বর্তমান পালাটিতে। ক্ষিতীশচন্দ্রের সংগৃহীত এই পালাটির মোট ছত্রসংখ্যা ৭৫০। বর্ত্তমান পালার সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের সংগৃহীত পালার ৭৭টি ছত্রের পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে সঙ্কলিত 'কমলা রাণী' এই পালাটির ছত্র সংখ্যা ৬৬০। দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থের ৩৪১টি ছত্র ব্যতিরেকে বর্তমান পালাটির ৩১৯টি ছত্রই নূতন। বর্তমান পালায় দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে সংকলিত এই পালাটির ৩৪১টি ছত্র মাত্র স্থান পেয়েছে। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় [২য় খণ্ড] প্রকাশিত 'কমলা রাণী' পালার প্রথম দিকের চারটি অধ্যায় অনুপস্থিত। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার শাস্তাপুর গ্রামের মাখনলাল সাহার গৃহে বর্ত্তমান পালাটির সম্পূর্ণ

অংশ সংগ্রহ করেন। দীনেশচন্দ্রের তুলনায় বর্তমান পালায় ৩৮টি ছত্রে তাৎপর্য ঘটিত পার্থক্য বিদ্যমান।

আমাদের আলোচ্য সংকলনে 'ধৃত রাজকন্যা রূপবতী পালা'র ছত্রসংখ্যা ৬৩৩ এবং তা এক প্রস্থেই। দীনেশচন্দ্রের সংকলনে ধৃত ২৯৯টি ছত্র বর্ত্তমান পাঠে বিদ্যমান। ১২৫টি ছত্র বাদ গেছে। ক্ষিতীশচন্দ্রের সংগ্রহে ধৃত নতুন ছত্র সংখ্যা ৩৩৪। বর্তমান পাঠে ধৃত ৮ম, ১১শ ও ১২শ অধ্যায় দীনেশচন্দ্রের সংগ্রহে অনুপস্থিত।

বর্তমান সংকলনে প্রকাশিত তৃতীয় পালাটি হ'ল 'পীর বাতাসীর পালা'। ছত্রসংখ্যা ৬১৯। তন্মধ্যে দীনেশচন্দ্রের সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ডে ধৃত পালাটির ৫০৫টি ছত্র বর্ত্তমান। ক্ষিতীশ-চন্দ্রের সংগ্রহে 'সদাগর কন্যা বগুলা' নামে প্রকাশিত পালাটিতে ধৃত ছত্র সংখ্যা ৬২৭ অর্থাৎ দীনেশচন্দ্রের তুলনায় বর্ত্তমান পালায় ২০২টি অতিরিক্ত ছত্র স্থান পেয়েছে।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় ধৃত 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটি বর্ত্তমান সংকলনে 'আলাল দুলালের পালা' নামে প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষিতীশচন্দ্রের গ্রন্থে পালাটি ১০১৪টি ছত্র সম্বলিত। অর্থাৎ দীনেশ-চন্দ্রের তুলনায় ১৯৪টি ছত্র অধিক। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটি ৭টি অধ্যায় সম্বলিত, কিন্তু বর্তমান সংকলনে ধৃত পাঠটির অধ্যায় সংখ্যা ১৩।

'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ডে প্রকাশিত 'নছর মালুম' পালাটি বর্তমান সংকলনে 'আমিনা বিবি ও নছর মালুম পালা' নামে প্রকাশিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থের তুলনায় বর্তমান সংকলনে ধৃত এই পালাটির ছত্রসংখ্যা ৮৪টি অধিক অর্থাৎ মোট ছত্রসংখ্যা ৯৩৮।

বর্তমান সংকলনে প্রকাশিত 'মণির ওঝা-মাঞ্জুর মাও' পালার ছত্রসংখ্যা ২৪০।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩য় খণ্ডটি ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে। এই খণ্ডে সংকলিত পালাগুলি হ'ল যথাক্রমে—লীলাকন্যা, কবি কঙ্ক, ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধু, কমলা কন্যা, কাফেন চোরা, সুনাই সুন্দরী, ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী এবং শীলা দেবী।

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় প্রকাশিত 'লীলাকঙ্কে'র পালাটি ক্ষিতীশবাবুর গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে ১৪৯৮টি ছত্রে। অর্থাৎ দীনেশচন্দ্রের তুলনায় ৪৯২টি ছত্র অধিক। দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে ধৃত 'লীলাকঙ্ক' পালাটির ১০০৬টি ছত্রই অবশ্য বর্তমান সংকলনে স্থান পেয়েছে।

দীনেশচন্দ্র 'ভেলুয়া' নামে যে পালাটি প্রকাশ করেছেন, বর্তমান সম্পাদক সংকলিত সেই পালাটিই 'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা'; ছত্রসংখ্যা ১২৭৪। বর্তমান সম্পাদক পালাটির ভূমিকায় বলেছেন :

'পূর্ববঙ্গে চট্টগ্রাম নোয়াখালি ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলার পল্লী অঞ্চলে দুইটি 'ভোলুয়া সোন্দরীর পালা' প্রচলিত আছে। দুইটি পালার কাহিনী, নায়ক নায়িকা, ঘটনাস্থল ও ঘটনার কাল পৃথক। মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় দুইটি পালাই 'ভেলুয়া' নামে প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা পার্থক্য বুঝাইবার জন্য 'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা' নাম দিলাম।'

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩য় খণ্ডে সঙ্কলিত 'কমলা কন্যার পালা' ১৪২৬টি ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বর্ত্তমান সম্পাদক এই পালাটি মৈমনসিংহ জেলার শেরপুর সহরস্থিত নগেন্দ্রনাথ সাহা এবং ইসলামপুরস্থিত ঈশান মিস্ত্রী গায়েনের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন।

দীনেশচন্দ্র সেনের 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩য় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে 'আয়রা বিবির পালা'। ক্ষিতীশবাবু এ'টিকেই 'কাফেনচোরা পালা

নামে প্রকাশ করেছেন। 'কাফেন চোরা'র ছত্রসংখ্যা ৫৩৬। তন্মধ্যে ৫২৪টি ছত্র দীনেশচন্দ্রের সংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ মাত্র ১২টি নূতন ছত্র বর্তমান পালাটিতে সংযোজিত হয়েছে।

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সুনাই সুন্দরী' পালাটি আসলে দীনেশচন্দ্র প্রকাশিত 'দেওয়ান ভাবনা' শীর্ষক পালা। ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদিত পালাটিতে অতিরিক্ত ১৭১টি ছত্রের সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ মৌলিক সম্পাদিত পালাটির মোট ছত্রসংখ্যা ৫৪৫।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩য় খণ্ডে ধৃত 'ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতীর পালা'র ছত্র সংখ্যা ৬২০। অবশ্য দীনেশচন্দ্রের সম্পাদিত পালার ৪৯৮টি ছত্র ক্ষিতীশচন্দ্রের সংগৃহীত পালায় স্থান পেয়েছে। 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩য় খণ্ডে প্রকাশিত 'শীলাদেবী' পালাটির ছত্র সংখ্যা ৬২৮। দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত পালার সঙ্গে এই পালাটির মোট ৬১টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে। বর্তমান পালাটি দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পালার সঙ্গে মৈমনসিংহ জেলাস্থিত কোবডহরা গ্রামের মোহনলাল পালের গৃহে রক্ষিত খাতার পালার সাহায্যে প্রকাশিত হয়েছে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে। এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে রঙ্গমালা সুন্দরী বা চৌধুরীর লড়াই, ভরার মেয়ের গান, মাণিকতারা ডাকাইত, নেজাম ডাকাইত পীরের কেরামতি, মইযাল বন্ধু—সাঁজুতী কন্যা ও শান্তি কন্যার হাঁহলা।

দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩য় খণ্ডে 'চৌধুরীর লড়াই' পালাটি প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষিতীশচন্দ্র এই পালাটিকেই 'রঙ্গ মালা সুন্দরী বা চৌধুরীর লড়াই' নামে প্রকাশ করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। মৌলিকের সংকলিত এই পালাটির পদ্য ছত্রসংখ্যা ৩০০২। দীনেশচন্দ্র সংকলিত ২৬৩২টি ছত্র অবশ্য মৌলিকের সম্পাদিত গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

ক্ষিতীশচন্দ্র সংকলিত 'ভরার মেয়ের গান' দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে স্থান পায়নি। তিনটি 'ছুটা গান' এবং 'ভরার মেয়ের বারমাসী' ক্ষিতিশচন্দ্র সংকলিত করেছেন। 'বারমাসটী'র শুরু আশ্বিন মাস থেকে এবং শেষ ভাদ্র মাসের বর্ণনায়।

ক্ষিতীশচন্দ্র সংকলিত 'মাণিকতারা ডাকাইতের পালাটি'র ছত্র সংখ্যা ৯৮২। বর্তমান পালাটির ১৬, ১৭ এবং ১৮ অধ্যায় নবতর সংযোজন। এই তিনটি অধ্যায় দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত পালায় অনুপস্থিত। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য যে, দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত এই পালাটি অসম্পূর্ণ, কিন্তু বর্তমান সম্পাদক পালাটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছেন।

'নেজাম ডাকাইত-পীরের কেরামতি' পালাটি ক্ষিতীশচন্দ্র ৫৪২টি ছত্রে প্রকাশ করেছেন। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ২য় খণ্ডে প্রকাশিত এই পালাটির ৪৩৪টি ছত্র অবশ্য বর্তমান সংকলনে স্থান পেয়েছে। ক্ষিতীশচন্দ্র এই পালাটি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পাংসার ফকির মাতাম সাঁইজীর আশ্রম থেকে সংগ্রহ করেছেন।

দীনেশচন্দ্র 'মইষাল বন্ধু' পালাটি 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ২য় খণ্ডে দুই প্রস্থে প্রকাশ করেছেন। লক্ষণীয়, বর্নিত ঘটনার অংশ বিশেষের বর্ণনাও দু' প্রকারের। তদুপরি দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত এই পালাটির দু'টি সংগ্রহই অসমাপ্ত। কিন্তু ক্ষিতিশচন্দ্রের সংকলিত এই পালাটি সম্পূর্ণ। ছত্রসংখ্যা ৮০৬। অবশ্য তন্মধ্যে ৫৮০টি ছত্র দীনেশচন্দ্র সংকলিত পালায় বর্তমান। বর্তমান সংগ্রহে দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থের তুলনায় ২০৬টি নতুন ছত্র সংযোজিত হয়েছে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ডের শেষ পালাটি হল 'শান্তি কন্যার হাঁহলা'।

১. The Science of Folklore ; Chapter IX ; page 173.
২. The Ballad of Tradition [New york, 1957] P. 3.
৩. Ibid, P. 10—11.
৪. Albert B. Friedman, Ed. The Viking Book of Folk Ballads of the English speaking world [Newyork, 1961, 2nd Ed] P. XIII.
৫. Mac Edward Leach—The Ballad Book, P 1 Haper and Brothers ; Newyork, 1955
৬. The date of Gopichandra ; Nalini Kanta Bhattasali Commemoration volume [1966, Dacca] PP 1—3.
৭. Sankar Sengupta ; Folklorists of Bengal ; page 153
৮. ভূমিকা ; 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ; পৃঃ ৵০
৯. Dr. Dusan Zbavitel ; Bengali Folk-Ballads from Mymensingh ; Page X.
১০. ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লোকসংস্কৃতিচর্চা , পৃঃ ১।
১১. ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ; আশুতোষ স্মৃতিকথা [১৯৩৫]
১২. পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ; ৩য় খণ্ড ; ২য় সংখ্যা [১৯৩৩] পৃঽ ৶০

পরিশিষ্ট

[ক]

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ সম্পাদিত ও মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী সঙ্কলিত এবং 'বাংলা একাডেমী' (ঢাকা) প্রকাশিত 'লোক-সাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থটি সিরাজুদ্দীন সাহেবের লোকসাহিত্য সম্পর্কিত দ্বিতীয় প্রয়াস। গ্রন্থটিতে সঙ্কলক ৯৭৮টি প্রবাদ সঙ্কলন করেছেন। প্রতিটি প্রবাদের সঙ্গে তার ভাবার্থ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পাদটীকায় দুরূহ ও অপরিচিত শব্দের অর্থও প্রদত্ত হয়েছে। প্রবাদগুলি বর্ণমালার ক্রম পরম্পরায় সজ্জিত। বিষয়বস্তু ও ভাব অবলম্বনে প্রবাদগুলিকে বিভক্ত করা হয়নি। তবে প্রথম দিকে প্রবাদের সঙ্কলন সন্নিবিষ্ট করার পূর্বে সঙ্কলক মাতৃত্ব বিষয়ক, পুত্রের স্ত্রৈণতাজনিত কিছু প্রবাদ বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন।

ছড়ার নানা পাঠান্তরের জন্য তার কামচারিতা ধর্মকে দায়ী করা হয়, কিন্তু লোক-সাহিত্যের অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রে পাঠান্তর তেমন বহুধা বিস্তৃত নয়। বিশেষত প্রবাদের ক্ষেত্রে আমরা একই ভাব প্রকাশক যে ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদের প্রচলন লক্ষ্য করি, তা একই প্রবাদের পরিবর্তিত রূপ অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ও পরিবেশে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের যে একইরূপ অভিজ্ঞতা হয়, সেই অভিন্ন অভিজ্ঞতারই ভিন্নতর প্রকাশ মাত্র বলে বলা যেতে পারে। জীবন-পথ পরিক্রমা কালে এরকম অভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ মানুষের আসে। আলোচ্য গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কিছু প্রবাদ এবং তৎসহ সেগুলির তুলনামূলক অন্য প্রবাদের উল্লেখ করা গেল—

১। অনেক মাতবরে কাজ নষ্ট (তুলনীয়—অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট)

২। পানির ছিটা দিলেই ছুইয়ের বাড়ি খাইতে হয়
(তুলনীয়—ইঁটটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়)

৩। চুল নাই নেড়ি নেড়ি কাঁকইর লাইগ্যা মরে।
কচু পাতার পুট্‌লা বাইন্ধ্যা খোঁপা বড় করে॥
(তুলনীয়—হাতে নাই পয়সা কড়ি, অইতাম চাই সাধের বেপারী)

৪। নাই মা'র চেয়ে কানা মা ভাল। (তুলনীয়—নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল)

৫। পড়শী যারা আয়না তারা। (তুলনীয়—ছায়ারে ঠেং দেখাইলে সেও ঠেং দেখায়)

৬। বলবার কথা নয়, গিন্নি মারছে। (তুলনীয়—কইতে লাজ করে, গিরখাইনে কিলাইছে)

৭। এক এড়ী আর এক এড়ীরে কয়
তুইন কাম জানস্‌না। (তুলনীয়—চালুনি কয় ধুচুনি তোর পেছন কেন ছাঁদা)

৮। একের লড়ি, অন্যের বোঝা। (তুলনীয়—দশের লাঠি একের বোঝা)

৯। গরীবের মাইয়ার রূপ বৈরী। (তুলনীয়—অপনা মাসে হরিণা বৈরী)

১০। ঘরের চোরে রাবণ বন্দী। (তুলনীয়—ঘর শত্রু বিভীষণ)

১১। ডক্‌ নাই লছন নাই, হিন্দুর মাইখ্যা বইছে।

১২। ঠেলায় পড়্‌ইয়া চেলায় সালাম। (তুলনীয়—ভূতের মুখে রাম নাম)

১৩। ধনীর মাথায় ধর ছাতি।
গরীবের মাথায় মার লাত্থি॥ (তুলনীয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া)

১৪। নউখের কাঁড়া কুড়াল দিয়া তোলা। (তুলনীয়—মশা মারতে কামান দাগা)

১৫। নিজে হুইবার জা'গা নাই,
শুক্কুর্ইয়ার মারে ডাকে। (তুলনীয়—আপনি শুতে ঠাঁই পায়না শঙ্করাকে ডাকে)

এইবার দুরূহ ও অপরিচিত আঞ্চলিক শব্দ যুক্ত কয়েকটি প্রবাদ উদ্ধার করা হল—

১। অকাজের মানুষ ভুতুরা দা। (ভুতুরা—ভোঁতা)
২। অতি আদরে বাওয়াস।
অনাদরে সর্বনাশ॥ (বাওয়াস—সুপক্ক লাউয়ের অন্তঃসার শূন্য খোলস)
৩। আইধ্যার আঠা, তাও ধুরা। (ধুরা—চিটা, চালহীন ধান)
৪। আউলা বাঘই জালে পড়ে। (আউলা—দলহীন/বোকা)
৫। আত্তির লেদা দেইখ্যা খাডাশের কুঁয়ানী। (আত্তির—হাতীর ; খাডাশের—খরগোশের)
৬। আতের বারাত ধন থু্ইয়া
হাত রাজ্যি অয়রাণ। (বারাত—নিকট ; হয়রাণ—অয়রাণ)
৭। আপ্নায় দাপনা ভাংগে। (দাপনা—ডানা/শক্তি/পাঁজর)
৮। আপনার লগুণ পরকে দিয়া।
বামুন মরে হতাশ অইয়া॥ (লগুণ—পৈতা)
৯। আ—ভাত্ত্যার তলা-গল্যা নাই। (আ—ভাতত্যা—হাভাতে; তলাগল্যা—ধৈর্য/সন্তোষ)
১০। আলা আলা পেন্দের ছালা।
পেন কর্ইয়াছে গলার মালা॥ (আলা আলা—আনন্দ প্রকাশ, পেন্দের—আনন্দের)
১১। আল্লুয়ার আল।
জাল্লুয়ার জাল॥ (আল্লুয়া—হালুয়া/চাষা ; জাল্লুয়া জেলে)

১২। আ—লবণ্যার জাত।
চাড়ে নিজের আত॥ (আ লবণ্যা—লবণহীন)

১৩। উইএর মার্গে ফইর অইলে মুন্না বাড়িত যায়।
(ফইর—পাখা)

১৪। উগ্‌গারীর ঘাড়ে লাথি।
যা উগ্‌গারী হুদা আতি। (উগ্‌গারী—উপকারী ; হুদা আতি=খালি হাতে)

১৫। উজ্‌জিয়ার কই হুক্‌না দিয়া চলে। (উজ্‌জিয়া—প্রথম বর্ষার জলে মাছ উজান দিকে যায়। আঞ্চলিক ভাষায় একে বলে উজ্‌জিয়া। হুক্‌না—শুকনা)

১৬। এক উললায় সাত বাড়ি উজাড়। (উল্‌ল্যা—হুলো বিড়াল)

১৭। কম জাত ভালা, কম ছিফৎ ভালা না। (ছিফৎ—গুণ/ব্যবহার)

১৮। কানা গরুর জুদা বাথান। (জুদা—পৃথক)

১৯। কুড়্‌ইয়া পুলা আর গড়্‌ইয়া বলদে লাভ নাই।
(কুড়্‌ইয়া—কুঁড়ে; গড়্‌ইয়া—হালের সময় যে বলদ মাটিতে শোয়)

২০। গোঁয়ার মরে ডোঁয়ার পড়্‌ইয়া (ডোঁয়ার—নদীর গভীর স্থান)

২১। চউখের দোষে সব অইল্‌দা (অইলদা—হলুদ)

২২। ছাড়েও না ধরেও না কাউসালি সার। (কাউসালি—বিড়ম্বনা)

২৩। গরীবের ঘরেই কচ্‌কাল (কচ্‌কাল—কলহ বিবাদ)

২৪। গোবরেও পইদ ফুল ফোটে (পইদ—পদ্ম)

২৫। গোশ্‌ত খায় না, সরউয়া চায়। (সরউয়া—ঝোল)

২৬। গোয়াল নিজের দইকে চুক্কা বলে না। (চুক্কা—টক)

২৭। ছাকর বন্দের টুই উদাস। (ছাকর বন্দ—ঘরামি)

২৮। ডক্ নাই লছন নাই, হিন্দুর মাইখ্যা বইছে। (ডক্—সৌন্দর্য ; লছন—পারিপাট্য)

২৯। ঠেলিবার শক্তি নাই, আতানিত সাউগার (আতানিত—হাতিরে দেখা ; সাউগার—মত্ত ; শক্তিশালী)

এইবার একটি প্রবাদের উৎপত্তিসূচক কাহিনী উদ্ধার করা গেল। 'কথা কইব যে, দুয়ার দিব সে'—প্রবাদটির উৎপত্তিসূচক কাহিনীটি হ'ল নিম্নরূপ—

এক বুড়ো-বুড়ীর সংসার। একবার সন্ধ্যাবেলায় এক দমক বাতাসে তাদের বন্ধ দরজা গেল খুলে। কেউ দরজা দিতে এগোয় না। সেই সুযোগে শেয়াল এসে ভাত তরকারী খেলে, চোর ঢুকে বাড়ীর সবকিছু নিয়ে গেল। তবু কেউ কোন কথা বললে না।

ভোরে উঠে বুড়ী অপরের বাড়ীতে কাজে চলে গেল। বুড়ো নির্বাক হয়ে বাড়ীর সামনে গিয়ে বসে রইল। এক নাপিত এসে বুড়োকে ডাকল—বুড়ো কিন্তু কোন কথা বললে না। নাপিত তখন রহস্য করে বুড়োর অর্ধেক দাড়ি কামিয়ে দিয়ে চলে গেল। বুড়ো তবু কোন কথা বললে না। প্রায় দুপুরবেলা বুড়ী বাড়ী ফিরে বুড়োর অবস্থা দেখে হেসে বললে, 'বেশ হয়েছে'। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো বুড়ীকে বলে উঠল, 'তুমি আগে কথা বলেছ, এখন দরজা বন্ধ করার দায়িত্ব তোমার।'

খোদেজা খাতুন 'বগুড়ার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে (১৯৭০) লোক-সাহিত্যের নানা বিষয় অবলম্বনে আলোচনা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'গ্রাম্য প্রবাদ' সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। প্রবাদ সম্পর্কিত আলোচনাটি দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে লেখিকা মূলতঃ প্রবাদের কার্যকরী শক্তি এবং বিশেষতঃ বগুড়া অঞ্চলে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষায় রচিত প্রবাদগুলি পাঠকের বোধ-

গম্য করার অভিপ্রায়ে বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করে নিয়েছেন। অনেকেই আঞ্চলিক ভাষায় রচিত লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানকে সাধারণের বোধগম্য করার জন্য পরিবর্তিত ও বিকৃত করে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু লেখিকা এই ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণের পরিবর্তে যে আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করে পাঠককে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত প্রবাদগুলি অনুধাবন করার ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রয়াসী হয়েছেন, এজন্য তিনি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদার্হ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখিকা ১৪২টি প্রবাদ অর্থসহ সঙ্কলন করেছেন। তবে সঙ্কলিত সব ক'টিই প্রবাদ নয়। কিছু কিছু বাক্যাংশও আছে। যেমন—আম্বু আম্বু করা, গাও ক্যাম্বা ক্যাম্বা করা, যার যার তার তার, পাল না পরব, দিনের লাগাল পাওয়া, কামের জঞ্জালী, জারিজুরি না খাটা, নৈলুট করে খাওয়া, ল্যাকর থ্যাকর করা, ছালু বালু করা, প্যাগনা করা, লব লব করা, ঢ্যামর ঢ্যামর করা ইত্যাদি। এইবার সঙ্কলিত কয়েকটি প্রবাদ উদ্ধার করা গেল ঃ

ক। ছলোক থাবা, বুড়োক বাবা।
(ছোটকে মেরে ও বড়কে সম্মান দেখিয়ে শিক্ষা দেওয়া)

খ। আগে হাঁটে প্রসাদ বাঁটে লায়ের ধরে হাল এই তিনে খায় গাল।
(সমাজের মাথা, প্রসাদ বণ্টনকারী ও নৌকা চালক সদাই গালিগালাজ খায়)

গ। খাউয়া মুখোত মুগের ডাল
খাবু আর পারবু গাল।
(কোন কিছুতে অধিকার না থাকা সত্ত্বেও অধিকার লাভে প্রয়াসী)

ঘ। ক'লে মা মার খায়
না ক'লে বা' কুত্তো খায়।

—এই প্রবাদটির অর্থ হল—উভয় সঙ্কট। প্রবাদটি সৃষ্টির মূলে একটি কাহিনী বিদ্যমান রয়েছে। কাহিনীটি হল—'মাংস এনে গৃহস্থ গৃহিনীকে রাঁধতে বলেছে। গৃহিনী মাংস রেখে অন্য ঘরে গেছে মশলা আনতে। এদিকে একটা কুকুরে সে মাংস খেয়ে ফেলেছে। ভয়ে অস্থির হয়ে গৃহিনী সেই কুকুরকে কেটেই রেঁধেছে। গৃহস্থের ছোট ছেলে এই কুকুরকে কাটতে দেখেছে; সুতরাং সে বলছে যদি একথা বলি তবে মা মার খাবে আর যদি না বলি তবে বাবা কুকুরের মাংস খাবে।'

ঙ। পানোত হিনি চুন
খসপ্যার দেয় না (কৃপণতা করা)

চ। বিটির বক্ত আর বান্দীর বক্ত।
(মেয়ের ভাগ্য বান্দীর ভাগ্যের সমান)

ছ। বিয়ার এক কথা
লিকার লব্বই কথা।
(মেয়েদের প্রথম বিবাহ সহজে হলেও দ্বিতীয়বার বিবাহে অনেক কথা ওঠে)

জ। ব্যাটা খালে আট্যা ধরে
একলা খালে দাদ্দারে ধরে।
(সবাই সহানুভূতির চোখে না দেখলে তার ভাল হয় না)

ঝ। ধার কাউয়ার মুখে স্যান্দ্র্যা আম। (বানরের গলায় মুক্তার মালা)

ঞ। এক দুলালীর তিন শাড়ী
তাও দুলালীর মন ভারি। (বেশি আদরের সন্তানের আদরের শেষ নেই)

ট। একনা হ'লে আলাই দুলাই
আর একনা হ'লে ভাঙ্গা তালাই
আর একনা হ'লে বাড়ীর বালাই। (সন্তানের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, ততই তারা উপেক্ষিত হয়)

মোহাম্মদ হানীফ পাঠান বিরচিত, বাংলা একাডেমী [ঢাকা] থেকে প্রকাশিত ১৩৮২ (১৯৭৬) 'বাংলা প্রবাদ পরিচিতি' বাংলা প্রবাদ চর্চার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গ্রন্থটিকে আমরা বাংলা প্রবাদের তৃতীয় বৃহত্তম সঙ্কলনের মর্যাদা দান করতে পারি। প্রথম বৃহত্তম সঙ্কলন হল ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের গ্রন্থটি। দ্বিতীয় বৃহত্তম সঙ্কলন ডঃ সুশীল কুমার দে'র 'বাংলা প্রবাদ'। বর্তমান সঙ্কলনে প্রায় ৩৩০০ প্রবাদ স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে দুইশতের কিছু অধিক সংখ্যক খনার বচনও সঙ্কলনটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে লেখক ঢাকা থেকে 'পল্লী সাহিত্যের কুড়ান মাণিক' নামে স্থানীয় ২৫৩টি প্রবাদের একটি সংগ্রহ ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করেন। লেখকের প্রবাদ সংগ্রহের দ্বিতীয় পর্যায় বর্তমান গ্রন্থটি। লেখকের ভাষায়ঃ

'১৩৪৩ সনে প্রকাশিত 'কুড়ান মাণিকের' পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণরূপে এই 'প্রবাদ-পরিচিতি' সংগৃহীত ও ব্যাখ্যাসহ সম্পাদিত হইল।'

সংগৃহীত প্রবাদগুলির সংগ্রহ স্থান, প্রত্যেকটি প্রবাদের পাশে জেলার নামের আদ্যক্ষর দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেওয়ায় সঙ্কলনটির বৈজ্ঞানিক চরিত্র রক্ষিত হয়েছে।

সঙ্কলনটির পরিশিষ্টে প্রবাদে ব্যবহৃত প্রায় সাতশত শব্দের অর্থের একটি তালিকা বর্ণমালার ক্রম পরম্পরায় প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে পাঠকের পক্ষে প্রবাদের অর্থ অনুধাবন সহজতর হয়েছে। স্থান কাল পাত্র ভেদে একই প্রবাদ যদিও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পরিগ্রহ করে থাকে, লেখক কিন্তু একটি মাত্র ব্যাখ্যাই তাঁর সঙ্কলনে সন্নিবিষ্ট করেছেন। অবশ্যই তা সংক্ষিপ্ততার খাতিরে। সঙ্কলিত সব প্রবাদ কিন্তু সংহত সমাজের সৃষ্ট নয়। কিছু কিছু সাহিত্যিক প্রবাদও গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। যেমন—

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত ঃ

ক। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। (১৬৬। ১৫)

খ। উত্তমে উত্তমে মিলে অধমে অধমে,
কোথায় মিলন হয় অধমে উত্তমে? (১৯৫। ২৬)

গ। যার ঘরে সিঁধ সে কি যায় নিদ্? (৫০১)

ঘ। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। (পৃঃ ২৬৪। ২)

ঙ। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। (পৃঃ ২৬৪। ১)

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার রচিত ঃ

চ। স্বর্গ, স্বর্গ করে লোকে সার তার নাম,
প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম। (১৯৪। ২৫)

ছ। আশায় বঞ্চিত হ'লে আসিবে না আর,
আর না করিবে এই মধুর ঝঙ্কার। (পৃঃ ৩১০। ৩২)

জ। চাওয়া কিছু অপরের মুখপানে চেয়ে,
না-খেয়ে পরাণে মরা ভাল তার চেয়ে। (পৃঃ ১৬৩। ৯)

রবীন্দ্রনাথ রচিত ঃ

ঝ। প্রেমের ফাঁদ পাতা-ভুবনে
কোথায় কে ধরা পড়ে কে জানে। (২১৪। ১)

শেখ ফজলুল করিম রচিত ঃ

ঞ। প্রীতি প্রেমের পুণ্য বাঁধনে
যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন
মোদের কুঁড়ে ঘরে। (পৃঃ ২২২। ৪৮)

মুঃ আঃ রহিম রচিত ঃ

ট। আগুণে জ্বলিয়া আমি হইব কবাব,
তবু না-যাইব আমি দুশমনের গোরে। (পৃঃ ২০৩। ১৩)

আবার বেশ কিছু প্রবাদ নয়, ছড়া জাতীয় রচনাও সঙ্কলনটিতে

স্থান লাভ করেছে লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ 'নারী' বিষয়ক প্রবাদ বলে প্রকাশ করা হয়েছে—

এও জানি, সেও জানি,
কিছু নাই বাকী,
সতীনে দিলে সোনার গয়না
মোরে দিলে ফাঁকি। (পৃঃ ৫৩। ১৫৮)

কিংবা,

ময়না, ময়না, ময়না,
সতীন যেন হয় না,
বঁটি, বঁটি, বঁটি,
সতীনকে ধরে কাটি। (পৃঃ ৫৩। ১৬১)

অথবা—

কিসের মাসী, কিসের পিসী,
কিসের বৃন্দাবন,
মরা—গাছে ফুল ফুটেছে,
মা বড় ধন। (পৃঃ ৫৮। ১৮৩)

পুনরায়—

ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ।
তুমি কাট চাল্‌তা,
আমি কাটি লাউ,
গতর-খাকী বউকে বল—
'ধান ভানিতে যাও'। (পৃঃ ৬৯। ২৪৮)

আবার,

কুমোরের হাঁপরে কত কি পোড়ায়,
কোনটা ভাল থাকে, কোনটা ফেটে যায়। (পৃঃ ৪১৯)

ছড়া জাতীয় রচনা ছাড়াও বেশ কিছু বাগ্‌ধারা বা বাক্যাংশকেও প্রবাদ বলে গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—

তিনেও নাই,
তেরতেও নাই। (পৃঃ ১৯০। ৬)
সাতেও নাই
পাঁচেও নাই। (পৃঃ ১৯০। ৭)
হয় এস্‌পার
নয় ওসপার। (পৃঃ ২৬৫। ৬)
যাক প্রাণ
থাক মান। (পৃঃ ২৬৫। ৭)
যাবৎ জীবন
তাবৎ চেষ্টা। (পৃঃ ২৬৫। ১০)

লেখক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন ঃ

'......অধিকাংশ প্রবাদ আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। কাজেই সর্বসাধারণে বুঝিবার জন্য ইহাদের কিছুটা ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। সর্বশেষ সংগ্রহটিতে (ডঃ সুশীল কুমার দে প্রণীত 'বাংলা প্রবাদ') কোন ব্যাখ্যা না থাকায় এবং বিষয় অনুসারে ভাগ না থাকায় সাধারণ পাঠক-সমাজ প্রবাদগুলির রস গ্রহণে বঞ্চিত। বিশেষ করিয়া ছাত্রগণ লেখক বক্তাগণ ইহা হইতে বিষয় বিশেষের জন্য প্রবাদ সংগ্রহ করিতে গিয়া হাঁপাইতে পড়িতে বাধ্য হন। কাজেই প্রবাদগুলিকে শিক্ষিত জনসাধারণের সহজ লভ্য এবং সহজবোধ্য করা বিশেষ আবশ্যক।' (পৃঃ ২২ ; ভূমিকা)

এই কারণেই যে লেখকের তাঁর বর্তমান গ্রন্থটি রচনার পরিকল্পনা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আর সেইজন্য তিনি বিষয়ানুসারে তাঁর সঙ্কলিত প্রবাদগুলিকে সর্বমোট ৭০টি ভাগে বিভক্ত করে আভিধানিক প্রণালীতে সাজিয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়াও 'বিবিধ প্রবাদ' অধ্যায়ে পাঁচমিশালী প্রবাদ স্থান লাভ করেছে। লেখকের গ্রন্থটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল, বিষয় অনুসারে পারস্পরিক সম্পর্ক সাপেক্ষে প্রবাদ

গুলিকে এমন ব্যাখ্যা সহ উপস্থাপিত করা হয়েছে যে সঙ্কলিত প্রবাদগুলির মধ্যে অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এক প্রকার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে। ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষেও সঙ্কলিত প্রবাদগুলি বোধগম্য হয়েছে। এইবার লেখকের উদ্ধৃত মন্তব্য সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করা যেতে পারে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে ডঃ দে'র সঙ্কলিত 'বাংলা প্রবাদ' এ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা প্রবাদের সঙ্কলনগুলির মধ্যেই কেবল শ্রেষ্ঠ নয়, যে কোন গবেষণামূলক গ্রন্থের ক্ষেত্রে এটি একটি আদর্শস্থানীয় রচনা সন্দেহ নেই। এইবার লেখক সুশীল কুমারের সঙ্কলন থেকে বিষয় বিশেষের জন্য প্রবাদ সংগ্রহের দুরূহতা বিষয়ে যা বলেছেন সেই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য—'বাংলা প্রবাদে' সন্নিবিষ্ট বিশদ শব্দসূচী অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয় বিশেষ অবলম্বনে রচিত প্রবাদ সংগ্রহের বিশেষ সহায়ক। ডঃ দে'র বক্তব্যের পুনরুদ্ধার করে আমরা বলি ঃ

'প্রবাদ সংগ্রহের শব্দসূচী একটু বিস্তৃত ভাবেই সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা কেবলমাত্র বিশিষ্ট প্রবাদ খুঁজিয়া লইতে সাহায্য করিবে তাহা নয়, এই শব্দগুলি যে সব বস্তু বা বিষয়ের বাচক তাহার সম্বন্ধে বিবিধ প্রবাদ যিনি একত্র আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, এরূপ সূচী তাঁহার সাহায্য করিতে পারিবে।'

[খ]

বাংলা লোক সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ ও তদ্বিষয়ক আলোচনায় মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী একটি উল্লেখযোগ্য নাম। দীর্ঘদিন ধরে বহু পরিশ্রম ও বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি লোক সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। মধ্যে মধ্যে তাঁর কিছু কিছু সংগ্রহ সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে। কাসিমপুরী সাহেব সংগৃহীত ছড়াগুলি তাঁর 'লোক-সাহিত্যে ছড়া' নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে। ছড়ার এই উল্লেখযোগ্য সঙ্কলনটি প্রকাশ করেন ঢাকার বাংলা একাডেমী। গ্রন্থটিতে পরিশিষ্ট সহ চার শতাধিক ছড়া স্থান পেয়েছে। ছড়া সংগ্রহের সময় সঙ্কলক আঞ্চলিক ধ্বনির ওপর নির্ভর করে শব্দের বানান লিখেছেন। ছড়াগুলি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল—মীর্জাপুর, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, সিলেট, জামালপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, নোয়াখালী, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। সংগৃহীত ছড়াগুলির মধ্যে এমন সব আঞ্চলিক শব্দ আছে যেগুলি বাংলা শব্দকোষ প্রণয়নে যথেষ্ট সহায়ক। এরূপ কিছু বিচিত্র আঞ্চলিক শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে—শইল (১), হাসস্যা, ভাস্স্যা, কান্‌দ্যা (৩), ঢাল ল্যা ঘুঙ্‌গ্যা (৪) (গোসল করাবার ছড়া)

চউখে, ভর্‌র্যা (১), নিশুন, বাস্স্যা, নাইত্তর (৪), কাল্লা (৫), দিয়াম, মহুরু, (১২), বইও (১৯), শেমাই (২০), হগল (২৪), অলই (২৬) (ঘুম পাড়াবার ছড়া বাগান) লাড়ুমা, ওড়ুম, চাড়ুমা (১), আত্তি, লাত্তি (৮), লউ (৯), টেকা (১১) (শিশুর শিক্ষা দান ও আনন্দবর্ধনের ছড়া) ইত্যাদি।

সঙ্কলয়িতা সংগৃহীত ছড়াগুলির জটিল গবেষণায় ব্যাপৃত হওয়ার

পরিবর্তে সহজ, সরলভাবে সেগুলিকে উপস্থিত করেছেন। সংগৃহীত ছড়াগুলির বৈচিত্র্য ও সেগুলির সহজ সরল উপস্থাপনা সঙ্কলনটিকে বিশেষ জনপ্রিয়তার অধিকারী করেছে। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণই তার প্রমাণ।

প্রকৃতি, বিষয় ও আঙ্গিক বিচারে সঙ্কলক তাঁর সংগৃহীত ছড়াগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। —(১) শিশু বিষয়ক ছড়া ; (২) ছেলেমেয়েদের খেলা ও আমোদ প্রমোদের ছড়া এবং (৩) বিবিধ ছড়া।

শিশু বিষয়ক ছড়াগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 'গোসল করাইবার ছড়া'গুলি। কারণ এই পর্যায়ের ছড়াগুলি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সুবৃহৎ ছড়ার সঙ্কলনেও অনুপস্থিত। শিশুকে কেবল খাওয়ানো এবং ঘুম পাড়ানই যে কষ্টসাধ্য কাজ তা নয়, সেই সঙ্গে শিশুকে স্নান করানও বড়ই হাঙ্গামার ব্যাপার। তাই ঘুম পাড়ান ও খাওয়ানোর মত স্নান করান উপলক্ষ্যেও জননী বা জননী স্থানীয়া যারা, তাদের অনেক সময় ছড়ার সাহায্য নেওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। ছড়ার সুরজাল বিস্তার করে অনিচ্ছুক শিশুকে স্নান করান অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে পড়ে।—

খোকন আমার নয়ন মণি ঝলমল করে।
পাঁচ কলসের পানি দিয়া খোকন গোসল করে॥
আমার খোকন গোসল করে পানকৌড়ির ছা।
আয়রে আয় সূর্যি মামা একটু দেখ্‌খ্যা যা॥ (২)

ছড়ার রাজ্যে তুলনামূলক বিচারে সূর্য অপেক্ষা চন্দ্রের আধিপত্যই অধিক। এর প্রধান কারণ, জননীর অন্তহীন অপত্য স্নেহ তার শিশুর সৌন্দর্যের সঙ্গে চন্দ্রের অনুপম স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনায় সহজেই উদ্বুদ্ধ হয়। তাই জননীর কাছে শিশুই 'চাঁদ সোনা'য় রূপান্তরিত হয় (Transfered Epithet)। কিন্তু শিশুর স্নান বিষয়ক ছড়ায় চন্দ্রের পরিবর্তে সূর্যের আধিপত্য বিশেষ

ভাবে লক্ষণীয়। এর কারণ প্রথমত—শিশুকে যখন স্নান করান হয়, তখন আকাশে সূর্যেরই অবস্থান। অতএব শিশুর স্নানের দৃশ্যের ন্যায় লোভনীয় ও মনোরম দৃশ্য একমাত্র সূর্যি মামার পক্ষেই অবলোকন করা সম্ভব হয় এবং বিপরীতক্রমে হতভাগ্য চাঁদমামা তার আদরের ভাগ্নের স্নানের দৃশ্য অবলোকন জনিত সুখ ভোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। দ্বিতীয়ত শিশুর স্নানের সময় পাছে ঠাণ্ডা লাগে, তাই অবচেতন ভাবেই হয়ত সূর্যের উপস্থিতি প্রার্থনা করা হয়ে থাকবে।

স্নানের ছড়ার আর একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে। স্নানের মাধ্যমে শিশুর যে কেবল দৈহিক ময়লাই নিষ্কাশিত হয় তা নয়, সেই সঙ্গে কোন কোন ছড়ায় শিশুর আপদ বালাই দূরীভূত করার অভিপ্রায়ও ব্যক্ত হতে দেখা গেছে এবং তদুপরি শিশুর জীবনও কামনা করা হয়েছে—

আমার আবু গোসল করে সোনার খাডে বইয়া।
আবুর নানী চাইয়া রইছে দুধের বাডি লইয়া॥
আবুর গোসল অইয়া গেছে,
আপদ—বালাই দূরে গেছে,
গাঙের পানি গাঙে গেছে,
আবুর শইল শুকাইয়া গেছে।
জিঁও—জিঁও—জিঁও॥ (১)

ছেলেখেলার যেমন ছড়া আছে, তেমনি খেলাধুলা উপলক্ষে শিশু যখন আঘাত পায়, তখন সেই আঘাত দূরীকরণের জন্যও ছড়া রচিত হয়েছে। যেমন—

কচ্‌কা ঝাড়া মচ্‌কা ঝাড়া,
বিলাই হাগে ছড়া ছড়া,
কুত্তা হাগে দই;
এমন ঝাড়া ঝাড়্‌ইয়া দিলাম,
চৌদ্দ গোষ্ঠী সই॥ (পূর্ব-ময়মনসিংহ)

কিংবা,

কচ্‌কা কচুরি।
তেল দিয়া মুছুরি ॥
ইন্দ্রের চাটি বরমার তেল।
হাত দিতে না দিতে কচ্‌কা মিলি গেল ॥

(দক্ষিণ-ত্রিপুরা)

এক্ষেত্রে ছড়াগুলি যে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হয় তা কিন্তু নয়, তবে দৈহিক দিক দিয়ে আঘাত প্রাপ্ত শিশু এই ধরণের ছড়ার আবৃত্তিতে এক প্রকার মানসিক শক্তি লাভের অধিকারী হয়।

আমরা যতই কেন সভ্যতার উত্তুঙ্গ শীর্ষে আরোহণ জনিত অহংবোধের দ্বারা পরিচালিত হই, তবু এখনও বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন সকল মানুষ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির জাল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়। কিন্তু শিশু যেহেতু বৈষয়িক বুদ্ধি থেকে মুক্ত, তাই শিশুরাই প্রকৃত অর্থে অসাম্প্রদায়িক। শিশুরা যেমন অসাম্প্রদায়িক তেমনি তাদের জন্য রচিত ছড়াগুলিও একান্তভাবে অসাম্প্রদায়িক। এর সত্যতা আমরা আপদ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া উপলক্ষে রচিত ছড়াতেই লক্ষ্য করতে পারি, যেখানে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দেবতার নাম সমান শ্রদ্ধা সহকারে একত্রে উচ্চারিত হয়েছে—

ইর কাছুম বীর কাছুম, কাছুম যমদূত।
আন্ধা চোরা কাচ—কাছুম চণ্ডী মার পুত ॥
ভূত—-পেরত যত পাই,
বুক চির্‌ইয়া তার রক্ত খাই।
রাম চক্রবান্‌।
ঠাণ্ডা জিল্‌কী বান
দেও, দান, বাণ,

কাট্টট্যা করি খান খান।
রামের আজ্ঞা গুরুর পায়।
রক্ষা কর কালিকা চণ্ডীর মায়॥
হক্ না এলাহা ইল্লাল্লাহ,
মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্॥ (নেত্রকোণা)

বাঙ্‌লা একাডেমী প্রকাশিত এবং শিব প্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত 'যশোর খুলনার ছড়া' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে ১৩৭১ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থটিতে যশোর ও খুলনার মোট ২৬০টি ছড়া সঙ্কলিত হয়েছে। সংগৃহীত ছড়াগুলির সঙ্গে পাঠান্তর, টীকা-টিপ্পনী এবং ছড়া সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল গ্রন্থে সংকলিত ছড়াগুলির সুদীর্ঘ ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত আলোচনা। বলাবাহুল্য গ্রন্থে সংকলিত ছড়াগুলি যেহেতু খুলনা ও যশোর থেকে সংগৃহীত, তাই ছড়াগুলির ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা মূলতঃ খুলনা—যশোরের ভাষার বৈশিষ্ট্য আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। সম্পাদক ছড়ার দুর্বোধ্য এবং অপ্রচলিত শব্দাবলী সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন এবং উপযুক্ত অর্থ নির্দেশ করে পাঠককে ছড়াগুলির রসাস্বাদনের পূর্ণ সুযোগ করে দিয়েছেন। এমন কি সঙ্কলিত ছড়ায় প্রকাশিত হিন্দী, ফারসী, আরবী, ইংরেজি, পর্তুগীজ প্রভৃতি শব্দগুলিও লেখকের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা একদিকে যেমন বর্ণনানুক্রমিক হয়েছে, তেমনি আলোচ্য প্রতিটি শব্দের সঙ্গে সেই শব্দ যে বিশেষ ছড়া থেকে সংগৃহীত, তাও সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ফলে পাঠক সাধারণের পক্ষে অতি সহজেই প্রয়োজনীয় শব্দার্থ জেনে নেওয়া সম্ভব হয়। বস্তুতঃ ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য আলোচনায় একদিকে সম্পাদকের দুরূহ শ্রমশীলতা,

অপরপক্ষে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থটির অপর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বিস্তৃত শব্দসূচী। এক্ষেত্রেও বর্ণমালার ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে। গ্রন্থটির সব শেষে, সংকলিত ছড়াগুলির প্রথম পংক্তিটি বর্ণনানুক্রমিক ভাবে ছড়ার নির্দিষ্ট সংখ্যা সহ প্রকাশ করা হয়েছে। তাই অপরাপর ছড়ার গ্রন্থের তুলনায় এই গ্রন্থটি এক বিশিষ্ট ও সুসম্পাদিত সংকলন হিসাবে চিহ্নিত হবার উপযুক্ত দাবী রাখে।

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রধান দুটি ভাগ। একটি ভাগে ছড়ার বৈশিষ্ট্য, সাহিত্যিক উৎকর্ষ, বিষয় অনুযায়ী ছড়ার শ্রেণীবিভাগ, প্রতিটি শ্রেণীর শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য, ছড়ায় প্রকাশিত সমাজ চিত্র প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। বলাবাহুল্য এই প্রথম বিভাগটি গ্রন্থটির অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দ্বিতীয় বিভাগে প্রথমে যশোর এবং পরে খুলনা থেকে সংগৃহীত ছড়াগুলি নির্দিষ্ট বিষয় অনুযায়ী শ্রেণী পরম্পরায় প্রকাশিত হয়েছে। এই বিভাগটিতেও সম্পাদকের দূরদৃষ্টি ও মুন্সীয়ানা সার্থকভাবে প্রতিফলিত। ছড়ার সঙ্কলন প্রকাশের ক্ষেত্রেও সম্পাদক পাদটীকায় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শব্দার্থ সংযোজন করেছেন, সেই সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত ছড়ার সাদৃশ্যমূলক ছড়া অথবা অন্যত্র প্রকাশিত একই ছড়ার পাঠান্তর প্রকাশ করে পাঠককে তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছেন। সকল দিক বিবেচনা করে গ্রন্থটিকে তাই একটি আদর্শ ছড়ার সঙ্কলন রূপে অভিহিত করতে হয়। এইবার আলোচ্য সঙ্কলন থেকে কয়েকটি বহুল প্রচারিত ছড়া উদ্ধার করা যেতে পারে যে ছড়াগুলির পাঠান্তর বা রূপান্তর অন্যত্র সহজেই লক্ষিত হয়ে থাকে। এমনই একটি হল যশোর থেকে সংগৃহীত ১২ সংখ্যক ছেলে ভুলানো ছড়াটি—

ইকিড় মিকিড় চামচিকি,
চামে কাটা মজুমদার,

দে এলো দামোদর।
দামোদরের হাটি কুটি,
গোয়ালি বসে চাল কুটি,
চাল কুটতি হলো ব্যালা,
ভাত খাওসে দুপুর ব্যালা।
ভাতে পড়লো মাছি,
কুদাল দিইয়ে রাঁছি।
কুদাল হলো ভুঁতা,
খেকশিয়ালের মাথা॥

অনুরূপ ১৩ সংখ্যক ছড়াটি—

আমচিকে, চামচিকে,
চামে প'লো মজুমদার।
হাড়ি কুট্টো হলো বেলা,
ভাত খাওসে দুপুর বেলা।
ভাত প'লো মাছি,
কুদাল দিয়ে চাঁছি।
কুদাল হলো ভুতা,
খেকশিয়ালের মাথা॥

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কলকাতা থেকে সংগৃহীত তাঁর 'লোক সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত ২৩ নং ছড়াটি এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। সে ছড়াটি নিম্নরূপ—

ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম চিক্‌ড়ি
চাম কাটে মজুমদার।
ধেয়ে এল দামুদর।
দামুদর ছুতরের পো।
হিঙুল গাছে বেঁধে থো॥
হিঙুল করে কড়্‌মড়্‌।

দাদা দিলে জগন্নাথ ॥
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি।
দুয়োরে বসে চাল কাঁড়ি ॥
চাল কাঁড়তে হল বেলা।
ভাত খাওসে দুপুরবেলা ॥
ভাতে পড়ল মাছি।
কোদাল দিয়ে চাঁচি ॥
কোদাল হল ভোঁতা।
খা ছুতরের মাথা ॥

এইবার উদ্ধৃত তিনটি ছড়ার তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করে নেওয়া যেতে পারে যে মূলতঃ একটি ছড়াই তিন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কোনটি মূল এবং কোন দুটি পাঠান্তর তা নির্ণয় করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ সংকলিত ছড়াটি প্রথম দুটির তুলনায় দীর্ঘতর। আবার দ্বিতীয়টি সর্বাপেক্ষা স্বল্পায়তন বিশিষ্ট। প্রথম দুটি ছড়ায় 'চামচিকে' নামক বিসদৃশ প্রাণীটির সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও, তৃতীয়টিতে তৎপরিবর্তে 'চাম চিক্‌ড়ি'র উল্লেখ রয়েছে। এক্ষেত্রে 'চামচিকে' চামচিক্‌ড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে কিনা, কিংবা অন্যবিধ প্রাণীর অস্তিত্বের প্রতি রচনাকার ইঙ্গিত করেছেন কিনা সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা অসম্ভব। 'মজুমদার' নামক ব্যক্তির উল্লেখ তিনটি ছড়াতেই রয়েছে। তবে তার বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় ছড়ায় 'দামোদর' নামক এক ব্যক্তির ধাবিত হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে, যদিও তার এবংবিধ আচরণের কারণটি আমাদের কাছে অজ্ঞাত রাখা হয়েছে। তৃতীয় ছড়াটিতে দামোদরের পিতৃ পরিচয় টুকুও সংক্ষেপে বিধৃত হয়েছে, কিন্তু প্রথম দুটি ছড়ায় তার কোন পরিচয় দেওয়া হয়নি। প্রথম ছড়াটিতে দামোদরের হাঁড়িকুঁড়ির উল্লেখ রয়েছে এবং

গোয়ালে বসে চাল কোটার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। এত জায়গা থাকতে হঠাৎ চাল কোটার আদর্শ স্থান হিসাবে গোয়াল ঘরকে কেন নির্বাচিত করা হল তা অবশ্য বর্ণিত হয়নি। যাইহোক চাল কুটতে বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু তৃতীয় ছড়াটিতে দামোদরের পরিবর্তে জগন্নাথ স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং তার হাঁড়ি-কুঁড়ির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গোয়াল ঘরের পরিবর্তে দুয়ারে বসে চাল কোটার কথা বলা হয়েছে। তিনটি ছড়ারই শেষাংশে বেশ সাদৃশ্য বর্তমান। ভাতে মাছি পড়া, কোদাল দিয়ে সেই ভাত চেঁচে ফেলা, আর এই কার্যের ফলে কোদালের মুখ ভোঁতা হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ তিনটি ছড়াতেই উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম দুটি ছড়ায় খেঁকশিয়ালের মাথা দিয়ে ছড়ার সমাপ্তি ঘোষণা করা হলেও রবীন্দ্রনাথ সঙ্কলিত ছড়াটি ছুতোরের মাথা খাওয়ার গালি দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। লোক সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ছড়ার জনপ্রিয়তা যে কত সুদূর প্রসারী, তা এই বিভিন্ন পাঠান্তরের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়, প্রমাণিত হয় ছড়ার বিপুল বিস্তারের পেছনে অনেকের এর সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণের বিষয়টি।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (ছড়া) পূর্বোক্ত ছড়াটির ২৪ পরগণা, হুগলী এবং বর্ধমান থেকে সংগৃহীত মোট পাঁচটি পাঠান্তর প্রকাশ করেছেন। এই পাঠগুলির একটি মাত্র উদ্ধৃত করা গেল—

ইকির মিকির চাম চিকির
চাম কাটতে হ'ল বেলা।
ভাত খানারে জামাই শালা,
ভাতে পড়ল মাছি।
কোদাল দিয়ে চাঁছি,
কোদাল হ'ল বোঁথা,

কামার ঘর কোথা। (২৪ পরগণা)

উদ্ধৃত পাঠটি সহ অপর চারটি পাঠের সব ক'টিতেই 'জামাই শালা' কথাটির উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। ডঃ ভট্টাচার্য এই থেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ যে পদটি 'ভাত খাওসে দুপুরবেলা' রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহার প্রকৃত পাঠ 'ভাত খাওসে জামাই শালা।' কারণ, এই পাঠই সর্বত্র পাওয়া যাইতেছে, 'দুপুরবেলা' পাঠ কোন স্থান হইতেই সংগৃহীত হয় নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।' (পৃঃ ২৪৬)

ডঃ ভট্টাচার্যের এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি কারণের উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অপর কারণটি হল, 'ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ একটি ছড়ার একটি শব্দ মাত্র পরিবর্তন করিতে গিয়া এক সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে বিনা কৈফিয়তেই এই কাজটি তিনি সাধন করিয়াছেন; কারণ, শব্দটি তাঁহার নিজের কাছে আপত্তিজনক মনে হইয়াছে।' (পৃঃ ঐ)

কিন্তু আমাদের উদ্ধৃত যশোর থেকে সংগৃহীত দ্বাদশ-ত্রয়োদশ সংখ্যক ছড়াদুটিতে 'জামাইশালা' পদটির অনুপস্থিতিই প্রমাণ করে ডঃ ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি সঙ্গত নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শালীনতা বোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাঁর সঙ্কলিত এই ছড়ার পাঠটির বিশেষ একটি পদের পরিবর্ত্তন সাধন করেছিলেন, কথাটি যে যুক্তিগ্রাহ্য নয়, তা বোধ করি আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা।

এরপর খুলনা থেকে সংগৃহীত প্রথম ছেলে ভুলানো ছড়াটির (১২৭ সংখ্যক) উল্লেখ করা যেতে পারে—

আয় চান্ আয়,
কোন বনে আয়,
মাছ মারলে মুড়ো দেবো,
ধান ভানলে কুড়ো দেবো,
কাল গা'র দুদ্ দেবো,

ধলো গা'র বাছুর দেবো,
চানের কপালে চান
টিপ দিয়ে যা।

এখানে 'চন্দ্র' শব্দটিই রূপান্তরিত হয়েছে 'চান' শব্দে। এটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সঙ্কলিত একটি ছড়া তুলনীয়। ছড়াটি সম্ভবত কলকাতা থেকে সংগৃহীত—

আয় আয় চাঁদামামা টী দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা॥
মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
কালো গোরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা॥

উভয় ছড়াতেই চাঁদকে মাছের মুড়ো, ধানের কুঁড়ো, কালো গরুর সুমিষ্ট দুধ প্রভৃতির দ্বারা প্রলুব্ধ করা হয়েছে শিশুর কপালে টিপ দেবার জন্য। অনুরূপ আরও দুটি ছড়ার উল্লেখ করা যেতে পারে। আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক চট্টগ্রাম থেকে এই দুটি ছড়া সংগৃহীত হয়েছে—

ক। আয় চান্দ আয়্ আয়।
আইলা দেম্ বাইলা দেম্,
মাছ কুটি মেজা দেম্,
চূড়া ঝাড়ি কুরা দেম্
কলা ছুলি বাকল দেম্,
চান্দ্ কপালে পুড়ুস্॥

খ। আয়্ চান্দ আয়্ চান্দ।
কলা দিম্, মোলা দিম্,
ধেয়ন গাইয়র দুধু দিম্।

গাইয়র্ নাম চুঙ্গুরী,
ডেকার নাম ভুভুরী ॥ পুডুস্ ॥

মেকলে এযুগে মহাকাব্য রচনা কেন সম্ভব নয়, তার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'As civilization advances poetry declines'। অর্থাৎ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্য রচনার সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়ে যায়। কারণ মহাকাব্যের জন্য প্রয়োজনীয় সরলতা সভ্যতার জটিল আবর্ত থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। মেকলের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলা যেতে পারে—সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রভাবে লোক সাহিত্য সৃষ্টির উন্নততর ধারাটিও স্তব্ধ হয়ে যায়। লোক সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সরলতা অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান। আজকের দিনে সভ্যতাভিমানী মানুষের কাছে আকাশের চাঁদকে সামান্য মাছের মুড়ো, কালো গরুর দুধ প্রভৃতির প্রলোভনে প্রলুব্ধ করা একান্ত ভাবেই অসম্ভব হত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় এই বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন—'এত বড়ো লোকটা যিনি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র সুন্দরীর অন্তঃপুরে বর্ষ যাপন করিয়া থাকেন, যিনি সমস্ত সুরলোকের সুধারস আপনার অক্ষয় রৌপ্য পাত্রে রাত্রিদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, সেই শশলাঞ্ছন হিমাংশু মালীকে মাছের মুড়ো, ধানের কুঁড়ো, কালো গরুর দুধ খাবার বাটির প্রলোভন দেখাইতে কে সাহস করিত! আমরা হইলে বোধ করি পারিজাতের মধু, রজনীগন্ধার সৌরভ, বউ-কথা কওএর গান, মিলনের হাসি, হৃদয়ের আলো, নয়নের স্বপ্ন, নববধূর লজ্জা প্রভৃতি বিবিধ অপূর্ব জাতীয় দুর্লভ পদার্থের ফর্দ করিয়া বসিতাম —অথচ চাঁদ তখনো যেখানে ছিল এখনো সেইখানেই থাকিত। কিন্তু ছড়ার চাঁদকে ছড়ার লোকেরা মিথ্যা প্রলোভন দিতে সাহস করিত না—খোকার কপালে টী দিয়া যাইবার জন্য নামিয়া আসা চাঁদের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব তাহা তাহারা মনে করিত না।

সুতরাং ভাণ্ডারে যাহা মজুত আছে, তহবিলে যাহা কুলাইয়া উঠে, কবিত্বের উৎসাহে তাহার অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক কিছু স্বীকার করিয়া বসিতে পারিত না।'

(রবীন্দ্র রচনাবলী ; ত্রয়োদশ খণ্ড ; লোক সাহিত্য ; পৃঃ ৬৮০)

অধ্যক্ষা খোদেজা খাতুন রচিত এবং বাংলা একাডেমী (ঢাকা) প্রকাশিত 'বগুড়ার লোক-সাহিত্য' (১৩৭৭) গ্রন্থটির তৃতীয় অধ্যায়ে 'গ্রাম্য ছড়া' বিষয়ক আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। লেখিকা বগুড়া জেলায় প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের ছড়া (সংখ্যায় ৮০টির অধিক) সঙ্কলন করেছেন এবং প্রাসঙ্গিক মন্তব্যসহ প্রকাশ করেছেন। সঙ্কলিত ছড়াগুলির বৈচিত্র্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়—মাঙ্গনের ছড়া, ঐন্দ্রজালিক ছড়া, ঘুম পাড়ানো ছড়া, শিশুদের সোহাগ জাগানো ছড়া, খেলাধুলা সম্পর্কিত ছড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পৌষ মাসে শীতকালে যখন নতুন ধান ওঠে, গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থা বৎসরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় অনেকটা স্বচ্ছল হয়, সেই সময় গ্রামের ছেলেমেয়েরা চড়ুইভাতির আয়োজন করে। চড়ুইভাতিকে বগুড়ায় বলে 'ভুল্‌কো ভাত'। 'ভুল্‌কো ভাতে' অংশগ্রহণ কারীরা রাত্রিবেলায় লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাল, ডাল, তরি-তরকারী সংগ্রহ করে। সংগ্রহ করার সময় তারা ছড়া বলে ঃ

জংলি পাঁচ পীরের বর।
এলাম রে ভাই অরণে
মাও লক্ষীর চরণে।
মাও লক্ষী দিল বর
ধান কুলো দুই বার কর
ধান দেয়না দেয় কড়ি
তাক করি লড়িঝড়ি

লড়ি ঝড়ি রাম রে
সোনার কড়ি বাম রে।
সোনার কড়ি রূপার মালা
এই ঘরখানি দেখতে ভালো।
ঘর তো বড় ছাটেনি
গিরস্ত বড় আটুনি।
দেও ধান যাই দূর
সোনার গাঁও মথুরাপুর।
যা'তে আসতে অনেকদূর
মদ্দে এক সমুদ্দুর।
রাম ক'ল শ্যাম ক'ল
আমরা সব ছ'ল প'ল।
জারে কসল্যা পাই
এক কুলো ধান দাও
বাড়ী বিল্যা যাই॥

লেখিকা কর্মপ্রেরণা উদ্রিক্তকারী বলে যে ছড়াটির উল্লেখ করেছেন, আসলে সেটি Work Song, কর্ম সঙ্গীত—

দলের জোরে পর্বত লড়ে
হেঁইও মারোরে।
মারো ঠেলা হেঁইও
হেঁইও মারো রে।
মারো টান হেঁইও
হেঁইয়া মারো রে।

রবীন্দ্রনাথ 'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম' ছড়াটির চারটি বিভিন্ন পাঠ সংগ্রহ করেছিলেন এবং এই পাঠগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন ঃ

'......উদ্ধৃত ছড়াগুলির মধ্যে মূল পাঠ কোন্‌টি, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব, এবং মূল পাঠটি রক্ষা করিয়া অন্য পাঠগুলি ত্যাগ

করাও উচিত হয় না। ইহাদের পরিবর্তনগুলিও কৌতুকাবহ এবং বিশেষ আলোচনার যোগ্য।'

রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত পাঠগুলির পরেও এই একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে অন্য অনেকের সঙ্কলনে। বিশেষতঃ এই প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সঙ্কলিত ছড়াগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। সত্য কথা বলতে কি, এই একটি বিষয় অবলম্বনে রচিত এত অধিক সংখ্যক ছড়ার পাঠ আর এ পর্যন্ত হস্তগত হয়নি। ডঃ ভট্টাচার্যের ভাষায়, 'স্বাধীন বাংলার ডোম সৈন্যদলের আমল হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত··· এই ছড়াটি ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে হইতে আসিয়াছে।'

অধ্যক্ষা খোদেজা খাতুনও তাঁর সঙ্কলনে এই ছড়াটির একটি স্বতন্ত্র পাঠ প্রকাশ করেছেন, যে পাঠটির সঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্যের নদীয়া, ২৪ পরগণা, ঢাকা ও হুগলী থেকে সংগৃহীত পাঠগুলির গভীর সাদৃশ্য বিদ্যমান—

ওপেন্‌টি বাইস্কোপ
টাইটেন টেইস্কোপ।
ঘুলতানা বিবিয়ানা
সায়েববাবুর বৈঠকখানা
কাল বলেছেন যেতে
পান সুপারি খেতে
পানের রাজা মৌরী বাটা
ইস্‌প্রিং এর ছবি আঁটা
হাত্‌ ছাড়্যা দাও যাদুমণি
যা'তে হ'বে অনেকখানি
মেন্দিপুরের চিরুণী
এমন খোঁপা বাঁধুনী
আমার নাম রেণুমালা
গলায় দেব মুক্তার মালা।

এইবার লেখিকা সঙ্কলিত প্রশ্নোত্তরমূলক দুটি ছড়া উদ্ধার করা গেল—দু'টি ছড়ারই ভিন্নতর একাধিক পাঠ অন্যান্য সঙ্কলনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে ঃ

১। এক কথা
ব্যাঙের মাথা
কি ব্যাঙ
টুরি ব্যাঙ
কি টুরি
পাট পুড়ি
কি পাট
গুয়া কাট
কি গুয়া
লীল গুয়া
কি নীল
গু গিল ॥

২। ঘুঘু ঘুঘু
ছ'লের ফুবু।
কি ছলে হ'চে
ব্যাটা ছ'ল হ'চে।
ছ'ল কুটি
মাছোত্ গ্যাছে।
কি মাছ পাচে
সউল মাছ পাচে।
মাছ কুটি
চিলে লেচে
চিল কুটি
ডালোত পড়চে।

ডাল কুটি
ছুতরে কাটচে।
ছুতর কুটি
মরে গ্যাছে
কব্বর কুটি
মিল্যা গ্যাছে
হালের পান্টি
চালোত থুয়ে
বউওক মারে
সোলার পান্টি দিয়্যা।
ঝুত্তুপুর, ঝুত্তুপুর।

দ্বিতীয় ছড়াটির প্রথম দিকের অর্থ সংগতি লক্ষণীয়। কিন্তু ছড়াটির শেষাংশে হঠাৎ বউকে কেন শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল, তা ঠিক বোঝা গেল না। যাইহোক, যদিবা তাকে শাস্তি দিতেই হয়, তাহলে হালের পান্টিই এক্ষেত্রে আদর্শ উপকরণ হতে পারত। কিন্তু দেখা গেল প্রহারদানকারী বউকে মারার সময় হালের পান্টি চালে রেখে দিয়ে সোলার পান্টিকে উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করে—'সাপও মরল অথচ লাঠিও ভাঙ্গলো না' গোছের কাজ সারা হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্যদের দেখান হল যে বউকে প্রহার করা হল, কিন্তু আসলে বউটির যাতে সত্য সত্যই কোন দৈহিক আঘাত না লাগে সেজন্য ব্যবহার করা হ'ল সোলার পান্টি। বউটির প্রহার কারীর স্পষ্ট কোন পরিচয়—ছড়াটিতে অনুল্লিখিত থাকলেও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে এই সহানুভূতিশীল ব্যক্তিটি বউটির স্বামী। এইভাবে বহু ছড়াতেই রহস্যালাপ স্থান পেয়েছে এবং স্নিগ্ধ হাস্য পরিহাস ছড়াগুলিকে বিশেষ ভাবে উপভোগ্য করে তুলেছে।

বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ঢাকার বাংলা একাডেমীর

প্রশংসনীয় ভূমিকা বাস্তবিকই এককথায় অতুলনীয়। বিশেষত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক সাহিত্যের বিক্ষিপ্ত উপকরণাদি উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত সংগ্রাহকদের দ্বারা সংগ্রহ করে সেগুলিকে নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করে বাংলা একাডেমী একদিকে যেমন বিস্মৃতির অতল গর্ভ থেকে লোক সাহিত্যের মূল্যবান উপাদানগুলিকে রক্ষা করছেন, সেই সঙ্গে সেগুলির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার বিশ্লেষণের ব্যবস্থা করে লোক সাহিত্য আলোচক ও গবেষকদের যথেষ্ট আনুকূল্য করছেন। এই প্রসঙ্গে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত "লোক-সাহিত্য" পত্রিকাটির উল্লেখ করতে হয়। একাডেমী সংগৃহীত লোক-সঙ্গীত, গীতিকা, ছড়া প্রভৃতি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান এই পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়ে থাকে। লোক সাহিত্যের আলোচনায় এরকম সুসম্পাদিত ও উন্নতমানের পত্রিকা উভয় বঙ্গেই অদ্বিতীয়। "লোক-সাহিত্য" পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যাটি (ফাল্গুন, ১৩৮২। মার্চ, ১৯৭৬) ছড়ার সঙ্কলন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। অবশ্য ছড়ার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভাগ আছে যেমন—শিশু বিষয়ক, প্রকৃতি বিষয়ক, নারী জীবন বিষয়ক, খেলার ছড়া ইত্যাদি। বর্তমান সংখ্যাটিতে কেবল বিভিন্ন ধরণের খেলার ছড়াই স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন—ঢাকা, রংপুর, চট্টগ্রাম, মোমেন শাহী, ফরিদপুর, রাজশাহী, সিলেট, কুমিল্লা, যশোর ও নোয়াখালী থেকে পত্রিকায় সঙ্কলিত ছড়াগুলি সংগৃহীত। শুধুমাত্র খেলার ছড়া সঙ্কলিত হওয়ায় স্বভাবতঃই নানাবিধ খেলার ছড়ার সন্ধান বর্তমান সঙ্কলনটিতে লাভ করা যায়। ঘুঘু সই খেলা, পুতুল খেলা, খুঁটাখুঁটি খেলা, চামচিক্‌ড়ি, হাতে তাই, বৌ-ছি, চিল ও হাঁস হাঁস খেলা, তুলিম তোল, ছাগল ধরা, সুঁদি সুঁদি, বাইছালী, হাইর জিত, পানিতে ধান নেড়ে দেওয়া, ফাঁদ পাতা, নাকটানা, বাঘ বাঘ খেলা, রোদ তোলা, চোখের পাতায় ফুঁ দেওয়া ইত্যাদি সর্বমোট ৩১টি বিভিন্ন

ধরণের খেলার ছড়া স্থান পেয়েছে। পত্রিকাটির ভূমিকাংশে, যে সব খেলার ছড়া সঙ্কলিত হয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করায় পাঠকের পক্ষে বিশেষ বিশেষ খেলার সম্পর্কে যেমন অবহিত হওয়া সম্ভব হয়, তেমনি বিশেষ বিশেষ খেলার ছড়ার আস্বাদনও সহজতর ও আরও অনেকখানি সার্থক হয়ে ওঠে। ছড়া সঙ্কলনটির সম্পাদক বদিউজ্‌জামান ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন ঃ 'খেলার ছড়ার মধ্য দিয়ে শিশু এবং বয়েসী শিশুর মানসিক সক্রিয়তা, সমাজ জীবনের প্রবহমান চিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে কৌতূহলী সমাজ বিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রকেও প্রসারিত করবে।' প্রথমে কাজিয়া মীমাংসার দুটি ছড়া উদ্ধৃত করা গেল- -

১। বিয়াল বিয়াল দুইপর
গাট্টা হাপ আজাগর
আজাগরোর আ মোটা
গাট্টা হাপ পুট্‌ পুটা।
হাপ মারি লেইঞ্জো বিষ
মোকদ্দমা টিস্‌ মিস্‌॥

২। এক পইসার তাগা
মহরদমা লাগা
এক পইসার কিস্‌মিস্‌
মহরদমা ডিশ্‌মিশ্‌॥

প্রথম ছড়াটি কুমিল্লা থেকে এবং দ্বিতীয় ছড়াটি সিলেট থেকে সংগৃহীত। ছড়া দুটিতে মূল যে শব্দটি স্থান পেয়েছে কিংবা বলা চলে, যে শব্দটিকে উপলক্ষ্য করে ছড়া দু'টি রচিত, তা হল 'ডিস্‌মিস্‌'। খেলতে গেলেই অনেক সময়ে কারণে-অকারণে খেলায় অংশ গ্রহণ-কারীদের মধ্যে বিবাদ বেধে যায়। বিবাদ থামাবার জন্যেই এই ছড়া আবৃত্তি করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এইরূপ ছড়া আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিবাদের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। এইরূপ ছড়া রচনার মূলে

এক সুন্দর মনস্তত্ব কাজ করেছে লক্ষ্য করা যায়। তা হল—ছোটদের খেলার বিবাদ মীমাংসায় বড়দের অংশ গ্রহণের সুযোগ না দেওয়া, দ্বিতীয়ত, বিবাদের নিষ্পত্তি না হলে মাঝপথে খেলা ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা, আর পরিণামে অংশ গ্রহণকারীদের আনন্দ লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়, তাই যাতে শেষ পর্যন্ত খেলা চালান যায় তাই এই ছড়ার সৃষ্টি, যার মাধ্যমে বিবাদ শুরু হলেই চট্‌পট তার নিষ্পত্তি ঘটান সম্ভব হয়।

এইবার খেলোয়াড় বণ্টনের দু'টি ছড়া উদ্ধৃত হল'—

১। এজিদ ভেজিদ, খেজিদ খা
পরজাপতি উইড়ে যা।
ইষ্টিশনের বিষ্টি ফুল
আয়রে আমার গোলাপ ফুল,
আয়রে আমার আম লেইট ॥

২। এলাটিন ব্যালাটিন চোর
বায় ফোর ডি ফোর টার্টি ফোর
এ্যাক লাটিম
চন্দন কাটিম,
চন্দনের নাম দাদা
ইতির সিজির ফিতির খায়,
প্রেজাপতি উড়ইয়া আয় ॥

এখানে উদ্ধৃত ছড়া দু'টি যথাক্রমে মোমেন শাহী এবং যশোর থেকে সংগৃহীত। প্রথম ছড়াটিতে ব্যবহৃত হয়েছে 'গোলাপ ফুল' কথাটি আর দ্বিতীয় ছড়াটিতে স্থান পেয়েছে 'প্রজাপতি' শব্দটি। দু'টি ছড়ায় এই দুটি শব্দই প্রধান এবং বিশেষ ইঙ্গিতবাহী। খেলায় অনেক সময় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি খেলোয়াড় উপস্থিত হয়। তখন কাকে বাদ দিয়ে কাকে নেওয়া হবে—সেই নিয়ে এক সমস্যার উদ্ভব হয়। সেই সমস্যা সমাধানের

জন্যই খেলোয়াড় বণ্টনের ছড়ার সৃষ্টি। প্রথমে দুটি পরস্পর বিরোধী দু'দলের দলপতি নির্বাচন করা হয়। তারপর অন্যান্য ছেলেমেয়েরা দু'জন করে গোপনে নিজেদের জন্যে ছদ্মনাম নির্বাচন করে। সকল ক্ষেত্রেই ছদ্মনাম প্রকৃতি বিষয়ক হয়, যেমন উদ্ধৃত ছড়া দু'টিতে স্থান পেয়েছে 'গোলাপ ফুল' এবং 'প্রজাপতি'। দলপতিরা খেলোয়াড় বণ্টনের ছড়া আবৃত্তি করতে থাকে। আবৃত্তিতে প্রকৃতি বিষয়ক নামের উল্লেখ থাকে আগেই বলা হয়েছে। এইবার যার ছদ্মনাম মিলে যায় সেই সুযোগ লাভ করে খেলায় অংশ গ্রহণের।

পত্রিকাটিতে 'সুঁদি সুঁদি' খেলার মাত্র ১টি ছড়া সঙ্কলিত হয়েছে; ছড়াটি সংগৃহীত হয়েছে রংপুর থেকে। প্রথমে ছড়াটি উদ্ধৃত করা গেল—

সুঁদি সুঁদি বাল্লি।
কি হে কোটাল্লি।
আজার কোন বাড়ি ?
হুয়া হুয়া বাড়ী।
আজা মশায় বাড়ীত্ আচেন ?
আচি।
এ্যাকটী চোর ধরেচি।
কি চোর ?
গুয়া চোর।
কি চাও ?
বিচের চাই।
কি বিচের ?
যেটা ভাল হয় সেটা।
ব্যাটাকে এ্যাকশো ডাং মারো।
কয়টা গরোম, কয়টা নরোম ?

পন্‌চাশটা গরোম
পন্‌চাশটা নরোম।

ছড়াটিতে একাধিক চরিত্রের উপস্থিতি বেশ সহজেই বোঝা যায়। চরিত্রগুলি হ'ল সুঁদি, কোটাল, রাজা ও চোর। প্রশ্নোত্তর মূলক এই ছড়া সুঁদি, সুঁদি খেলায় আবৃত্তি করা হয়। এই খেলার উপকরণ দূর্বাঘাসের প্রস্তুত একটি আংটী। খেলায় অংশ গ্রহণকারী ছেলেরা আংটীটি হাতের তালুর উল্টো দিকে রাখে এবং অন্য হাতের সাহায্য ছাড়াই আংটীটি ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে আঙুলে পরতে চেষ্টা করে। যে মধ্যমায় পরাতে পারে, সে হয় রাজা, অনামিকায় পরতে পারলে হয় সুঁদি, তর্জনীতে পরলে হয় কোটাল আর যে ছেলে কোন আঙ্গুলেই পরতে পারে না তাকে হতে হয় চোর। রীতি হ'ল সুঁদি এবং কোটাল চোরের বিরুদ্ধে রাজার কাছে নালিশ জানাবে এবং অবশ্যই তা ছড়ার মাধ্যমে। রাজা চোরকে পঞ্চাশবার জোরে এবং পঞ্চাশবার মৃদুভাবে আঘাত করার আদেশ দেয়। এই আদেশ পালন করে কোটাল। কোটালের মারার মধ্য দিয়েই ঘটে এই খেলার পরিসমাপ্তি।

'লোক-সাহিত্য' পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় সর্বমোট ৫০১টি ছড়া সঙ্কলিত হয়েছে।

জনাব রওশন ইজদানী তাঁর 'মোমেন শাহীর লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে (বাংলা একাডেমী; ঢাকা থেকে প্রকাশিত; ১৩৬৪) স্বতন্ত্রভাবে মোমেন শাহী অঞ্চলের প্রচলিত ধাঁধা সম্বন্ধে আলোকপাত করেননি ঠিকই, কিন্তু পরিণত বয়স্কদের কাছে এক বিশেষ শ্রেণীর প্রচলিত 'ছুটকী শিলুকে'র যে উল্লেখ করেছেন, আসলে সেগুলিই ধাঁধা। লেখক এরূপ ছয়টি 'ছুটকী শিলুকে'র উদাহরণ দিয়েছেন। প্রতিটিই পদ্য ধাঁধা এবং ধাঁধাগুলির সঙ্গে তাদের উত্তরও লেখক প্রকাশ করেছেন।

'নারীর স্তন' অবলম্বনে রচিত ধাঁধা—

মুখটা কালা
সকলেই কয় ভালা
কালিদাস পণ্ডিতে কয়
শুইলে আর উঠে না॥

ছেলে কোলে গর্ভবতী নারীর গমন অবলম্বনে রচিত ধাঁধাটি নিম্নরূপ—

ধুন্‌তে ধুন্‌তে মুখে উঠছে ফেনা,
এই পথে নি যাইতে দেখছ
দুই পায়ে তিন জনা।

কচ্ছপের ডিম ফোটা অবলম্বনে রচিত ধাঁধাটি হ'ল—

গাই এ ভাঙ্গে নল খাগড়া,
বাছুর ভাঙ্গে আইল,
ছয়মাস আগে গাই ফরইছে
বাছুর অইছে কাইল॥

লেখক দরবারী শিলুকের শিশু পর্যায়ের প্রসঙ্গে যেগুলি উল্লেখ করেছেন, সেগুলিও প্রকৃতপক্ষে সব ধাঁধা। লেখক এরূপ

১০টির উল্লেখ করেছেন। জামা, আয়না, হুঁকা, চরকা, কচুগাছ লবণ, শামুক প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে ধাঁধাগুলি রচিত।

'জামা' অবলম্বনে রচিত ধাঁধাটি হল—

হাত আছে পাও নাই
গলা আছে মাথা নাই ॥

'শামুক' সম্পর্কিত ধাঁধাটি হল—

কাঠের বলদ গোস্তের শিং
চল্‌ছে বলদ বাদ্‌লা দিন ॥

'কচুগাছ' বিষয়ক ধাঁধাটি হল—

গাছের নাম জগমাতা
ডালে ডালে একেক পাতা ॥

'লবণ' সম্পর্কিত ধাঁধা—

ধাইয়ো লাই
খাই বস্তুর বাকল নাই ॥

লেখক মন্তব্য করেছেন, 'এ জাতীয় অসংখ্য 'শিলুক' শিশু মহলে প্রচলিত আছে'। লেখক যদি আরও সচেতনভাবে এই শ্রেণীর 'শিলুক' (ধাঁধা) সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন, তবে তা বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চায় উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসাবে বিবেচিত হবে নিঃসন্দেহে।

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী কেবল বাংলা ছড়ারই সঙ্কলন প্রকাশ করেন নি, বাংলা ধাঁধা চর্চার ইতিহাসেও তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাংলা একাডেমী (ঢাকা) প্রকাশিত ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ সম্পাদিত 'লোক সাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ' শীর্ষক গ্রন্থে (১৩৭৫) সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী সঙ্কলিত পূর্ব বাংলার (অধুনা বাংলাদেশ) বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ২৩১টি ধাঁধা সঙ্কলিত হয়েছে। ধাঁধা রচিত হয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অথচ একান্ত পরিচিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে। ছড়ার ক্ষেত্রে আমরা যেমন পাঠান্তর লক্ষ্য

করে থাকি, ধাঁধার ক্ষেত্রেও তেমনি পাঠান্তর লক্ষিত হয়। অর্থাৎ একই বিষয় বস্তু অবলম্বনে এক এক অঞ্চলে ধাঁধা এক এক ভাবে রচিত হয়। এক্ষেত্রে একই ধাঁধা যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে তা নয়, বরং বৈচিত্র্যময় বিষয় সাধারণ ভাবে মানুষকে ধাঁধা রচনা করতে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করে বলা যায়। কারণ বিষয় এক হলেও তার প্রকাশ ভঙ্গির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। 'রোদ' সম্পর্কিত তিনটি ধাঁধা সঙ্কলিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে যথাক্রমে ময়মনসিংহ, ঢাকা এবং সিলেট থেকে সংগৃহীত হয়ে। ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত ধাঁধাটি হল—

খাল ঝন্ ঝন্ খাল ঝন্ ঝন্
খাল নিল চোরে।
বৃন্দাবনে আগুন লাগছে
কে নিভাইতে পারে॥

এই একই বিষয় অবলম্বনে রচিত ঢাকা থেকে সংগৃহীত ধাঁধাঁটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নতর—

আছ্মান থাইক্যা পড়ল খাল,
ঝুন্ ঝুন্ করে।
বিন্নে ঝাড়ে আগুন লাগ্‌ছে
কে ঠকাইতে পারে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য সঙ্কলিত বাংলা লোক-সাহিত্যের ৫ম খণ্ডে ঢাকা থেকে সংগৃহীত 'রোদ' বিষয়ক ধাঁধাটিরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা গেল—

লাঠি ঝুন্ ঝুন্ লাঠি ঝুন্ ঝুন্ লাঠি নিল চোরে,
বাঙলা বাজার আগুন লাগছে কে নিভাইতে পারে।

আবার মেদিনীপুরে প্রচলিত এই বিষয়ক ধাঁধাটি প্রকাশিত হয়েছে আর একটু বিচিত্র ভাবে ঃ

উপরে পাতা তলে পাতা পাতা ঝন্ ঝন্ করে

বৃন্দাবনে আগুন লেগেছে কে নিভাতে পারে।

ঢাকা থেকে সংগৃহীত 'রোদ' বিষয়ক আর একটি ধাঁধা :

লাঠি কোন কোন কোন
ঢাকার শহরে আগুন লাগছে
কে নিভাইতে পারে ?

নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত সূর্য থেকে কিরণ কিভাবে এই পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয় সেই প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকেরা বিকিরণ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করলেও ব্যাপারটা যে সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য তাতে সন্দেহ নেই। যে সূর্যালোক আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের এক অতি প্রয়োজনীয় ও পরিচিত উপকরণ, সেই সূর্যালোক তাই ধাঁধা রচনার বিশেষ উৎস হয়ে উঠেছে।

ধাঁধা রচনার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল হুঁকা। বর্তমানে হুঁকার ব্যবহার নিতান্ত সীমিত ক্ষেত্রে প্রচলিত থাকলেও কিছুদিন আগেও কিন্তু ধূমপানের ক্ষেত্রে হুঁকার ছিল রাজকীয় আধিপত্য। শুধু এই জন্যই নয়, সেই সঙ্গে হুঁকার গঠন ও ব্যবহার বৈশিষ্ট্যও তাকে ধাঁধার রাজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। কাসিমপুরী সাহেবের সঙ্কলনে হুঁকা সম্পর্কিত ৫টি ধাঁধা স্থান পেয়েছে। নেত্রকোণা থেকে সংগৃহীত ধাঁধাটি হল :

এতখানি পুকুরে কই-এ উড়্‌উড়্‌ করে।
রাজা আইয়্যে বাদশাহ আইয়্যে তারে সেলাম করে॥

কিশোরগঞ্জের ধাঁধাটিতে বলা হয়েছে :

উপ্‌রের বাড়িত আগুন লাগ্‌ছে।
মধ্যের বাড়ি থাইম্যা রইছে।
নীচের বাড়ি ডাক মারছে॥

ঢাকা থেকে সংগৃহীত ধাঁধাটি নিম্নরূপ—

মধ্যিখানে তালগাছ ব্রহ্মা করে বাস।

কেউ খায়, কেউ ছোঁয়, কেউ করে আশ ॥

আবার খুলনার ধাঁধাটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর :

আকাশ হইতে পড়্‌ল বুড়ী ঝুড়ি কাঁথা লইয়া।
সেই বুড়ী কাইজ্যা করে সভার মধ্যে গিয়া।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সঙ্কলনে শুধু হুঁকা বিষয়ই ৭১টি ধাঁধা সঙ্কলিত হয়েছে।

ঢাকা দি লাগ্যে আগুন
কেল্‌গাতা গেই এ পোড়া
শঙ্খনদী ভুট ভুটাই এ
নল উলাদি ধাই এ ধুঁয়া। (চট্টগ্রাম)

ডঃ ভট্টাচার্যের ঢাকা থেকে সংগৃহীত হুঁকা সম্পর্কিত ধাঁধা দু'টি হ'ল :

ক। উপরে থিক্যা ন্যামলো বুড়ি ক্যাতা মুড়ি দিয়্যা,
সেই বুড়ি কথা কয় সবার মাজে বইয়্যা।

খ। সমুদ্রের মধ্যে বান্দিয়াছে লাল পক্ষীর বাসা,
কেউ খাচ্ছে কেউ দাচ্ছে কেউ করছে আশা।

মেদিনীপুর থেকে সংগৃহীত ধাঁধাটিতে অনেকখানি মার্জিত রুচি ও সূক্ষ্ম উপমা প্রয়োগ নৈপুণ্য লক্ষণীয় :

বজ্রের সমান তেজ ধায় দ্রুত গতি,
ক্ষণেক প্রসব করে, ক্ষণে গর্ভবতী।
মানবের সঙ্গে থাকে নাকে নাক চানা
পণ্ডিতে কহিতে নারে কহে মূর্খ জনা।

'বগুড়ার লোক সাহিত্য' গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী (ঢাকা) থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থটির রচয়িতা অধ্যক্ষা খোদেজা খাতুন। গ্রন্থটিতে লেখিকা বগুড়া জেলায় প্রচলিত লোক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলির সঙ্গে পাঠক সাধারণের পরিচয় স্থাপনে সহায়তা করেছেন। গ্রন্থটি

সর্বমোট ৭টি অধ্যায়ে সমাপ্ত। চতুর্থ অধ্যায়টি 'গ্রাম্য হেঁয়ালী' সম্পর্কিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থটির অপরাপর অধ্যায় গুলির তুলনায় ধাঁধা সম্পর্কিত অধ্যায়টিই সর্বাপেক্ষা সীমিত পরিসরে রচিত। বগুড়ায় ধাঁধা 'শিল্লোক' নামে পরিচিত। সাধারণতঃ কর্মক্লান্ত দিনের অবসানে গ্রামবাসীরা শ্রান্তি অপনোদন এবং সেই সঙ্গে আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যে 'শিল্লোক' নিয়ে আলোচনা করে, শিল্লোক ভাঙ্গায়। লেখিকা সর্বমোট ৩০টি ধাঁধা উত্তরসহ সঙ্কলন করেছেন। ধাঁধাগুলি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত অথবা পরিচিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বস্তু বা বিষয় অবলম্বনে রচিত। অবলম্বিত বিষয়ের মধ্যে আছে ছাতা, কলার মোচা, আনারস, পুকুর, জাল, আখ, ডিম, নারকেল, তরমুজ, ভাত, উকুন, লেবু, উনান, নৌকা, ঘরের চাল প্রভৃতি। লেখিকা সঙ্কলিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধাঁধার উল্লেখ করা গেল ঃ

'কবর' সম্পর্কিত ধাঁধা—

ঘর আছে তার দুয়ার নাই।

'ছাতা' সম্পর্কিত ধাঁধা—

ঘর ঢং ঢং এক পায়ুই

'গোমাই' সম্পর্কিত ধাঁধা—

দিলে খায় না, না দিলে খায়।

খই আমাদের গ্রাম্য জীবনের এক অন্যতম খাদ্যোপকরণ। এই 'খই' অবলম্বনেও ধাঁধা রচিত হয়েছে—

ভাঙ্গা ঘরত ফকির লাচে।

ঘরের 'চাল' সম্পর্কিত ধাঁধা—

ইট ঘুঘুর পিঠ টান।
কোন ঘুঘুর চার কান।

এইবার লেখিকা সঙ্কলিত একটি আক্রমণাত্মক ধাঁধার উল্লেখ করা গেল—

সিন্দুরেরি ডগমগ কাজলেরি ফোটা
এই শিল্লোক যাঁই ভাঙ্গাবার পারবি
তাঁই চাঁন খাঁর বেটা ॥
চাঁন খাঁর ব্যাটা লারে
চাঁন খাঁর লাতি
এই শিল্লোক ভাঙ্গাতে লাগবি
আশ্বিন আর কার্তিক (কুঁচ).

'মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য' রওশন ইজদানী রচিত। গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী (ঢাকা) থেকে প্রকাশিত (১৩৬৪)। রওশন ইজদানী একজন পল্লীকবি। আবার তিনি যে লোক সাহিত্যেরও একজন দরদী ও উৎসাহী ব্যক্তি, আলোচ্য গ্রন্থটিই তার প্রমাণ। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'পল্লীকে জানতে হ'লে যেমন সাধনার দরকার তেমন প্রয়োজন তার মাটি-জল-ধূলি-কাদাকে উপেক্ষা ক'রে অধিবাসীদের নিবিড় সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করা। আমি তাই এ পল্লীকে জানার জন্য, এর প্রতিটি আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য এর সমাজ-মানসের খাঁটি রূপটি নিরীক্ষণের জন্য দীর্ঘ বার বছর ধরে এর আনাচে কানাচে বিচরণ করেছি, মাটির-গাঁয়ের মাটির আসরে বহু বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি এদের নিকট থেকে পুস্তকের মাল মশলা সংগ্রহ করেছি। কাজেই আমার এ সংগৃহীত জিনিস একান্ত ভাবে খাঁটি পল্লীর মাল, এতে এতটুকুন পালিশ বা বুনট নেই।'

বস্তুতঃ এই কারণেই প্রত্যক্ষভাবে সংগৃহীত এবং অবিকৃত উপকরণের জন্য আলোচ্য গ্রন্থটির এক বিশেষ মূল্য আছে। গ্রন্থটিতে লেখক মোমেনশাহী অঞ্চলে প্রচলিত লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের পরিচয় উপস্থাপন করেছেন। এতদঞ্চলে প্রচলিও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকসঙ্গীত, ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতির সঙ্গে লোককাহিনীরও কিছু পরিচয় প্রদান করেছেন। অবশ্য সংগৃহীত লোককাহিনীগুলি সংখ্যায় নিতান্তই সীমিত। লেখক মোমেনশাহী অঞ্চলে প্রচলিত লোককাহিনীগুলিকে যথাক্রমে 'পাড়াগাঁয়ের 'শিল্‌কী কিসসা', 'দরবারী শিলুক,' 'পাড়াগাঁয়ের লম্বা কেচ্ছা',

'বড়দের ছুটকী গল্প' ও 'ছোটদের কিস্‌সা' এই সকল পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

শিল্‌কী বা শ্লোক যুক্ত কিসসাগুলি বিশেষ বিশেষ শ্লোকের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়। বলাবাহুল্য এই শ্লোকভিত্তিক কিস্‌সা-গুলি দীর্ঘ হয়। এই পর্যায়ের আলোচনায় লেখক একটির 'শিলকী' মাত্র এবং আর একটির শিলকী সহ সম্পূর্ণ কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন। ইজদানী সাহেবের মতে 'গ্রাম্য শিল্‌কী কিস্‌সারই দ্বিতীয় পর্যায় 'দরবারী শিলুক'। গাঁয়ের বিয়ে-শাদীর মজলিসে বা এমনিতর কোন উৎসবানুষ্ঠানে এসব 'শিলুক' কথিত হয়। এমন কি এসব নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে হারজিত হয়।' একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা গেল—

'শিলুক কথক' প্রথম মজলিসে পা দিয়েই সেলাম জানাল—
"আচ্ছেলাম আলেকুম ভাই ডোনে ডানে।"

এই সেলাম শুনে প্রতিপক্ষের বুঝতে দেরী হয়না যে এই ব্যক্তি একজন 'শিলুক-কথক।' তখন তারা উল্টে প্রশ্ন করে ঃ

ছেলামের নাই কালাম
বওনের নাই ঠাঁই
এই ছেলাম জানাইলেন আপ্‌নে
কার কার পাই ?

শিলুক-বক্তা অবশ্য মজলিসে বসার আগে জবাবে বলে ঃ

"ছেলামের আছে কালাম
রেওনের আছে ঠাঁই
এই ছেলাম জানাইছি আমি
দশ জনের পাই"

'পাড়াগাঁয়ের লম্বা কেচ্ছা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, 'মোমেনশাহীর পল্লী অঞ্চলে এক জাতীয় কাহিনী প্রচলিত আছে, সাধারণতঃ সেগুলিকে লম্বা কেচ্ছা বলে অভিহিত করে পল্লী-

বাসীরা। সেগুলিকে অশিক্ষিত গ্রাম্য গীতালুরা গেয়ে থাকে; মোমেনশাহীতে প্রচলিত পালা গীতিগুলিতে ছন্দ আছে, পদ আছে কবিতার মত একটা নিয়মানুগ পদ্ধতিতে তার আগাগোড়া রচিত; কিন্বা 'লম্বা গীতি' ঠিক তার বিপরীত—এতে রাগিনীর চেয়ে কথা বেশী, মিলের চেয়ে অমিল বেশী। ...কিন্তু তা লিপিবদ্ধ করার উপায় নেই। এগুলির কোন লিখিত পুথি, পুস্তক নেই—মূল কাহিনীটুকু মানুষের মুখে মুখে জিয়ে আছে।'

লেখক এরপর এইসব কেচ্ছা কাহিনীর নিদর্শন স্বরূপ 'আদম খাঁ', 'বিরাম খাঁ'—'ডেংগুমিঞা', 'চিমুরাণী' 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। আর 'আদম খাঁ বিরাম খাঁর কেচ্ছা' আনুপূর্বিক বর্ণনা করেছেন।

নিছক অবসর বিনোদনের সময় পাড়াগাঁয়ে কিছু মানুষ একত্রিত হলে তাদের মধ্যে যে বৈঠকী ধরণের গালগল্প অনুষ্ঠিত হয় তাই হল 'বড়দের ছুটকী গল্প।' সাধারণতঃ এই সব গল্প নাতিদীর্ঘ ও নারীঘটিত কাহিনী হয়ে থাকে। লেখক 'ছুটকী গল্প'কে আবার নারীঘটিত ছুটকী কেচ্ছা ও সাধারণ ছুটকী কেচ্ছা—এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং দুটি বিভাগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু'টি কাহিনী বিবৃত করেছেন।

'ছোটদের কিস্‌সা' বলতে লেখক ছোটদের উগযোগী ছড়াযুক্ত অনবদ্য কাহিনীগুলিকেই অভিহিত করেছেন।

আবদুল হাফিজ রওশন ইজদানীর লোককাহিনী সংগ্রহ ও এতদ্‌সম্পর্কিত আলোচনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'বাংলাদেশে তিনিই বোধহয় প্রথম ব্যক্তি যিনি একই সঙ্গে লোক কাহিনী ও তার আলোচনা প্রকাশ করেছেন।'

বাংলা লোক সাহিত্যের আলোচনায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম আশরাফ সিদ্দিকী। বাংলা লোক সাহিত্য সংগ্রহের ইতিহাস প্রায় শতাব্দীকালের প্রাচীন হলেও লোক সাহিত্যের আধুনিক পদ্ধতিতে

সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণের সূত্রপাত কিন্তু খুব প্রাচীন নয়। মুষ্টিমেয় যে ক'জন গবেষককে এই বিরল ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গেছে এবং আন্তর্জাতিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা লোক সাহিত্যের সংগ্রহ তথা বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত, আশরাফ সিদ্দিকী তাঁদেরই অন্যতম। বাঙলা একাডেমী (ঢাকা) প্রকাশিত (১৩৭১) 'কিশোর গঞ্জের লোক-কাহিনী' গ্রন্থটি আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত। গ্রন্থের নামকরণেই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠকের অবহিত হবার সুযোগ রয়েছে। কিশোর গঞ্জ থেকে সংগৃহীত মোট ৩০টি গল্প সংকলিত হয়েছে বর্তমান সংকলনটিতে। গল্পগুলি উপকথা ও রূপকথা শ্রেণীর। এ পর্যন্ত যতগুলি লোক কথা সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, তন্মধ্যে বর্তমান সংকলনটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলনের মর্যাদা দান করতে হয়। কারণ দীর্ঘকাল ধরে নানা জনে লোক কথা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেও সেগুলির প্রকাশ এবং আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত্রুটিমুক্ত থাকেনি। সত্যি কথা বলতে কি লোককথা সংগ্রহে যে পরিমাণ নিষ্ঠা দেখা গেছে, সেগুলির প্রকাশে এবং আলোচনায় সেরকম নিষ্ঠা লক্ষিত হয় নি। অবশ্য এর অন্যতম কারণ লোককথা আলোচনায় আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে বাঞ্ছিত জ্ঞানের অভাব। এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য লোককথা সংকলনগুলির কোনটিতেই সংগ্রহ সূত্র বা সংগ্রাহক সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংযোজিত হয় নি। অথচ লোককথার আলোচনায় অভিপ্রায় বিশ্লেষণ, তুলনামূলক আলোচনা কিংবা ভাষা বিজ্ঞানের আলোয় কথার বিচারের মতই কথকের ব্যক্তি পরিচয় গ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ—

'The style of the story-teller, above all is manifested in the devices of the composition of the tale in the choice or elimination or modification of the sequence of motifs in specific episodes in the

peculiar characterisation, according to his own taste, of the persons in the tale, in the intensification of the softening of specific details. Moreover, with regard to style in the narrower sense of the word, an especially important feature, depending to a great extent on the individual inclinations and tastes of the narrator, consists in his utilization of the traditional story farmulas (loci communes) in the varying degree to which he utilized them, in his choice of those for which he has the greatest fondness, and also in his original utilization of the world material, without even speaking of the great distinctions which are to be observed among the narrators in the very manner of narration, intonation, in the utilization of mimetics, of gestures, exclamations, and a number of other partly dramatic devices.' [J. M. Sokolov ; Russian Folklore ; Page 405]

লোক কথার পাঠান্তর ও রূপান্তরের অন্যতম কারণ কথকদের ব্যক্তিগত মেজাজ ও রুচি, সেইজন্য আলোচ্য সংকলনে সম্পাদক প্রথমেই গ্রন্থে সংকলিত কথাগুলির সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মাদুর রব এবং ১৩ জন কথক—ইমাম বক্স, ফালান্যা, আজহারুল ইসলাম, আবদুল জলিল, নজই, মজিদ মিয়া, শেখ মইধর, ইস্‌মত আলী পাথর আলী প্রমুখাদির বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করেছেন। সম্পাদক এদের প্রত্যেকের নিবাস, দৈহিক গঠন, বয়স, জীবিকা, ব্যক্তিগত অভিরুচি তথা মানসিক গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। সংগ্রাহক এবং কথক পরিচিতির পর প্রতিটি গল্পের বিস্তারিত আলোচনা সংযোজিত হয়েছে। এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে গল্পগুলিতে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্র, অভিপ্রায় ও টাইপের উল্লেখ এবং

সর্বোপরি অনুরূপ কথার উল্লেখ অথবা তুলনামূলক আলোচনা। কয়েকটির উল্লেখ প্রসঙ্গত করা যেতে পারে। সম্পাদক যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে 'বিলাইর বড়াই' গল্পটির একটি পাঠ Clouston সাহেবের সংগ্রহে বিদ্যমান। কিংবা 'এড়ি ও সোহাগী' গল্পটি বিশ্ব বিখ্যাত 'সিণ্ডেরেলা' টাইপের। গ্রন্থটির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ হল প্রথমে সংযোজিত দীর্ঘ ৬২ পৃষ্ঠা ব্যাপী সম্পাদকের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে লোককথা সংগ্রহের সাম্প্রতিক রীতি-পদ্ধতি সহ আমাদের দেশের লোক কথা সংগ্রহের গুরুত্ব, মধ্যযুগের ইংরেজী সাহিত্য প্রাচীন লোককথা ও রূপকথার দ্বারা যেভাবে প্রভাবিত হয়েছিল আমাদের সাহিত্য সেভাবে প্রভাবিত না হবার কারণ, সর্বোপরি লোক কথার চিরন্তনী আকর্ষণের কারণ। সম্পাদক লোক কথার চিরন্তন আবেদন সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন—

'পৃথিবীতে যত দুঃখ কষ্ট যত বাস্তবের সংঘাতই আসুক না কেন—স্বপ্ন দেখা মানুষের কোনদিনই শেষ হবে না। রূপকথা, লোককথা—ইত্যাদি ত' স্বপ্নেরই জগৎ! বাস্তব জীবনে যে রাজকন্যা ও রাজপ্রাসাদের দর্শন পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়—স্বপ্নলোকে কিন্তু তা সম্ভব। তাই স্বপ্ন দেখা মানুষের চিরন্তন অভ্যাস। স্বপ্ন কোনদিনই পুরাতন হয় না—এই লোক কাহিনী গুলিও তাই পুরাতন হয় না—চির তারুণ্যের জয়টীকা মস্তকে ধারণ করে অগ্রসর হয়ে চলে যুগের পর যুগ—দিনের পর দিন—পার হয়ে যায় অরণ্য পর্বত নদী সমুদ্র ও মরুভূমির দুস্তর ব্যবধান।'

বাস্তবিক, একটি আদর্শ লোককথা সংকলন গ্রন্থ উপহারের জন্য 'বাংলা একাডেমী' এবং বিশেষত সম্পাদক আশরাফ সিদ্দিকী ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। সংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে 'কিশোর গঞ্জের লোক কাহিনী'র তুলনায় অনেকগুলি বৃহত্তর লোক কথার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি

নিয়ে লোক কথার আলোচনা এবং সংকলন প্রকাশ যে এই প্রথম তা স্বীকার করতে হয়।

বাংলা একাডেমী (ঢাকা) প্রকাশিত 'লোক-সাহিত্যে'র ষষ্ঠ খণ্ডটি ১৩৭৩ (১৯৬৬) 'শোলোকী কিস্‌সা সংখ্যা' রূপে চিহ্নিত হয়েছে। চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, কুমিল্লা ফরিদপুর এবং ঢাকা জেলা থেকে সর্বমোট ২১টি শোলোকী কিস্‌সা স্থান পেয়েছে সংকলনটিতে। প্রথমেই শোলোকী কিস্‌সা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে। সাধারণ কিস্‌সা কাহিনীর সঙ্গে শোলোকী কিস্‌সার প্রধান পার্থক্য হ'ল—শেষোক্ত কাহিনীতে হেঁয়ালীমূলক একটা ছড়া যুক্ত থাকে। এবং ছড়াটি কাহিনীর একেবারে প্রথমে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কিস্‌সাটি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ছড়ার প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হয় না। ছড়াটি কাহিনীরই অংশ অথচ কাহিনী সম্পূর্ণ না হওয়া অবধি ছড়ার অর্থ অজ্ঞাতই থেকে যায়। সাধারণভাবে প্রতিপক্ষকে বেকায়দায় ফেলার অভিপ্রায়েই ছড়াটি প্রথমে বলার রীতি। প্রতিপক্ষ যদি জানে, তাহলে ছড়াটির সঙ্গে যুক্ত কাহিনীটি ব্যক্ত করে। এই জাতীয় কাহিনী বাংলা দেশের এক এক স্থানে এক এক নামে পরিচিত। যেমন চট্টগ্রামে পরিচিত 'ভাঙানী ছড়া' নামে আবার ময়মনসিংহে এগুলি অভিহিত হয় 'শিল্‌কি কিস্‌সা' নামে। কিন্তু ঢাকা ও রংপুরে এগুলি পরিচিত 'শোলোকী কিস্‌সা' রূপে।

আলোচ্য সংকলনে সংকলিত শোলোকী কিস্‌সা গুলি আঞ্চলিক ভাষায় আনুপূর্বিক বর্ণিত হয়েছে। ফলে সংগ্রহ রীতির বিচারে সংগৃহীত কাহিনী গুলির বৈজ্ঞানিক চরিত্র অক্ষুণ্ন আছে স্বীকার করতে হয়। তবে আঞ্চলিক ভাষা সর্বসাধারণের বোধগম্য হবে না বলে প্রতিটি কিস্‌সার প্রথমে 'কাহিনী সংক্ষেপ' প্রদত্ত হয়েছে। এ ছাড়াও দুরূহ আঞ্চলিক শব্দগুলির সহজ সরল অর্থ পাদটীকায় বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি

কিস্‌সার সংগ্রাহক এবং যার কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে উভয়েরই সংক্ষিপ্ত অথচ প্রয়োজনীয় পরিচয়টুকু প্রদান করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে সংগ্রহকাল।

ফরিদপুর থেকে চিত্তরঞ্জন দাস সংগৃহীত পঞ্চম কিস্‌সাটি উদ্ধার করা গেল। কিস্‌সার প্রথমেই যে ছড়াটি বর্ণিত হয়েছে তা হ'ল—

কপাল যদি আচান হয়
পইড়া পায় সোনা,
মুড়ি খাইয়া মলো তারা
মানুষ তিনজনা,
আমারে যে মার্‌তি চালো
মারা গ্যালো সে,
পানোর আইড়া মানুষ মার্‌লি
বিচিয়ার তারে কে?

এইবার বর্ণনা করা হ'ল কাহিনীটি—

'এক দ্যাশে ছেলো এক ফকির, আর ছেলো তার পরিবার। তার পরিবারের বয়স ছেলো অল্প। ভারি সোন্দর ছেলো ফকিরির পরিবার। তারে দেখ্‌লি ভালো মানষিরও মাথা ঘুরাইয়া যায়। স্বভাবটা তার ত্যামোন ভালো ছেলো না। ঐ দ্যাশে ছেলো এক মাতুব্বর। তার সাথে ছেলো ফকিরির পরিবারের ভালবাসা। কিন্তু ফকিরির জ্বালায় তাগে মেলামেশাতে ভারি অসুবিধা হতো। ওরা চিন্ত অর্‌লো ফকিরিরি বাড়ীরতিয়া না খেদাতি পারলি ওগে সুবিধা হবেনা। তাই.না মনে অইরা ফকিররি তার পরিবার কয় যে, এক কাচ্ কর এট্টু দূরি যাওনা তুমি বিক্ষিয়া অর্‌তি। দ্যাহোদেহি দূরি গেলি কিছু বেশী টেশী বিক্ষিয়া পাওয়া যায় নেকি? এ্যাতো কয় তবু ফকির বাড়ীর তিয়া বারু যায় না। দিন ভইরা ভিক্ষিয়া টিক্ষিয়া অইরা রাত্রি বাড়ী ফিরে আসে। রাগের জ্বালায় আর

বাঁচে না তার পরিবার, মাতুব্বরেও চেইতো গেছে। শালার ফকিররি না মার্‌তি পার্‌লি আর ভাস্তি নাই। কি ভাবে মারা যায়, ফকিরির পরিবার বাত্তানয় মাতুব্বরের কাছে। মাতুব্বর কয় যে ওরে দূরি ফাটাতি হবে ভিক্ষিয়া অর্‌তি যে ভাবেও হোক্ ফাটান দরকার। মাতুব্বর শিহোইয়া ছ্যায় আচ্‌কিয়া তুমি জম্বের ঝগড়া বাধাবা। ওরে বাড়ীরতিয়া খেদান দরকার।

মাতুব্বরের কথামত ফকিরির পরিবার বাধাইছে ঝগড়া। আহানে ফকিরও বিরক্ত হইয়া গেইছে! নিত্যি গুতায় ফাষাণ ক্ষয়। কয়দিন আর সহ্য অরা যায়। ফকির কলো যে আমার ঝোলা কম্বল ছ্যাও, যাই দেহি দক্ষিণি। এবার ভিক্ষিয়া না পালি আর বাড়ী ফেরব্‌ না। এইয়া শুইনা ভারী খুশী হইছে ফকিরির পরিবার। এইয়াইতো চাতিছে সে। তাড়াতাড়ি ঝোলা কম্বল বারোরিয়া ছ্যায় ফকিরির বৌ। আর এট্টা হুড়ুমির টোলা দেলো বিষ মিশাইয়া। সেই ঝোলা আর হুড়ুমির টোলা নইয়া তো বারোইয়া পড়ল ফকির সাব। হাট্‌তি হাট্‌তি তো অনেক দূর গেইছে। এট্টা গাছের তলায় বইস্যা ভাব্‌তিছে, হুড়ুম কয়ডা আহানে খাই। আবার ভাব্‌তিছে, না খাব না। আহানে খালি পরে আবার পাবানি কোহানে। এইয়া ভাইবা আবার ঝোলা টোলা নইয়া উইঠা পড়্‌ল ফকির সাব। আবারও হাট্‌তি হাট্‌তি অনেক দূর গেইছে। ক্ষিদিয়াও নাক্‌ছে ফকিরির। হুড়ুমির টোলাডা বারোরিয়া খাবে আহানে। এবারও এট্টা গাছের তলায় বইছে খাবার জন্যি। টোলাডা খুইলা এবারও ভাব্‌তিছে, না, খাব না। আহানে খালি পরে আবার পাবানি কোহানে। এইয়া মনে কইরা আবার বাইন্ধা থোলো হুড়ুমির টোলাডা। আবার হাট্‌তি নাক্‌ছে। হাট্‌তি হাট্‌তি অনেক দূর গেইছে; আহানে আর গেরাম বাড়ী চোহি পড়ে না। অরুণ জঙ্গল। সেহানে গাছপালা ছাড়া আর কিছু নাই।

সেই জঙ্গলের মধ্যি যাইয়া ফকির ভাব্তিছে, কোহানে থাহা যায়। ঘর বাড়ী কিছু ছ্যাহে না। ফকির ভারি চিন্তিয়ায় পইড়া গেলো। তাই তো কি অরি শ্যাষকালে কি বাগ ভল্লুকির প্যাটে না যাতি হয়। খুচ্তি থায়ে কোহানে একটু আশ্রয় পাওয়া যায়। খুচ্তি খুচ্তি রাত হইয়া গেইছে। আহানে আর কোহানে যায়। ছ্যাহে এট্টা মস্ত গাছ, বড় বড় তিনহান ডাল এক জাগারতিয়া তিন দিক ছড়াইয়া গেইছে।

সেই গাছে যাইয়া উঠ্ছে তো ফকির। সেই তে—ডালায় বইসা বেশ আরামে রইছে ফকির। সেহানতিয়া ঘোমালিও পড়ার কোন ভয় নাই। গাছে উইঠা ফকির ভাবতিছে হুড়ুম কয়ডা আহানে খাই। বারোরিছে টোলাডা। আবার ভাবতিছে আহানে খাইয়া ফেল্লি বেহানে কি খাবানে। থাউকগিয়া আহানে খাব না। বেহানে গাথুলিয়া খাবানে। এবার থুইয়া দেলো হুড়ুমির টোলাডা। হুড়ুমির টোলাডা কাসে থুইয়া ফকিরতো পড়লো ঘুমোইয়া।

এদিকে আর্ছে কি তিন জন চোর চুরি কইরা ঐ গাছের তলায় আইসা টাহাফয়সা ভাগ করতিছে। এই সোমায় কি অইরা যেন ঐ হুড়মির টোলাডা পড়িছে গাছেরতিয়া। চোররা ছ্যাহে যে এট্টা হুড়মির টোলা। চোররা গাছের উপর তাহাইয়া দেখ্তি নাগলো কোহানতিয়া পড়িছে এই হুড়ুমির টোলা। অন্ধকারের মধ্যি ভালো কইরা কিছু দেখ্তি পালো না তারা। তাগেও খিদিয়ায় কাম সারা। সারারাত ধইরা চুরী অরাতো। এর ছ্যাহে যে আহুড় গুড় দিয়া মাহানো রইছে হুড়ম কয়ডা। এর মধ্যি যে বিষ মিশোনু থাকৃতি পারে তা তারা চিন্তিয়াই অরল না। সেই বিষ মিশোনু হুড়ুম খাইয়া মইরা সেই গাছের তলায় পইরা রইছে কয় চোর। বেহান ব্যালো গাছেরতিয়া নাইমা ছ্যাহে যে কয়জন মানুষ মইরা রইছে। কাছেই তাগে টাহা—ফয়সা, গয়না-গাটি। তাই না দেইহা ফেতকইরা ফকির সেই টাহা ফয়সা,

আর গয়না গাটি এটা টোলা বাইন্ধা ওহানতিয়া সইরা পড়লো। দুড়ে চারডে টাহা বারিও রাখ্‌ল। তাড়াতাড়ি আহানে হাট্‌তিছে ফকির সাব। ক্ষিদিয়ার কথা আহানে আর তার মনেও নাই। এট্টা বাজারে যাইয়া কিছু খাবার টাবার খাইয়া আবার হাট্‌তি নাগ্‌ল ফকির। তাড়াতাড়ি হাট্‌তে নাক্‌ছে আহানে ফকির। যার জন্যি ছ্যাশেরতিয়া গেইছলো ফকির, তারে এ টাহা—ফয়সা না দেহাতি পারলি আর শান্তি পায় না।

এদিকে বাড়ীতে ফকিরির পরিবার ফকিররি বাড়ীরতিয়া খেদাইয়া মাতুব্বরে নইয়া মাইতা রইছে। তাগে ফূর্তি আহানে ছ্যাহে কেডা। যার জন্যি অসুবিধা ছেলো সেতো আর আহানে বাধা দিতে আসপেনানে। আর আসারও ফত নাই। হুড়ুম খাইয়া হয়তো সে মইরাই পইড়া রইছে যেহানে সেহানে। আর চিন্তিয়া কি? যায় জন্যি চিন্তিয়া ছেলো তারে তো শ্যাষ করিছি। দুই জনে আহানে প্রেম ফাতারে যেন ভাইসা চলিছে। রাত দশটার সোমায় আইছে তো ফকির বাড়ীতি। আইসা তার পরিবাররে ডাকতিছে। তাই না শুইনা মাতুব্বর দেখলো যে তাইতো এ্যাহোন করি কি? কি ভাবে পলাই। ফকিরির কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়লি চলবে না। ফাচে ছেলো হোগ্‌লার ব্যাড়া। সেই ব্যাড়ার বাধন কাইটা সেই হান দিয়া দেলোতো মাতুব্বর এক নাফ। ফাচে ছিলো একখানা বারেন্দা, সেই জায়গায় ফকির এটা আইড়া গরু বইন্ধা রাখতো, তার শিং দুইখ্যান ছেলো খুব ধারালো। মাতুব্বর সাব সেই নাফ দেছে, পড়্‌বিতো পড়্‌ এ্যাহেবারে আইড়া গরুর শিং এর উপুয়ার যাইয়া পড়্‌ছে। আইড়া গরুর শিং এ্যাহেবারে তার প্যাটের মধ্যি যাইয়া ঢোকছে। সঙ্গে সঙ্গে ফকিরির পরিবার দেছি চেল্লানী। সেই চেল্লানী শুইনা গেরামের সব মানুষ আইসা ঢুহিছে ফকিরির বাড়ী। আইসা ছ্যাহে কি মাতুব্বর সাব খুন হইয়া গেইছে! ফকিরির বৌ কয় যে আমার ফকিরই

মাতুব্বররে মাইরা ফেলিছে। ফকির কয় যে আমি কিছু জানি না। তা শোনে কেডা। তার বৌ-ই সাক্ষী দেছে যে ফকিরই মাইরা ফেলিছে।

এ্যার পর আর অবিশ্বাসের কি থায়ে। গ্রামের মান্‌ষি থানায় জানাল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আইসা ফকির সাবরে বাইন্ধা লইয়া গ্যালো। অনেকদিন ধইরা কেচ্ চল্‌তি নাগলো। ফকির সাবের কোন উকিল মোক্তার ছেলো না। নিজিই নিজের পক্ষ নইয়া কেচ্ চালাতি নাগলো। আমি কোন অন্যাই করি নাই এই ছেলো তার বিশ্বাস। আমার কোন শাস্তি হতি পারে না। হাকিম জিজ্ঞাসা করল, ফকির—তুমি তোমার পক্ষের কথা কও।

তহন ফকির কতি লাগ্‌লো ঃ

কপাল যদি আচান হয়
পইড়া পায় সোনা,
মুড়ি খাইয়া মলো তারা
মানুষ তিন জোনা।
আমারে সে মারতি চালো
মারা গ্যালো সে,
পালের আইড়া মানুষ মারলি
বিচিয়ার অরে কে ?

এই শোলোক শুনলি হাকিম বাত্তানলো এ্যার অর্থ কি ? ফকির তহন আগাগোড়া সগল ঘটনা খুইলা কলো। হাকিম ফকির সাবরে খালাস দেলো। কোচ্ ডিসমিস হইয়া গ্যালো। গেরামের মান্‌ষি সগলতা শুইনা অবাক্ হইয়া গ্যালো।'

জনাব রওশন্ ইজদানী রচিত ও ঢাকার 'বাংলা একাডেমী' প্রকাশিত 'মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থটির অধিকাংশ স্থান অধিকার করে আছে মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের লোকসংগীতের সংগ্রহ ও সেই সম্পর্কিত আলোচনা। অবশ্য লোককথা সম্পর্কিত আলোচনা ও লোককথাও স্থান পেয়েছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে। রওশন্ ইজদানী নিজে পল্লীকবি। কিন্তু শুধু-সৃজনধর্মী কাজে ব্যাপৃত না থেকে তিনি নিজেই দীর্ঘদীনের পরিশ্রমে তাঁর গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, পরিচিত হয়েছেন ঘনিষ্ঠভাবে মৈমনসিংহের নানা আচার-অনুষ্ঠান রীতি নীতির সঙ্গে, আর তাঁর ক্লান্তহীন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রমাণ করেছে লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগকে। সচরাচর সংগ্রাহকের সংগৃহীত উপকরণের সাহায্যেই লোক সাহিত্য সম্পর্কিত গ্রন্থাদি রচনা করতে দেখা যায় বিশেষত সংকলন গ্রন্থগুলি রচনায়, কিন্তু ইজদানী সাহেব অপরের ওপর নির্ভর না করে স্বয়ং তাঁর গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন ও সংগৃহীত উপকরণগুলির বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই স্বভাবতই এই গ্রন্থটির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। তাঁর নিজের ভাষায়, 'এর সমাজ মানসের খাঁটি রূপটি নিরীক্ষণের জন্যে দীর্ঘ বার বছর ধ'রে এর আনাচে-কানাচে বিচরণ করেছি, মাটির গাঁয়ের মাটির আসরে বহু বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি,—এদের নিকট থেকে পুস্তকের মাল মসলা সংগ্রহ করেছি।' এইবার গ্রন্থের বিষয়বস্তুর আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে।

প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে 'হাল্কার গান' প্রসঙ্গে। 'হাল্কার গান' অধ্যাত্ম সঙ্গীত। চট্টগ্রাম জেলার চিশ্‌তিয়া তরিকার

পীর মওলানা আব্‌হুল কদ্দুস সাহেবের ভক্তেরা সাধারণত এই গান গেয়ে থাকে। এই গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় ঢোলক। এই গানের জন্য তাল-মান-সুর ইত্যাদি নির্দিষ্ট আছে। অধিকাংশ 'হাল্‌কা গান'ই বন্ধুহারা রূপক। এই পর্যায়ের কোন গানেই রচয়িতার নামোল্লেখ থাকেনা। একটি হাল্‌কা গানের অংশবিশেষ উদ্ধার করা গেল—

মনপাখী উড়াইলে বাবা
কোন্ নাম জপ বলো না।
তিন জনা এক যোগে গেলে
রবে না তোর ভাবনা॥

* * *

হুই জনা এক যোগে গেলে
মাক্কার ঘরের ঠিকানা॥
কি কলেরই বাক্স দিলে
আজব রঙের কারখানা;
তিনের হাতে এক চুড়ানী
সহজে তো মিলে না॥

লেখক ভূত আনয়নের একটি গান সংকলন করেছেন যেটি ওঝারা গেয়ে থাকে। যার ওপর ভূতে ভর করে তাকেই অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে 'আসন' করে হাতজোড় করে বসিয়ে তার হুই হাতের ফাঁকে একটি রক্তজবার ফুল এবং হুই চোখে তেল পড়া দেওয়া হয়। এই লোকটি হল মাধ্যম একে বলা হয় 'বর্তি'। এই 'বর্তির' সামনে একটা কাঁসার থালা বা লোটা জাতীয় জিনিষে একটি কাঠি দিয়ে আঘাত করে তালে তালে গান গাওয়া হয়—

সোনার গাঁইয়া মাঝিরে
নাও আন বায়ারে
কালাচান পার অইত আইয়া॥

জবা ফুলের তলে তলে
রসের দামালী গো—
দেও পরী, দেও দরশন ॥
কালী মায়ের যতগুণ
করতে আছে তুনা গো তুন,
তুর্গা মায়ের গুণের সীমা নাই ॥
মাগো দোহাই দেই ভর কর আইয়া ॥
নাইওরী গো নাইওর যাইতে
কে কইর‍্যাছে মানা
নয়ালী যইবনের কালে
আনন্দের দামালী গো
দেও পরী, দেও দরশন।
আসনে মোর চান বৈরাগী
চাঁদে গো বাইরইয়া দেখ্
দোহাই দেই ঐ আল্লার
ভর কর আইয়া।

—উদ্ধৃত গানটি যদিও ভূত আনয়ন উপলক্ষে গীত হয়, কিন্তু সমগ্র গানটির কোন স্থানেই কোন প্রকার অর্থহীন শব্দ, কিংবা রহস্যময় কোন বক্তব্য স্থান পায়নি। আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল গানটির অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। কালী, তুর্গা প্রভৃতি হিন্দুদের দেবদেবীর সঙ্গে আল্লারও দোহাই দেওয়া হয়েছে। এর থেকে প্রতিপাদ্য করা যায় বাংলা লোকসংগীত যে সংহত সমাজের সৃষ্টি, সেই সমাজ মূলে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিপোষক। তত্বপরি প্রয়োজনে কিংবা বিপদে উদ্ধারলাভের জন্য মানুষ যে তার ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে অনায়াসে ত্যাগ করে উদার মানসিকতার পরিচয় দিতে সক্ষম, উদ্ধৃত গানটি তারও বোধ করি একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

অশিক্ষিত সরল-প্রাণ রাখালেরা একপ্রকার গান গায় এগুলি 'রাখালীগান' নামে পরিচিত। রাখালী গান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বিচ্ছেদ ও খেয়াল। খেয়াল গানগুলি ভাব সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নয়, কিন্তু বিচ্ছেদ পর্যায়ের গানগুলি বড়ই গভীর। একটি বিচ্ছেদ পর্যায়ের গান উদ্ধার করা গেল—

দুঃখু কইও বন্ধের লাগ পাইলে গো নিরলে ॥
আমার বন্ধু রঙিচঙি
জলের উপর বান্‌ছে টঙ্গি গো
দুই হাত উড়াইয়া বন্ধে ডাকে
গো নিরলে দুঃখু কইও বন্ধের লাগ্ পাইলে ॥
আমার বন্ধু কালাচান
তিল কুড়াইয়া বুন্‌ছে ধান গো
সেই ধানও খাইলো রাজার আঁসে গো নিরলে,
দুঃখু কইও বন্ধের লাগ্ পাইলে ॥

এই ধরণের গানের সঙ্গে বাজে বাঁশী। এই গানগুলির সঙ্গে ভাটিয়ালীর গভীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

লেখক তাঁর গ্রন্থে জারী, সারি, ঘাটু ইত্যাদি সংগীত সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। পরিশেষে 'গাইনের গীত' সম্পর্কে উল্লেখ করে বর্ত্তমান আলোচনার সমাপ্তি টানা যেতে পারে। মৈমনসিংহের অন্যতম আঞ্চলিক সংগীত হ'ল এই 'গাইনের গীত'। এগুলি 'গাজীর গাইন' নামেও পরিচিত। গাইনের গীতে নানাপ্রকার আচার বিধি পালিত হতে দেখা যায়। এই গানে ব্যবহৃত বাদ্য-যন্ত্রের মধ্যে আছে মৃদঙ্গ ও করতাল। সাধারণতঃ একটি দীর্ঘ কেচ্ছা অবলম্বনে এই গীত রচিত হয়। যারা এই গান করে তারা পরিধান করে গেরুয়া রঙের বস্ত্র। আর এদের হাতে থাকে একটি 'আশা'-যার অগ্রভাগ ত্রিশূলের মত এবং এর মাথায় থাকে একটি অর্ধচন্দ্র। 'গাইনের গীতে'র প্রারম্ভে বন্দনা গীত হয়। এই বন্দনা-

গান জারী-গানের বন্দনা গানেরই অনুরূপ। জনপ্রিয় গাইনের গীতের পালাগুলি হ'ল—গফুর বাদশা, অলেক বাদশা, বেজান পরী, লাল পরী, গুলে হারমুজ, বারাস বাদশা, অসমা সুন্দরী ইত্যাদি। মূল পালা আরম্ভের পূর্বে লক্ষ্মীর বন্দনা গাওয়া রীতি। লক্ষ্মীর বন্দনা অংশে লক্ষ্মীর জন্ম বৃত্তান্ত দানের পর নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করা হয়। কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

শঙ্খনিয়া নারী জানো সংখ্য দিকে মন
দিবানিশি করে কেবল পিন্ধনের যতন ॥
চিন্তনিয়া নারী জানো চিন্তার দিকে মন
দিবানিশি করে কেবল সুস্বামীর ভজন ॥
পদ্মনিয়া নারী জানো পদ্ম ফুলের বাস
আপন পতি ঘরে থইয়া পরের করে আশ ॥
হস্তিনীয়া নারী জানো পায়ের গোছা মোটা।
সেই নারী বংশের মধ্যে থইয়া যায় খুটা ॥
ইহ'বা নাগিনী নারী যেবা পুরুষ আসে,
ছয় মাসের আয়ু কাটে তার আঞ্চলের বাতাসে ॥

এইবার কি কি কারণে নারী লক্ষ্মীছাড়া হয়, তা দেখা যাক—

সানঝা বেলা যেবা নারী হরিদ্রা বিলায়
হান্‌জু বছর রাড়ি অইয়া বাপের বাড়ী যায় ॥
সান্‌ঝা বেলা যেবা নারী গিরহে না দেয় বাতি
লক্ষ্মী দেবী উইঠ্যা বলে তার কপালে লাথি ॥
উঠান ফুইর্‌যা যেবা নারী দক্ষিণে দেয় সারা
আইত চাইলে লক্ষ্মী দেবী সীমানায় থাকে খাড়া
উপারে উঠিয়া নারী বড় রাও করে
লক্ষ্মীদেবী উইঠ্যা বলে ছেল্ মারছে অন্তরে ॥
দুপুর বেলা যেবা নারী জুইড়্যা দেয় গো বারা
লক্ষ্মীদেবী উইঠ্যা বলে ছাড়লাম আমি পাড়া ॥

আর লক্ষ্মীর সমান কল্যাণবতী নারী সম্বন্ধে বলা হয়েছে

রাইন্ধ্যা বাইড়্যা যেবা নারী মুখে দেয় পান
লক্ষ্মীদেবী উইঠ্যা বলে সেও আমার সমান ॥

সতীনারীর পতিকে তুলনা করে বলা হয়েছে এরপর—

সতী নারীর পতি জানো মজিদের চূড়া
অসতী নারীর পতি ভাঙ্গা নায়ের গুরা ॥

গাইনদের গানে যতগুলি প্রিয় বিষয় আছে, তার মধ্যে আছে খোঁপার বর্ণনা, শাড়ীর বর্ণনা ইত্যাদি।

আচিল বেসরের ঝাঁপা খুলিল চাকুনী
দশ নউখে বাছিয়া লইল আবের কাঁকই খানি।
একে তো আবের গো কাঁকই চন্দন ফোঁটা ফোঁটা,
চিরলে চালিয়া কেশ করিল গুটা গুটা।
চিরলে চালিয়া কেশ বায় বান্ধিল খোঁপা,
খোঁপাতে গুঞ্জিয়া দিল গন্ধ বেলী চাঁপা।
খেঁাপা না বান্ধিয়া বিবি খেঁাপার দিকে চায়,
মন খুশী না হইলে খেঁাপা খসাইয়া ফালায় ॥
তারপরে বান্ধিল খেঁাপা খেঁাপার নামে "এও"
খেঁাপার মধ্যে বান্ধা থাকে বিয়াল্লিশ গণ্ডা দেও।

এইবার শাড়ীর বর্ণনা—

তারপরে পইরাইল শাড়ী নামে "গঙ্গাজল"
নউখের উপর থইলে শাড়ী করে টলমল।

* * *

তারপরে পইরাইল শাড়ী শাড়ীর নামে "ইয়া,"
সেই শাড়ী পিইন্ধ্যা অইছিল্ চল্লির বেডির বিয়া ॥
হাতেতে লইলে শাড়ী মুইষ্ঠেতে মিলায়
মিরতিকাতে থইলে শাড়ী পিপ্ড়ায় লইয়া যায়।

'উত্তরবঙ্গের মেয়েলী গীত' অধ্যাপক হাসান হাফিজুর রহমান

ও আলমগীর জলীল সম্পাদিত এবং 'বাঙ্‌লা একাডেমী', ঢাকা থেকে প্রকাশিত (১৩৬৯)। গ্রন্থটিতে রংপুর ও রাজশাহী থেকে বেশ কিছু মেয়েলী গীত সঙ্কলিত হয়েছে। গানগুলি বিবাহ, জীবন-চিত্র, কাহিনী, কৌতুক, প্রেম : পরকীয়া ইত্যাদি কয়েকটি পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। সঙ্কলিত মোট গানের সংখ্যা ২১৪। তন্মধ্যে রংপুর থেকে সংগৃহীত গানের সংখ্যা ৭২ এবং রাজশাহী থেকে সংগৃহীত গানের সংখ্যা ১৪২। বিষয় বস্তুর বিচারে বিবাহের গানের সংখ্যাই সর্বাধিক—১১২টি ; তার পরেই স্থান 'জীবন চিত্র' পর্যায়ের গানের—৫৪টি।

বাংলা লোক সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে লোকসঙ্গীত জনপ্রিয়তম বিভাগ। শুধু তাই নয়, বাংলা লোকসঙ্গীতে সম-সাময়িক জীবনধারার সার্থক প্রতিফলন ঘটায়, এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক দিয়েও এর গুরুত্ব অপরিসীম। লোক সঙ্গীতের বহু বিচিত্র বিভাগের মধ্যে বিবাহ সঙ্গীতের প্রাচুর্যই সর্বাধিক। কারণ বাঙ্গালী সমাজে বিবাহে সংগীত স্ত্রী আচারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে। বিবাহে একদিকে যেমন বৈদিক রীতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের মাধ্যমে বৈদিক আচার আচরণ অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি স্ত্রী আচারও লৌকিক নিয়মে পালিত হয়ে থাকে। আর এমন কোন স্ত্রী আচার নেই যা নাকি সঙ্গীত ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হয়। এগুলির মধ্যে আছে গায়ে হলুদ, জল সওয়া, বরবরণ, কন্যা বিদায়, বাসী বিবাহ, বাসর আর কত কি।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে রংপুর ও রাজশাহী থেকে বিবাহে গীত হয় এমন সঙ্গীতই কেবলমাত্র সঙ্কলিত হয়নি, বিবাহ উপলক্ষ্য ছাড়াও মেয়েদের দ্বারা গীত হয় এরকম সংগীতও স্থান পেয়েছে। সেই কারণে সংগৃহীত গানগুলি থেকে সমাজ জীবনে স্ত্রীলোকের কি স্থান, আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকের মানসিক গঠন বৈশিষ্ট্য

সর্বোপরি আঞ্চলিক ভাষার নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য নিদর্শন লাভ করা যায়। 'মন, সমাজ এবং সেই সঙ্গে ভাষা সচল, সেজন্যে এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, একই অনুষ্ঠানের ওপর ধারাবাহিক ভাবে যুগে যুগে মেয়েলী গীত রচিত হয়ে চলেছে এবং সাথে সাথে সময়ের বিবর্তনের ছাপও এসব গীতে বেশ স্পষ্ট ভাবেই নিজের অগ্রগতির পরিচয় বিধৃত করে গেছে।' দু'একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে—

জোছ্‌নার রাতে ফেটিং ফোটে
তারা ঝিকিমিকি আরে কে
আমার বাবার বাড়ী রে সোয়ামী
কাচের আগ্‌না বান্দা আরে কে
আমার ভাইয়ের বাড়ীত রে সোয়ামী—
কাচের পৈকর বান্দা আরে কে
তোমার আগিনা ঝাড়ি গো দিতে
গায়ে পড়িবে ময়লা আরে কে
তোমার পৈকরে গোসল গো করিতে—
পায়ে ভরিবে কাদা আরে কে
তোমার জন্যে আনিছি গো কন্যা
জোড় এক সাবান আরে কে
তোমার জন্যে আনিছি গো কন্যা
জোড় এক গামছা আরে কে
আমার বাবার বাড়ী রে সোয়ামী
আছে লাক্স সাবান জোড় আরে কে
আমার বাবার বাড়ী আছে রে সোয়ামী—
দামী গাম্‌ছা জোড় আরে কে॥

এই গানটিতে লাক্স সাবানের উল্লেখ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। আর একটি গানে স্বামীকে ভাত পান ইত্যাদি দিতে বিলম্ব হওয়ায়

পত্নী স্বামী দ্বারা বেত্রাহত হয়েছে এবং ক্ষুব্ধ চিত্তে কন্যা তার ভাইকে বলেছে প্রহারকারী স্বামীর হাতে হাতকড়া লাগাতে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত স্বামীর বন্ধন মুক্তির জন্য তাকেই অনুরোধ জ্ঞাপন করতে দেখা গেছে। রাগের মাথায় স্বামীর শাস্তির জন্য বললে কি হয় যতই হোক স্বামী তো !

উপর ভিঁয়ত বড়ো বেলের গাছ না রে কে
আলু বুলে ব্যাল ঘাটে খুচি নারে কে
হ্যানি সোমে সাহু আল দূরের বনিজ নারে কে
সাহু চা'ল তাড়াতাড়ি ভাত নারে কে
ভাত দিতে হ'য়ে গেল দেরী নারে কে
পান দিতে হ'য়ে গেল দেরী নারে কে
সাহু মারে জোড়া বেতের বাড়ি নারে কে
কাঁদে 'সায়েরা' ধূলায়ে লুটায়ে নারে কে।
লাগাও ভাইধন সাহুর হাতত কড়া নারে কে
লাগাও ভাইধন সাহুর গালাত কড়া নারে কে
পারে গেল সোনা চক্কের পানি নারে কে
পারে গেল সোনা আংকির পানি নারে কে
ভাইয়ের ভাত বেলের আড়ায় পহর নারে কে
বাপের ভাত ও মাস বছরে নারে কে
খুলে দাও ভাইধন সাহুর হাতের হ্যানকাপ নারে কে
খুলে দাও ভাইধন সাহুর গলার গামছা নারে কে

উদ্ধৃত গানটিতে 'হ্যানকাপ (Hand Cup) শব্দটির ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

আলোচ্য সঙ্কলনে বিধৃত গানগুলি থেকে নারী মনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হ'ল আমাদের দেশের নারীরা অত্যন্ত সরল ও কোমল প্রকৃতির। নারীমনের চিন্তাভাবনা স্বামী-সংসার, সাজ-সজ্জা অলঙ্কার এবং পিত্রালয়ের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখানে উল্লেখ

করা যেতে পারে যে তথাকথিত আধুনিকতা এ সব সংগীতে প্রভাবই বিস্তার করতে পারেনি। আধুনিক সমাজে মেয়েলী গীতের প্রচলন প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। আর অবাধ স্ত্রী স্বাধীনতা নারীকে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করেছে। নারী আর কেবল ঘরকন্নার কাজেই ব্যাপৃত থাকেনা, তার কর্মক্ষেত্র পুরুষের মতই বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। তাই এখন যদি গীত রচিত হত, তাহলে নিশ্চয়ই নারীর চিন্তাধারার ব্যাপকতা প্রতিফলিত হত সেইসব গানে। যাই হোক, আমাদের আলোচ্য গানগুলিতে যে নারীকে আমরা পাই, সে নারী আক্ষরিক অর্থেই গৃহিনী। জগৎ বলতে তার নিজের সংসারটি মাত্র। কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এখানে লক্ষ্য করার মত—তা হ'ল যতই না কেন নারী 'কাদার ঢেলা' হোক অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত পরের ঘরের গৃহিনী রূপে আত্মপ্রকাশের জন্যই বিধি নির্দিষ্ট হোক, তবু পিত্রালয়ের স্মৃতি সে ভোলে না। দুঃখে, আপদে বিপদে প্রথমেই তার মনে পড়ে পিত্রালয়ের কথা। এর পেছনে রয়েছে মনস্তাত্বিক ও সামাজিক কারণ। জ্ঞানাবধি যে পিত্রালয়ে কন্যা মানুষ হয়, স্নেহ মায়া মমতায় পিতৃগৃহে অতিবাহিত দিনগুলি তার কাছে সুখ স্বপ্নের মতই প্রতিভাত হয়। তাই স্বামী গৃহে উপস্থিত হয়ে এবং সেখানে একাত্ম হয়েও—পিত্রালয়ের কথা বিস্মৃত হতে পারে না। আর সামাজিক কারণটি হ'ল—আমাদের দেশের সমাজে সর্বাপেক্ষা অবহেলিত ছিল স্ত্রীলোকেরা। আগে ছিল বহু বিবাহ প্রথা। ফলে সতীনের জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে হত স্ত্রীকে। তার ওপর ছিল ননদ ও শাশুড়ীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। এসবের বিরুদ্ধে মুখ ফুটে কিছু বলার পর্যন্ত অধিকার বা সুযোগ ছিলনা বধূর। তাই এই সব নিপীড়নের মধ্যে তাকে আকৃষ্ট করতো পিতৃগৃহের সুখকর পরিবেশ। বধূর একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল এ'টি। একটি গানে স্বামী দূরদেশে বাণিজ্য যাত্রা করলে, পত্নী তার পিতার কাছে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

কারণ পতির অনুপস্থিতিতে পিত্রালয়ই তার একমাত্র নিরাপদ স্থল।

ঘরের মাঝে বাজে রিনিঝিনি
পৈটাত যা'কে অতিশয় ভাল লাগে।
সাহু যাচে দূরের বাণিজ্যে
সাহু যাচে লক্ষ্মীর বাণিজ্যে
হামি যামো আপন বাবার দেশে
হামি যামো আপন চাচার দেশে
পথে যাইতে ঘাটালক করিমো মানা
পথে যাইতে ঘাটা ওয়ালাক করিমো মানা
বাবা দিয়েছে শও টাকার সিন্দূর
চাচা দিয়েছে শও টাকার তেল
ওই না সিন্দূর দিয়ে ঘাটাল'ক বোজামো
ওই না তেল দিয়ে ঘাটাল'ক মানামো
তাও না জি যামো হামি আপন চাচার দেশে
ঘরের মাঝে বাজে রিনিঝিনি
পৈটাত থাকে অতিশয় ভাল লাগে॥
সাহু যা'চে দূরের বাণিজ্যে
হামি যামো আপন ভায়ার দেশে।
পথে যাইতে ঘাটালক করিমো মানা।
পথে যাইতে ঘাটাওয়ালাক করিমো মানা।
ভায়া দিয়াছে হাজার টাকার শাড়ী
ওয় না শাড়ী দিয়ে ঘাটালক বোজামো
তাও যামো হামি চাচার দেশে॥

কন্যা যতই কেন পিত্রালয়কে তার নিরাপদ আশ্রয়স্থল কিংবা শেষ আশ্রয়স্থল বলে মনে করুক, তাই বলে শ্বশুরালয়ে তার ওপর যে পীড়ন কিংবা নির্যাতন হয়, তা সহজে মা-বাবা কিংবা বাপের

বাড়ীর কাউকে জানতে দিতে চায় না। কারণ সে জানে, এক্ষেত্রে তারা কেবল অন্তহীন দুঃখ পাবেন মাত্র। কন্যাকে সুখী করার জন্যেই তারা দেখে শুনে সম্বন্ধ স্থির করেছেন, কিন্তু তার পরেও যে কন্যা সুখী হয়নি এই নির্মম সত্য জানলে পর তাদের অনুশোচনার আর শেষ থাকবেনা। তাই এই ব্যাপারে কন্যা অত্যন্ত সতর্ক। তার কারণে বাপের বাড়ীর লোকজনকে দুঃখ দিতে সে নারাজ। অকস্মাৎ শ্বশুরালয়ে উপস্থিত ভাইকে তাই তার সনির্বন্ধ অনুরোধ—'আমার মা যেন শোনে না অ রে', 'আমার বাবা যেন শোনে না অ রে'।—

যেমন ভাসে পদ্মের রে পাতা
তেমনি ভাসি আমি কি ভাইধন অরে
খুঁটিত ক'রে আন্দি রে অন্ন
ঝিনায় দিয়ে বাঁটি কি ভাইধন অরে
মায়ে ব্যাটা যুক্তি ক'রে চালের বাতা ধরে কি
পোড়া চাঁচি ভাত ওরে ভাইধোন থালির বুকে
দেয় অ কিরে

ইয়া না কথা রে ভাইধন
আমার মা যেন শোনে না অ রে
ওয় না জি আমার মায়ে শুন্‌লে রে ভাইধন
দয়ে ঝাঁপ দিবে অ রে
ওয় না কথা রে ভাইধন
আমার বাবা যেন শোনে না অ রে
ওয় না জি কথা রে ভাইধন বাবা শুনলে রে
গলায় দড়ি দিবে অ রে
ইয় না জি কথা রে ভাইধন ভাবী যেন
শোনে না অ কিরে
আমার ভাবী শুন্‌লে রে ভাইধন—
যুগ্‌গের খোঁটা দিবে অ কি ভাইধন॥

গ্রন্থে সঙ্কলিত গানগুলির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয়। এমন অনেক গীত সঙ্কলিত হয়েছে যেগুলি একান্তভাবে হিন্দু সমাজের অনুষ্ঠানে গীত হবার জন্য রচিত। আবার বিপরীতক্রমে একান্তভাবে মুসলিম সমাজের অনুষ্ঠানে গীত হয়, এমন সংগীতেরও সংযোজন হয়েছে। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে উভয় সম্প্রদায়ের সংগীতেই পারস্পরিক ঐতিহ্যের প্রভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। এর থেকেই বোঝা যায়, 'যে স্তরের জনগোষ্ঠী থেকে এই গীতগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে অবাধ সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যিক সমন্বয় ঘটেছে। সচেতন বাছাই সেক্ষেত্রে কার্যকরী হয়নি। স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত পারিপার্শ্বিক প্রবণতাই সেখানে মূল প্রেরণা।'

আধুনিক যুগেও গ্রন্থে সঙ্কলিত গানগুলি—যেগুলি স্বভাবে ছড়াধর্মী এবং ছন্দের বিচারে ব্যাকরণ বহির্ভূত স্বতঃস্ফূর্ততার গুণে উপভোগ্য।

ঢাকা'র 'বাঙ্‌লা একাডেমী' প্রকাশিত 'লোক-সাহিত্যে'র ৫ম খণ্ডটি (১৩৭২ : আষাঢ়) বারমাসীর সঙ্কলন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই সঙ্কলনটি সম্পাদনা করেছেন মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। এই সঙ্কলনে রংপুর, মৈমনসিংহ, সিলেট এবং ফরিদপুর থেকে মোট ৩৩টি বারমাস্যা সঙ্কলিত হয়েছে। রংপুর থেকে সংগৃহীত বারমাস্যার সংখ্যা হ'ল ৬; মৈমনসিংহ থেকে সঙ্কলিত বারমাস্যার সংখ্যা ১৩; সিলেট এবং ফরিদপুর থেকে সংগৃহীত বারমাস্যার সংখ্যা হ'ল যথাক্রমে ৯টি এবং ৫টি। 'প্রসঙ্গ—কথা'য় 'বাঙ্‌লা একাডেমী'র পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন :

'লোক-সাহিত্য' পঞ্চম খণ্ডে বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত পঁয়ত্রিশটি বারমাসী মুদ্রিত হলো।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সঙ্কলিত বারমাসীর সংখ্যা যে ৩৩, তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

সঙ্কলিত বারমাসীগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশের

পূর্বে বারমাস্যা বা বারমাসী সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে। সাধারণভাবে বার মাসের সুখ-দুঃখের কাহিনীই হ'ল বারমাস্যা। কিন্তু বারমাস্যার গানে দেখা যায়—বৎসরের বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের পটভূমিকায়—বিরহী নায়িকার মনোবেদনার যে বিচিত্র রূপ, তারই সার্থক প্রকাশ। বারমাসী তাই মূলতঃ বিচ্ছেদ জনিত বেদনার বাঙ্ময় প্রতিফলন। এই শ্রেণীর গানের দু'টি বিভাগ—বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা দান এবং বিরহিনী নায়িকার মনোবিশ্লেষণ। কবি দৃষ্টি অনুযায়ী কোন বারমাসীতে দেখা যায় প্রকৃতি-বর্ণনার আধিপত্য: আবার কোন বারমাসীতে থাকে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ওপর সমধিক গুরুত্ব। বলা বাহুল্য দ্বিবিধ উপাদানের সার্থক সমন্বয়েই বারমাসীর কাব্যিক উৎকর্ষ নির্ভরশীল। আমাদের বাংলার লোক সঙ্গীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এই বারমাসী সঙ্গীত। অবশ্য উল্লেখ করা যেতে পারে যে শুধু বাংলার লোক সাহিত্যেই নয় ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের লোক সাহিত্যেও বারমাসী প্রচলিত আছে। সংস্কৃত সাহিত্যেও বারমাসীর সন্ধান পাওয়া যায়। তবে অনুমান করা হয়, এক্ষেত্রে লোক সাহিত্যের প্রভাবেই সংস্কৃত সাহিত্যে বারমাসীর সৃষ্টি—

'the Baromasi originated in folk-Poetry; that owing to its intrinsic attractiveness and its great popularity in Bengal, it found a place again and again in the classical literature......'।

সাধারণতঃ বারমাসী গানে মাস গণনা করা হয় বৈশাখ মাস থেকে। তবে মাস গণনার নির্দিষ্ট কোন রীতি নেই। বৎসরের যে কোন মাস থেকেই বারমাস্যার সূচনা হয়ে থাকে।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এই প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, 'তবে অগ্রহায়ণ এবং বৈশাখ মাসেই অধিক সংখ্যক বারমাসীর সূচনা হইয়াছে।' কিন্তু আমাদের আলোচ্য সঙ্কলনটিতে

ধৃত ৩৩টি বারমাসীর ১৪টিতে মাস গণনা শুরু হয়েছে বৈশাখ মাস দিয়ে, এর পরই স্থান কার্তিক মাসের। কার্তিক মাস দিয়ে শুরু হয়েছে ৮টি বারমাসী, অগ্রহায়ণ মাস দিয়ে শুরু হয়েছে মাত্র ৩টি গান। অপরপক্ষে ফাল্গুন ও চৈত্র মাস দিয়ে শুরু হয়েছে ২টি করে বারমাসী।

'লোক-সাহিত্যে'র ৫ম খণ্ডে ধৃত বারমাসীগুলির মূল বক্তব্য মোটামুটি এক হলেও নায়িকার নামের ক্ষেত্রে বহুল বৈচিত্র্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। বিরহিনী নায়িকা কখনও ধামী কখনও বা কমলা আবার কখনও বা সে আবিরা। তাই স্বভাবতঃই নায়িকার নামানুযায়ী বারমাসীগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত—ধামীর বারমাসী, কমলার বারমাসী, শান্তির বারমাসী, আবিরার বারমাসী, হুলবী কইন্যার বারমাসী, হুক্কিণীর বারমাসী, বিরহীর বারমাসী, ফুলোরার বারমাসী, ফাতেমার বারমাসী, পয়নবোর বারমাসী, মনুরার বারমাসী, অভাগীর বারমাসী, রাধারাণীর বারমাসী, তুরা কইন্যার বারমাসী, সাউদে কুমার ও শান্তি কইন্যার বারমাসী ইত্যাদি।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে বারমাসী হ'ল মূলতঃ বিরহ সঙ্গীত। কিন্তু মৈমনসিংহ থেকে সংগৃহীত ১ম বারমাসী গানে বিরহ বেদনার কোন ছায়াপাত ঘটেনি। এই বারমাসীটিতে বর্ণিত হয়েছে—নসা মিয়ার বাড়ীতে প্রস্ফুটিত বিভিন্ন ধরণের কুসুম চয়ন করে নায়িকা যেন ভিন্‌দেশী নাগরের সঙ্গে পাশা খেলতে যায়। পাশা খেলায় প্রতি ক্ষেত্রেই অবশ্য নায়িকা পরাজিত হয়েছে এবং নায়িকা বিভিন্ন উপকরণ প্রেরণ করতে নিষেধ করেছে—

প্রথম না আষাঢ় মাসে
খেলবাম পাশা চাইরী হাতে গো মায়া
খেলবাম পাশা বিনদেশী নাগরের সনে
কি ফুল তুলিয়া দেও
ফুল তুলিয়া দেও গণ্ডব নাগেশ্বরী ॥

নসা মিয়ার বাড়ীতে গো
হাজার ফুলের ঝারি ॥
ঝালুকা খেলিতে যদি গো মায়া
হারী বিনদেশী নাগরের সনে
বছর না ফিরিতে ফিরব গো মায়া
তোমারই না ঘরে কি
ফুল তুলিয়া দেও
ফুল তুলিয়া দেও ফুল গণ্ডব নাগেশ্বরী ॥
নসা মিয়ার বাড়ীতে গো
হাজার ফুলের ঝারি ॥
পাশা খেলিতে গো মায়া
হারী বিনদেশী নাগরের সনে
চৈতে না পাঠাইও মায়া গো
আমার তরে চালিতা
কি ফুল তুলিয়া দেও
ফুল তুলিয়া দেও ফুল গণ্ডব নাগেশ্বরী ॥
নসা মিয়ার বাড়ীতে গো
হাজার ফুলের ঝারি ॥
পাশা খেলিয়া গো মায়া
হারী বিনদেশী নাগরের সনে
বৈশাখে না পাঠাইও মায়া গো
পূবের ক্ষেতের নালিতার পাত
কি ফুল তুলিয়া দেও
ফুল তুলিয়া দেও ও ফুল গণ্ডব নাগেশ্বরী ॥
নসা মিয়ার বাড়ীতে গো
হাজার ফুলের ঝারি। ইত্যাদি।

৬ সংখ্যক 'বন্ধুয়া বারমাসী'তে এক এক সঙ্গে দু'মাসের উল্লেখ রয়েছে—

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠি দুই মাস আইল
　　গাছে পাকনা আম,
কারে বা খাওয়াইব আমি
　　দেশেতে নাই শ্যাম রে।
ফাঁকি দিয়া বন্ধু আমার কোথায় লুকাইল রে॥
আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস আইল
　　আমার না ফুরাইল আশ,
ভরা যৌবন লইয়া অভাগিনী—
　　করে হায় হুতাশ রে।
ফাঁকি দিয়া বন্ধু আমার কোথায় লুকাইল রে॥
ইত্যাদি।

সিলেট থেকে সংগৃহীত ৪ সংখ্যক বারমাসীর শেষাংশে দীর্ঘ বিরহ-বেদনার পর নায়িকার সঙ্গে নায়কের মিলনের কথা বর্ণিত হয়েছে। বছরও শেষ হল, হতভাগিনী নায়িকার বিচ্ছেদ জনিত বেদনারও অবসান হ'ল—

চৈতে বছর শেষ
সাধু আইলা নিজ দেশ
করি আইলা বনিজ লংকার।
দুখিনীর গেল দুখ
মনে পাইলা বড় সুখ
সাধু আইলা করিয়া বেপার।
চৈতের রদির জ্বালা
দুক্ষিনীরে ভুলি গেলা
ঘরে পাইয়া সাধু আপনার।
শ্রীধর বানিয়া কয়
কেউ নাহি কর ভয়
সকলি ঘরে আসিবা একবার।

শেষ পর্যন্ত মিলনের আশ্বাস বাণীই বড় হয়ে উঠেছে গানটিতে। সিলেট থেকে সংগৃহীত ৮ সংখ্যক গানটি 'বিয়ার বারমাসী'। গানটির বিষয়বস্তু মোটামুটি ভাবে ছ'টি ভাগে বিভক্ত—কোন্ কোন্ মাসে বিবাহ হয়না অথবা বিবাহ সম্পর্কিত বাক্যালাপও বন্ধ থাকে অপর পক্ষে কোন সময় বিবাহের পক্ষে অনুকূল। প্রথমে বিবাহ নিষেধ সম্পর্কিত কিছু অংশ উদ্ধার করা গেল—

শাওন মাস বিষম মাস
বিয়া নাইসে অয়.
এই মাসে বিয়া অইলে
সর্বনাশ ঘটয়।
শাওনে অইছিল বিয়া
বিপুলা সুন্দরী,
কাল রাইতকুর মাঝে বেটি
অই গেছিল রাড়ী।
এর লাগি শাওন মাসে
বিয়া অইতে মানা,
এই মানা করিয়া গেছৈন
ময় মুরুব্বী দানা।
ভাদো মাসে শাছরো মতে
বিয়া শাদী মানা,
কিওর লাগি মানা
কেউ অই জানে না।
বিয়াত সামান্তি কথা
দেপ্তা পূজা সইত,
এ মাসো করইন্না কেউ
হককলি রইত। ইত্যাদি।

এইবার বিবাহের পক্ষে অনুকূল সময়ের বর্ণনা—

ফালকুনো বসন্তের বাও
কুরিলার ডাক,
বিয়ার ডামাডোল খালি
ঝাইন শানাইর হাক।
আকায়া বকায়া কাম
থাকে যত ইতি,
হকোল তাত্ মন দেইন
চাইয়া পাঞ্জি পুথি।
জায়জোগাড় চাইরো ভায়
বস গোল্লা ফুটে,
জামাই কন্যার যাওয়া দেখাত
পুয়াপুড়ি ছুটে। ইত্যাদি।

'বাঙ্লা একাডেমী' (ঢাকা) কর্তৃক প্রকাশিত 'লোক-সাহিত্যে'র ৭ম খণ্ডটি আনুষ্ঠানিক লোকগীতির সঙ্কলন হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে (১৩৭৬)। এই খণ্ডটি সম্পাদনা করেছেন মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। সঙ্কলনে ধৃত লোকগীতিগুলি সংগৃহীত হয়েছে বর্তমান বাংলা দেশের অন্তর্গত মৈমনসিংহ, রংপুর, ঢাকা, ফরিদপুর এবং কুমিল্লা থেকে।

আনুষ্ঠানিক গীত ইংরেজীতে 'Calendric Song' নামে পরিচিত। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট সঙ্গীতগুলিই হ'ল আনুষ্ঠানিক গীত। আনুষ্ঠানিক গীত নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে গীত হয় না। মোট ৮২টি গীত এই খণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছে। সঙ্কলিত গানগুলির মধ্যে আছে ব্যাঙ বিয়া বা পুতুলা বিয়ার গীত এবং হুদুমা গীত—যেগুলি বৃষ্টির প্রার্থনায় গীত হয়ে থাকে। ওন্নিগান, হুলোই গীত এবং বাঘাই পীরের শিরনী গানগুলি মাঙ্গন উপলক্ষে গীত হয়ে থাকে। মাড়োয়ার গীত, ফোরোল ডুবার গীত, উমালী বাড়ার গীত, মেহদী তোলার গীত ও হাংগোর ধরা

গীতগুলি আসলে বিবাহ সঙ্গীত। হাইট্যারা গীত, ত্যাল পান গুয়ার গীত ও সাইটোরের গীত নবজাতক সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে গীত হবার রীতি। আর বেরা ভাসান গীত আসলে মানতের গান।

গ্রাম বাংলার মানুষের প্রধানতম জীবিকা হ'ল কৃষি। আর কৃষির জন্য প্রয়োজন হ'ল উপযুক্ত সময়ে জলসেচের। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক, তবু কৃষিকার্যে জলসেচের ব্যাপারে আজও মানুষকে বিশেষ ভাবে নির্ভর করতে হয় প্রকৃতির করুণার ওপর। তাই খরা অথবা অনাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতে গ্রাম বাংলার মানুষের করুণ কণ্ঠের আবেদন আকাশে বাতাসে মুখরিত হতে থাকে বৃষ্টি প্রার্থনায় অনুষ্ঠিত আনুষ্ঠানিক গীতের মাধ্যমে—

আল্লা মেঘ দে পানি দে,
ছায়া দে রছুল।
ছায়াদে দে রছুল রে আল্লা
মেঘ লামাইয়া দে,
ঝুম ঝুমাইয়া মেঘের পানি
ক্ষেত ভাসাইয়া দে॥
আম পাতা লড়ে চড়ে
কাঁডল পাতা ঝরে
এক ফোডা পানির লাইগ্যা
কাইন্দা কাইন্দা মরে,
আল্লা মেঘ দে, পানি দে
ছায়া দে রছুল।

নবজাতক সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিক গীতের অন্যতম হ'ল হাইট্যারা অনুষ্ঠানের গীত। এই পর্যায়ের একটি গানের কিছু অংশ উদ্ধৃত হ'ল। উদ্ধৃত অংশে নবজাতককে সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

আইজ বড় আনন্দ মনার

মনার আইজ বড় আনন্দ।
পন্থরিয়া লোকে জিজ্ঞাসে
তোমার বাড়ী কিসের বাত্তি বাজে
কিসের বাত্তি বাজে গো
কিসের বাত্তি বাজে॥
নয়াত বাগে গো আমার
নয়া ফুল ফুডিছে
নয়াত বাগে গো আমার
নয়া ফুল ছিডিছে
সেই ফুলেরই জেলহাসে
সেই ফুলেরই সুভাসে
ধ্বনি ধ্বনি বাত্তি বাজিছে॥

এই পর্যায়ের গানে অনেক ক্ষেত্রেই নবজাতককে গোপাল বা কৃষ্ণ বলে চিত্রিত করা হয়েছে। আসলে পৌত্র বা দৌহিত্রের ওপর দেবত্বের আরোপের মাধ্যমে মাতামহী বা পিতামহীর অন্তহীন স্নেহই অভিব্যক্ত হয়েছে—

বৃন্দাবনের চান্দ—
আমার হেস্যে ওঠে প্রাণ নবরসে
বিনা সুতায় বুইনো জোরো
আমি সাজাই গোকুল চান্দ,
আমার হেস্যে ওঠে প্রাণ—নবরসে॥
বৃন্দাবনের চান্দ
আমার হেস্যে ওঠে প্রাণ নব রসে
ওরে, বিনে জলে খোইসো চন্দন
আমি সাজাই নাতি চান্দ,
আমার হেস্যে ওঠে প্রাণ নবরসে॥

'লোক-সাহিত্যে'র আলোচ্য খণ্ডটি সুসম্পাদিত। প্রতিটি গানের মধ্যেকার আঞ্চলিক দুরূহ শব্দগুলির অর্থ পাদটীকায় সংযোজিত হওয়ায় যে কোন পাঠকের পক্ষে গানগুলির রস আস্বাদন করা সম্ভবপর হয়। ব্যাঙ বিয়ের অনুষ্ঠান, পুতুল বিয়ের অনুষ্ঠান, হাইট্যারা অনুষ্ঠান, মেহেদী তোলা অনুষ্ঠান, শিরনী গানের মাঙ্গন ইত্যাদির আলোক চিত্র সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির মর্যাদা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধ্যক্ষা খোদেজা খাতুন রচিত 'বগুড়ার লোক-সাহিত্য' (১৩৭৭) গ্রন্থটি ঢাকা'র 'বাঙলা একাডেমী' কর্তৃক প্রকাশিত।

এই গ্রন্থের প্রথম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম অধ্যায়ে বগুড়া জেলায় প্রচলিত লোক সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মুখ্যতঃ এই আলোচনায় বিবাহ সঙ্গীতগুলিই স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যে আছে হল্‌দি কোটা, কনে বিদায়, বর-কনের কথোপকথন, শা-নজর ইত্যাদি সম্পর্কিত সঙ্গীত। 'হল্‌দি-কোটা'র একটি সঙ্গীত লেখিকা সঙ্কলন করেছেন, যে সঙ্গীতে আনন্দোচ্ছ্বাসের পরিবর্তে তীব্র বেদনাবোধ মূর্ত হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই বেদনা প্রকাশিত হয়েছে কন্যার তরফে। অভাব পীড়িতা জননী কোন এক সময়ে বুঝিবা বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন যে পরের ঘরের বউ যে হবে তাকেই খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করতে হচ্ছে। বিবাহের শুভদিনে কন্যার আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় জননী হৃদয় যখন বেদনাপ্লুত, তখন সেই পূর্ব্বের বিরক্তি প্রকাশের সমুচিত জবাব দেয় কন্যা—

হলদি না উর্‌সে রে দয়্যার মাও
ঘরে যায়্যা শোতে॥
এখন ক্যানো কান্দ গো দয়্যার মাও
লালিয়্যা লালিয়্যা।
এ্যানা ভাতের জন্যে গো দয়্যার মাও
কতই কতা কচো॥

এখন ক্যানো কান্দ গো দয়্যার মাও
ভাতের থালি লয়্যা।
হামার ভাত দিয়্যা গো দয়্যার মাও
অতিত বিড্যায় কর।
হামার ভাত দিয়্যা গো দয়ার মাও
ফকির বিড্যায় কর॥

একটি সঙ্গীতে কন্যা তার পিতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বহু দূরে তার বিবাহ দেবার জন্যে। কন্যা অভিযোগ করেছে লোভী পিতা, কন্যার কথা না ভেবে মাংস ভক্ষণের লোভে এবং অর্থলাভের পরিপ্রেক্ষিতে কন্যার সম্বন্ধ করেছেন দূর দেশে। সচরাচর বিবাহে বরকেই কন্যাপক্ষকে পণ দিতে হয়, কিন্তু আলোচ্য সংগীতটিতে কন্যার পিতার, পাত্র পক্ষের কাছ থেকে পণ নেওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে—

কাগজ—কাটা ঘরেতে
বাতি ঝলম্‌ল করোচে।
সেই না বাতির ঝলকে
বাপজান কোরান পড়োচে॥
হায়—হাস্‌কোল বাবাধন—
তোমার শরীলে দয়্যা কম।
খাসী খাওয়ার লোভেতে
বিয়্যা দিছ্‌ল্যা দূরে যে
ট্যাকা লেওয়ার লোভেতে
বিয়্যা দিছ্‌ল্যা দূরে যে॥

একটি সঙ্গীতে কন্যা বিদায়ের করুণ চিত্রটি চিত্রিত হয়েছে। বাস্তবিক কন্যা বিদায়ের মত করুণ ব্যাপার আমাদের সমাজে খুব কমই আছে। দীর্ঘদিন ধরে যে কন্যাকে কত আদর যত্নে মানুষ করা হ'ল, সেই কন্যাই চিরদিনের মত হয়ে গেল পর। মা বাবা

পরিচিত আত্মীয় স্বজনের সংসার ত্যাগ করে কন্যাকে যেতে হয় সম্পূর্ণ অপরিচিত শ্বশুরালয়ে—

চান্দ ওঠেরে আল্লা আসমান জুড়িয়া
সুরুজ ওঠেরে মাও মুখখানি ঘামিয়া
খুলিত আচ্ছে গো মাও সৈয়দ জাদার ব্যাটা
খুলিত আচ্ছে রে মাও মোহল জাদার ব্যাটা
কান্দোন কান্দে রে বিবি মায়ের কোলে বস্যা
কান্দোন কান্দে রে বিবি বাপের কোলে বস্যা
আজক্যার রাতি রে বাবা না দেইয়ো ছাড়িয়্যা
আজগ্যার রাতি গো মাও না দেইয়ো এড়িয়্যা ।

বিবাহ সঙ্গীতগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে বাস্তবিকই অনবদ্য । কোন সঙ্গীতে আছে সতীনের জ্বালার কথা, কোন সঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছে দাম্পত্য প্রেমের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চিত্র, কোনটিতে আবার কন্যার স্বামীর প্রতি আস্থা অভিব্যক্ত; ননদ, জা প্রভৃতির প্ররোচনায় স্বামীর দ্বারা নির্য্যাতিত বধূর বিড়ম্বিত জীবন-চিত্রও কোন কোন সঙ্গীতের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে ।

জাত বলে কিছুটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। তদুপরি সংকলনে গৃহীত গীতিকাগুলি কথ্যভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী লিখিত হয়েছে। ফলে দুর্বোধ্যতার পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্পাদক কিন্তু গীতিকাগুলিকে সহজবোধ্য করার জন্যে দুর্বোধ্য আঞ্চলিক শব্দগুলির অর্থ পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট করেছেন।

সংযোজন

লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান যেমন—ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, সঙ্গীত, কথা ও গীতিকার সঙ্গে আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ সংকলন বিষয়ে উল্লেখ করা না হয়। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহের ন্যায় এই আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহেও বহু মানুষকেই ব্রতী হতে দেখা গেছে। এই সব সংকলকদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, রাজকুমার কাব্যভূষণ, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, হরিদাস পালিত, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। আমরা অবশ্য সীমিত পরিসরে এঁদের সকলের প্রয়াস সম্পর্কে আলোচনা করতে অক্ষম, তবে কয়েকজনের প্রয়াস সম্পর্কে উল্লেখ করে বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার প্রায় প্রথম থেকেই আঞ্চলিক শব্দ সংকলনে এদেশীয় মনীষী ও লোক সংস্কৃতি প্রেমিক মানুষদের সজাগ দৃষ্টি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৯ সনের ২য় সংখ্যায় সতীশচন্দ্র ঘোষ রচিত 'গ্রাম্য-শব্দ-সংগ্রহ' নামক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই নিবন্ধটিতে বরিশাল জেলা থেকে সংগৃহীত ২১৬টি গ্রাম্যশব্দ অর্থসহ প্রকাশিত হয়েছে। সংকলিত শব্দগুলির মধ্যে কয়েকটি বিচিত্র শব্দের অর্থসহ উল্লেখ করা হ'ল—

আনাষ্টন—অভাব।

ওর্‌সা—শয়নগৃহ সংলগ্ন রন্ধনগৃহ।

কড়ুয়া—আকৃশী।

কয়া—একপ্রকার হরিদ্বর্ণ ফড়িঙ্।

কাকই—চিরুণী।

খাড়াল—মেঝে।
বাও—উত্তর।
খান্দার—ঝগ্‌ড়া।
নিতা—নিমন্ত্রণ।
যুয়ান্—বলশালী।
ছোরানি—চাবি।
চিব্‌ড়ী—পানের পিক।
বিলই—বিড়াল।
বরই—কুল ফল।
মাথারী—স্ত্রীলোক।
হুঙ্গান—জ্বালান।
হুরুম—মুড়ি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩১৪ সনের ৪র্থ সংখ্যায় রাজকুমার কাব্যভূষণের 'গ্রাম্যশব্দকোষ ও পাবনার গ্রাম্য শব্দাদি সংগ্রহ' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে লেখক পাবনা জেলা থেকে সংগৃহীত কিছু গ্রাম্য শব্দ সংকলন করেছেন।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩১৬ সনের ৪র্থ সংখ্যায় দেবেন্দ্রনাথ বসু রচিত 'নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ' শীর্ষক ক্ষুদ্র নিবন্ধটিতে ৩৮টি গ্রাম্য শব্দ ও সেগুলির অর্থ প্রকাশিত হয়েছে। সংকলিত কয়েকটি শব্দ অর্থসহ উল্লিখিত হ'ল—

টিপা—কৃপণ।
খস্তারাম—বলবান।
লিকি—উকুন।
হরবড়—হানি।
উট্‌কান—খুঁজে বার করা।
আতায় কাতায়—যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করা।

ওক—বসন।

ঘুরাকী—যে স্ত্রীলোক গোপনে পরপুরুষ গামিনী হয়।

এই একই সংখ্যায় পরমেশপ্রসন্ন রায়ের 'ঢাকার গ্রাম্য শব্দ' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে লেখক ঢাকা জেলার বিশেষতঃ মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ অর্থসহ সঙ্কলন করেছেন। শব্দগুলিকে লেখক বর্ণমালার ক্রম পরম্পরায় সাজিয়ে দিয়েছেন। কয়েকটি উল্লিখিত হ'ল—

অ্যাজা—মাতামহ।

আইলসা—আগুন রাখবার মৃৎপাত্র।

আগর—শক্ত।

আইজার্ন—বন্ধ করা।

উফড়া—মুড়কি।

উরুণ—মুড়ি।

উরুস—ছারপোকা।

কোকা—খোকা।

কেইছা—কেঁচো।

গয়া—ফড়িং বিশেষ।

গোদানি—উল্কী।

চঙ্গ—মই।

চাঙ্গ—মাচা।

চুকা—টক।

চেল্লা—বিছা।

ছেপ—থুথু।

ঠেটাপানি—বজ্জাতি।

ধুরু—অবিশ্বাসসূচক অব্যয়।

দৈলা—পিটালি।

টাবলা—বহুভাষী বাচাল।

জো—তুক-তাক।

বাউলী—বেড়ী॥

বিহান—প্রাতঃকাল।

মেরকুষ্টি—অতি দুর্বল।

ভাইস্তা—ভাইপো।
সপ—মাদুর।
লোড়—দৌড় দেওয়া।
সিংটাল—হিংসা।
সুলপি—সড়কি।
হাবাইতা—লোভী।
হাচুন—ঝাঁটা।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩১৭ সনের ১ম সংখ্যায় রাজকুমার বেদতীর্থ-স্মৃতিতীর্থ লিখিত 'বঙ্গীয় গ্রাম্য ভাষাতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে গ্রাম্য শব্দকোষ রচনার প্রয়োজনীয়তা ও এই ধরণের শব্দ সংগ্রহের গুরুত্ব বিষয়ে উপযুক্ত উদাহরণসহ আলোচিত হয়েছে। লেখকের ভাষায়, 'যেমন ভিত্তি স্থাপন করিয়া তবে তাহার উপর অট্টালিকা গাঁথিতে হয়, তেমনই শব্দাবলীর অর্থ বুঝিয়া তদনন্তর গঠন প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করার প্রয়োজন। কেবল যে পুস্তকধৃত চলিত শব্দাবলীর অর্থ বুঝিবার জন্য গ্রাম্য শব্দকোষের প্রয়োজন, তাহা নহে; পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ বাসিগণের পরস্পর ভাষা বুঝিবার জন্যও চলিত শব্দাভিধানের প্রয়োজন।' [পৃঃ ৩৪]

লেখক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দ বিভিন্ন শব্দ-সংগ্রাহক মারফৎ সংগ্রহ করেছিলেন এবং মুর্শিদাবাদ, সাঁওতাল-পরগণা, মালদহ, দিনাজপুর ইত্যাদি কয়েকটি জেলা থেকে গ্রাম্য শব্দাদি সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন—'যদি মাতৃভাষার অভাব পূরণ একান্ত আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা হইলে উপরিউক্ত জেলা সমূহের শব্দসংগ্রহ বিষয়ে সকলে আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি ক্ষুদ্রশক্তি, সাধারণের সহানুভূতি না পাইলে এই বহু আয়াসের কার্য্য কেমন করিয়া সমাপন করিব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎ মিলিত হইলে তবে মহানদীর সৃষ্টি হয়। বহু তারকা সমুদিত হইলে তবে অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার কতকাংশে অপনীত হয়। আমার পক্ষেও তাই। সাধারণে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। শব্দ সংগ্রহাদি করিয়া দিয়া সৎ-পরামর্শ প্রদান করিয়া আমাকে প্রোৎসাহিত রাখুন।' [পৃঃ৩৫-৩৬]